ভূ-দৃশ্য পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য হ্রাসঃ আশুগঞ্জ উপজেলার উপর একটি পর্যবেক্ষণ মূল্যায়ন

এম.ফিল.থিসিস

উপস্থাপনায়

সুরাইয়া আক্তার

রেজিঃ নং ৫৫

শিক্ষা বর্ষঃ ২০১০-২০১১

তত্ত্বাবধায়ক

ড. তৌহীদা রশিদ

অধ্যাপক

ভূগোল ও পরিবেশবিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সুরাইয়া আক্তার ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ২০১০-১১ বর্ষে এম ফিল প্রোগামের একজন ছাত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. তৌহীদা রশিদ এর অধিনে "ভূ-দৃশ্য পরিবর্তন ও জীব বৈচিত্র্য হ্রাসঃ আশুগঞ্জ উপজেলা উপর একটি পর্যবেক্ষণ মূল্যায়ন" শিরোনামে গবেষণা করে থিসিসের কাজ সম্পন্ন করেছেন। আশা করি থিসিসের কাজটি সন্তোষজনক ভাবে প্রস্তুত করতে পেরেছেন।

নির্দেশনায়
ড. তৌহীদা রশিদ
অধ্যাপক
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ, অবিবেচনা প্রসূত সম্পদের আহরণ, কৃষি ভূমির সম্প্রসারণ, বনভূমি সংকোচন, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, অধিক ফলনশীল শস্য উৎপাদনের জন্য পরিবেশের সাথে ভারসাম্যহীন প্রযুক্তি তথা রাসায়নিক সার কীটনাশক প্রয়োগ, লোকজ ঐতিহ্যের বিলুপ্তি পরিবেশের বিরূপ পরিবর্তন অর্থাৎ এ সবের একক এবং সামগ্রিক প্রভাব অনেক প্রজাতি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিলীন হয়ে গেছে। যার ফলে লোপ হয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। আর যেটুকু আছে তাও আবার হুমকির সম্মুখীন। গবেষণা এলাকাটি খুব দ্রুত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে যে জন্য আশুগঞ্জ এলাকাটিকে গবেষণার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল।

আশুগঞ্জ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পনগরী ও বাণিজ্য শহর। বিদেশেও আশুগঞ্জ অনেক পরিচিত। বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আশুগঞ্জ এলাকাটির গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় অর্থনীতিতে আশুগঞ্জ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এখানে দেশের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা তথা শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আশুগঞ্জ সার কারখানা, আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পেট্রোবাংলার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, খাদ্যশস্য সাইলো বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। এছাড়া এখানে খুব শীঘ্রই রূপান্তরিত গ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মাণের কাজ শুরু হবে। সড়ক যোগাযোগের জন্য ভারতীয় ট্রানজিটের নৌবন্দর হিসেবে আশুগঞ্জকে ব্যবহারে ভারতীয় উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আশুগঞ্জের গুরুত্ব আরো অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সিলেট এবং চট্রগ্রামের সিংহভাগ চাউল আশুগঞ্জ থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এখানে ছোট বড় ছয় শতাধিক চাতাল ও অটো রাইস মিল গড়ে উঠেছে এবং এই সেক্টরটি একটি শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর ফলে উক্ত সেক্টরে প্রায় অর্ধলক্ষ লোক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। ক্রমে ক্রমে ব্যবসা এবং শিল্পক্ষেত্রে আশুগঞ্জের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মেঘনা নদীকে কেন্দ্র করেই আশুগঞ্জ থানাটির উত্থান ও বিকাশ। আশুগঞ্জ থানা থেকে মেঘনার রেলপথ ও সড়ক সেতু এই দুটি সেতুকে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকা ও বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের সাথে সকল প্রকার যোগাযোগ এর বিকাশ ঘটে চলেছে। ফলে এই এলাকাটি ধীরে ধীরে উন্নত নগরের দিকে বিকশিত হচ্ছে। সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যালয়, হ্রদ, পার্ক, বাজার ইত্যাদি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিচারে আশুগঞ্জ একটি সুন্দর স্থান। এর নৈসর্গিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমে মেঘনা নদী, পূর্বে সোনাহর এ তিতাস নদী এবং নগরের অভ্যন্তরের জলাভূমি ও ফসলী জমি এবং অসংখ্য গাছপালা। কিন্তু নগর নির্মাণের সময় আমরা যদি এই সব উপাদান সঠিক ভাবে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় এবং জলাভূমি সদ্যব্যবহারের পরিবর্তে নির্মাণ করা হয় অপরিকল্পিত দালান কোঠা তাহলে এই অঞ্চলের জীব বৈচিত্র্য সংকটাপন্ন হয়ে পরবে। যোগাযোগ ক্ষেত্রটিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এই অঞ্চলে যোগাযোগ মাধ্যমটি বেশ উন্নত এখানে রয়েছে রেল লাইন, সেতু এবং সড়ক সেতু। যে কারণে এই অঞ্চলটি খুব দ্রুত নগারায়ণের দিকে অগ্রসরমান হচ্ছে। যার জন্যে এই অঞ্চলের ভূদৃশ্যের ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এছাড়াও ভারত বাংলাদেশ মহাসড়কটি এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আশুগঞ্জ এলাকাটি আর্ন্তজাতিক নৌ-বন্দর হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। যার ফলে এই অঞ্চলের আবাসিক অবস্থার আরোও পরিবর্তন হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যে জন্য এই অঞ্চলটি নিয়ে গবেষণা করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পরে।

গবেষণার জন্য আশুগঞ্জ এলাকার সকল অধিবাসীদের সাথে আলোচনা মাধ্যমে আশুগঞ্জ এলাকার ইকোলজিক্যাল জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা হয়েছে। এই গবেষণা কাজের জন্য গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসাবে যে সকল অধিবাসী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আশুগঞ্জ এলাকার উপর নির্ভরশীল কেবল মাত্র তাদের কাছ থেকেই প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। গবেষণা এলাকায় বিগত বৎসরে ভূমিব্যবহার ও ইকোজিক্যাল পরিবর্তনের ধারা পরিমাপের জন্য দূর অনুধাবন কৌশলের সহায়তা নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সময় জমিতে কীটনাশক দেওয়ার প্রবণতা, বৃক্ষ নিধন প্রবণতার হার, মেঘনা নদীর নাব্যতা এবং সার্বিক ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনশীলতার বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। গবেষণা এলাকার সংরক্ষিত বনভূমি, কৃষিজমির অবস্থানিক পরিবর্তনশীলতার বাস্তব চিত্র পাওয়ার জন্য ১৯৫০ সালের মৌজার নকশা ও ১৯৮৯, ১৯৯৪, ২০০০, ২০০৪, ২০০৯ ও ২০১৪ সালের ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এজন্য মাঠ জরিপের সময় গবেষণা এলাকার চারটি ইউনিয়নের ১৬ টি মৌজার সার্বিক ইকোলজিক্যাল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নোট করা হয়েছে। তাছাড়া নদী ও সরু খাল পথে যেয়ে নদীর পাড় এলাকার ভূ-দৃশ্যগত পরিবর্তনগুলো পর্যালোচনা করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, এই অঞ্চলে যে সব প্রধান কৃষিজ ফসল রয়েছে তা হল ধান, পাট, সরিষা, গম, আলু, পেঁয়াজ রসুন। এর মধ্যে কিছু প্রজাতি বিলুপ্ত প্রায় সেগুলো হল আখ, কাকরুল, মটর, কেওড়া ধুন্দা। এই অঞ্চলটি মৎস্য চাষের জন্য বেশ উপযোগী। তবে বর্তমান সময়ে মৎস্য চাষের হার কমে এসেছে এর কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এই অঞ্চলের প্রাণী প্রজাতির মধ্যে ছিল বিভিন্ন ধরনের সাপ, সোনা গুই, বিভিন্ন ধরনের পাখি সাদা বক, উভচর, সরীসৃপ পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণী যার কিছু কিছু হারিয়ে গিয়েছে। আশুগঞ্জ অঞ্চলের বড় ধরনের পরিবর্তন গুলোর মধ্যে রয়েছে বেশি ভাগ মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

পেশা পরিবর্তন যেমন ফসলি জমি গুলোর অনেকাংশে ধান সিদ্ধ দেওয়ার জন্য বয়লার তৈরি করা হচ্ছে। যার জন্য ফসলি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এছাড়া সারকারখানা ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে।

জলাশয়ের পরিবর্তনের মধ্যে দেখা যায় যে, আশুগঞ্জ এলাকার অভ্যন্তর দিকে কিছু কিছু জলাশয় ভরাট করে বসতি তৈরি করা হয়েছে। কিছু খাল পানি শূন্য হয়ে সে গুলোতে ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। যদি এই ভাবে আরো পরিবর্তন চলতে থাকে তা হলে এই অঞ্চলের জীব বৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

এক সময় প্রচুর জলাভূমি ছিল এই অঞ্চলে। মানব সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে এই জলাভূমির আয়তন কমতে শুরু করেছে। বলা যায় যে, জলাভূমি গুলো বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন। জনসংখ্যা বাড়ার ফলে বসতি গড়ে তোলার জন্য জলাভূমির পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। তা ছাড়া কৃষি জমির বৃদ্ধি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন, জাতীয় স্থানীয় এবং গ্রাম পর্যায়ে অপরিকল্পিত ভাবে রাস্তা ঘাট নির্মাণ, সংকীর্ণ কালভার্ট, পলি জমা গাছ কাটা, গবাদি পশুর অতিরিক্ত চারণ, অতিরিক্ত মৎস্য অহরণ, কল কারখানা শহর ও এ্যগ্রো রাসায়নিক এবং অন্যান্য উৎস হতে পানি দূষণের ফলে জলাভূমি আজ ধ্বংসের মুখোমুখি।

ভূ-দৃশ্য পরিবর্তনের ফলে জলবায়ু, ইকোলজিক্যাল পরিবর্তনের উপর কি ধরনের প্রভাব পরেছে তা আলোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় দেখা যায় যে, মোট ৮৭টি কৃষি ফসল নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে এর মধ্যে ৪৪টি ফসল বিলুপ্ত পাওয়া গিয়েছে। ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গবেষণা এলাকাটির কৃষি জমির হ্রাস পেয়েছে ১৫.৫ শতাংশ। ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের সাথে সাথে একই হারে গবেষণা এলাকার ফসল, প্রাণী ও পাখি প্রজাতি হ্রাস পেয়েছে। গবেষণায় মাঠ জরিপে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে গবেষণা এলাকাটির ফসল প্রজাতি ৪৮ শতাংশ, প্রাণি প্রজাতি ২৫ শতাংশ ও পাখি প্রজাতি ৩৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। গবেষণা এলাকার ভূ-উপগ্রহ চিত্র থেকে পাওয়া তথ্য Erdas Imagine Supervised classification মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গবেষণা এলাকাটির নগরায়ণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২০.৬৩ শতাংশ। ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গবেষণা এলাকাটির জলাশয় হ্রাস পেয়েছে ৮.৬১ শতাংশ ও বনভূমি হ্রাস পেয়েছে ৩.৩১ শতাংশ।

এলাকাটির নগরায়ণ বৃদ্ধি ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সংশ্লেষমান (correlation analysis) পাওয়া যায় ০.৯৩১৭। সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সাথে কৃষি জমির সংশ্লেষ মান -০.৬৯৩। জলাশয় ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সংশ্লেষ মান -০.৯৫। গবেষণা এলাকাটিতে বনভূমির সাথে তাপমাত্রার সংশ্লেষ মান পাওয়া যায় ০.৭৩৯। এ থেকে বুঝা যায় যে, গবেষণা এলাকাটিতে নগরায়ণ বৃদ্ধির ফলে জলবায়ুর উপর প্রভাব পরেছে। এই প্রভাবের কারণে জীববৈচিত্র্যের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

এলাকাটিতে ভূ-দৃশ্য পরিবর্তনের সাথে সাথে জীববৈচিত্র্যের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া এটিও দেখা যায় যে, উচ্চ ফলনশীল ফসলের চাপে দেশীয় ফসল হ্রাস পেয়েছে সম্পূর্ণ ভাবে। নগরায়ণের বৃদ্ধি ও ভূ-দৃশ্যের পরিবর্তনের ফলে গবেষণা এলাকাটির ইকোলজি ও জলবায়ুগত বিষয়ের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এলাকাটির তাপমাত্রা প্রায় ১ ডিগ্রী বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন হয়েছে। শুধু মাত্র ১৯৮৯ সন থেকে ২০১৫ সন পর্যন্ত এই কয়েক বছরে এলাকাটির জলাভূমি অর্ধেক অংশ হ্রাস পেয়েছে। অপর দিকে নগায়ণ ২০.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকাটি নগরায়ণের দিকে অনেক দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি এই ভাবে এই নগরায়ণ বৃদ্ধি পেতে থাকে টেকশয় উন্নয়ন নীতি প্রয়োগ করে, এলাকাটির জীববৈচিত্র্য সংগ্রহের ব্যবস্থা সঠিক ভাবে না করা হয় তা হলে এলাকাটি থেকে খুব দ্রুত জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাবে। গবেষণা এলাকার গত ৫০ বছরের জীববৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা করতে যেয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ জীববৈচিত্র্যা বিলুপ্ত হয়েছে বলে জানা যায়। এখনই যদি সঠিক ভাবে এই জীববৈচিত্র্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা না করা হয় তা হলে আরো অনেক প্রানী ও উদ্ভিদকুল এলাকাটি থেকে হারিয়ে যাবে।

গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে ভূমিকা, গবেষণার যৌক্তিকতা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে পূর্ববতী গ্রন্থ সমালোচনা, তৃতীয় অধ্যায়ে পদ্ধতি (Methodology) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিভাবে কোন পদ্ধতিতে ব্যবহার করে গবেষণাটি করা হয়েছে তা লিখা রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে এলাকা পরিচিতি। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষণা এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন। সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে - ইকোলজিক্যাল পরিবর্তন। অষ্টম অধ্যায়ে রয়েছে কৃষি ফসল বিলুপ্তি সংক্রান্ত তথ্য, নবম অধ্যায়ে রয়েছে উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্তির তথ্য, দশম অধ্যায়ে রয়েছে প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্তির তথ্য, একাদশ অধ্যায়ে রয়েছে গবেষণা এলাকার পাখি প্রজাতি বিষয়ক তথ্য, দ্বাদশ অধ্যায়ে রয়েছে মৎস্য ্য প্রজাতি, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রয়েছে এ ভূ-দৃশ্য পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস সম্পর্ক বিশ্লেষণ, চর্তুদশ অধ্যায়ে রয়েছে ভূ-দৃশ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্ক। পঞ্চদশ অধ্যায়ে রয়েছে উপসংহার।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায় যে, থিসিসটি গবেষণায় যে সব তথ্য উঠে এসেছে তা সময় উপযোগী এবং খুব মূল্যবান গবেষণা এলাকাটিকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষিত এলাকার ঘোষণা দেওয়া যেতে পারে। এলাকাটিতে যেহেতু খুব বেশি উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে সেহেতু এলাকাটির প্রতিটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয় ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই থিসিসটি করতে পেরে প্রথমে আমি মহান আল্লাহতালার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এই জন্য যে থিসিসটি লেখার মত বিদ্যা ও বুদ্ধি তিঁনি আমায় দিয়েছেন। "ভূ-দৃশ্য পরিবর্তন ও জীব বৈচিত্র হ্রাসঃ আশুগঞ্জ উপজেলা উপর একটি পর্যবেক্ষণ মূল্যায়ন" শিরনামে গবেষণাটি করার জন্য সুপারভাইজার অধ্যাপক ড. তৌহীদা রশিদ কে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনি আমাকে এই গবেষণা প্রতিবেদনটি করার জন্য সকল প্রকার উপদেশ দিয়ে সহায়তা করেছেন। যদি তিনি সহায়তা না করতেন তা হলে এই গবেষণা প্রতিবেদনটি সঠিক ভাবে করা আমার জন্য কঠিন হয়ে পরত। তার সহায়তায় কাজটি সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছি। এই কাজটি সঠিক ভাবে করতে পারার জন্য আমার মা বাবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাদের সার্বক্ষনিক সহায়তার কারণে কাজটি আমি সঠিক ভাবে সমাধান করতে পেরেছি। যেকোন গবেষণা প্রতিবেদন একা কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাই যাদের সাহায্য সহযোগিতা না পেলে আমার পক্ষে এই প্রতিবেদনটি সুন্দর সুষ্ঠভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হতো না তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়া বিভাগীয় বিজ্ঞ শিকক্ষমন্ডলীর নিকট থেকে যে আন্তরিক দিক নির্দেশনা, উপদেশ ও সহয়তা পেয়েছি তা আমার কর্মতৎপরতাকে উৎসাহিত ও ত্বরানিত করেছে। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আবহাওয়া অফিস, ঢাকা স্পর্সো, বাংলাদেশ মৃত্তিকা অধিদপ্তর, সেটেলমেন্ট অফিস, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন র্বোড, পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তাবৃন্দকে। এছাড়া আশুগঞ্জ উপজেলার সকল সদস্যকে যারা এই গবেষণা প্রতিবেদনটি করতে সহায়তা করছে। আশুগঞ্জ উপজেলার অধিবাসিদের যারা স্বতর্স্ফুতভাবে আমাকে বিভিন্ন মূল্যবান তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন।

সুরাইয়া আক্তার
৩-৩-২০১৬

সূচীপত্র

মুখবদ্ধ II

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার	V
অধ্যায় পরিচিতি	VI-XIII
মানচিত্র তালিকা	XIII
চিত্র তালিকা	XIV-XVI
টেবিল	XVI-XVII
বর্ণমালা ও আদ্যাক্ষর সমষ্টি	XVIII
প্রথম অধ্যায়	১ - ৭
ভূমিকা	১
গবেষণার যৌক্তিকতা	৪
গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ	৭
থিসিস এর অধ্যায় বিন্যাস	৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	৮ - ১৫
পূর্ববর্তী গ্রন্থ পর্যালোচনা (LITERATURE REVIEW)	
তৃতীয় অধ্যায়	১৬ - ২২
গবেষণা পদ্ধতি	
৩.১ এলাকা নির্বাচন	১৬
৩.২ গবেষণার সময়কাল	১৬
৩.৩ মূল মানচিত্র সংগ্রহ	১৬
৩.৪ উপাত্ত সংগ্রহ	১৬
৩.৪.১ দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন	১৭
৩.৪.২ চেক লিস্ট বিশ্লেষণ	১৭
৩.৪.৩ প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ	১৯
৩.৪.৪ প্রাথমিক জরিপ	১৯
৩.৪.৫ ছবি বিশ্লেষণ	১৯
৩.৫ উপাত্ত বিশ্লেষণ	১৯
৩.৫.১ উপাত্ত লিপিবদ্ধকরণ	২১
৩.৫.২ কালীন সারি বিশ্লেষণ	২১
৩.৬ মূল মানচিত্র বিশ্লেষণ	২২
৩.৭ GIS পদ্ধতিতে মানচিত্র বিশ্লেষণ	২২
৩.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা	২২
অধ্যায় চতুর্থ	২৩ - ৩৭
এলাকা পরিচিতি	
৪.১ উপজেলার পটভূমি	২৩
৪.২ নামকরণ	২৩
৪.৩ উল্লেখযোগ্য স্থান বা স্থাপনা	২৩
৪.৪ গবেষণা এলাকার অবস্থান ও আয়তন	২৩
৪.৫ গবেষণা এলাকার প্রশাসনিক কাঠামো	২৪
৪.৬ জনসংখ্যা	২৪
৪.৭ যাতায়াত ব্যবস্থা	২৬
৪.৮ গবেষণা এলাকার ভূমিরূপ গঠন	২৬
৪.৯ গবেষণা এলাকার মৃত্তিকা ও পানি	২৭
৪.১০ গবেষণা এলাকার পানি সম্পদ	২৭
৪.১০.১ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি	২৮
৪.১০.২ ভূ-গর্ভস্থ পানি	২৮

Dhaka University Institutional Repository

৪.১১ সেচ ব্যবস্থা ২৮
৪.১২ গবেষণা এলাকাটির জলবায়ু ২৮
৪.১৩ গবেষণা এলাকার পলল ও ক্ষয়ীভবন ২৯
৪.১৪ গবেষণা এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ২৯
৪.১৫ গবেষণা এলাকার বসতি ও জনসংখ্যা বিন্যাস ২৯
৪.১৬ গবেষণা এলাকার জনসংখ্যাকে বয়স ভিত্তিক বিশ্লেষণ ৩২
৪.১৭ স্কুল গমনকারি জনসংখ্যা বিশ্লেষণ ৩২
৪.১৮ পেশা অনুসারে জনসংখ্যা বিশ্লেষণ ৩৩
৪.১৯ মূল আয়ের উৎসের উপর ভিত্তি করে এলাকাটির বসতি বিন্যাস পর্যবেক্ষণ ৩৪
৪.২০ গবেষণা এলাকার কৃষি ও কৃষি নয় এমন বসতি বিশ্লেষণ ৩৪
৪.২১ কৃষি খামার সংখ্যা বিশ্লেষণ ৩৫
৪.২২ গবেষণা এলাকার কৃষি জমির অবস্থান ৩৫
৪.২৩ আবাসভূমি তৈরির মাধ্যম বিশ্লেষণ ৩৬
৪.২৪ খাবার পানির উৎস বিশ্লেষণ ৩৬
৪.২৫ এলাকাটির পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ ৩৭

অধ্যায় পঞ্চম ৩৮ - ৫৮
ভূ-দৃশ্যগত পরিবর্তন বিশ্লেষণ
ভূমিকা ৩৮
৫.১ গবেষণা এলাকার মানচিত্র বিশ্লেষণ ৩৮
৫.১.ক গবেষণা এলাকার ১৯৫০ ও ২০১৪ সালের মানচিত্র পর্যবেক্ষণ ৪১
৫.১.খ গবেষণা এলাকার ১৯৫০ ও ২০১৪ সালের মানচিত্রের শতকরা ভূমিব্যবহারের পরিবর্তন বিশ্লেষণ ৪১
৫.২ ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ ৪৪
৫.২.১ ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন বিশ্লেষণ (শতকরা) ৪৫
৫.২.২ গবেষণা এলাকাটির ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ ৪৭
৫.২.৩ গবেষণা এলাকার ১৯৮৯ ও ২০১৪ সালের ভূ-উপগ্রহ মানচিত্র বিশ্লেষণ ৪৮
৫.২.৪ নগরায়ণ এলাকা ও কৃষি জমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ ৫০
৫.২.৫ নগরায়ণ এলাকা ও গ্রামীণ বনায়ন সম্পর্ক বিশ্লেষণ ৫২
৫.২.৬ নগরায়ণ এলাকা ও জলাশয় সম্পর্ক বিশ্লেষণ ৫৪
৫.২.৭ কৃষি জমি ও জলাশয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ ৫৬
৫.২.৮ কৃষি জমি পতিত ও খোলা জমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ ৫৮

অধ্যায় ষষ্ঠ ৫৯ - ৭৪
গবেষণা এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন
৬.১ বৃষ্টিপাত সংঘটনের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার জলবায়ু গত পরিবর্তন ৫৯
৬.১.১ শ্রীমঙ্গল অঞ্চলের বৃষ্টিপাত সংঘটনের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার জলবায়ুগত পরিবর্তন ৫৯
৬.১.২ কুমিল্লা অঞ্চলের বৃষ্টিপাত সংঘটনের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার জলবায়ুগত পরিবর্তন ৬০
৬.২ তাপমাত্রার ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার জলবায়ুগত পরিবর্তন নিম্নে দেওয়া হল ৬১
৬.২.১ সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ভিত্তিতে শ্রীমঙ্গল স্টেশনের জলবায়ুগত পরিবর্তন ৬১
৬.২.২ সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ভিত্তিতে কুমিল্লা স্টেশনের জলবায়ুগত পরিবর্তন ৬২
৬.২.৩ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিশ্লেষণ ৬২
৬.২.৪ কুমিল্লা স্টেশনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিশ্লেষণ ৬৩
৬.২.৫ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের শুষ্ক তাপমাত্রা বিশ্লেষণ ৬৪
৬.২.৬ কুমিল্লা স্টেশনের শুষ্ক তাপমাত্রা বিশ্লেষণ ৬৫
৬.৩ আর্দ্রতার ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার জলবায়ুগত পরিবর্তন নিম্নে দেওয়া হল ৬৬
৬.৩.১ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৬৬
৬.৩.২ কুমিল্লা স্টেশনের আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৬৬
৬.৪ বায়ু প্রবাহের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার জলবায়ুগত পরিবর্তন ৬৭
৬.৪.১ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪.২ কুমিল্লা স্টেশনের গড় বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ ৬৮
৬.৫. বাষ্পীভবনের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার জলবায়ুগত পরিবর্তন ৬৯
৬.৫.১. শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বাষ্পীভবন বিশ্লেষণ ৬৯
৬.৫.২ কুমিল্লা স্টেশনের বাষ্পীভবন বিশ্লেষণ ৬৯
৬.৬ জলবায়ু পরিবর্তনে জলবায়ুর নিয়ামকগুলোর সাথে অন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ ৭০
৬.৬.১ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের জলবায়ুর আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ ৭০
৬.৬.২ কুমিল্লা স্টেশনের জলবায়ুর আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ ৭১
৬.৭ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বার্ষিক জলবায়ু বিশ্লেষণ ৭২
৬.৭.১ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বার্ষিক তাপমাত্রা বিশ্লেষণ ৭২
৬.৭. ২ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বার্ষিক বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ ৭২
৬.৮ কুমিল্লা স্টেশনের বার্ষিক জলবায়ু বিশ্লেষণ ৭৩
৬.৮.১ কুমিল্লা স্টেশনের বার্ষিক তাপমাত্রা বিশ্লেষণ ৭৩
৬.৮.২ কুমিল্লা স্টেশনের বার্ষিক বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ ৭৪

অধ্যায় সপ্তম ৭৫ - ৯০
ইকোলজিক্যাল পরিবর্তন
৭.১ মাটির আর্দ্রতার পরিবর্তশীলতা পরীক্ষা ৭৫
৭.২.১ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৭৫
৭.২.২ কুমিল্লা স্টেশনের ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৭৬
৭.৩. ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৭৭
৭.৩.১ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৭৭
৭.৩.২ কুমিল্লা স্টেশনের ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৭৮
৭.৪. ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৭৯
৭.৪.১ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৭৯
৭.৪.২ কুমিল্লা স্টেশনের ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৮০
৭.৫ ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৮১
৭.৫.১ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৮১
৭.৫.২ কুমিল্লা স্টেশনের ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৮২
৭.৬. ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৮৩
৭.৬.১ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৮৩
৭.৬.২ কুমিল্লা স্টেশনের ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৮৪
৭.৭ মেঘনা নদীর পানির পরিবর্তশীলতা নির্ণয় ৮৫
৭.৭.১ ভৈরব বাজার স্টেশনের জোয়ার বিশ্লেষণ ৮৫
৭.৭.২ ভৈরব বাজার স্টেশনের ভাটা বিশ্লেষণ ৮৬
৭.৭.৩ ভৈরব বাজার স্টেশনের পানি নির্গমন হার বিশ্লেষণ ৮৭
৭.৮ মৃত্তিকার জৈব পদার্থ বিশ্লেষণ ৮৮
৭.৮.১ গবেষণা এলাকার মৃত্তিকার জৈব পদার্থ বিশ্লেষণ ৮৯
৭.৮.২ গবেষণা এলাকার মৃত্তিকার পি এইচ বিশ্লেষণ ৮৯
৭.৮.৩ গবেষণা এলাকার মৃত্তিকার বিনিময় যোগ্য অম্লত্ব বিশ্লেষণ ৮৯

অধ্যায় অষ্টম ৯১ - ১১২
গবেষণা এলাকার বিলুপ্ত কৃষি ফসল
প্রথম পরিচ্ছেদ কৃষি ফসল
ভূমিকা ৯১
৮.১ দানা জাতীয় শস্য ৯১
৮.১.১ আউশ ধান বিলুপ্তির হার ৯১
৮.১.২ আমন ধান বিলুপ্তির হার ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

৮.১.৩ বোরো ধান ও গম বিলুপ্তির হার ৯৩
৮.১.৪ ভুট্টা বার্লি যব বিলুপ্তির হার ৯৪
৮.১.৫ জোয়ার বাজরা চীনা কাউন বিলুপ্তির হার ৯৫
৮.২ ডাল জাতীয় শস্য ৯৫
৮.২.১ ছোলা অড়হর মটর ও মুগ বিলুপ্তির হার ৯৫
৮.২.২ মাস-কলাই খেসারি গাড়ি-কলাই ও ফেলন বিলুপ্তির হার ৯৬
৮.৩ গবেষণা এলাকায় তৈল বীজ বিলুপ্তির হার ৯৬
৮.৩.১ সরিষা রাই তিল তিসি বিলুপ্তির হার ৯৬
৮.৩.২ চীনা বাদাম রেড়ী (কেস্টার) সূর্যমুখী ও সয়াবিন বিলুপ্তির হার ৯৭
৮.৪ অর্থকরী ফসল বিলুপ্তির হার ৯৮
৮.৪.১ পাট মেস্তা শন পাট বিলুপ্তির হার ৯৮
৮.৪.২ তুলা আঁখ তামাক বিলুপ্তির হার ৯৮
৮.৫ কন্দাল জাতীয় ফসল বিলুপ্তির হার ৯৯
৮.৬ তরি-তরকারী জাতীয় ফসল বিলুপ্তির হার ৯৯
৮.৬.১ বেগুন মিষ্টি কুমড়া চাল কুমড়া বাঁধা কপি বিলুপ্তির হার ১০০
৮.৬.২ ফুলকপি ওলকপি লাউ টমেটো বিলুপ্তির হার ১০০
৮.৬.৩ মূলা শিম পটল ঢেঁড়স বিলুপ্তির হার ১০১
৮.৬.৪ জিঙ্গা শসা লাল শাক, পুঁই শাক বিলুপ্তির হার ১০২
৮.৬.৫ বরবটি করলা গাজর কাঁকরোল শালগম বিলুপ্তির হার ১০২
৮.৭ ফল জাতীয় ফসল বিলুপ্তির হার ১০৩
৮.৮ মসলা জাতীয় ফসল বিলুপ্তির হার ১০৩
৮.৮.১ মরিচ পেঁয়াজ রসুন হলুদ বিলুপ্তির হার ১০৪
৮.৮.২ ধনে আদা কালোজিরা মৌরী বিলুপ্তির হার ১০৪
৮.৯ গো-খাদ্য জ্বালানী বীজতলা বিলুপ্তির হার ১০৫
৮.১০ গবেষণা এলাকায় ফসল বিলুপ্তির কারণ ১০৬
ক. জলবায়ু পরিবর্তন ১০৬
খ. শিল্পকারখানা বৃদ্ধি ১০৬
গ. নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া ১০৭
ঘ. হাইব্রিড্র জাতীয় ফসল উৎপাদন ১০৭
ঙ. বসতি নির্মাণ ১০৭
চ. জলাবদ্ধতা ১০৭
ছ. অপরিকল্পিতভাবে কালভার্ট নির্মাণ ১০৭
জ. মাটির জৈব পদার্থের বিভিন্নতা ১০৭
ঝ. মাটির আর্দ্রতা কমে যাওয়া ১০৭
ঞ. বিদ্যুৎ সমস্যা ১০৭
৮.১১ গবেষণা এলাকায় কৃষি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে জনগণের মতামত বিশ্লেষণ ১০৮
ক. অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার বন্ধ করা ১০৮
খ. জৈবিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জমির সঠিক ব্যবহার ১০৮
গ. আবাদি জমির সঠিক ব্যবহার ১০৯
ঘ. বিদ্যুৎ সরবারহ ১০৯
ঙ. নাব্যতা বৃদ্ধি ১০৯
চ. নিম্ন/ নিচু অঞ্চলের জমির সঠিক ব্যবহার ১০৯
ছ. দেশী প্রজাতির ফসল উৎপাদনে কৃষকশ্রেনীকে উৎসাহিত করা ১০৯
কৃষি ফসলগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম ১১০

অধ্যায় নবম ১১৩ - ১২৬
গবেষণা এলাকার বিলুপ্ত উদ্ভিদ প্রজাতি
ভূমিকা ১১৩
৯.১ গবেষণা এলাকায় বনভূমির ধরণ ও আয়তন ১১৩
৯.২ গবেষণা এলাকার ইউনিয়ন ভিত্তিক গাছের তালিকা ও গাছের শতকরা হার ১১৩
৯.৩ গবেষণা এলাকার পরিবেশতান্ত্রিক উদ্ভিদকূল ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

৯.৪ গবেষণা এলাকার উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের ধারণা ১১৬
৯.৫ গবেষণা এলাকায় বিলুপ্ত প্রায় গাছের তালিকা ঃ ১১৭
৯.৫.১ গবেষণা এলাকায় উদ্ভিদ প্রজাতি কমে যাওয়ার হার নির্ণয়ে জনগণের মতামত বিশ্লেষণ ১১৭
৯.৫.২ গবেষণা এলাকায় উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্তির মানবীয় কারণ বিশ্লেষণ ১১৭
ক. বৃদ্ধি ১১৮
খ. বসতি নির্মাণ ১১৯
গ. জ্বালানি কাজে ব্যবহার ১১৯
ঘ. কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ১১৯
ঙ. ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ১১৯
চ. অন্যান্য ১১৯
৯.৬ গবেষণা এলাকাটির সামাজিক বনায়ন এর অর্ন্তগত ১১৯
৯.৬ ১. এলাকাবাসীর মতামতের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকায় গ্রামীণ বনায়ন তৈরীর সমস্যা সমূহ বিশ্লেষণ ১২০
ক. অংশীদারিত্ব ১২০
খ. অধিক আর্থিক উপার্জন ১২০
গ. সঠিক বনায়ন ১২০
ঘ. দক্ষ জনশক্তি ১২০
ঙ. অশিক্ষা ১২০
চ. অন্যান্য ১২১
৯.৬.২ গবেষণা এলাকায় বনভূমি সংরক্ষণের উপায় সমূহ ১২১
ক. গণসচেতনতা বৃদ্ধি ১২১
খ. সরকারী ব্যবস্থাপনা ১২১
গ. কৃষকদের বনায়ন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ১২১
ঘ. বেসরকারী প্রকল্প ১২২
ঙ. দক্ষ জনশক্তি গঠন ১২২
চ. বনভূমি আইন সম্পর্কে ধারণা ১২২
ছ. অন্যান্য ১২২
৯.৭ গবেষণা এলাকায় বন নিধনের ফলে পরিবেশের প্রভাব মূল্যায়ন : ১২২
৯.৮ গবেষণা এলাকায় সামাজিক বনায়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র ১২৩
৯.৯ গবেষণা এলাকায় বর্তমান উদ্ভিদ প্রজাতির তালিকা ও গুনাগুন ১২৩

দশম অধ্যায় ১২৭ - ১৩৪
গবেষণা এলাকার বিলুপ্ত প্রাণী প্রজাতি
ভূমিকা ১২৭
১০.১ এলাকাবাসীর মতামত বিশ্লেষণ: ১২৭
১০.২ গবেষণা এলাকায় গৃহপালিত পশু পাখি বিলুপ্তির হার নির্ণয় ১২৮
১০.২.১ গরু মহিষ ছাগল ভেড়া বিলুপ্তির হার ১২৮
১০.২.২ মুরগী হাঁস কবুতর বিলুপ্তির হার ১২৮
১০. ৩ গবেষণা এলাকার প্রাণী প্রজাতির হ্রাসের প্রাকৃতিক কারণ ১২৯
ক. ভূদৃশ্যের পরিবর্তন ১৩০
খ. আবহাওয়ার পরিবর্তন ১৩০
গ. স্বাধু পানির হ্রাস ১৩০
ঘ. তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া- ১৩০
ঙ. প্রাকৃতিক দূর্যোগ ১৩০
চ. অন্যান্য ১৩০
১০.৪ বন্য প্রাণী ধ্বংসের মানবীয় কারণের ভিত্তিতে জনগণের মতামত বিশ্লেষণ ১৩০
ক. কলকারখানা বৃদ্ধি ১৩১
খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি ১৩১
গ. ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ১৩১
ঘ. কৃষিকাজের বৃদ্ধি ১৩২
চ. ঘরবাড়ি তৈরি ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

ছ. অন্যান্য ১৩৩
১০.৫ গবেষণা এলাকার বনপ্রাণী হ্রাসের জনগণের মতামত বিশ্লেষণ ১৩৩

অধ্যায় একাদশ ১৩৫ - ১৪৪
গবেষণা এলাকার বিলুপ্ত পাখি প্রজাতি
ভূমিকা ১৩৫
১১.১ গবেষণা এলাকার হুমকির সম্মুখীন পাখি প্রজাতি ১৩৫
১১.২ জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে পাখি বিলুপ্তির হার ১৩৬
১১.৩ গবেষণা এলাকার পাখি প্রজাতির হ্রাসের প্রাকৃতিক কারণ ১৩৭
ক. তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া ১৩৭
খ. আবহাওয়ার পরিবর্তন ১৩৭
গ. স্বাধু পানির হ্রাস ১৩৭
ঘ. প্রাকৃতিক দূযোর্গ ১৩৮
ঙ. শিলা বৃষ্টি ১৩৮
১১. ৪ গবেষণা এলাকায় পাখি প্রজাতি হ্রাসের মানবীয় কারণ সমূহ ১৩৮
ক. ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ১৩৯
খ. পাখি শিকার ১৩৯
গ. গাছ কাটা ১৩৯
ঘ. কলকারখানা বৃদ্ধি ১৩৯
ঙ. জমি ভরাট ১৩৯
চ. কৃষি জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ ১৪০
১১. ৫ গবেষণা এলাকায় পাখি প্রজাতি সংক্ষণের উপায় সমূহ ১৪০
ক. পাখির অভয়ারন্য সৃষ্টি ১৪০
খ. গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে ১৪১
গ. জমিতে কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে ১৪১
ঘ. গণসচেতনতা সৃষ্টি ১৪১
ঙ. অবৈধ শিকার বন্ধ করা ১৪১
চ. খালে বিষ প্রয়োগ বন্ধ করা ১৪১
ছ. স্বাধুপানির ব্যবস্থা করতে হবে ১৪১
১১.৬ গবেষণা এলাকায় পাখি প্রজাতি রক্ষায় সরকারি ভূমিকা- ১৪২

অধ্যায় দ্বাদশ ১৪৫ - ১৫৮
গবেষণা এলাকার বিলুপ্ত মৎস্য প্রজাতি
ভূমিকা ১৪৫
১২.১ গবেষণা এলাকায় হুমকির সম্মুখীন মৎস্য প্রজাতি ১৪৭
১২.২.এলাকাবাসীর মতামত বিশ্লেষণ ১৪৮
১২.৩ গবেষণা এলাকায় মৎস্য প্রজাতি হ্রাসেন কারণ পর্যালোচনা ১৪৮
ক. গবেষণা এলাকার কলকারখানা ১৪৮
খ. মৎস্য সম্পদের আবাসস্থল ধ্বংস ১৪৮
গ. খালের পানিতে বিষ প্রয়োগ ১৪৮
ঘ. ঘন জালের ব্যবহার ১৪৮
ঙ. কৃষি জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ ১৪৮
চ. রোগব্যাধীর আক্রমন ১৪৯
ছ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি ১৪৯
জ. পুকুরে পাড়ে বাঁধ দেওয়া ১৪৯
ঝ. অবকাঠামোগত নির্মাণ ১৪৯
ঞ. জমি ভরাট ১৪৯

১২. ৪ গবেষণা এলাকায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষনে জনগণের অভিমত ১৫০
ক. গবেষণা এলাকার বসতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ১৫১
খ. জমিতে কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

গ. কলকারখানার বর্জ্য দূষণ মুক্ত করা ১৫১
ঘ. খালে বিষ প্রয়োগ বন্ধ করা ১৫১
ঙ. নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা ১৫১
চ. পানির ব্যবস্থা করতে হবে ১৫১
ছ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে রাখা ১৫২

১২.৫ গবেষণা এলাকায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে সরকারের ভূমিকা ১৫৩
ক. গণসচেতনতা সৃষ্টি ১৫৪
খ. কারেন্ট জালের ব্যবহার বন্ধ করা ১৫৪
গ. বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে ১৫৪
ঘ. অবকাঠামোগত নির্মাণ ১৫৪
ঙ. পাতলা জাল সরবরাহ ১৫৪
১২.৬ গবেষণা এলাকায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে সরকারি ভূমিকা মূল্যায়ন ১৫৫

১২.৭ মেঘনা নদীতে শুশুকের অবস্থান ১৫৫
১২.৮ শুশক হ্রাস পাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ ১৫৬

অধ্যায় ত্রয়োদশ ১৫৮ - ১৬৩
ভূ-দৃশ্য পরিবর্তন ও জীব বৈচিত্র্য হ্রাস সম্পর্ক বিশ্লেষণ
১৩.১ কৃষি জমি ও জীববৈচিত্র্য হ্রাসের সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৫৮
১৩.২ নগরায়ণ বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস সম্পর্ক বিশ্লেশণ ১৫৮
১৩.৩ জলাশয় হ্রাস ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৫৯
১৩.৪ বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৬০
১৩.৫ উচ্চ ফলনশীল ফসল ও দেশীয় ফসল উৎপাদন সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৬০
১৩.৬ খাদ্য শস্য ও অর্থকারী ফসল উৎপাদন সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৬১
১৩.৭ কৃষি জমি ও ফল ও তরকারী জাতীয় ফসল সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৬২
১৩.৮ খাদ্য শস্য ও তৈল জাতীয় ফসল হ্রাস সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৬২
১৩.৯ খাদ্য শস্য ও মসলা জাতীয় ফসল হ্রাস সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৬৩

অধ্যায় চর্তুদশ ১৬৪ - ১৮০
ভূ-দৃশ্য ও জলবায়ূ পরিবর্তন সম্পর্ক
ভূমিকা ১৬৪
১৪.১ নগরায়ণ বৃদ্ধি ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সম্পর্ক ১৬৪
১৪.২ নগরায়ণ বৃদ্ধি ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সম্পর্ক ১৬৫
১৪.৩ নগরায়ণ বৃদ্ধির ও আর্দ্রতার সম্পর্ক ১৬৬
১৪.৪ নগরায়ণ ও বায়ূ প্রবাহ বিশ্লেষণ ১৬৭
১৪.৫ নগরায়ণ ও বাষ্পীভবন সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৬৮
১৪.৬ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কৃষি জমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৬৯
১৪.৭ কৃষি জমি ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৭০
১৪.৮ বৃষ্টিপাত ও কৃষিজমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৭১
১৪.৯ বাষ্পীভবন ও কৃষিকাজের সম্পর্ক: ১৭২
১৪.১০ আর্দ্রতা ও কৃষিকাজের সম্পর্ক: ১৭৩
১৪.১১ জলাশয় ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৭৪
১৪.১২ জলাশয় ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৭৫
১৪.১৩ বৃষ্টিপাত ও জলাশয় এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৭৬
১৪.১৪ বাষ্পীভবন ও জলাশয় এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৭৭
১৪.১৫ বনায়ন ও তাপমাত্রার সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৭৮
১৪.১৬ বৃষ্টিপাত ও বনভূমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৭৯
১৪.১৭ বায়ু প্রবাহ ও বনভূমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৮০
অধ্যায় পঞ্চদশ ১৮১ - ১৮৯
উপসংহার
১৫.১ গবেষণার ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার ১৮১
১৫.২ আশুগঞ্জ উন্নয়নে অতীতে গৃহীত ব্যবস্থা ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

১৫.৩ আশুগঞ্জে বর্তমান উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ১৮৬
১৫.৪ আশুগঞ্জ অঞ্চললে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে টেকসই ব্যবস্থাপনা ১৮৭
১৫.৫ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষজ্ঞদের মতামত ১৮৭
১৫.৬ আশুগঞ্জে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষেণের সুপারিশ ১৮৮
১৫.৭ উদ্ভিজ্জ প্রজাতি সংরক্ষণের সুপারিশমালা ১৮৮
১৫.৮ প্রাণী প্রজাতি সংরক্ষণের সুপারিশমালা ১৮৮
১৫.৯ পাখি প্রজাতি সংরক্ষণের সুপারিশমালা ১৮৮
১৫.১০ মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণের সুপারিশমালা ১৮৮
গ্রন্থপুঞ্জি ১৯০-১৯৭
পরিশিষ্ট ১৯৮-২১৬
ছবি ২১৭-২২২
প্রশ্নমালা ২২৩-২২৭

মানচিত্র

চিত্র ৩.১: দৈবচায়িত ভাবে এলাকা নির্ণয় ১৭
মানচিত্র ৩.২: কৃষি ভিত্তিক এলাকা, মৎস্য চাষ ও কৃষি ভিত্তিক এলাকা এবং কৃষি আবাসিক বানিজ্য এলাকা ১৮
মানচিত্র ৪.১: আশুগঞ্জ উপজেলার গবেষণা এলাকা ২৫
মানচিত্র ৪.২: গবেষণা এলাকার জনসংখ্যা বিন্যাস ৩১
মানচিত্র ৫.১: গবেষণা এলাকার মানচিত্র ১৯৩৭ ৩৯
মানচিত্র ৫.২: গবেষণা এলাকার মানচিত্র ২০০৮ ৪০
মানচিত্র ৫.৩: গবেষণা এলাকার মানচিত্র ১৯৫০ ৪২
মানচিত্র ৫.৪: গবেষণা এলাকার মানচিত্র ২০১৫ ৪৩
মানচিত্র ৫.৫: গবেষণা এলাকার বিভিন্ন সনের ইডাজ ইমেজ ক্লাসিফিকেশন ৪৪
মানচিত্র ৫.৬: গবেষণা এলাকার ১৯৮৯ ও ২০১৪ সনের ভূ-উপগ্রহ মানচিত্র বিশ্লেষণ ৪৬
মানচিত্র ৫.৭: গবেষণা এলাকার ১৯৮৯ ও ২০১৪ সালের কৃষিভূমি ও নগরায়ণের ব্যবহার ৫১
মানচিত্র ৫.৮: গবেষণা এলাকার ১৯৮৯ ও ২০১৪ সালের নগরায়ণ ও গ্রামীণ বনায়ন ভূমি ব্যবহার ৫৩
মানচিত্র ৫.৯: গবেষণা এলাকার ১৯৮৯ ও ২০১৪ সালের নগরায়ণ ও জলাশয়ের ভূমি ব্যবহার ৫৫
মানচিত্র ৫.১০: গবেষণা এলাকার ১৯৮৯ ও ২০১৪ সালের কৃষি জমি ও জলাশয়ের ভূমি ব্যবহার ৫৭
মানচিত্র ৮.১: গবেষণা এলাকার কৃষি জমির ৯২
মানচিত্র ৯.১: গবেষণা এলাকার গ্রামীণ বনভূমি ১১৪
মানচিত্র ১২.১: গবেষণা এলাকার জলাশয়ের বিন্যাস ১৪৬

গ্রাফচিত্র

চিত্র ৩.১ : ফ্লো-চার্ট (গবেষণা পরিকল্পনা) ২০
চিত্র ৪.১: গবেষণা এলাকার বসতি জনসংখ্যাকে বিন্যাস ৩০
চিত্র ৪.২: গবেষণা এলাকার জনসংখ্যাকে বয়স ভিত্তিক বিশ্লেষণ ৩২
চিত্র ৪.৩: স্কুল গমনকারি জনসংখ্যা বিশ্লেষণ ৩৩
চিত্র ৪.৪: পেশা অনুসারে জনসংখ্যার বিশ্লেষণ ৩৩
চিত্র ৪.৫: মূল আয়ের উৎসের উপর ভিত্তি করে এলাকাটির বসতি বিন্যাস পর্যবেক্ষণ ৩৪
চিত্র ৪.৬: গবেষণা এলাকার কৃষি খামার ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস ৩৪
চিত্র ৪.৭: কৃষি খামাররের আকার ভিত্তিক সংখ্যা বিশ্লেষণ ৩৫
চিত্র ৪.৮: গবেষণা এলাকার কৃষি জমির অবস্থান বিশ্লেষণ ৩৫
চিত্র ৪.৯: গৃহ তৈরির মাধ্যম ৩৬
চিত্র ৪.৯: খাবার পানির উৎস বিশ্লেষণ ৩৭
চিত্র ৪.১০: এলাকাটির পয়নিস্কাশন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৫.১: ১৯৫০ ২০১৫ সনের ভূমি ব্যবহারের শতকরা হার ৪১
চিত্র ৫.২: গবেষনা এলাকার ইডাজ ইমেজ প্রক্রিয়া। ৪৪
চিত্র ৫.৩: গবেষণা এলাকার বিভিন্ন সনের ভূমি ব্যবহারের হ্রাস বৃদ্ধি মূল্যায়ন ৪৭
চিত্র ৫.৪: গবেষণা এলাকার বিভিন্ন ভূমি ব্যবহার শ্রেণী বিন্যাস (শতকরা হার) ৪৮
চিত্র ৫.৫: নগরায়ণ এলাকা ও কৃষি জমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ ৫০
চিত্র ৫.৬: গবেষণা এলাকার নগরায়ণ ও গ্রামীণ বনভূমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ ৫২
চিত্র ৫.৭: গবেষণা এলাকার নগরায়ণ ও জলাশয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ ৫৪
চিত্র ৫.৮: গবেষণা এলাকার কৃষি ও জলাশয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ ৫৬
চিত্র ৫.৯: গবেষণা এলাকার কৃষি জমি পতিত জমি ও খোলা স্থানের বিশ্লেষণ ৫৮
চিত্র ৬.১: শ্রীমঙ্গল স্টেশনে বিগত ৬৪ বছরের মাসিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিশ্লেষণ ৫৯
চিত্র ৬.২: কুমিল্লা স্টেশনে বিগত ৬৪ বছরের মাসিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিশ্লেষণ ৬০
চিত্র ৬.৩: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বিশ্লেষণ ৬১
চিত্র ৬.৪: কুমিল্লা স্টেশনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বিশ্লেষণ ৬২
চিত্র ৬.৫: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিশ্লেষণ ৬৩
চিত্র ৬.৬: কুমিল্লা স্টেশনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিশ্লেষণ ৬৩
চিত্র ৬.৭: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের শুষ্ক তাপমাত্রা বিশ্লেষণ ৬৪
চিত্র ৬.৮: কুমিল্লা স্টেশনের শুষ্ক তাপমাত্রা বিশ্লেষণ ৬৫
চিত্র ৬.৯: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৬৬
চিত্র ৬.১০: কুমিল্লা স্টেশনের আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৬৭
চিত্র ৬.১১: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ ৬৭
চিত্র ৬.১২: কুমিল্লা স্টেশনের গড় বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ ৬৮
চিত্র ৬.১৩: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বাষ্পীভবন বিশ্লেষণ ৬৯
চিত্র ৬.১৪: কুমিল্লা স্টেশনের বাষ্পীভবন বিশ্লেষণ ৭০
চিত্র ৬.১৫: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের অন্ত:দশক জলবায়ুর পরিবর্তন বিশ্লেষণ ৭১
চিত্র ৬.১৬: কুমিল্লা স্টেশনের অন্ত:দশক জলবায়ুর পরিবর্তন বিশ্লেষণ ৭১
চিত্র ৬.১৭: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বার্ষিক তাপমাত্রা বিশ্লেষণ ৭২
চিত্র ৬.১৮: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বার্ষিক বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ ৭৩
চিত্র ৬.১৯: কুমিল্লা স্টেশনের বার্ষিক তাপমাত্রা বিশ্লেষণ ৭৩
চিত্র ৬.২০: কুমিল্লা স্টেশনের বার্ষিক বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ ৭৪

চিত্র ৭.১: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৭৬
চিত্র ৭.২: কুমিল্লা স্টেশনের ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৭৭
চিত্র ৭.৩: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৭৮
চিত্র ৭.৪: কুমিল্লা স্টেশনের ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৭৯
চিত্র ৭.৫: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৮০
চিত্র ৭.৬: কুমিল্লা স্টেশনের ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৮১
চিত্র ৭.৭: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৮২
চিত্র ৭.৮: কুমিল্লা স্টেশনের ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৮৩
চিত্র ৭.৯: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৮৪
চিত্র ৭.১০: কুমিল্লা স্টেশনের ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ ৮৫
চিত্র ৭.১১: ভৈরব বাজার স্টেশনের জোয়ার বিশ্লেষণ ৮৬
চিত্র ৭.১২: ভৈরব বাজার স্টেশনের ভাটা বিশ্লেষণ ৮৭
চিত্র ৭.১৩: ভৈরব বাজার স্টেশনের পানি নির্গমন হার বিশ্লেষণ ৮৮
চিত্র ৭.১৪: মৃত্তিকার জৈব পদার্থ বিশ্লেষণ ৮৯

চিত্র ৮.১: আউশ ধান বিলুপ্তির হার ৯১
চিত্র ৮.২: আমন ধান বিলুপ্তির হার ৯৩
চিত্র ৮.৩: বোরো ও গম বিলুপ্তির হার ৯৪
চিত্র ৮.৪: ভুট্টা বার্লি যব বিলুপ্তির হার ৯৪
চিত্র ৮.৫: জোয়ার বাজরা চীনা কাউন বিলুপ্তির হার ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৮.৬:	ছোলা অড়হর মটর ও মুগ বিলুপ্তির হার	৯৬
চিত্র-৮.৭:	মাস-কলাই খেসারি গাড়ি-কলাই ও ফেলন বিলুপ্তির হার	৯৬
চিত্র ৮.৮:	সরিষা রাই তিল তিসি বিলুপ্তির হার	৯৭
চিত্র ৮.৯:	চীনা বাদাম, রেড়ী, কেস্টর সূর্যমুখী ও সয়াবিন বিলুপ্তির হার	৯৭
চিত্র ৮.১০:	পাট মেস্তা শন পাট বিলুপ্তির হার	৯৮
চিত্র ৮.১১:	তুলা আঁখ তামাক বিলুপ্তির হার	৯৯
চিত্র ৮.১২:	কন্দাল জাতীয় ফসল বিলুপ্তির হার	৯৯
চিত্র ৮.১৩:	বেগুন মিষ্টি কুমড়া চাল কুমড়া বাঁধা কপি বিলুপ্তির হার	১০০
চিত্র ৮.১৪:	ফুলকপি ওলকপি লাউ টমেটো বিলুপ্তির হার	১০১
চিত্র ৮.১৫:	মূলা শিম পটল ঢেঁড়স বিলুপ্তির হার	১০১
চিত্র ৮.১৬:	জিঙ্গা শসা লাল পুঁই শাক বিলুপ্তির হার	১০২
চিত্র ৮.১৭:	বরবটি করলা গাজর কাঁকরোল শালগম বিলুপ্তির হার	১০৩
চিত্র ৮.১৮:	কলা পেঁপে, তরমুজ বাঙ্গী আনারস বিলুপ্তির হার	১০৩
চিত্র ৮.১৯:	মরিচ পেঁয়াজ রসুন হলুদ বিলুপ্তির হার	১০৪
চিত্র ৮.২০:	ধনে আদা কালোজিরা ও মৌরী বিলুপ্তির হার	১০৫
চিত্র ৮.২১:	গো-খাদ্য জ্বালানী ও বীজ তলা বিলুপ্তির হার	১০৫
চিত্র ৮.২২:	গবেষণা এলাকার কৃষি ফসল বিলুপ্তির হার নির্ণয়ে জনগণের মতামত বিশ্লেষণ	১০৬
চিত্র ৮.২৩:	গবেষণা এলাকায় কৃষি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে জনগণের মতামত বিশ্লেষণ	১০৮
চিত্র ৯.১:	গবেষণা এলাকায় উদ্ভিদ প্রজাতি কমে যাওয়ার হার নির্ণয়ে জনগণের মতামত বিশ্লেষণ	১১৮
চিত্র ৯.২:	গবেষণা এলাকায় উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্তির মানবীয় কারণ বিশ্লেষণ	১১৮
চিত্র ৯.৩:	এলাকাবাসীর মতামতের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকায় গ্রামীন বনায়ন তৈরির সমস্যা সমূহ বিশ্লেষণ	১২০
চিত্র ৯.৪:	গবেষণা এলাকায় বনভূমি সংরক্ষণের উপায় সমূহ	১২১
চিত্র ৯.৫:	বন নিদনের ফলে পরিবেশের প্রভাব মূল্যায়ন	১২২
চিত্র ১০.১:	গবেষণা এলাকায় হুমকী সম্পূর্ণ বন্য প্রানী প্রজাতির তালিকা	১২৮
চিত্র ১০.২:	গরু মহিষ ছাগল ভেড়া বিলুপ্তির হার	১২৮
চিত্র ১০.৩:	মুরগী হাঁস কবুতর বিলুপ্তির হার	১২৯
চিত্র ১০.৪:	বন্য প্রাণী বিলুপ্তির প্রাকৃতিক কারণ	১২৯
চিত্র ১০.৫:	বন্যপ্রানী ধ্বংসের মানবীয় কারণ পর্যালোচনা	১৩১
চিত্র ১০.৬:	বন্য প্রাণী ধ্বংসের হার জনগনের মতামত বিশ্লেষণ	১৩৩
চিত্র ১১.১:	জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে পাখি প্রজাতি বিলুপ্তির শতকরা হার	১৩৭
চিত্র ১১.২:	পাখি প্রজাতির বিলুপ্তির প্রাকতিক কারণ	১৩৮
চিত্র ১১.৩:	পাখি প্রজাতির বিলুপ্তির মানবীয় কারণ	১৪০
চিত্র ১১.৪:	পাখি প্রজাতি সংরক্ষণের উপায়	১৪২
চিত্র ১২.১:	গবেষণা এলাকায় হুমকি সম্পূর্ণ মৎস্য প্রজাতির পাই চিত্র	১৪৭
চিত্র ১২.২:	মৎস্য প্রজাতি হ্রাসের কারণ	১৫০
চিত্র ১২.৩:	এলাকায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে জনগনের মতামত পর্যালোচনা	১৫২
চিত্র ১২.৪:	গবেষণা এলাকায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে সরকারের ভূমিকার	১৫৩
চিত্র ১৩.১:	কৃষি জমি হ্রাস ও জীববৈচিত্র্য হ্রাসের সম্পর্ক বিশ্লেষণ	১৫৮
চিত্র ১৩.২:	নগরায়ণ বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস সম্পর্ক	১৫৯
চিত্র ১৩.৩:	জলাশয় হ্রাস ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্ক বিশ্লেষণ	১৫৯
চিত্র ১৩.৪:	বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস সম্পর্ক	১৬০
চিত্র ১৩.৫:	উচ্চ ফলনশীল ফসল ও দেশীয় ফসল উৎপাদন সম্পর্ক	১৬১
চিত্র ১৩.৬:	খাদ্য শস্য ও অর্থকারী ফসল উৎপাদন সম্পর্ক	১৬১
চিত্র ১৩.৭:	কৃষি জমি, ফল ও তরকারী জাতীয় ফসল উৎপাদন সম্পর্ক বিশ্লেষণ	১৬২

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৩.৮: খাদ্য শস্য ও তৈল জাতীয় ফসল হ্রাস সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৬৩
চিত্র ১৩.৯: খাদ্য শস্য ও মসলা জাতীয় ফসল হ্রাস সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৬৩

চিত্র ১৪.১: নগরায়ণ বৃদ্ধি ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সম্পর্ক ১৬৪
চিত্র ১৪.২: নগরায়ণ বৃদ্ধি ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সম্পর্ক ১৬৫
চিত্র ১৪.৩: নগরায়ণ বৃদ্ধির ও আর্দ্রতার সম্পর্ক ১৬৬
চিত্র ১৪.৪: নগরায়ণ ও বায়ূ প্রবাহ বিশ্লেষণ ১৬৭
চিত্র ১৪.৫: নগরায়ণ ও বাষ্পীভবন সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৬৮
চিত্র ১৪.৬: সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কৃষি জমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৬৯
চিত্র ১৪.৭: কৃষি জমি ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৭০
চিত্র ১৪.৮: বৃষ্টিপাত ও কৃষিজমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৭১
চিত্র ১৪.৯: বাষ্পীয়ভবন ও কৃষিজমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৭২
চিত্র ১৪.১০: আর্দ্রতা ও কৃষিকাজের সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৭৩
চিত্র ১৪.১১: জলাশয় ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৭৪
চিত্র ১৪.১২: জলাশয় ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৭৫
চিত্র ১৪.১৩: বৃষ্টিপাত ও জলাশয় এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৭৬
চিত্র ১৪.১৪: বাষ্পীভবন ও জলাশয় এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৭৭
চিত্র ১৪.১৫: বনায়ন ও তাপমাত্রার সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৭৮
চিত্র ১৪.১৬: বৃষ্টিপাত ও বনভূমির বিশ্লেষণ সম্পর্ক ১৭৯
চিত্র ১৪.১৭: বায়ু প্রবাহ ও বনভূমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৮০

টেবিল

টেবিল ৪.১: ইউনিয়নের নাম, আয়তন ও জনসংখ্যা ২৪
টেবিল ৪.২: গবেষণা মৌজা পরিচিতি ২৪
টেবিল ৪.৩: গবেষণা এলাকার ভূমির শ্রেনীবিভাগ ২৬
টেবিল ৪.৪: গবেষণা এলাকার মাটির প্রকৃতি ২৭
টেবিল ৪.৫: গবেষণা এলাকার বসতি ও জনসংখ্যা বিন্যাস ৩০

টেবিল ৫.১: গবেষণা এলাকার ১৯৫০ ও ২০১৪ সালের ভূমি ব্যবহার ৪১
টেবিল ৫.২: ১৯৫০ ও ২০১৫ সনের ভূমি ব্যবহারের শতকরা হার ৪১
টেবিল ৫.৩: ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ এলাকার পরিমাপ হেক্টর ৪৫
টেবিল ৫.৪: ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন বিশ্লেষণ শতকরা হারে ৪৭

টেবিল ৭.১: মৃত্তিকার পি এইচ বিশ্লেষণ ৮৯
টেবিল ৭.২: মৃত্তিকার বিনিময় যোগ্য অম্লত্ব বিশ্লেষণ ৯০

টেবিল ৮.১: দানা জাতীয় শস্যগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম ১১০
টেবিল ৮.২: ডাল জাতীয় শস্যগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম ১১০
টেবিল ৮.৩: তৈল বীজ জাতীয় শস্যগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম ১১০
টেবিল ৮.৪: অর্থকরী শস্যগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম ১১১
টেবিল ৮.৫: কন্দাল জাতীয় ফসলগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম ১১১
টেবিল ৮.৫: তরি-তরকারী জাতীয় ফসলগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম ১১১
টেবিল ৮.৬: ফল জাতীয় ফসলগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম ১১২
টেবিল ৮.৭: মসলা জাতীয় ফসলগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম ১১২
টেবিল ৮.৮: গো-খাদ্য, জালানী ও বীজ তলা বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম ১১২

টেবিল ৯.১: গবেষণা অঞ্চলের ইউনিয়ন ভিত্তিক উদ্ভিদজ্জ এলাকা ১১৩
টেবিল ৯.২: গ্রামীণ বনায়নে ইউনিয়ন ভিত্তিক গাছের তালিকা ও গাছের শতকরা হার ১১৫
টেবিল ৯.৩: গবেষণা এলাকায় পরিবেশতান্তিক ধরণ অনুসারে উদ্ভিদ বিন্যাস সারণী ১১৬
টেবিল ৯.৪: বর্তমানে যে সব উদ্ভিদ কম পাওয়া যায় (বিলুপ্ত প্রায়) ১১৭
টেবিল ৯.৫: বনায়নের জন্য প্রাপ্ত ঢাল ১২৩
টেবিল ৯.৬: সামাজিক বনায়নের সম্ভাবনাময় ভূমির আনুমানিক ক্ষেত্র ও পরিমাণ ১২৩
টেবিল ৯.৭: গবেষণা অঞ্চলে বর্তমান উদ্ভিদ প্রজাতির তালিকা ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৯.৮: ভেষজ প্রকৃতির উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিক নাম ও ব্যবহার ১২৪
টেবিল ৯.৯: জলজ উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম ও গোত্র ১২৪
টেবিল ৯.১০: বাহারী উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিক নাম ও গোত্র ১২৫
টেবিল ৯.১১: ফুল ও ফল প্রদানকারী উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিক নাম ও গোত্র ১২৫
টেবিল ৯.১২: সাধারণ আগাছা জাতীয় উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিক নাম ও গোত্র ১২৬
টেবিল ৯.১৩: কাঠ প্রদানকারী উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিক নাম ও গোত্র ১২৬
টেবিল ১০.১: গবেষণা এলাকায় হুমকি সম্পূর্ণ বন্য প্রাণী প্রজাতির তালিকা ১২৭
টেবিল ১০.২: বন প্রাণী ধ্বংসের প্রাকৃতিক কারণগুলো ভিত্তিতে জনগনের মতামত বিশ্লেষণ ১২৯
টেবিল ১০.৩: বন প্রাণী ধ্বংসের মানবীয় কারণ জনগনের মতামত বিশ্লেষণ ১৩০
টেবিল ১০.৪: বন্য প্রাণী ধ্বংসের হার জনগনের মতামত বিশ্লেষণ ১৩২
টেবিল১০.৫: গবেষণা এলাকায় প্রানী প্রজাতির তালিকা বৈজ্ঞানিক নাম ১৩৩
টেবিল ১১.১: গবেষণা এলাকায় হ্রাস প্রাপ্ত পাখি প্রজাতির তালিকা ১৩৫
টেবিল ১১.২: জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে পাখি বিলুপ্তির হার ১৩৬
টেবিল ১১.৩: পাখি বিলুপ্তির প্রাকৃতিক কারণ ১৩৮
টেবিল ১১.৪: পাখি প্রজাতি বিলুপ্তির মানবীয় কারণ ১৪০
টেবিল ১১.৫: উত্তর দাতার মতামতের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকায় পাখি প্রজাতির সংরক্ষণে উপায় ১৪২
টেবিল ১১.৬: গবেষণা এলাকায় পাখি প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম ও অবস্থা ১৪২
টেবিল ১২.১: গবেষণা এলাকার জলাশয় বিশ্লেষণ ১৪৫
টেবিল ১২.২: গবেষণা এলাকায় হুমকির সম্মুখীন মৎস্য প্রজাতির তালিকা ১৪৭
টেবিল ১২.৩: গবেষণা এলাকায় মৎস্য প্রজাতি হ্রাসের কারণ পর্যালোচনার ১৫০
টেবিল ১২.৪: এলাকায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে জনগনের মতামত পর্যালোচনা ১৫২
টেবিল ১২.৫: গবেষণা এলাকায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে সরকারের ভূমিকার আলোচনা ১৫৩
টেবিল ১২.৬: সরকারী কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনগনের অভিমতের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকায় প্রজাতি সংরক্ষণে সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন ১৫৫
টেবিল ১২.৭: শুশক হ্রাস উত্তর দাতার মতামত ১৫৫
টেবিল ১২.৮: শুশক হ্রাসের কারণ ১৫৬
টেবিল ১২.৯: গবেষণা এলাকার মৎস্য প্রজাতির তালিকা বৈজ্ঞানিক নাম ১৫৬
টেবিল ১৩.১: সাম্প্রতিকালে বন সংরক্ষিত বনভূমির বিভিন্ন প্রকল্প সমূহ ১৮৬
টেবিল ১৩.২: National ACTs/ policies related to the Management of the SRF ১৮৬

বর্ণমালা ও আদ্যক্ষর সমষ্টি

AEZ	Agro-Ecological Zone
BARC	Bangladesh Agriculture Research Council
BRDB	Bangladesh Rural Development Board
CBO	Community Based Organization
CEGIS	Center for Environmental and Geographic Information Services
ECAs	Ecologically Critical Areas
FAO	Food and Agriculture Organization
FD	Forest Department
GCC	Global Climate Change
GDP	Gross Domestic Product
GIS	Geographic Information System
GoB	Government of Bangladesh
IUCN	Information union for Nature Conservation
NGOs	Non Government Organization

P^H	Negative logarithm of Hydrogen ion concentration
RRA	Rapid Rural Appraisal
RS	Remote Sensing
SPARRSO	Space Research & Remote Sensing Organization
SRDI	Soil Resource Development Institute
UDCC	Upazila Development Coordination Committee
UNDP	United Nation Development Program
UNO	Upazila Nirbahi Officer
WARPO	Water Resources Planning Organization
WHO	World Health Organization
WRI	World Resources Institute
এন জি ও	বেসরকারী অলাভজনক সংগঠন
এস আর ডি আই	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইউস্টিটিউট
বা পা উ বো	বাংলাদেশ পল্লী উন্নায়ন বোর্ড
বি বি এস	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
বি আর ডি বি	বাংলাদেশ পল্লী উন্নায়ন বোর্ড
জি আই এস	ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি
সে/মি	সেন্টি মিটার
পি এইচ	হাইড্রজেন আয়নের ঘনত্ব
হে	হেক্টর

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ভূমিকা

গত কয়েক দশক ধরে জীববৈচিত্র্যের দ্রুত হ্রাস বিশ্বব্যাপী চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে (ইসলাম, ২০০৪)। বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বেশি ভাগ জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল (Koziell, ২০০১)। এটি সর্বদাই প্রমাণিত যে, অনুন্নত দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। অনুন্নত ও উন্নয়শীল দেশের জনগোষ্ঠীকে জীববৈচিত্র্য হ্রাসের মূল কারণ বলে অনেকে ধারণা করে (CBD,২০০৬; ২০০৭)। যদিও বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ। কিন্তু এর রয়েছে সুবিশাল উদ্ভিদ ও প্রানিকুল (হোসেন, ২০০১; নিশাত, ২০০২)। এই দেশে ৭০০০টি স্থানীয় উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে (Mittermeier et. Al,১৯৯৮)। আনুমানিক ৫৭,০০ প্রজাতির এনজিওস্পার্ম, ৬৮ প্রজাতির বন্য উদ্ভিদ, ১৩০টি তন্তু জাতীয় উদ্ভিদ, ৫০০টি ঔষধি উদ্ভিদ, ২৯টি অর্কিড ও ১৭০০টি জিমনোস্পার্মের গুপ্তজীবী উদ্ভিদ রয়েছে (ইসলাম, ২০০৩)। বাংলাদেশে কৃষিকাজে ৬৩.৫ শতাংশ লোক নিয়োজিত রয়েছে (রাসেদ, ২০০৮)। কৃষি খাত ও বনভূমি থেকে জিডিপি ২৪ ও ৭.১ শতাংশ আয় হয় (Khuda, ২০০১)। দেশে বিভিন্ন বননির্ভর প্রজেক্টগুলোতে ৯০ মিলিয়ন মানুষ কাজ করতে পারে (নিশাত, ২০০২)। ১,১২০০০ লোক জীবিকা নির্বাহের জন্য সুন্দরবনে বিভিন্ন ধরনের কাজের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে (খান,২০০১)। এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে জীববৈচিত্র্য ১০ মিলিয়ণ গুণ বেশি হ্রাস পেয়েছে (Sandler,১৯৯৯)। বর্তমান প্রজাতি বিলুপ্তির হার ১০০০ থেকে ১০,০০০ এর মধ্যে রয়েছে (উইলসন, ১৯৮৮)।

আইইউসিএন লাল তালিকা (২০০৪) অনুসারে বর্তমানে ১৫,৫৮৯ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে। ১২ শতাংশ পাখি, ২৩ শতাংশ স্তন্যপায়ী, ৩২ শতাংশ উভচর প্রাণী ক্ষতির সম্মুখীন (Baillie et. Al, ২০০৪)। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য বেশি হুমকির সম্মুখীন বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় হার্বেরিয়াম রিপোর্ট অনুসারে ১০৬ ভাস্কুলার জাতীয় উদ্ভিদ হুমকির সম্মুখীন (খান, ২০০১)। বাংলাদেশে ১৬৭ প্রজাতির গাছ হুমকির সম্মুখীন রয়েছে (Dey, 2006)। প্রায় ১২ প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্তির পথে রয়েছে (রহমান, ২০০৪)। ১৮ প্রজাতির প্রাণী বিপদাপন্ন অবস্থায় রয়েছে (হোসেন, ১৯৯২)। অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, অধিক জনসংখ্যা ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন এই জীববৈচিত্র্য হ্রাসের জন্য দায়ী। কোনো কোনো বিজ্ঞানী এই ক্ষেত্রে আবার ভিন্নমত পোষণ করেন। অনেক সময় ধরে একই জমিতে একই রকম ফসল উৎপাদন, কৃষিকাজে সঠিক প্রযুক্তি সঠিকভাবে ব্যবহার না করা জীববৈচিত্র্য হ্রাসের একটি প্রধান কারণ বলে তারা মনে করেন (ইসলাম, ২০০৪)। জমিতে বিদ্যমান বিলিয়ন অনুজীব গাছপালাকে রোগ মুক্ত করতে সহায়তা করে। এক-ফসল উৎপাদনে মাটি যে পরিমাণ পুষ্টি হারায় মাটির অনুজীব শুধু প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ১৮ গুণ দ্রুত তা পূর্ণ উদ্ধার করতে পারে (John Jeavons, 2009)। একই জমিতে বারবার একই ধরনের ফসল উৎপাদন করা হলে মাটির নিজস্ব সক্রিয়তা হ্রাস পায়। মাটির জৈবিক শক্তি হারিয়ে যায় (cited in www.straight, com)। অতিরিক্ত রাসায়নিক স্যার ব্যবহার, কীটনাশক ও জমির আগাছানাশক ওষুধ আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি করে থাকে। ভিটামিন, ক্যালসিয়াম এবং আয়রনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো স্বাভাবিকভাবে ঝরা পাতা, সবুজ উদ্ভিদ ও শাকসবজির অবশিষ্ট অংশ। গ্রাম অঞ্চলে ধানক্ষেতের পাশে স্বাভাবিক ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে গড়ে ওঠা আগাছা কৃষিজমির জন্য ক্ষতি সাধন করে। অধিক রাসায়নিক সারের ব্যবহার মাটির জন্য ক্ষতিকর। রাসায়নিক সার স্থায়ী ফসল উৎপাদনে ক্ষতি সাধন করে থাকে। উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত (McNeely,২০০২) । বেশি ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ফসল উৎপাদন করা হয়। ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন নগরায়ণ, শিল্পকারখানা তৈরি আদি কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তর ও পরিবর্তনের ফলে জীববৈচিত্র্য হ্রাস হয়ে থাকে। ব্রাজিলিয়ানে আমাজান বনের মধ্যে দিয়ে ৫০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা তৈরির ফলে পূর্বের তুলনায় জীববৈচিত্র্য হ্রাসের পরিমাণ হাজারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (Kaimowitz and Angelson, ১৯৯৮)। এ ছাড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠী জীববৈচিত্র্য হ্রাসকে প্রভাবিত করে (Perrings and Gadgil, n. d.)। তারা কম সময়ে অধিক আর্থিক সুবিধা পেতে চায়। কিন্তু বন বা বৃক্ষ প্রজাতি সংরক্ষণ একটি দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা (Holden, SHiferaw, and Wilk, ১৯৯৮)।

জীববৈচিত্র্য থেকে পাওয়া সুবিধা টাকা দিয়ে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। যদিও প্রতি বছর বহু ট্রিলিয়ন ডলারের চেয়ে অধিক পরিমাণে আথিক সুবিধা জীববৈচিত্র্য থেকে পাওয়া যায় (Costanzia et. Al, ১৯৯৭)। অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জন্য জীববৈচিত্র্য অধিক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ দেশের মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জীববৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের সংস্কৃতি স্বাস্থ্য ও জীবন ধারণ জীববৈচিত্র্যের সাথে সংযুক্ত। খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও জীবিকা নির্বাহসহ অন্যান্য পণ্য উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের সাথে জীববৈচিত্র্য অপরিহার্যভাবে সংযুক্ত রয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি ক্ষেত্রে মানুষের হাইব্রিড উৎপাদন, রাসায়নিক সার, কীটনাশকের ব্যবহার জীববৈচিত্র্য হ্রাসে সহায়তা করছে (FAO, ২০০৮)।

বর্তমানে জীবকুলের বিশাল আবাস ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রাণিকুল মূলত বিভিন্ন ধরনের পাখি এবং মাছের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উদ্ভিদরাজ্যের সদস্যরা কমে গেছে মারাত্মকভাবে। অথচ এই কিছু দিন আগেও উদ্ভিদরাজির পরিমাণ ছিল উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

এক সময় উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলে খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল। এর মূল কারণ বাংলাদেশের মাটি উর্বর। যেখানে ৫০০০ প্রজাতির ফুল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ (গুপ্তবীজী) এবং ১৫০০ প্রজাতির প্রাণিকুল বর্তমান ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্যি যে, এদেশের বেশির ভাগ বনের সম্পদ হারিয়ে যাচ্ছে। ন্যাশনাল বোটানিক্যাল ও জুলজিক্যাল জরিপ অনুসারে বর্তমানে বসবাস ও কৃষিকাজের জন্য ৯০ শতাংশ ভূমি এ দেশের মানুষ ব্যবহার করছে। বনভূমি ধ্বংসের প্রক্রিয়া (১৯৭১-১৯৮০) জরিপ অনুসারে ৩৭০০০ হেক্টর বনভূমির মধ্যে ৮০০০ হেক্টর বনভূমি ধ্বংস হয়েছে। প্রজাতি বৈচিত্র্য মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন এবং বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। অনেক প্রজাতি হারিয়ে গেছে, আবার অনেক প্রজাতি মহাহুমকিগ্রস্ত অবস্থায় আছে।

দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান জীববৈচিত্র্য অনুসন্ধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে এসব প্রতিষ্ঠান উৎসাহী নয়। তবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান বিভাগ ও বন বিভাগের ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত জরিপ কার্যক্রম থেকে জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। সম্প্রতি কিছু সংরক্ষণবাদী দল, সংগঠন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু বিলুপ্ত প্রায় বন্য প্রাণীর অবস্থান মূল্যায়ন করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্ভেরিয়াম সীমিত সম্পদের বাংলাদেশে উদ্ভিদ জরিপে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

গৃহপালিত পশুপাখি ছাড়াও বাংলাদেশে ২৩ প্রজাতির উভচর, ১৫৪ প্রজাতির সরীসৃপ, ৬৩২ প্রজাতির পাখি এবং ১৩২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর তালিকা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের এ পর্যন্ত জীববৈচিত্র্যের ওপর একটি সার্বক্ষণিক জরিপ না হলেও বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশে পাঁচ হাজারেরও (৫০০০) অধিক সপুষ্পক উদ্ভিদ প্রজাতি এবং পনেরশ প্রাণী প্রজাতি বিদ্যমান বলে ধারণা করেন এবং এদের বেশি ভাগই প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে বিচরণ করে। কিন্তু সম্প্রতি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, এসব প্রাণী প্রজাতির বেশির ভাগই দুষ্প্রাপ্য ও বিলুপ্তির পথে। জাতিসংঘ পরিবেশ জরিপ ১৯৯৫ মতে বিশ্ব জীববৈচিত্র্য নিরূপণ অনুসারে ১৬০০ থেকে ১৮০০ সালে কেবল ৩৮টি প্রজাতির পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটেছে। ১৮১০ সাল থেকে ১০০৫ সাল পর্যন্ত তার তিনগুণ ১১২ প্রজাতি পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। উদ্ভিদ, মাছ ও কীটপতঙ্গের ন্যায় অন্য ধরনের প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটেছে হাজার হাজার। প্রাকৃতিক বসতি, বিশেষ করে উপকূলীয় বনাঞ্চলের অন্তর্ধানই প্রজাতিসমূহের বিলুপ্তির মূল কারণ। এটি প্রধানত মানুষের কাজের ফলশ্রুতি বন উজাড়, বায়ূ ও পানিদূষণ, সমুদ্রে বর্জ্য নিক্ষেপ ও সাধারণভাবে উন্নয়নের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সবগুলোই পরোক্ষভাবে মানব জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট। ১৯৮০ ইং দশকের গোড়া থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত আর্দ্র উষ্ণমণ্ডলীয় হরিৎ বনাঞ্চলের প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ একর প্রতি বছর বিনাশ হয়ে গেছে, বিশ্ব ভিত্তিতে ১ শতাংশের কম। এসব বনাঞ্চল ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ৭শতাংশ জুড়ে থাকলেও তা এ গ্রহের ৫০শতাংশ থেকে ৮০শতাংশ প্রজাতিকুলের বসতি (জি বি - ১৯৮০)। বিশ্বের অনেক উষ্ণমণ্ডীয় দেশের মতো আমাদের দেশেও প্রাকৃতিক বন উজাড় হচ্ছে ও এর ফলে জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তি ঘটছে প্রতিনিয়ত। বাংলাদেশে কি পরিমাণ বন উজাড় হচ্ছে তার জরিপ বা পরিসংখ্যান না থাকলেও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে প্রতিবছর ৩৮,০০০ হেক্টর প্রাকৃতিক বনভূমি উজাড় হচ্ছে (করিম, ২০০০)।

জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য কনভেনশন (FCBD) ১৯৯২ ইং সালের জুনে জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়নে সম্মেলনে স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং ১৯৯৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর তা আইনগতভাবে অবশ্য পালনীয় করা হয়, ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৬ ইং পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ ১৬৫টি দেশ এই কনভেনশন অনুমোদন করেছে। কনভেনশনের উদ্দেশ্য হলো জৈব প্রজাতি, জেনেটিক সম্পদ, বসতি ও ইকো-ব্যবস্থা সংরক্ষণ, জৈব সামগ্রীর স্থিতিশীল ব্যবহার নিশ্চিত ও জেনেটিক সম্পদ থেকে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য ও সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করা।

কনভেনশনে প্রাকৃতিক পরিবেশের বাইরে জৈব উপাদান সংরক্ষণ এবং ইকো-ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রজাতিগুলো রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জীববৈচিত্র্য কনভেনশনে বাংলাদেশও অংশগ্রহণ করে এবং কনভেনশন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।এ চুক্তির আলোকে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কিন্তু বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের তথ্য খুবই অপ্রতুল এবং অনেকাংশে তা অনুমানভিত্তিক অথবা গৌণ তথ্যভিত্তিক। জীববৈচিত্র্যময় এলাকাসমূহের বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যের আলোকে অদ্যাবধি চিহ্নিত করা হয়নি। কেবল বনবিভাগের কিছু অনন্য সমৃদ্ধ এলাকাকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশ বন বিভাগ এসব সংরক্ষিত বনাঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্ত দেশের দক্ষিণ পূর্ব দিকের পার্বত্য বনাঞ্চলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বন বিভাগ আশানুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারেনি। প্রতি বছর পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলের প্রায় ৪০ হাজার একর পাহাড়ি জমিতে জুম চাষ করা হচ্ছে যা অত্র অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রধান অন্তরায় বলে চিহ্নিত হয়েছে। এতে করে বনাঞ্চল উজাড়সহ বনজ সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দুই শতাধিক কোটি টাকা হবে। বাংলাদেশে ৫০০০ গুপ্তবীজী উদ্ভিদের একটি পরিসংখ্যান ছিল। তিনটি ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ এদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে জন্মাত। বিভিন্ন কারণে এই উদ্ভিদগুলো মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ যেমন ফলের গাছ, শস্যের ক্ষেত, বাঁশঝাড়, ওষধি উদ্ভিদ আবার কিছু জলজ উদ্ভিদ (Khan, ১৯৯০)। বাংলাদেশ কিছু ফসলি উদ্ভিদের জেনেটিক রিসোর্সের

Dhaka University Institutional Repository

দিক থেকে বেশ সমৃদ্ধ। যেমন কলা, শাক, পাট, তুলা ও ওচা। প্রায় ৮০০০ ভ্যারাইটির ধান ও ৩০০০ ভ্যারাইটির অন্যান্য শস্য অসংরক্ষিতভাবে বাংলাদেশে আছে (Mahatab, 1991)। বন ধ্বংসের কারণে এই ভ্যারাইটিগুলো আজ হুমকির মুখে। বাংলাদেশের ক্ষেত-খামার থেকে শুরু করে জলজ উদ্ভিদ বিপদাপন্ন হয়ে পড়ছে। ২৭টি বিপদাপন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে ৯টি প্রজাতি এন্ডেমিক (MoEF, 1991; Mahatab, 1991) আটটি কাঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়ামের তালিকায় ৩৭টি প্রজাতি হুমকিগ্রস্ত। বাংলাদেশে বর্তমানে ৮০০০ ভ্যারাইটির ধান রয়েছে। উচ্চ ফলনশীল ধানের কারণে প্রাকৃতিক প্রজাতিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের জলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে একই কথাই প্রযোজ্য (Ahmed, 1999; (Bangladesh State of Biodiversity)। গ্রাম্য জনসাধারণ খাদ্য, আশ্রয়, জীবিকার জন্য এই জলাভূমির ওপর নির্ভরশীল। ৩৩০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৩০০ প্রজাতির পাখি (দেশি ও অতিথি), ১২০ প্রজাতির মাছ, ৫০ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী এবং ৮ প্রজাতির উভচর এই জলাভূমিগুলেতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক চক্রের মধ্যে পানিচক্র, ভূ-জৈব রাসায়নিক চক্র, উৎপাদনচক্র সফলভাবে সম্পন্ন করতে জলাভূমি প্রয়োজন। নিম্ন জলাভূমির সঙ্গে গ্রাম্য মানুষের জীবন জড়িয়ে আছে। মাছ ধরা, নৌকা চালানো এর উদাহরণ। জনসাধারণ প্রাকৃতিক শোভা উপভোগের জন্য জলাধারের কিনারে জড়ো হয়। কখনো বর্ষাকালে চলে নৌকাবাইচ। মাছে-ভাতে বাঙালি মাছের এক প্রধান জোগানদাতা এই জলাভূমিগুলো। বাংলাদেশের হ্রদ, হাওড় বাঁওড়, পুকুর ও দিঘিতে প্রায় ২৭০ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়।

নিম্ন জলাভূমিগুলো বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের ভাণ্ডার। টেকসই উন্নয়ন এসব জলাভূমিগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করবে যা একটি দেশের কল্যাণ বয়ে আনবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এসব জলাভূমির সংরক্ষণ জরুরি। বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। এ দেশে রয়েছে সমুদ্রতীরবর্তী উপকূলীয় বনাঞ্চল ও ম্যানগ্রোভ বন। ১০০০ -এর চেয়ে বেশি ধানের প্রজাতি, ৫০০০ এর চেয়ে বেশি উদ্ভিদ প্রজাতি, যার মধ্যে ৩৩টি প্রজাতি হুমকিগ্রস্ত, ৩৫০ প্রজাতির পাখি আছে, যার মধ্যে ২৭টি প্রজাতি হুমকিগ্রস্ত। কমপক্ষে ৫০০ প্রজাতির ফুল আছে যাদের বেশির ভাগ অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন। এ দেশে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা ৬ হাজারের বেশি, তন্মধ্যে ৩০০ বিদেশি ও ৮ একান্ত দেশীয়। বিপন্ন হিসেবে চিহ্নিত ৯৫ প্রজাতির বৃক্ষের ৯২টি আবৃতবীজ, ৩টি নগ্নবীজ। কেবল স্বাদুপানিতেই আছে ৩০০ প্রজাতির শৈবাল ও তাদের জাত। স্বল্পলোনা ও সমুদ্রে রয়েছে সহস্র। ছত্রাক সম্পর্কে এখনো পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগৃহীত হয়নি। ব্রায়োফাইট প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ২৫০। বাংলাদেশে জন্মে এমন ২৫০ প্রজাতির টেরিডোফাইটের মধ্যে ২৩০টি হলো ফান। সপুষ্পক (আবৃতিবীজ) উদ্ভিদ আছে প্রায় ৫,০০০ প্রজাতির। এ দেশে জন্মেমাত্র ৪ প্রজাতির নগ্নবীজ উদ্ভিদ তন্মধ্যে ৩টিই সাইকাস, নিটাস বিপন্ন। বাংলাদেশে ৩ প্রজাতির ধান রয়েছে এবং প্রকারভেদ ১০,০০০ প্রজাতির হয়ে থাকে (কালাম, ২০১২)।

বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত শনাক্ত ভ্রমরের ১৮ প্রজাতির মধ্যে ৪টি মৌমাছি এবং ২টি প্রজাতির ভীমরুল পাওয়া গিয়েছে। পৃথিবীতে মাছের প্রজাতি প্রায় ২২,০০০, উভচর ৫০০, সরীসৃপ ৭,৪০০, পাখির ৮৫৭ ও স্তন্যপায়ী ৪,৫০০। বাংলাদেশের বনভূমি ও জলাভূমি মেরুদণ্ডী প্রাণীতে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের প্রায় ১৬০০ প্রজাতির মেরুদণ্ডীর মধ্যে রয়েছে ৭০৮ প্রজাতির মাছ (অভ্যান্তরীণ ২৬৬ ও সামুদ্রিক ৪৪২) ২২ প্রজাতির উভচর, ১২৬ প্রজাতির স্তন্যপায়ী (অভ্যন্তরীণ ১১০, সামুদ্রিক ১৭) ৬২৮ প্রজাতির পাখি (স্থায়ী ৩৮৮, পরিযায়ী ২৪০) ও ১১৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী (অভ্যন্তরীণ ১১০, সামুদ্রিক ৩)। গত শতাব্দিতে ১ ডজনেরও বেশি মেরুদণ্ডী প্রাণী বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে গেছে। IUCN (২০০০) কতৃর্ক বাংলাদেশের মেরুদণ্ডী প্রাণিকুলের বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন অনুসারে বিভিন্ন পর্যায়ের বিপন্ন প্রজাতির সংখ্যা মাছ ৫৪, উভচর ৮, অভ্যন্তরীণ (সামুদ্রিক নয়) সরীসৃপ ৫৮, স্থায়ী বাসিন্দা পাখি ৪০, অভ্যন্তরীণ স্তন্যপায়ী ৪০।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ, অবিবেচনা প্রসূত সম্পদের আহরণ, কৃষিভূমির সম্প্রসারণ, বনভূমি সংকোচন, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, অধিক ফলনশীল শস্য উৎপাদনের জন্য পরিবেশের সাথে ভারসাম্যহীন প্রযুক্তি তথা রাসায়নিক সার কীটনাশক প্রয়োগ, লোকজ ঐতিহ্যের বিলুপ্তি, পরিবেশের বিরূপ পরিবর্তন অর্থাৎ এসবের একক এবং সামগ্রিক প্রভাব অনেক প্রজাতি ভূপৃষ্ঠ থেকে বিলীন হয়ে গেছে। যার ফলে লোপ পাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। আর যেটুকু আছে তাও আবার হুমকির সম্মুখীন।

বর্তমান বিশ্ব মানবাধিকার ও পরিবেশ ও দুটি কথা সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। কেননা পরিবেশকে টিকিয়ে রাখার ওপর সমগ্র মানব সত্ত্বার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। সমুদ্রের পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি গ্রিনহাউস ইফেক্ট ওজোন স্তরের ক্ষয় বায়ুমণ্ডলে গ্যাসের অতিরিক্ত নির্গমন।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পায়িত বর্জ্য অধিক হারে পানিতে নির্গমন ইত্যাদি কারণে সমগ্র ইকোসিস্টেমে একটি নীতিবাচক প্রভাব ফেলেছে যার ফলে লোপ পাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও টেকসই উন্নয়নের জন্যে জাতিসংঘ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

আমাদের চারপাশের গাছপালা এবং পশুপাখির মধ্যে রয়েছে হাজারো বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যকে ঘিরেই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। সভ্যতা বিকাশের চাপে এই ভারসাম্য আজ ব্যাহত হচ্ছে। এ জন্য মানুষ তার চারপাশের পরিবেশ নিয়ে আজ উদ্বিগ্ন। এই উদ্বেগ্যের আরো একটি কারণ রয়েছে তা হলো গাছপালা পশু-পাখির বৈচিত্র্য তথা জীববৈচিত্র্যের মধ্যে একটা ক্ষয়ের ধারা এসেছে। হারিয়ে যাচ্ছে বহু গাছপালা লতাগুল্ম ও পশুপাখি প্রজাতি।

উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের প্রজাতিগত বৈচিত্র্যকেই সহজ ভাষায় একটি স্থানের জীববৈচিত্র্য বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চলের আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ গড়ে ওঠে। পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য প্রত্যেকটি গাছপালা ও প্রাণী নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। যেমন ক্যাঙ্গারুর পা সামনের দিকে ছোট, পেছনের বড়। তেমন পানি টেনে আনার জন্য খেজুর গাছের শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যে কারণে জীববৈচিত্র্যের বিষয়টি উদ্বিগ্নতার কারণ তা হলে যে প্রজাতিটি হারিয়ে যাচ্ছে তাকে আর আমরা ফিরে পাব না। একই সঙ্গে তার কি গুণাগুণ ছিল তাও জানতে পারব না কখনো। যেমন মৃতসঞ্জীবনী লতা, ঝিং সেংয়ের বিস্ময়কর গুণাবলি নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে। আমাদের দেশে আগে প্রচুর পরিমাণে ব্রাহ্মলতা জন্মাত তা দিয়ে স্মৃতিবর্ধক ঔষধ তৈরি করা হতো। এটি বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করার ফলে এই গাছটিকে আর তেমনভাবে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই ধরনের দুষ্প্রাপ্য লতা খুঁজে দেখার জন্য এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য গবেষণা করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আমাদের দেশে পড়তে শুরু করেছে যদিও এর জন্য বাংলাদেশ দায়বদ্ধ নয়। উন্নত বিশ্বের অযাচিত কাজের ফসল জলবায়ু পরিবর্তন যার কারণে জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে আজ। বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ একটি সময়ের দাবি।

বিগত শতাব্দীতে বিশ্বজুড়ে জনসংখ্যার বিপুল স্ফীতির কারণে এ পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্যর উপাদান বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে। এমনকি কোনো কোনো প্রজাতি পুরোপুরি বিলুপ্তির পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। জনসংখ্যার আধিক্যে বিপর্যস্ত ছোট আয়তনের বাংলাদেশও এ পরিস্থিতির শিকার। এক সময় বাংলাদেশে ছিল এমন বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা বিলুপ্তির দিকে এগোচ্ছে। বিশ্বে অন্যান্য অংশের বিভিন্ন দেশে জীববৈচিত্র্যের ওপর হুমকি এসেছে বহু কারণে মানুষের হামলা ভিন্ন প্রজাতির মোকাবেলায় টিকতে না পারা। পরিবেশের পরিবর্তন দূষণ বিশ্বায়ন ও অবাধ শিকার। একথা সত্য যে আমাদের জীববৈচিত্র্যকে বিপর্যস্ত করার অনেক কারণই মানবসৃষ্ট। এক সময় জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ছিল এমন ছয়টি এলাকাকে বাংলাদেশের পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সেই এলাকাগুলো বর্তমানে গুরুতর হুমকির সম্মুখীন বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকা এবং দেশের বিভিন্ন জলাভূমির যেগুলো বর্তমানে জীববৈচিত্র্যের সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে মৌলভীবাজার হাকালুকি হাওড়, টেকনাফ উপদ্বীপের সৈকত, সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ ও সোনাদিয়া দ্বীপ, সিলেটের টানগুয়া হাওড় ও মাজাট হাওড়। বর্তমানে নতুন একটি জলাভূমিকে সংকটাপন্ন বলা হয়েছে সেটা হলো ঢাকা গুলশান ও বারিধারা লেক। আশুগঞ্জ থানাটি হলো ঢাকা ও মৌলভীবাজার জেলার মধ্যবর্তী একটি স্থান। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে এই অঞ্চলের ভূদৃশ্যগত বিপুল পরিবর্তন হয়েছে। যার জন্য এই অঞ্চলে জীববৈচিত্র্য অনেকাংশে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত হচ্ছে।

আশুগঞ্জ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পনগরী ও বাণিজ্য শহর। বিদেশেও আশুগঞ্জ অনেক পরিচিত। বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় অর্থনীতিতে আশুগঞ্জ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এখানে দেশের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা তথা শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। আশুগঞ্জ সার কারখানা, আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র, পেট্রোবাংলার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, খাদ্যশস্য সাইলো বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। এ ছাড়া এখানে খুব শীঘ্রই রূপান্তরিত গ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মাণের কাজ শুরু হবে। সড়ক যোগাযোগের জন্য ভারতীয় ট্রানজিটের নৌবন্দর হিসেবে আশুগঞ্জকে ব্যবহারের ভারতীয় উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আশুগঞ্জের গুরুত্ব আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে।

শিল্প ছাড়াও আশুগঞ্জ বাংলাদেশের একটি অন্যতম বাণিজ্য নগরী হিসেবে সমাধিক পরিচিত। বিশেষ করে ধান এবং চাউলের ব্যবসার জন্য আশুগঞ্জ একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগরী। এখানে দেশের অন্যতম বৃহৎ সেচ প্রকল্প 'মাহবুবুল হুদা ভূঁইয়া ইরিগেশন প্রজেক্ট' অবস্থিত। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই আশুগঞ্জের ধান-চাউলের বিশাল বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সিলেট এবং চট্টগ্রামের সিংহ ভাগ চাউল আশুগঞ্জ থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এখানে ছোট-বড় ছয় শতাধিক চাতাল ও অটো রাইস মিল গড়ে উঠেছে এবং এই

Dhaka University Institutional Repository

সেক্টরটি একটি শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর ফলে উক্ত সেক্টরে এখানে প্রায় অর্ধলক্ষ লোক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। ক্রমে ক্রমে ব্যবসা এবং শিল্পক্ষেত্রে আশুগঞ্জের গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে।

আশুগঞ্জ থানাটি নগরায়ণের ফলে এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় নগরগুলো বেশির ভাগই গড়ে উঠেছিল নদীর তীরে। আশুগঞ্জ থানাটি এর ব্যতিক্রম নয়। মেঘনা নদীকে কেন্দ্র করেই আশুগঞ্জ থানাটির উত্থান ও বিকাশ। আশুগঞ্জ থানা থেকে মেঘনার রেলপথ ও সড়ক সেতু এই দুটি সেতুকে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকা ও বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সাথে সকল প্রকার যোগাযোগের বিকাশ ঘটে থাকে ফলে এই এলাকাটি ধীরে ধীরে উন্নত নগরের দিকে বিকশিত হচ্ছে। নগর হচ্ছে বহু মানুষের বাসস্থান ও কর্মস্থল। নগর বিকাশের প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যালয় হ্রদ, পার্ক, বাজার ইত্যাদি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিচারে আশুগঞ্জ একটি সুন্দর স্থান। এর নৈসর্গিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে। পশ্চিমে মেঘনা নদী, পূর্বে সোনাহরের তিতাস নদী এবং নগরের অভ্যন্তরের জলাভূমি ও ফসলি জমি এবং অসংখ্য গাছপালা। কিন্তু নগর নির্মাণের সময় আমরা যদি এই সব উপাদান সঠিকভাবে রক্ষা করতে ব্যর্থ হই এবং জলাভূমি সদব্যবহারের পরিবর্তে নির্মাণ করা হয় অপরিকল্পিত দালান-কোঠা তাহলে এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে। আশুগঞ্জ অঞ্চলটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত এই অঞ্চলটি পাট, ধান ও মাছের ব্যবসার জন্য বিখ্যাত।

ইউরিয়া সার কারখানা, জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সাইলো, ধানকল, বয়লার, এবং প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্র, পল্লি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, প্লাস্টিক কারখানা, গার্মেন্টস ও ইটের ভাটার জন্য এই অঞ্চলটি বেশ সমৃদ্ধ ও উন্নত। যোগাযোগ ক্ষেত্রটিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে এই অঞ্চলে যোগাযোগ মাধ্যমটি বেশ উন্নত এখানে রয়েছে রেললাইন, সেতু এবং সড়ক সেতু। সে কারণে এই অঞ্চলটি খুব দ্রুত নগরায়ণের দিকে অগ্রসরমান হচ্ছে। যার জন্যে এই অঞ্চলের ভূদৃশ্যের ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। এ ছাড়াও ভারত-বাংলাদেশ মহাসড়কটি এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যাবে। আশুগঞ্জ এলাকায় নৌবন্দর করার জন্য সংসদে বিল পাস হয়েছে। যার ফলে এই অঞ্চলের আবাসিক অবস্থার আরো পরিবর্তন হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিশেষ করে এখানে উল্লেখ্য করা যায় যে মেঘনা নদীর ওপর সড়ক সেতু নির্মাণের পর পর এই এলাকার জীবনযাত্রার মানের বিশাল পরিবর্তন হতে শুরু করে। এর সঁঙ্গে সঁঙ্গে এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর অনেক প্রভাব পরে বদলে যেতে থাকে মানুষের কাজের ধরন। যা বর্তমান পরিবেশের জীববৈচিত্র্যের ওপর মারাত্মক ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে। মানুষ পরিবেশের জীববৈচিত্র্য বাস্তুস্থানের বিষয় চিন্তা না করেই তারা ইচ্ছে মতো বাড়িঘর তৈরি, হোটেল মোটেল তৈরি বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক কারখানা, সাইলো ইত্যাদি করেছে যা জৈববৈচিত্র্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গবেষণা আরম্ভের পূর্বে গবেষণার জন্য নির্ধারিত এলাকার জনগণের সাথে মত বিনিময় এর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, এই অঞ্চলে যেসব প্রধান কৃষিজ ফসল রয়েছে তা হলো ধান, পাট, সরিষা, গম, আলু, পেঁয়াজ ও রসুন। এর মধ্যে কিছু প্রজাতি বিলুপ্তপ্রায় সেগুলো হলো আখ, কাকরোল, মটর, কেওড়া ধুন্দুল। এই অঞ্চলটি মৎস্য চাষের জন্য বেশ উপযোগী। তবে বর্তমান সময়ে মৎস্য চাষের হার কমে এসেছে এর কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এই অঞ্চলের প্রাণী প্রজাতির মধ্যে ছিল বিভিন্ন ধরনের সাপ, সোনা গুই, বিভিন্ন ধরনের পাখি সাদা বক, উভচর, সরীসৃপ পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী যার কিছু কিছু হারিয়ে গিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আশুগঞ্জ অঞ্চলের বড় ধরনের পরিবর্তনগুলোর মধ্যে রয়েছে বেশির ভাগ মানুষের পেশা পরিবর্তন যেমন ফসলি জমিগুলোর অনেকাংশে ধান সিদ্ধ দেওয়ার জন্য বয়লার তৈরি করা হচ্ছে। যার জন্য ফসলি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এ ছাড়া সার কারখানা ও বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে।

জলাশয়ের পরিবর্তনের মধ্যে দেখা যায় যে আশুগঞ্জ এলাকার অভ্যন্তর দিকে কিছু কিছু জলাশয় মাটি দিয়ে ভরাট করে বসতি তৈরি করা হয়েছে। কিছু খাল পানিশূন্য হয়ে সেগুলোতে ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। এই ভাবে যদি আরো পরিবর্তন চলতে থাকে তা হলে এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

আশুগঞ্জ অঞ্চলটি মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত এই অঞ্চলের পানিতে এক সময় একটি বিশেষ প্রজাতির প্রাণী দেখা যেত। সাধারণের ভাষায় একে শুশুক বা শিশু বলে ডাকা হতো। যেটি ডলফিন প্রজাতির একটি প্রাণী, এই প্রাণীটিকে গ্রামের লোকজন কৌতূহলের সঙ্গে দেখেছে। নদীপথে যাতায়াতকারী লোকজনকে আনন্দ দিয়েছে। তবে বিশ্বব্যাপী পরিবেশদূষণের ফলে হারিয়ে যাচ্ছে

এসব বিচিত্র প্রাণী। মেঘনা পাড়ের মানুষ এখন আর তেমনভাবে এই প্রাণীটির দেখা পায় না। বর্তমানে মেঘনা নদীতে কী পরিমাণ শুশুক রয়েছে বা আদৌ আছে কি নেই তাও মানুষের জানা নেই।

জীববৈচিত্র্য নষ্ট হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। মানুষ বাড়ছে তাই তার আরো বাসস্থান চাই। উজাড় হচ্ছে বনাঞ্চল ভরাট হচ্ছে জলাভূমি, কলকারখানা গড়ে উঠেছে। বাড়ছে দূষণ এবং এর প্রভাব পড়ছে প্রাণী ও উদ্ভিদের ওপর। খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে পরিবেশ থেকে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী। বেচে থাকা বাসস্থানের তাগিদে মানুষ প্রাণী শিকারের সন্ধান যাচ্ছে। উদ্ভিদ বনাঞ্চল কেটে আবাস ভূমি তৈরি করছে যার ফলে হারিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ ও প্রাণী।

মেঘনা নদীর পাড়ে পলি জমে নদীর মধ্যে চর তৈরি হয়েছে। এই চরে এখন মানুষ বসবাসের জন্য বসতবাড়ি গড়ে তুলছে। আজ থেকে ৪০ বছর আগেও এই চরে এমন ভাবে মানুষ বসবাস করতে দেখা যায়নি। আশুগঞ্জ এলাকায় মেঘনা নদীতে সড়ক পথে সেতু নির্মাণের ফলে এই অঞ্চলে আবাসন ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। এবং এলাকায় গিয়ে জনমত যাচাই করে জানা যায়, নদীতে পলি জমে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাত স্থান কমে এসেছে। এই অঞ্চলে যেসব বৃক্ষ লতা ছিল তা এখন দেখা যায় না। কৃষিকাজ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এবং নদীর পানির ওপর নিয়ন্ত্রণ এনে তা অন্যত্র প্রবাহিত করার জন্য ব্যারেজ অথবা জমি নির্মাণ করা হচ্ছে। এর ফলে নদীতে কি ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়ছে তা সঠিকভাবে তলিয়ে দেখা হয় না। এই সব অবকাঠামো অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণের ফলে নদীতে চলাচলকারী এই সব যানবাহনের জন্য জীববৈচিত্র্যের বিচরণক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এবং বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্যের পরিমাণ মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।

এক সময় প্রচুর জলাভূমি ছিল এই অঞ্চলে। মানব সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে এই জলাভূমির আয়তন কমতে শুরু করেছে। বলা যায় যে জলাভূমিগুলো বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন জনসংখ্যা বাড়ার ফলে বসতি গড়ে তোলার জন্য জলাভূমির পরিমাণ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। তা ছাড়া কৃষিজমির বৃদ্ধি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন, জাতীয় স্থানীয় এবং গ্রাম পর্যায়ে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তা ঘাট নির্মাণ, সংকীর্ণ কালভার্ট, পলি জমা গাছ কাটা, গবাদি পশুর অতিরিক্ত চারণ, অতিরিক্ত মৎস্য অহরণ, কল-কারখানা শহর ও অ্যাগ্রো-রাসায়নিক এবং অন্যান্য উৎস হতে পানিদূষণের ফলে জলাভূমি আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। এই সব জলাভূমি ধ্বংসপ্রাপ্ত বা হ্রাস হলে যেসব ক্ষতি হতে পারে সেগুলো হলো মৎস্য প্রজাতির উৎপাদন ও প্রজাতির হ্রাসের বন্য প্রাণীর মধ্যে বিশেষ করে পাখি এবং সরীসৃপ প্রজাতির হ্রাস, উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের ফলে দেশীয় প্রজাতির ধান বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রচুর জলজ প্রাণী আগাছা ও গুল্ম বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হারিয়ে যাবে প্রাকৃতিক পানির আধার ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে জলাভূমিকেন্দ্রিক প্রতিবেশ ব্যবস্থা, জীবিকা সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং পরিবেশ, সবচেয়ে বড় বিষয় হলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে জীববৈচিত্র্য। ওপরে উল্লেখিত কারণগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এ অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির হার নির্ণয়ের জন্য এই গবেষণাটি অতি আবশ্যক। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড যেন জলাভূমিকে ধ্বংস করে বাস্তবায়িত না হয়। তা ছাড়া জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও এলাকার স্থানীয় পরিবেশ রক্ষার জন্য গুরুত্বের ভিত্তিতে প্রাধান্য দিয়ে আরো বেশি সংখ্যক জলাভূমির তালিকা তৈরি করতে হবে। একই সাথে জলাভূমিগুলোতে যেন কোনো ধরনের দূষণক্রিয়া সংগঠিত না হয় তার জন্য মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে সর্বোপরি জনগণের সচেতনতাই পারে জলাভূমিগুলোকে রক্ষা করতে ।

গবেষণার উদ্দেশ্যাবলি নির্ধারণ

১) মৌজা মানচিত্র ও ভূ-উপগ্রহ মানচিত্র পরিক্ষণের মাধ্যমে বিগত (১৯৫০-২০১৪) ৬৪ বছরের ভূ-দৃশ্য পরিবর্তন নির্ণয় করা

২) বিগত ৫০ বছরে কি কি উদ্ভিদ ও প্রাণী ছিল তার একটি সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করা

৩) ২০১৩-২০১৪ সালের মধ্যে গবেষণা এলাকায় জলজ-স্থলজ জীববৈচিত্র্যের তালিকা প্রস্তুত করা হবে

৪) গবেষণা এলাকার জলজ বাস্তুসংস্থান ও স্থলজ বাস্তুসংস্থানের গুণাগুণ নির্ধারণ করা

৫) জীববৈচিত্র্য হ্রাসের প্রাকৃতিক ও মানবীয় কারণ অনুসন্ধান

৬) জনসাধারণ ও সরকারি বন কর্মকর্তাদের মতামতের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপায় পর্যালোচনা

থিসিসের অধ্যায় বিন্যাস

গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে ভূমিকা, গবেষণার যৌক্তিকতা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে LITERATURE REVIEW, তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণার পদ্ধতি (Methodology) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিভাবে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষণাটি করা হয়েছে তা লেখা রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে এলাকা পরিচিতি। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষণা এলাকার জলবায়ূ পরিবর্তন। সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে- ইকোলজিক্যাল পরিবর্তন। অষ্টম অধ্যায়ে রয়েছে কৃষি ফসল, নবম অধ্যায়ে উদ্ভিদ প্রজাতি, দশম অধ্যায়ে প্রাণী প্রজাতি, একাদশ অধ্যায়ে গবেষণা এলাকার পাখি প্রজাতি, দ্বাদশ অধ্যায়ে মৎস্য প্রজাতি। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভূ-দৃশ্য পরিবর্তনের ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস সম্পর্ক বিশ্লেষণ, চর্তুদশ অধ্যায়ে রয়েছে ভূ-দৃশ্য ও জলবায়ূ পরিবর্তন সম্পর্ক। পঞ্চদশ অধ্যায়ে রয়েছে উপসংহার।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
পূর্ববর্তী গ্রন্থ পর্যালোচনা (LITERATURE REVIEW)

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত কত জীবের সৃষ্টি ও কত জীবর মৃত্যু ঘটেছে এর কোনো সঠিক তথ্য আমাদের জানা নেই। জীববৈচিত্র্যের রেকর্ড শুরু হয় কার্যত ১৬০০ খিষ্টাব্দের পর থেকে। এর আগে কোনো দেশেরই জীববৈচিত্র্যের পূর্ণাঙ্গ তালিকা নেই, এমনকি এখনো অনেক দেশেই জীববৈচিত্র্যের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের প্রবল ধারণা যে, কম করে হলেও এখনো অন্তত আরো ১৫ লাখ প্রজাতির জীবের বর্ণনা ও নামকরণ বাকি আছে। কাজেই এখনো যেমন অনেক জীব সম্বন্ধে আমাদের জানার বাকি আছে, আবার আমাদের জানার অনেক আগেই বহু জীব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। প্রাকৃতিক কারণে নৈপথ্য বিলুপ্তি একটি স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু বর্তমানে মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্রিয়াকলাপ ক্রমবর্ধমান হারে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে চলছে এবং এই হারে বাসস্থান ধ্বংস ও জীববিলুপ্তি চলতে থাকলে অচিরেই এটা গণবিলুপ্তিতে রূপ নেবে।

মানুষ কর্তৃক জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের সূচনা হয়েছে অস্ট্রেলিয়া (৩০-৪০ হাজার বছর আগে), আমেরিকা (১১-১২ হাজার বছর আগে), মাদাগাস্কার (১৪০০ বছর আগে), নিউজিল্যান্ড (১০০০ বছর আগে) ইত্যাদি ভূখন্ডে মানুষ পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে। প্রথম দিকে বড় বড় প্রাণী এবং উড়তে পারে না এমন পাখি মানুষের হাতে ধ্বংস হতে শুরু করে। মানুষ হিংস্র প্রাণী হত্যা করেছে আত্মরক্ষার জন্য, আর পাখি ও অন্যান্য সরল প্রাণী হত্যা করেছে খাবার সংগ্রহের জন্য এবং আগুন দিয়ে বন পুড়িয়েছে বিভিন্ন কারণে (হাসান, ২০০০)। এ পর্যন্ত ৩,০০,০০০ জীবাশ্ম প্রজাতির বর্ণনা ও নামকরণ করা হয়েছে। মনে করা হয় পৃথিবীতে জীবের উন্মেষ কাল থেকে আজ অবধি যত প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রায় ৯৯ শতাংশ এখন বিলুপ্ত। অতীতের সংঘটিত বিভিন্ন গণবিলুপ্তির কারণেই বিলুপ্তির হার এত বেশি। কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক বিলুপ্ত প্রজাতির অধিকাংশই আমাদের তালিকাভুক্ত নয়, কারণ সর্বশেষে গণবিলুপ্তি ঘটেছে ক্রিটেসিয়াস যুগের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১৩৮ মিলিয়ন বছর আগে। আর আমাদের তালিকাভুক্তির কাজ শুরু হয়েছে কার্যত আজ থেকে ৪০০ বছর আগে (হাসান, ২০০০)।

খেলা পরিচালক ও বনকর্মকর্তা Aldo Leopold, ১৯৩৩ সালে জীববৈচিত্র্য নিয়ে সম্ভবত প্রথম উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালে Fairfield Osborn's জনপ্রিয় বই লিখে 'Our Plundered Planet' জীববৈচিত্র্যের প্রতি জনসাধারণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৬০ এর দশকে আমরা জীব জগতের কি ধরণের ক্ষতি করছি এই বিষয়ে প্রকাশিত দুটি সাহিত্য জনমনে বিস্ফোরণ গঠিয়েছিল। বই দুটি হলো Rachel carson's 'Silent Spring' (1962) এবং Wesley MarX 'The Frail Ocean' (1967)। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনিয়তা ও গণসচেতনতার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বই দুটি প্রকাশ করা হয় (Mitchell and Stallings, 1970)। এই সময়ে জীববৈচিত্র্য বিষয়টি শুধু মাত্র সংরক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে সব প্রজাতির ওপর দৃষ্টি দেওয়া হতো যা প্রাকৃতিকভাবে সহজেই সনাক্ত এবং সংরক্ষণ করা যায়। ১৮৮৬ সালে the Audubon Society প্রতিষ্ঠার পর জীববৈচিত্র্য বিষয়টি জনগণের উদ্বেগের কারণ হয় (Graham, 1990)। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপলব্ধি হয় বাস্তব্যবিদ্যার বিকাশ এখানেই শেষ হয়নি। স্থানীয় ও বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন স্তরে জীববৈচিত্র্যের বিভিন্ন দিকের ওপর আরো অনেক গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বদ্বীপ সমভূমি ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ ২০°৩৪ ও ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ ও ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত পদ্মা মেঘনা, যমুনাসহ প্রায় ২৩০টি নদ-নদ, খাল, ডোবা-নালা, জলাশয় এ দেশকে জালের মতো বিস্তৃত করে রেখেছে। এসব নদী বাহির থেকে প্রতিবছর প্রায় ২ মিলিয়ন টন পলিমাটি নিয়ে এসে বাংলাদেশে জমা করে (রশীদ-২০০৩)। গঙ্গা, ব্রক্ষ্মপুত্র আর মেঘনা নদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা গড়ে উঠেছে এদেশের ৮০ শতাংশ সমতল ভূমি। এ ছাড়া ১২ শতাংশ পাহাড়িয়া অঞ্চলও ৮ শতাংশ লালমাটি সমৃদ্ধ উচ্চভূমি রয়েছে (UNDP/FAO/ 1988)। সাধারণত বনভূমি, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান, মৃত্তিকা ও জলবায়ু ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী দেশের মোট প্রাকৃতিক বনাঞ্চলকে তিনটি শ্রেনিতে বিভাজন করা যায় যথা:

ক) দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের উপকূলীয় ম্যনগ্রোভ বনাঞ্চল

খ) কেন্দ্রীয় ও উত্তর পশ্চিম উচ্চভূমির ক্রান্তীয় আর্দ্র পত্রপতনশীল শাল বনাঞ্চল।

গ) দক্ষিণ-পূর্বের চিরসবুজ ও অর্ধচিরসবুজ পাহাড়ি বনাঞ্চল

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে সে দেশের মোট আয়তনের ২৬ শতাংশ বনভূমি থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশে আয়তনের তুলনায় বনভূমি খুবই অপ্রতুল্য। দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ২.৫৩ মি.হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের ১৭.৪৯ শতাংশ) ১৯৮০ সাল থেকে গত ২০ বছরে দেখা যায় যে, দেশের বৃক্ষচ্ছাদিত বনভূমি শতকরা ২.১ শতাংশ হারে হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশের এক এক স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ এক এক রকম। আঞ্চলিকতা ভিন্ন হওয়ার কারণে উদ্ভিদগোষ্ঠীর

মধ্যে তারতম্য লক্ষ করা যায়। একটি দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে দেশের মোট আয়তনের ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ লক্ষ করলে দেখা যায় এর পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়। ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যদি পরিবেশন করতে গিয়ে ১৯৫১ সালের 'ইস্ট বেঙ্গল সেন্সাস' রিপোর্টে তখনকার বনভূমির পরিমাণ ১০ হাজার ৩৮ বর্গমাইল অর্থাৎ ২৫৯৯৮.৪২ বর্গকিলোমিটার। বৃহদাকার নদীগুলো বাদে ১৯৫১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের আয়তন ছিল ৫৪১৪১ বর্গমাইল এবং অরণ্যের আয়তন ১৮.৫৪ শতাংশ (চৌধুরী, ১৯৮৮) ।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের পরিসংখ্যান সম্পর্কিত কোনো তথ্যের তেমন উল্লেখ নেই। তবে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভূক্ত ১৯৬৫-৬৬ সালে ৯৪৪০.৮৭ বর্গমাইল অরণ্য ছিল, ১৯৮১ সালে বনভূমি ছিল ১৫ শতাংশ, ১৯৮৩-৮৪ সালে ৮২৪৫.২৯ বর্গমাইল। এ হিসাব অনুসারে ১৯৮৩-৮৪ সালে অরণ্যের পরিমাণ ছিল ১৪.৮৩ শতাংশ। কিন্তু বাংলাদেশ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল কর্তৃক ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত অ্যাগ্রিকালচার ইন বাংলাদেশ গ্রন্থে অরণ্যের পরিমাণ ১০ শতাংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি ১৯৮৫-৮৬ তে দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ১৩.৪১ শতাংশ দেখানো হয়েছে। একই সময়ে অর্থনৈতিক জরিপে বন অঞ্চলের পরিমাণ ধরা হয় ৯.৩ শতাংশ। দ্য টাস্কফোর্স রিপোর্ট ফর ইউএনসিইডি (১৯৯২) এ বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ ১৯.৭৯ শতাংশ উল্লেখ করা হয় (হক ২০০২)। পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি (১৯৯৩) বনভূমি ১২.৮০ শতাংশ বলা হয়েছে। অনেকের মতে এর প্রকৃত পরিমাণ আরো কম (ইমাম, ২০০০)। Foresty Master plan 1995 and ADB/GOB/MOEF in Resources, Environment and Development in Bangladesh (in BUP) এর তত্ত্ব হতে দেখা যায় বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ১৭.৯ শতাংশ (Gain 1998)। Bangladesh state of Environment report 1997 অনুযায়ী বনভূমির পরিমাণ ১২.৭৮ শতাংশ। পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি ২০০১ তে মোট বন ভূমির পরিমাণ মোট ভূমির ১৩.৩৬ শতাংশ উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০০২) তে বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাপ্ত উপাত্ত অনুসারে বর্তমানে দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৭ শতাংশ। বর্তমানে ১.১ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বনভূমি রয়েছে যা মোট ভূমির ৭.৭ শতাংশ বনভূমি। (Bangladesh state of Environment report 2002)। ইন্টারনেট হতে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় বনভূমির পরিমাণ মোট ভূমির ১০ শতাংশ (FAO, Last Updated, 2001)। USAD and CIDA -এর পরিচালনায় এক জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে বিগত ২০ বছরে দেশের ৫০ শতাংশ বন উজাড় হয়ে গেছে। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত বনভূমি সংক্রান্ত উপাত্তের ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞসহ সব মহল এ ব্যাপারে একমত যে, বর্তমানে বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ ন্যূনতম সীমা রেখার অনেক নিচে যা কোনো ক্রমেই ১০ শতাংশের ঊর্ধ্বে নয়। ৬৪ টি জেলার মধ্যে ৬০টিতে কোনো রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই (the Fourth five year plan, 1990-95) এ বিভিন্ন বিভাগ ভিত্তিকভাবে পরিসংখ্যানে দেখা যায় কোনো বিভাগেই প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিমাণ বনভূমি নেই (ইমাম, ২০০০)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পূর্বে যে পরিমাণ বনভূমি ছিল বর্তমানে তা আরো অনেক পরিমাণ কমে গেছে। আজ থেকে প্রায় ১৩০ বছর পূর্বে ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টরের রচিত পুস্তকে দেখা যায়, বাংলাদেশের অনেক স্থানে বনভূমি ছিল বর্তমানে সেখানে বনভূমি নেই। খুলনা জেলার বালেশ্বর থেকে মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত বিপুল পরিমাণে বনভূমি ছিল (Hunter, ১৮৭৭) ।

T. E Loveijoy 1980 সালে আমেরিকার ওয়াশিংটন Dc তে World Wildlife Fund (WWF) এ Global ও Environmental topics এর ওপর কাজ করছিলেন। তিনি Global Forestry, Global Climate এর সঙ্গে Biological Diversity সম্পর্কে US প্রেসিডেন্টের কাছে Report করেন। এতে তিনি Forest এর সার্বিক ক্ষতির বিষয় তুলে ধরেন। তিনি তার Report এ বনের প্রজাতির মোট সংখ্যাকে Biological Diversity হিসেবে দেখিয়েছেন।

E. A Norse R. E. ও Mc Mauus 1980 সালে US প্রেসিডেন্ট কার্টার সময় White House Council on Environmental Quality এর ইকোলজিস্ট ছিলেন। Council on Environmental Quality- একাদশ বার্ষিক Report এ Biological Diversity এর Genetical ও Ecological বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন।

বর্তমান জীববৈচিত্র্য সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। আমাদের তালিকাভুক্ত প্রজাতির মধ্যে অনেক প্রজাতি ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান হারে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৮ সালের ৮-এপ্রিল প্রকাশিত IUCN Redlist -এর রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, পৃথিবীর বর্তমান উদ্ভিদ প্রজাতির ১২.৫ শতাংশই বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁচেছে অর্থাৎ ২,৭০,০০ ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে ৩৩.৭৯৮টি প্রজাতিই বিলুপ্তির কাছাকাছি অবস্থায় আছে। বিগত বছরগুলোতে কি হারে প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ বিলুপ্তির হার নির্ণয় করা যায়। জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে দেখা যায় প্রতি দুইশ বছরে একটি স্তন্যপায়ী প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্তি ঘটেছে; কিন্তু শুধুমাত্র এই শতাব্দীতেই বিলুপ্ত হয়েছে কমপক্ষে ২০টি প্রজাতি। পাখির বিলুপ্তির হার আরও অনেক বেশি।

বাসস্থান ধ্বংসের পরিমাণ হতে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি বা বিলুপ্তি অনুমান করা যায়। সাধারণভাবে বলা হয় ৯০ শতাংশ বাসস্থান হ্রাস পেলে ৫০ শতাংশ প্রজাতি ধ্বংস হয়। প্রজাতি বিলুপ্তির একটি বড় কারণই হলো বাসস্থান বা আবাসস্থল ধ্বংস। হিসেব করে দেখা গিয়েছে প্রজাতি ভেদে আগামী ২৫ বছরে বিলুপ্তির হার ২ থেকে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বন ধ্বংসের কারণে আগামী ২৫ বছরে প্রজাতি ভেদে ১

থেকে ১০ শতাংশ বিলুপ্তির হতে পারে। যা নৈপথ্যে বিলুপ্তির হারের তুলনায় ১,০০০-১০,০০০ গুন বেশি। ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ ইং সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মরু প্রক্রিয়াসংক্রান্ত সম্মেলনের বিবরণী থেকে দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় ২/৫ অংশ এলাকা মরুভূমি হয়ে যাওয়ার হুমকির সম্মুখীন। প্রতি বছর প্রায় ২ লাখ বর্গমিটার জায়গা (পশ্চিম জার্মানির আয়তনে সমান) মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাংশের প্রায় ৪টি জেলার ৭২৯৬ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃতি বরেন্দ্র এলাকায় মরু প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। এই এলাকা প্রায় ভূমি ক্ষয়ের কবলে পতিত হয়, বৃষ্টিহীনতার দরুণ এখানে প্রতি বছর খরা দেখা দেয়। IUCN প্রোগ্রাম- ১৯৮৪ -এর প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে বিলুপ্তি ঘটবার কারণ গুলো জরুরী ভিত্তিতে মোকাবেলা করতে না পারলে যেসব বন্যপ্রাণী অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তাদের বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বে সংগ্রহ করতে হবে।

WRI (World Resources Institute) ১৯৯২ ইং-এর আলোকে জীববৈচিত্র হ্রাসের জন্য বসতি বিনাশ ও খণ্ডায়নকে দায়ী করেছে। তাদের আলোচনা মতে জনসংখ্যা ও সম্পদ আহরণ প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় বিগত কয়েক যুগ ধরে প্রাকৃতিক পরিবেশে নিরাপদ বাস্তুতন্ত্র দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে উঠছে। ফলশ্রুতিতে মধ্য আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল বরাবর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনভূমির ৯৮ শতাংশ বিলুপ্তির পথে, ১৯৮১-৮৫ সালে থাইল্যান্ড থেকে বিলুপ্ত হয়েছে ২২ শতাংশ বনভূমি, বাংলাদেশ হারিয়েছে প্রায় ৭ শতাংশ বনভূমি।

সোভিয়েত রাশিয়ার বিখ্যাত উদ্ভিদ প্রজননবিদ N. I Vavilov (১৯৪৯-৫০) সরকারের আর্থিক এবং সক্রিয় সহযোগিতায় তাঁর কয়েকজন সহকর্মীসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আবাদি উদ্ভিদের উৎপত্তিস্থল নির্ধারণ ও বুনো জাত আবাদি উদ্ভিদ সংগ্রহের অভিযান চালিয়েছিলেন। এই সংগ্রহ অভিযানের ভিত্তিতে তিনি আবাদি উদ্ভিদের উৎপত্তিস্থান সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ উপস্থাপন করেন। তার মতানুসারে যদি এলাকায়

১) একটি আবাদি শস্যের সর্বাপেক্ষা অধিকজাত প্রকরণ অথবা শনাক্তকারী লক্ষণ গুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবধান দেখা হয়।

২) এই স্থানে ওই প্রজাতির এবং তার সমপ্রজাতিগুলোর ব্যাপক সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। তবে সে স্থানটিকে উক্ত প্রজাতির উৎপত্তিস্থল বলে গণ্য করা উচিত। তার এই বিরাট সংগ্রহের বাছাইকরণ এবং ব্যাপক পর্যবেক্ষণের পর তিনি আবাদি উৎপত্তিস্থান গুলোকে আটটি প্রাথমিক কেন্দ্রে বিভক্ত করেন। ফসিল সর্ম্পকীয় জ্ঞান এবং বর্তমানকালের তথ্য থেকে এটি প্রমাণিত হয় প্রকৃতপক্ষে প্রজাতি এবং প্রজাতির জেনেটিক বৈচিত্র্য ধ্বংসের মাধ্যমে ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়। বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বিলুপ্তির প্রধান কারণ Deterministic ও stochastic উভয় পদ্ধতি।

Diamond (1986) বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য ধ্বংসের উপাদানগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেন। এই ভাগগুলো হল অত্যাধিক হারে জীব প্রজাতি হত্যা বা ধ্বংস করা, বাসস্থান ধ্বংস, প্রবর্তিত/ আমদানিকৃত প্রাণী ও আগাছা- এর প্রভাব, দূষণ, গৌণ ক্ষতি। তাঁর এই গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিল্পের বিভিন্ন কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য অত্যাধিক হারে উদ্ভিদ ও প্রাণী নমুনা সংগ্রহ করা হলে বাস্তুতন্ত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষ তার প্রয়োজনে যখন ভূমিকে কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তখন সেই স্থানের উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবের বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ ধ্বংস হয়। যেমন কৃষিকাজ, গৃহায়ন, রাস্তা ও ড্যাম নির্মাণ, শিল্পকারখানা প্রসার, বালি পাথর দিয়ে ভরাট, চাষাবাদের জন্য নিম্ন জলাভূমি ভরাট, পর্যটন শিল্প তৈরি ইত্যাদি কারণে বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রবর্তিত প্রাণীর মধ্যে pest (যা ফসল নষ্ট করে) এবং উদ্ভিদের মধ্যে আগাছা উল্লেখযোগ্য যা ইকোসিস্টেমের ওপর মারাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করে। এরা জীব সম্প্রদায়ের গঠন, বায়োজিওকেমিস্ট্রি, ভূমিক্ষয়, পানিচক্র ইত্যাদি দ্বারা মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা, প্রাণী চারণ, ক্ষুদ্র প্রাণী কর্তৃক তৃণচারণ, অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা (প্রবর্তিত ও স্থানীয় জীবের), রোগ সৃষ্টি মিথোজীবী ও পলিনেটর ধ্বংস ইত্যাদি সংঘটিত করে। এর ফলে স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির ওপর প্রবর্তিত প্রাণী ও উদ্ভিদ মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশে ইউক্যালিপটাস, কচুরিপানা, আফ্রিকার মাগুর প্রভৃতির প্রবর্তন উল্ল্যেখ করা যেতে পারে। পরিবেশ দূষণের নানা ধরণের ভৌত রাসায়নিক ও জৈবনিক কারণগুলো পরিবেশের স্বাভাবিকতা নষ্ট করে। এর ফলে যে কোনোইকোসিস্টিমের বাসস্থান নষ্ট হয় তথা জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়। যে কোনো দুই বা ততোধিক কারণে সমন্বিত ক্ষতির মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের গৌণ ক্ষতি সাধিত হয়।

Harris & Silva-lopez (1992) এর মতে, বাস্তুতান্ত্রিক যে কোনো ক্ষতির জন্য পপুলেশন খণ্ডায়ন (Fragmentation) সবচেয়ে বেশি দায়ী। যে কোনো বিশালাকার বাসস্থানের জীববৈচিত্র্যগুলো অস্বাভাবিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হওয়াকে খণ্ডায়ন বা Fragmentation বলে । এই খণ্ডগুলোতে ভিন্ন ধরনের প্রজাতি দীর্ঘ সময়ের জন্য অবস্থান করে।

de Comdolle (1855) পর্যবেক্ষণ করেন যে, যেকোনো ভূখণ্ডকে ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করলে ক্ষুদ্র খণ্ড থেকে এক বা একাধিক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে। Fragmentation-কে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হল ১) Regressive 2) Enveloping 3) Divisive 4) Intrusive & 5) Encroaching এর কোনো এলাকা খণ্ডিত হলে সেই খণ্ডিত স্থানটি কৃত্রিম স্থলজ চরে পরিণত হয়।

Vavilov বিশ্বাস করেন যে সেন্টার অব জেনেটিক ডাইভারসিটি আবার ঐ ট্যাক্সোনের জন্য সেন্টার অব অরিজিন ও বটে। একথাটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্য। বিশেষ করে বিরাট মহাদেশীয় ভূখণ্ডের ট্রপিক্যাল অঞ্চলে যেখানে হাজার হাজার বছরে জলবায়ুর তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। কিন্তু যেখানে আধুনিক ট্যাক্সো সৃষ্টির পর হতে জলবায়ুও ব্যাপক পরিবর্তন ও স্থলভাগের ব্যাপক চ্যুতি-বিচ্যুতি ঘটেছে সেখানে সেন্টার অব অরিজিন' এবং সেন্টার অব জেনেটিক ডাইভারসিটি' অভিন্ন নাও হতে পারে। ট্যাক্সো যত বেশি পুরাতন হবে, সেন্টার অব অরিজিন এবং সেন্টার অব জেনিটিক ডাইভারসিটি এক হওয়ার সম্ভাবনা ততই কম হবে।

Stebbins-এর মতে বিবর্তনীয় প্রক্রিয়া অতীতকালে যেরূপ ছিল বর্তমানকালেও সেরূপই আছে। এই মতানুসারে অ্যানজিওস্পার্ম প্রাথমিকভাবে বৈচিত্র্য লাভ করেছিল আংশিক অনুর্বর (semi-arid) অঞ্চল গুলোতে যেহেতু সেই বাসস্থানগুলোই এখন প্রতি গণের সর্বাধিক সংখ্যক প্রজাতি ধারণ করে। প্রতিটি মনোটাইপিক ট্যাক্সোনোর একটি মাত্র সেন্টার অব অরিজিন থাকার কথা।

Afrin et. al. (2010) একটি গবেষণা করেছেন 'The Environmental Impact of Alien Invasive plant Species in Bangladesh' তিনি তাঁর গবেষণায় বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন দেশের প্রজাতির বিরূপ প্রতিক্রিয়ার একটি প্রভাব আনুপাতিক হারে বিশ্লেষণ করেছেন। একটি বিদেশি প্রজাতি স্থাপনের ফলে এবং সহিংস আক্রমণাত্মক পরিবেশের পরিবর্তন যা বাংলাদেশের স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। তিনি দেখিয়েছেন যে, আক্রমণকারী Alien গাছপালা বিস্তারে নৃতাত্ত্বিক ব্যাঘাতের কারণে হতে পারে। প্রাকৃতিক শত্রুর অনুপস্থিতি তাদের অবাদ শোষণ সুবিধা সবার জন্য ক্ষতির কারণ হবে। এবং ঘন ঘন তাদের অ্যালোপ্যাথিক প্রতিযোগিতামূলক কৌশল দেশীয় প্রজাতির জীবিকা নির্বাহনে আক্রমণাত্মক বিবেচিত হবে, প্রাকৃতিক বাসস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা ধারণক্ষমতা প্রভাবিত এবং দ্রুত অপরিহার্য প্রাকৃতিক বা আধা প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের সেবা এবং গতিবিদ্যা স্থানীয় চরিত্র পরিবর্তন উন্নয়নের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।

Akter and zuberi (2009) একটি গবেষণা করেন 'Invasive Alien Species in Northern Bangladesh: Identification, inventorry ant impacts' তাদের গবেষণায় তাঁরা মূলত সাতটি প্রজাতির প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছে এই প্রজাতিগুলো হলো Ageratum conyzoides, Eichhornia crassipes, Eupatorium odoratum, (chromolaema odorata) Ipomoea carneo, Lantana Camara, Mikania micrantha and Parthenium hysterophorus। বিভিন্ন ভূমি (রাস্তার পাশে, নিচু ভূমির ওপর, পতিত জমি, বাড়ির পাশে, ও রেললাইনের পাশে) এই প্রজাতিগুলো কি ধরনের প্রভাব ফেলে তা নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি তার গবেষণায় এটি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, একটি ভিন্ন প্রজাতির উপস্থিতি সব সময় স্থানীয়ভাবে যুক্ত অন্য প্রজাতির সংখ্যা কমিয়ে দেয়। সব নতুন প্রজাতি স্থানীয় বিভিন্ন ফিনোটাইপীয় অঙ্গসংস্থানসংক্রান্ত প্রজননক্ষম প্রজাতি ধ্বংস করে তার নিজ আপন আবাসস্থল তৈরির মাধ্যমে তার অস্তিত্ব ও ক্ষমতা প্রকাশ করে।

Adjaye (2000) একটি গবেষণা পরিচালনা করেন 'Biodiversity loss and Economic Growth: A cross-country analysis' এই গবেষণায় প্রায়োগিক পরিবেশের মানের ওপর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রভাবের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এই গবেষণার মূল বিবেচ্য বিষয় হলো জীববৈচিত্র্য কমে যাওয়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর প্রভাব ফেলে। যেখানে অর্থনৈতিক ভাবে উন্নয়ন হয় সেখানে অবশ্যয় জীববৈচিত্র্য হ্রাস পায়। প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পরিবেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক তেমনভাবে অন্যদিকে জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। এই জীববৈচিত্র্য হ্রাসের মানের সঙ্গে জটিল বাস্তুতন্ত্র সুক্ষ্মভাবে জড়িত রয়েছে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি দ্বারা এই জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এই গবেষণায় যে কথাটি বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে জীববৈচিত্র্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর একটি প্রত্যাশিত বিরূপ প্রভাব আছে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিযোগিতা জীববৈচিত্র্য হ্রাসের ওপর উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলে। তিনি তাঁর গবেষণায় বলেছেন যে, জীববৈচিত্র্যের মান অপরিবর্তনীয় রেখে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর বৃহদাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হবে। কারণ অর্থনীতির উন্নয়নের বিকাশ জীববৈচিত্র্য হ্রাসের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত।

Altieri (1999) একটি গবেষণা পরিচালনা করেন 'The Ecological role of Biodiversity in Agro-Ecosystems' গবেষণায় ফসল ও মাটির উর্বরতার সুরক্ষায় জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়। এই গবেষণায় প্রকাশ পায় যে, ফসল এবং মাটির উর্বরতা সুরক্ষা নিশ্চিত করায় জীববৈচিত্র্য ভূমিকা অন্বেষণ। এই গবেষণায় দেখা যায় যে জীববৈচিত্র্য মূলত পরোক্ষভাবে পরিবেশগত জৈবিক প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। কারণ জৈবিক সম্পূর্ণতা এবং বৈচিত্র্যের রক্ষণাবেক্ষণ জৈবিক উপস্থিতির ওপর নির্ভর করে। তিনি বিভিন্ন ধরনের কৃষি বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি জীববৈচিত্র্য ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নত ধরনের কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে সে সম্পর্কে নকশা পদ্ধতি এবং কৃষি বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

Bachner (2011) একটি গবেষণা পরিচালনা করেন 'Biodiversity Conservation and Endangered Species Protection' এই গবেষণা তিনি আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য আইনের একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা প্রদান করেন এবং একটি টেকসই উন্নয়নের কৌশল প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন।

Baten (2010) একটি গবেষণা পরিচালনা করেন 'Agriculture Biodiversity and food Security: two sides of a coin' এই গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, জীববৈচিত্র্যের হ্রাস কৃষি খাদ্য সমস্যা তৈরির একটি প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই গবেষণায় দেখানো হয়েছে কৃষি ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্যের সঠিক ব্যবহার ছাড়া তথাকথিত আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা অনুশীলন বাংলাদেশের সাম্প্রতিক খাদ্য সংকটের জন্য দায়ী। অবশেষে গবেষণায় বর্তমান যান্ত্রিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে মিশ্র চাষ পদ্ধতি, জৈব কৃষি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, জৈবসার ব্যবহার, টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব করা হয়। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে, ফসল এবং পশু বর্জ্য পুর্নব্যবহার, সর্বনিম্ন খরচে কৃষি আবাদের ব্যবস্থা করা বা টেকসই প্রকল্প হিসেবে শস্য আন্তঃ আবর্তন এবং বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদন করা যেতে পারে।

Braure et. al. (2006) একটি গবেষণা পরিচালনা করেন 'the use of Market Incentives to preserve Biodiversity' এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য MBIs কিভাবে বর্তমানে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, শনাক্তরণ করছে, এই সব জীববৈচিত্র্যগুলো কিভাবে রাখা হয় এর সাফল্য বা ব্যর্থতা ও পুনরায় ব্যবহার করা হলে বা অতিরিক্ত ব্যবহার করা হলে কি ধরনের কার্যসম্পাদন করতে হবে তার সম্ভাব্য মূল্যায়ন করা। গবেষণার ফলাফলে দেখিয়েছেন MBIs (ট্যাক্স, ফি, এবং চার্জ) বর্তমান সময়ে আরো ব্যাপকভাবে বাসস্থান এবং বাস্তু সংরক্ষণ বরং সরাসরি প্রজাতি সংরক্ষণ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রাণিকুলের এক তৃতীয়াংশ প্রাণী প্রজাতি সরাসরি এর অধীনে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

Kannan and james (1999) গত দুই দশক ধরে এই বিষয়ে বিভিন্ন জার্নালে ও প্রধান কাগজপত্রের ওপর ভিত্তি করে এই গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করেন। এই প্রতিবেদনের নাম 'Effects of Climate Change Global Biodiversity: A review of key literature' একটি নৃতাত্ত্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের জীববৈচিত্র্যের ওপর তার প্রভাব এই গবেষণায় দেখানো হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত গবেষণায় যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে তা হলো কেন্দ্রিয় আমেরিকায় উভচর বিলুপ্তি কারণে, বিভিন্ন প্রাণীর প্রজাতির অবস্থান পরিবর্তন (বিশেষ করে প্রজাপতি), প্যাথোজেন চালিত রোগের বিস্তার, প্রবাল-প্রাচীরের রাসায়নিক বিক্রিয়া, এবং ক্রান্তীয় সামুদ্রিক ও স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। অবশেষে গবেষণার উপসংহারে বলা হয়েছে, যে কোনো প্রানীর বিলুপ্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর প্রভাব ফেলে। কারণ যেকোনো একটি প্রজাতি বিলুপ্তি স্থানীয় পরিবেশের এবং অন্য সব জীব সম্প্রদায়ের পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

Mukul and saha (2010) একটি গবেষণা পরিচালনা করেন 'Contribution of Indigenous Agro-forestry Systems in Biodiversity Conservation and Ecosystem Functioning: Experiences From four contrasting systems of Bangladesh' এ গবেষণায় উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশের আদিবাসীদের চার রকম কৃষি বনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন পান-দ্রাক্ষালতা (Piper betel) ভিত্তিতে খাসিয়া সম্প্রদায় কৃষি কাজ করে। লেবু (Citrus lemon) উদ্যান এবং আনারস (Ananas comosus) পালন ভিত্তিক ত্রিপুরা কৃষিচাষ পদ্ধতি, স্বল্প পুনরাবর্তন ভিত্তিক স্থান পরিবর্তনের পদ্ধতির মাধ্যমে গারো আদিবাসী সম্প্রদায় চাষ করে থাকে। তাদের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বস্তুতান্ত্রিক কার্যকারিতা বোঝার জন্য চেষ্টা করেছেন। গাছের বৈচিত্র্যময় কার্যকারিতা, বন্য ফসল রোপণ অনুপাত, সংস্কৃতি ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ মান এবং প্রতিটি কৃষি চাষপদ্ধতি বাস্তুতন্ত্র সুবিধা নিয়মানুগ জরিপ পদ্ধতির মান একটি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। গবেষণায় দেখা যায় পান দ্রাক্ষালতা ভিত্তি করে কৃষি বনায়ন অনেক বেশি পরিকল্পিত এবং বাস্তবায়নযোগ্য পরিবেশেগত ও বাস্তুতান্ত্রিক ভূমি ব্যবহারের ব্যবস্থা। এই এলাকায় উচ্চতর উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী বৈচিত্র্যকে সংরক্ষনের জন্য বাস্তুতান্ত্রিক সব ধরনের সুবিধা দিয়ে থাকে। কখনো কখনো আদিবাসী বনভূমি তৈরিতেও সহায়তা করে থাকে। তবে এই নিবিড় কৃষি বনায়ন পদ্ধতিতে অনেক উচ্চ ফলনের জন্য কৃষিক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহারের তীব্রতা স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের জন্য হুমকি স্বরূপ হতে পারে। বর্তমানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উন্নয়নগত পরিবর্তনের মাঝে অপরিবর্তনীয় কৃষি-বনায়ন পদ্ধতি, ভূমি ব্যবহারের ধারণ ক্ষমতার মধ্যে রেখে ইতিবাচক টেকসই উন্নয়ন করতে হবে।

Mukul (2007) একটি গবেষণা পরিচালনা করেন 'Biodiversity Conservation and Sustainable Development in Bangladesh: An overview of the present status, management problems and firure prospects' নিবিড় সাহিত্য গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এই গবেষণা করা হয়েছিল সম্পূর্ণ দেশের জীববৈচিত্র্য অবস্থান, জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন ব্যবস্থা বর্তমান জীববৈচিত্র্য হ্রাসের কারণ, দেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্বেগ্য, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রধান নীতি এবং আইন, জীববৈচিত্র্য গবেষণার উদ্বেগ্য, জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ খাত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরিশেষে এই গবেষণায় দেখা যায়, মৌলিক প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এই সিদ্ধান্তে আসেন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য টেকসই উন্নয়ন নীতির ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগ করতে হবে যাতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়ে দেশগুলো আরো বেশি উন্নত সুবিধা পেতে পারে।

Mokhlesur (1995) একটি গবেষণা পরিচালনা করেন 'wetland and Biodiversity: A case study of common property resources in Bangladesh' এবং কৃষিজমি ও জলাভূমি ভিত্তিক জীববৈচিত্র্য হ্রাসের জন্য জলাভূমি রূপান্তর সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি তার গবেষণায় বাংলাদেশে জলাভূমি ভিত্তিক সাধারণ সম্পত্তি ও সম্পদের বিদ্যমান অবস্থার বিস্তারিত সমীক্ষা পরিচালনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। একটি টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে জলাভূমি জৈব সংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা করার জন্য সংরক্ষণে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করেন যাতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়।

Ney-nifle and Mingle (1999) একটি গবেষণা পরিচালনা করেন যার বিষয় 'Habitat Loss and Changes in the Species-Area Relationship' এই গবেষণায় তিনি স্থান অঞ্চল সম্পর্ক ব্যবহার করে আবাসস্থল হ্রাসের পরিমাণ থেকে প্রজাতি বিলুপ্তির সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। গবেষণায় প্রজাতির বিলুপ্তির হার নির্ণয়ের জন্য একটি আয়তাকার পরিসীমা নির্ধারণের প্রয়োজন হয়। কত পরিমাণ আবাসস্থল বিলুপ্তির ফলে কি পরিমাণ প্রজাতি বিলুপ্ত হবে তার একটি অনুপাত দেখানো হয়। এই গবেষণার ফলাফলে দেখানো হয়েছে যে একটি আয়তকার এলাকায় কোনো প্রকার অভ্যন্তরীণ খণ্ডায়ন ছাড়া শুধু ৫০শতাংশ আবাসস্থল ধ্বংসের ফলে ১০ শতাংশ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর যদি অভ্যন্তরীণ খণ্ডায়ন হয় তা হলে অধিক সংখ্যক প্রজাতি বিলুপ্তির হয়।

Brink (2012) একটি গবেষণা পরিচালনা করেন যার বিষয় 'rethinking Global Biodiversity Strategies' তিনি তাঁর গবেষণায় ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী কৌশলগত উন্নয়নের সম্ভাবনা ও উৎপাদনে কাঠামোগত পরিবর্তন, পণ্য ও সেবা খরচের স্থিতিবিন্যাসের সাধারণ নীতির বিশাল ভান্ডারের রূপে জীববৈচিত্র্যকে দেখিয়েছেন। কারণ মানব উন্নয়ন খাদ্য চাহিদা, অন্যান্য পণ্য সেবা ও কাঠের চাহিদা বৃদ্ধি করে যা সরাসরি প্রাকৃতিকভাবে স্থানীয় অঞ্চলগুলোতে প্রভাবফেলে। উপরন্তু প্রাকৃতিক ও কৃষিজ জমির ওপর অর্থনৈতিক কার্যক্রম বায়ুদূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। উৎপাদন খরচ ও কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য সংরক্ষণ ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে বেশির ভাগ চাপ থেকে সরাসরি অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই মানুষের কর্মকান্ডের পরিবর্তনই জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রবণতায় গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবে ফেলতে পারে। মানুষের কর্মকাণ্ড যেমন কৃষিকাজ, বনভূমি, মৎসচাষ, শক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে eco-efficiency' (প্রতি ইউনিট উৎপাদনের ফলে পরিবেশের কি পরিমাণ ক্ষতি তা নির্ণয়) পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিজমি সম্প্রসারণ করে, স্থলজ এবং সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্রের অধিক দূষণের পরিমাণ কমিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন সীমিত রেখে জীব বৈচিত্র্য হ্রাসের মাত্রা কমানো সম্ভব।

Pingali and rosegrant (1994) একটি গবেষণা পরিচালনা করেন যার বিষয় 'Confronting the Environmental Consequence of the green revolution in Asia' এশিয়ার অনেক অঞ্চলে সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করে এক, দুই ও তিন ফসলি ধান উৎপাদন করা হয়। যা মাইক্রো পরিবেশের অবনতি করে থাকে। এসব অঞ্চলে এক, দুই ও তিন ফসলি ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাধারণ সমস্যা হয়ে দেখা দেয়, কীটপতঙ্গ সংক্রমন বৃদ্ধি, মাটি খনন, মাটি পুষ্টির হ্রাস, মাটির ধারণ ক্ষমতা, মাটি ক্ষার ও অম্লত্ব পরিমাণ বৃদ্ধি, এবং লবণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতা বৃদ্ধিজনিত একটি সাধারণ সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।

Slingenberg et. al. (2009) একটি গবেষণা পরিচালনা করেন যার বিষয় 'Study on Understanding the Causes of Biodiversity Loss and the Policy Assessment Framework' গবেষণায় জীববৈচিত্র্য হ্রাসের কারণ আর্থসামাজিক গতির ক্ষেত্রে এর মিথষ্ক্রিয়ায় কি ধরনের প্রভাব ফেলে তা ব্যাখ্যা করা হয়, যেখানে বিশ্বের পরিস্থিতির মূল্যায়নে বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণের জন্য খুব সাধারণ নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা করা হয়। এই গবেষণায় সামুদ্রিক, উপকূলীয়, জলাভূমি ও বন বাস্তুতন্ত্রের ওপর গুরুত্ব দিয়ে জীববৈচিত্র্য হ্রাসের ফলে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করে উল্লেখযোগ্য বাস্তব সম্ভত ব্যবস্থা গ্রহনের কথা বলা হয়। সামুদ্রিক এলাকা সঠিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এর ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ক্রমবর্ধমানভাবে নগরায়ণের ফলে পরিবেশদূষণ হচ্ছে স্বাদু পানির বাস্তুতন্ত্র হুমকির মুখে পড়ছে যা ক্রমান্বয়ে, জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব ফেলছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবহন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বন বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন, উপকূলীয় পরিবেশদূষণ, কৃষিজমি রূপান্তর, বৃক্ষ নিধন, জ্বালানি কাঠ, এ ছাড়া অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বাজারে জৈব জ্বালানির পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি অন্তর্নিহিত কারণে সামূদ্রীক জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ।

Thrupp (2000) তিনি একটি গবেষণা পরিচালনা করেন যার বিষয় 'Linking Agricultural biodiversity and Food Security: the valuable role of agro-biodiversity for sustainable agriculture' যার মূল বিষয় ছিল কৃষি ও জীববৈচিত্র্যের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করা। মূলত কৃষি ও জীববৈচিত্র্যের মধ্যে তেমন কোনো অনিবার্য দ্বন্দ নেই। যদি টেকসই চাষ পদ্ধতি এবং কৃষি নীতি প্রতিষ্ঠা ও পরিবর্তন করা যায় তা হলে জীববৈচিত্র্য সুসংহত রেখে উন্নত চাষ পদ্ধতি ব্যবহার করে

পরিবেশবান্ধব চাষ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন করে, খাদ্য নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন, স্বাস্থ্য এবং বাস্তুতন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব।

Uddin et. Al (2008) একটি গবেষণা পরিচালনা করেন 'Protected Areas of Bangladesh: Current Status and efficacy for biodiversity conservation and reviewed the present status of challenges to, and prospects for PAs in Bangladesh' গবেষণার উদ্দেশ্য হলো সব দেশের বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দাতা এবং সংরক্ষণ সংস্থার PAs হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করা। গবেষণায় বলা হয় যে PAs পরিচালকদের কার্যকর সহব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় বন ব্যবহারকারী দলের বিভিন্ন stakeholder এর সঠিক সংজ্ঞায়ন এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া প্রয়োজনীয় নিরাপদ সিদ্ধান্ত গ্রহন ভবিষ্যতে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে মুখ্য ভূমিকা রাখবে।

মোহাম্মদ শামসুর রহমান (১৯৯৮) রচিত 'উদ্ভিদ পরিবেশতত্ত্ব' বই এ পরিবেশ তত্ত্বের অর্থ ও উদ্দেশ্য, উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের শ্রেনিবিভাগ, উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের চরিত্রাবলি, উদ্ভিদ সম্প্রদায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ, পৃথিবীর উদ্ভিদকুল ও উদ্ভিজ্জ অঞ্চল আলোচনার সঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থান, আয়তন, ভূ-প্রকৃতি মাটি, নদ-নদী, জলবায়ু, বাংলাদেশের উদ্ভিদ, বাংলাদেশের উদ্ভিজ্জ অঞ্চল এবং অরণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এ বইতে উদ্ভিজ্জের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হয়েছে।

তপন চক্রবর্তী (২০০৩) রচিত 'বাংলাদেশের বন ও বনাঞ্চল' বইয়ে বনের জন্মকথা, বনাঞ্চলের সৃষ্টি, বৃক্ষের মূল্য, বন ও মানুষের সম্পর্ক, বাংলাদেশের বনবনানীর শ্রেনিবিভাগ, অতীত ও বর্তমান বনাঞ্চল, বন ও বনাঞ্চলের অবদান, বন ও বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণ, বন ও বনাঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণী, বাংলাদেশের বন নীতি ও বিধিবিধান, সামাজিক বনায়ন, বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা, বন সংরক্ষণ ও বন ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

হাসান তারীক (১৯৯২) রচিত 'পরিবেশ বিজ্ঞান বৈচিত্র্য' বইয়ে ইকোসিস্টেম অধ্যায়ে বনভূমির ইকোসিস্টেম, মৃত্তিকার উপাদান, গঠন বুনন, পঞ্চম অধ্যায়ে জীববৈচিত্র্যের গঠন, স্তর, পরিমাণ, ধ্বংসের কারণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উদ্ভিদ প্রজাতির সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, লুপ্ত প্রায় সপুষ্পক উদ্ভিদ, এবং লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় প্রাণীর তালিকা বিশেষ করে বাংলাদেশের বিপদাপন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির তালিকা উল্লেখ করেছেন।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সমন্বয়, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) এর সহযোগিতায় প্রকাশিত 'পিপলস রিপোর্ট অন বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট টু থাউজেন্ড ওয়ান' (প্রথম খণ্ড) এ বাংলাদেশের বন ও প্রাণবৈচিত্র্য অধ্যায়ে আমাদের বনাঞ্চল, সুন্দরবন কি টিকে থাকবে? সংরক্ষিত বনভূমি টেংরাগিরি, পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে কুয়াকাটা, মধুপুর বন, বনায়ন, একটি কেস স্টাডি, বিপন্ন উদ্ভিদরাজি, আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও জ্বালানি সম্পদও জ্বালানি কাঠের দুষ্প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইয়াসমীন শাহিদা (১৯৮৭) "রাজশাহী নগর বিস্তার ও আসবাব শিল্পের ক্রমোন্নতি" আসবাব শিল্পের বিস্তারের সঙ্গে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব, ফার্নিচার শিল্পের ক্রমবিকাশ, পারিসরিক বিন্যাস, কর্মসংস্থানে ফার্নিচার শিল্পের ভূমিকা এবং বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের সম্ভাব্যতাকে উল্লেখ করে এ প্রজেক্ট পেপারটি উপস্থাপিত হয়। এ গবেষণাপত্রে, রাজশাহী শহরে আসবাব শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব, কাঠের আসবাবপত্রের সঙ্গে অন্যা আসবাবপত্রের তুলনা, আসবাব শিল্পের ক্রমবিকাশ, শহর বৃদ্ধির সঙ্গে শিল্পের প্রসার, শিল্পের বণ্টন বিন্যাস, শিল্পের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া শিল্পের ব্যয়, শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক, তাদের বৈশিষ্ট্য, উৎপাদিত দ্রব্য. শিল্পের অন্তরায়, শিল্পের প্রসারের প্রভাব ও শিল্পে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সুপারিশ প্রভৃতি বিষয়গুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এ গবেষণাপত্রে কাঠভিত্তিক শিল্পের বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেদনটির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে, আসবাব শিল্পের ব্যবহার, নগরের বৃদ্ধির সঙ্গে ফার্নিচার শিল্পের ক্রমোন্নতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

দেশের প্রাকৃতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং ভূমি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষায় বনভূমি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। দেশের বনজ সম্পদের ঘাটতি পূরণ, কাঠভিত্তিক শিল্প কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ জীববৈচিত্র্য পরিবেশও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং জনগণের চিত্র বিনোদনের ব্যবস্থা তথা সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর (Forest Department) ব্যাপক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪) ।

"বনভূমি বলতে উপকাণ্ড বিশিষ্ট বৃক্ষের অরণ্যকে বোঝায় (তাহা, ২০০০) সাধারণ অর্থে কাঠসহ অন্যান্য বনজ সম্পদ উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত এলাকার নাম বন। অথবা পরোক্ষভাবে উপকার সাধিত হওয়ার নিমিত্তে গাছপালা গড়ে তোলা হলে সে অঞ্চলকেও বনভূমি বলা হয় (তপন, ২০০২)। গাছপালার সাধারণ নাম হচ্ছে উদ্ভিদ তবে এর সমাবেশগত বিভিন্ন অবস্থানকে বিভিন্ন নামে অভিহত করা হয়ে থাকে। কোনো বিষেশ স্থানে বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সৃজিত উদ্ভিদের সমাবেশকে উদ্ভিদগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় (Plant community) বলা হয় (তাহা ২০০০)। উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের একাধিক স্তরভেদ আছে। যেমন উচ্চকাণ্ড বৈশিষ্ট্য বৃক্ষভূমি বা বনভূমি (Woodland and forest), তৃণভূমি (Grass land), ঝোপঝাড় ও পুষ্পময় মরুভূমি (Scrub and

desert) ইত্যাদি। এরূপ স্তরবিন্যাসকে বায়োচোর (Biochore) বা বায়োমি (Biome) বলা হয় (তাহা, ২০০০)। উদ্ভিদে এই স্তর বিন্যাসকে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পর্ণমোচী বন (Deciduous forest), মিশ্রবন (mixed forest) প্রভৃতি একাধিক রূপ বিন্যাস বা ক্রমে বিভক্ত করা যায়। প্রাকৃতিক নিয়মে গাছপালার সমাবেশ হয়ে থাকে। প্রকৃতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে গাছপালার প্রকারও বদলে যায়। অর্থাৎ বনসৃষ্টির প্রারম্ভ পর্যায়ে যে ধরনের উদ্ভিদ থাকে তাদের সঙ্গে কিছুদিন পর ধীরে ধীরে অন্য ধরনের গাছ বা উদ্ভিদ প্রজাতি দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে পুরনো প্রাথমিক বাসিন্দা যাদের পাইওনিয়ার রেসিডেন্ট (Pioneer resident), বলা হয় তারা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। এভাবে একের পর এক নতুন ধরনের বা জাতের উদ্ভিদ পুরুনোদের স্থান দখল করে নিতে থাকে। নানা জাতের গাছপালার একে একে এই বিলুপ্তি ও আগমনকে উদ্ভিদ পর্যায়ক্রম (Succession) বলা হয়। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে নতুন উদ্ভিদের আগমন এবং পুরাতন উদ্ভিদের বিলুপ্তি চলতে থাকে। তবে একটি পর্যায় আসে যখন এই আসা-যাওয়ার পালা শেষ হয়ে যায়। এই শেষ পর্যায়কে চূড়ান্ত দশা বা পর্যায় (Climac condition) বলা হয়। এই অবস্থায় এসে উদ্ভিদের এই পর্যায়ক্রম থেকে যায়, সৃষ্টি হয় একটি স্থায়ী বনভূমি বা বনাঞ্চলের (তপন, ২০০২)।

IUCN এ ১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ সালের প্রাণী বিলুপ্ত সংখ্যা ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্তীর তালিকায় ১৬৩টি প্রজাতি যুক্ত হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা হয় আগামী ২০০-৩০০ বছরে পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী বর্তমান সংখ্যার অর্ধেকই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। মেরুদণ্ডী মোট প্রজাতির (বর্তমানে জীবিত রয়েছে) অর্ধেক সংখ্যক বিলুপ্ত হতে পারে আগামী ৭০০০ বছরে এবং বর্তমানে উদ্ভিদ প্রজাতির অর্ধেক সংখ্যক বিলুপ্ত হতে পারে আগামী ৩০০০ বছরে (হাসান, ২০০০)।

উপরোক্ত বই ও গবেষণাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে জীববৈচিত্র্য সংগ্রহ করা এবং এর তালিকা প্রস্তুত করা অতি আবশ্যক। যদি এখনই জীববৈচিত্র্য সংগ্রহের সঠিক পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তা হলে অচিরেই অনেক জীব পৃথিবীতে থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

তৃতীয় অধ্যায়
পদ্ধতি (Methodology)

৩.১ এলাকা নির্বাচন (study Ares seletion)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলা এই প্রকল্পের জন্য গবেষণা এলাকা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রাথমিক জরিপ গবেষণা করে দেখা যায় এই এলাকার জীববৈচিত্র্য নিয়ে এর পূর্বে কোন গবেষণা করা হয়নি। এলাকার লোকজনের সাথে সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, এলাকার জীববৈচিত্র্যের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। একটি পাইলট জরিপের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের সাথে অনুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে কোন কোন জীব প্রজাতি হারিয়েছে তার একটি সাধারণ তালিকা তৈরি করা হয়। এলাকায় কি কি ধরনের পরিবরর্তন হয়েছে তার একটি প্রাথমিক ধারণা গ্রহন করা হয়। আশুগঞ্জ সবুজ সেচ প্রকল্প, আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইউরিয়া সারকারখানা তৈরির ফলে এলাকাটি দ্রুত নগরায়ণের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং বিশেষ করে এলাকায় অসংখ্য বয়লার, অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন এই এলাকার জীববৈচিত্র্য হ্রাসের জন্য ক্ষতিকারক বলে চিহ্নিত হয়। এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৃষি বাসস্থানের পরিবর্তন ইত্যাদির জন্য প্রতি বছর জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। এই সব কিছুর ওপর ভিত্তি করে বিগত ৬৫ বছরে এলাকায় কি পরিমাণ জীববৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে তা নির্ণয় করা হয়।

৩.২ গবেষণার সময়কাল (Times of the study)

গবেষণার উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে সমীক্ষা সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এই গবেষণার জন্য ১৯৫০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়কে সমীক্ষাকাল হিসাবে গ্রহন করা হয়েছে। এ সময় কালের মধ্যে অঞ্চলের ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন, কৃষি জমির পরিবর্তন, নদীর নাব্যতা, নদীতে পানির সরবারহ, বন নিধনের হার এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মাত্রা ইত্যাদির ওপর তথ্য সংগ্রহীত হয়েছে। ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ১৯৮৯- ২০১৪ সালের স্যাটেলাইট ইমেজ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া এলাকায় যেয়ে ২০১৪-১৫ সালের প্রশ্নমালা জরিপ করা হয়েছে।

৩.৩ মূল মানচিত্র সংগ্রহ (base map collection)

গবেষণা এলাকা নির্বাচনের পরে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে গবেষণা এলাকার ২০০৮ সালের মূল মানচিত্র ও ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর থেকে ১৯৫০ সালে প্রকাশিত মৌজা (নকশা) মানচিত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৯৩৭ সালের যোগাযোগ ব্যবস্থার মানচিত্র সংগ্রহ করা হয় এবং USGS Global Visualization Viewer (GLOVIS) থেকে ১৯৮৯-২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন সালের ভূ-উপগ্রহ চিত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এরপর কম্পিটারে জি আই এস (GIS) সফটওয়্যার ব্যবহার করে এলাকাটির ভৌগলিক অক্ষ ও দ্রাঘিমা রেখা সঠিকভাবে নির্ণয় করে এলাকার ইউনিয়ন, মৌজা ইত্যাদি অঙ্কন করা হয়েছে।

৩.৪ উপাত্ত সংগ্রহ (data collection)

গবেষণাটি প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত বিভিন্ন সরকারি রিপোর্ট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভাগীয় প্রকাশনা ছাড়াও কৃষি বিভাগ, বন বিভাগ, পরিবেশ, জনসংখ্যা, আশুগঞ্জ উপজেলা নির্বাহি অফিসের অধীনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আশুগঞ্জ উপজেলাটি ২০০১ সালে নতুন করা হয়। তাই তথ্য সংগ্রহ করতে একটু কষ্ট করতে হয়েছে। ১৯৭৪ সালের পূর্বের তথ্যের জন্য নাছিমনগর থানা ও সরাইল থানার প্রশাসনিক ডাটার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৯৯১ সালের পরের তথ্যের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানা ও সরাইল থানার প্রশাসনিক ডাটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ২০০১ সালে আশুগঞ্জ উপজেলা তৈরি হবার পর ২০০৮ সালের পরের তথ্য আশুগঞ্জ উপজেলায় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া বন বিভাগ অফিস, ঢাকা মহাখালি বন বিভাগ অফিস, আশুগঞ্জ লাইব্রেরী, সেমিনার, IUCN লাইব্রেরি এবং BBS, BARC, CIRDAP, SRDJ লাইব্রেরি এবং এর BBS (1961-2011) বিভিন্ন সালের Statistiect year Book হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানির উন্নয়ন বোর্ড, দূর্যোগ গবেষণা ব্যুরো, IDB ভবন ও SPARPSO অফিস থেকে বিভিন্ন উপাত্ত, মানচিত্র ইমেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। আশুগঞ্জ উপজেলার ওপর প্রকাশিত বিভিন্ন বই এবং মাইক্রোসফটে অপ্রকাশিত থিসিস থেকে প্রাসঙ্গিক নিবন্ধ, রিপোর্ট মানচিত্র সংগ্রহ করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সেমিনার ও লাইব্রেরি ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান লাইব্রেরির বই ও থিসিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া আশুগঞ্জ উপজেলার ওপর বিভিন্ন পত্রিকায় যে সকল ডকুমেন্ট প্রকাশ করা হয়েছে সে গুলো থেকে পাওয়া তথ্য গবেষণায় উপস্থাপন করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিয়ে যে সকল গবেষক কাজ করছেন তাদের মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.৪.১ দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন (Rapid rural appraisal)

মাঠ পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহের জন্য দ্রুত গ্রামীণ মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষক গবেষণা এলাকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সংস্পর্শে এসে ঐ এলাকার সম্প্রতিক অবস্থা, সমস্যা সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করে জ্ঞান অর্জন করে থাকে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলার বেশির ভাগ মানুষ আশুগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে বিধায় এ এলাকা সম্পর্কে তাদের পুরোপুরি জ্ঞান রয়েছে। ঐ সকল অধিবাসীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে আশুগঞ্জ এলাকার ইকোলজিক্যাল জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে যে সকল অধিবাসী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আশুগঞ্জ উপজেলার ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে শুধু মাত্র তাদের কাছ থেকেই প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জেলে, সাধারণ কৃষক, বন কর্মকর্তা এবং চেয়ারম্যান, মেম্বার, শিক্ষক ও সাধারণ জনগণের নিকট থেকে মতামত গ্রহন করা হয়েছে। RRA পদ্ধতির অন্য একটি অংশ হল পর্যবেক্ষণ। এজন্য মাঠ জরিপের সময় গবেষণা এলাকার চারটি ইউনিয়নের ১৬টি মৌজার সার্বিক ইকোলজিক্যাল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নোট করা হয়েছে। তাছাড়া নদী ও সরু খাল পথে যেয়ে নদীর পাড় এলাকার ভূদৃশ্যগত পরিবর্তনগুলোর আলোকচিত্র নেয়া হয়েছে।

৩.৪.২ চেক লিস্ট বিশ্লেষণ (checklist Analysis)

একটি কাঠামোগত সহজ চেকলিস্ট পারে খুব সহজে সঠিক প্রজাতিটিকে খুঁজে বের করতে। এই জন্যে প্রথমে একটি সাধারণ চেকলিস্ট তৈরি করা হয়েছে। যাতে করে আমরা কোন প্রজাতি খুঁজছি তার প্রতি আমাদের লক্ষ্য স্থির থাকে। চেকলিস্টকে প্রথমে কি কি জীব প্রজাতি সংগ্রহ করা হবে সে অনুসারে ভাগ করা হয়েছে। চেকলিস্টকে প্রথমেই উদ্ভিদ, প্রাণী দুটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। স্থলচর, জলচর এই দুই বিষয়ের ওপর দৃষ্টি রেখে প্রাণিকুলকে মাছ, পাখি, বন্যপ্রাণি ও গৃহপালিত প্রাণী এই কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ঠিক একই ভাবে প্রথমত বৃক্ষ ও কৃষি প্রজাতি হিসেবে দুটি ভাগে উদ্ভিদকুলকে বিভক্ত করা হয়েছে। কৃষি প্রজাতিকে দানা জাতীয় ফসল, ডাল, তৈল, অর্থকরী, কন্দাল, তরি-তরকারী, ফল ও মসলা জাতীয় ফসলের ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। বিগত ৬৫ বছরে কোন ফসলগুলো বেশি পরিমাণে উৎপাদন করা হয় তার ওপর ভিত্তি করে ফসলগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ঠিক একই ভাবে লতাগুল্ম, কাষ্ঠল, জলজ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে বৃক্ষকুলকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বিশেষ করে ৫০ বছরের উর্দ্ধের কৃষক শ্রেনীকে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যারা খুব কাছ থেকে জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তন হতে দেখেছে। ঠিক একই ভাবে মৎস্য, প্রাণী ও বৃক্ষ প্রজাতির ক্ষেত্রেও এলাকার ৫০ বছরের উর্দ্ধের এলাকাবাসী থেকে প্রশ্ন প্রত্রের উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য আশুগঞ্জ উপজেলা থেকে ১৬টি প্রধান অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথমত এলাকাটিকে প্রধান তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। কৃষি ভিত্তিক এলাকা, মৎস্য চাষ ও কৃষি ভিত্তিক এলাকা, এবং কৃষি আবাসিক ও বানিজ্য এলাকা। এরপর প্রতিটি প্রধান জোন থেকে এলোমেলো ভাবে পাঁচ থেকে দশ জনের একটি দল করে প্রতিটি দল থেকে একটি করে প্রশ্নপত্রের উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে। এমন ভাবে প্রধান ১০০০ জনের মতামতের ভিত্তিতে ১০০টি প্রশ্নপত্রের উত্তর সংগ্রহ করা হয়।

চিত্র ৩.১: দৈবচায়িত ভাবে যে কোন একটি এলাকা নির্বাচন করা

উদাহরণ - দেখা যাচ্ছে যে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম এর মাঝ স্থানে আশুগঞ্জ একটি মধ্য এলাকা যা দৈবচায়িত ভাবে নির্ণয় করা হয়েছে। দৈবচায়িত ভাবে যে কোন একটি এলাকাকে নির্ণয় করা হয়েছে। তার পর সেই এলাকা থেকে ৫০ বছরের উর্দ্ধে কৃষি ও জেলে সম্পদায়কে দৈবচায়িত ভাবে নির্ণয় করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র জরিপের মাধম্যে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

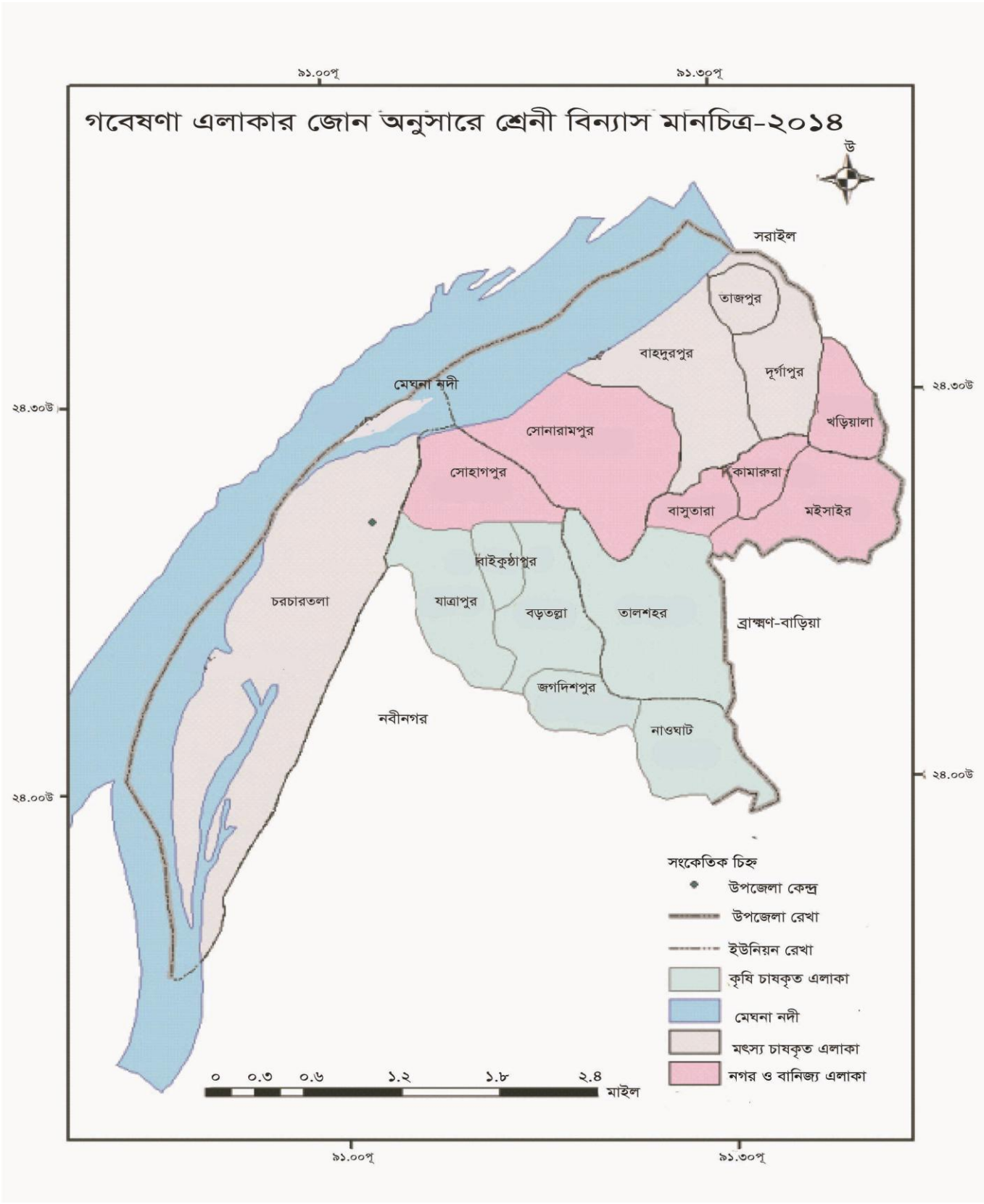

মানচিত্র ৩.২ ঃ কৃষি ভিত্তিক এলাকা, মৎস চাষ ও কৃষি ভিত্তিক এলাকা, এবং কৃষি আবাসিক বানিজ্য এলাকা
উৎস- মূল মানচিত্র এল জি ই ডি ও বি বি এস

৩.৪.৩ প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ (Initial observation)

মাঠ জরিপের পূর্বে আশুগঞ্জ ইউনিয়নের বিভিন্ন মৌজা ঘুরে গবেষণা বিষয়ের সাথে সংশিষ্ট্য নিয়ামক গুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর ফলে গবেষণা এলাকা সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা জন্মে যা জরিপ কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। উল্লেখিত গবেষণার জন্য প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ জরিপ করা হয়েছে ২০১৪ থেকে ২০১৫ জানুয়ারী। ইকোসিস্টেম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য প্রশাসনিক মানচিত্র, বন বিভাগের মানচিত্র, ভূমি ব্যবহার মানচিত্র, আশুগঞ্জ এলাকার রাজনৈতিক মানচিত্র, মৃত্তিকা মানচিত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করে প্রাথমিক পর্যবেক্ষনের সময় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণা এলাকার নাম অবস্থান, আয়তন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, নদনদী খাল বিল ও জলাশয় সম্পর্কে অধিবাসীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া কৃষিজ ফসল, উদ্ভিদ, প্রাণী, মৎস্য ও পাখি প্রজাতির নাম সম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৪.৪ প্রাথমিকজরিপ (key Important Interview)

RRA পদ্ধতির অংশ হিসাবে প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের আলোকে গবেষণা বিষয়ের ওপর আশুগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের কৃষি কর্মকর্তার জন্য পৃথক পৃথক প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে। গবেষণা এলাকার ১৬টি মৌজায় বসবাসকারি কৃষি, জেলে প্রভৃতি পেশার লোকজনের জন্য উদ্ভিদ, প্রাণী, মৎস্য ও পাখি প্রজাতির ওপর ৬৮ টি প্রশ্ন সম্বলিত প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহনের মাধ্যমে এই সব প্রশ্নমালা জরিপ উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পরিবারের প্রধান ও যাদের বয়স ৫০ (বিশেষ ক্ষেত্রে ৪৫ বছর) বছরের উর্দ্ধে এবং যারা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য আশুগঞ্জ উপজেলার ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে শুধু মাত্র তাদের কাছ থেকেই বেশি ভাগ উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা মৌজায় বসবাসকারি অধিবাসীদের নিকট থেকে স্বচায়িত বিচারমূলক দৈবচৈয়িত পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্রের উত্তর পূরণ করা হয়েছে। সময় ও আর্থিক স্বল্পতার কারণে গবেষণা এলাকার ১৬টি মৌজা থেকে মোট ১০০ টি প্রশ্নপত্র সাক্ষাৎকার গ্রহনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে। প্রতিটি প্রশ্নমালা পূরনের জন্য ৫ থেকে ১০ জনের দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া মাঠ জরিপের সময় চেয়ারম্যান আশুগঞ্জ থানার UNO, থানা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, NGO কর্মি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা এলাকার সর্বমোট ১০০০ জন উত্তর দাতার নিকট থেকে ১০০ টি প্রশ্নপত্রের উত্তর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে। উত্তরদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে। উত্তরদাতা গণকে প্রথমে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে।

১) যাদের বয়স ৫০ বছরে এর উর্দ্ধে কেবল তাদের নিকট থেকে উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে। যারা এলাকার বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত, বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থকারি কর্মকাণ্ডের সাথে সংস্পৃক্তদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২) যারা আশুগঞ্জ এলাকার অধিবাসী, যারা কৃষি কাজের সাথে যুক্ত এবং যাদের প্রচুর কৃষি জমি রয়েছে অথবা যাদের বাবার অনেক কৃষি জমি ছিল শুধু তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে

৩) উত্তর দাতা শিক্ষিত ও সচেতন

৪) সমাজের প্রতিষ্ঠিত লোক যেমন এলাকার চেয়ারম্যান, মেম্বার, গণমান্য ব্যাক্তিবর্গ

৫) প্রসাশনিক কর্মকর্তা যেমন এলাকার কৃষি নির্বাহী অফিসার, জনসংখ্যা অধিদপ্তরের অফিসার, এনজিও কর্মকর্তা

৬) এলাকাবাসীর কাছ থেকে উদ্ভিদ, প্রাণী, পাখি, মৎস্য ও কৃষি সম্পর্কে আলাদা আলাদা প্রশ্নপত্রেরর মাধ্যম্যে তথ্য সংগ্রহ

৩.৪.৫ ছবি বিশ্লেষণ (observation)

গবেষণার বাস্তবিক প্রমাণ যাচাই করার জন্য ক্যামেরার মাধ্যমে গবেষণা ক্ষেত্রের ছবি তোলা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ছবি বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্য পর্যবেক্ষণ আরো সহজ হয়।

৩.৫ উপাত্ত বিশ্লেষণ (data compilation and analysis)

সাধারণ জনগণ ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা উপাত্ত সমূহকে প্রথমে প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রেণি বিন্যাস করা হয়েছে। তারপর তথ্যগুলোকে গবেষণা বিষয়ের উপযোগী করে শ্রেণি বিন্যাস করে তাদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাত্ত গুলোর তালিকাবদ্ধ করে পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা এই প্রকল্পের সব তথ্য অবশেষে বিষদ ভাবে কম্পাইল এবং উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে টেক্সট, টেবিল, তালিকা ও মানচিত্র সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিক নিয়মে উপস্থাপন করা হয়।

টেবিল ৩.২ : ফ্লো-চার্ট (গবেষণা পরিকল্পনা)

৩.৫.১ উপাত্ত লিপিবদ্ধকরণ (data editing and encoding)

চেকলিস্ট এবং বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জরিপ কাজে সংগ্রহ করা তথ্যের যে কোন ধরনের ভুলগুলো পুনরায় দেখা হয়। এরপর তথ্য গুলোকে সঠিক তথ্যগত ভাবে সাজানো হয়ে থাকে। এই সাজানো তথ্যগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমে এনকোড করা হয়। পরিমাণগত তথ্য এনকোডিং করার পর মাইক্রোসফট ওয়াড ২০০৭, ও মাইক্রোসফট এক্সেল ২০০৭ দ্বারা গুনগত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। যদি কোথাও ইচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত নয় এমন কোন ভুল হয় সেগুলোকে আবার পুনরায় সম্পাদনা করা হয়। তারপর তথ্যগুলোকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

৩.৫.২ কালীন সারি বিশ্লেষণ (time Series Analysis and Nomenclature of Species by IUCN;s Process)

কিছু কিছু প্রজাতি পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি উৎপাদন হতে পারে আবার কিছু কিছু প্রজাতির উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে। আবার কোন কোন প্রজাতি চাষ ক্ষেত্রে শূন্যের কোটায় নেমে যেতে পারে। যেহেতু প্রজাতিগুলো বিলুপ্ত বা বিলুপ্তির পথে চলছে। এটা কেন হয়? কোন প্রজাতি গুলো বিলুপ্তির পথে যাচ্ছে আর কোনগুলো উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে তা জানার জন্য সময় সিরিজকে একটি ধ্রুবক ধরে প্রজাতির হ্রাস বৃদ্ধির একটি সূত্রের সাহায্যে দেখানো হল। এই জন্য ইতিবাচক প্রক্রিয়া হলো যারা নিজেরা একটি কৃষি প্রজাতি চাষ করে বা অন্যদের চাষ করা দেখেছে তাদের কাছ থেকে বিগত ১৯৬৪, ১৯৭৪, ১৯৮৪, ১৯৯৪, ২০০৪, ২০১৪ সালের তথ্যগুলো সংগ্রহ করে কোন ফসল কতটুকু চাষ হয় তার একটি হিসাব তৈরি করা। প্রতিটি স্বতন্ত্র প্রজাতি চাষের জন্য ১৯৬০ দশক কে ধ্রুবক ধরে তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। এই তালিকা প্রকাশের জন্য প্রতিটি দশক থেকে ধ্রুবক দশক বিয়োগ করে প্রাপ্ত ফলকে ধ্রুবক দশক দিয়ে ভাগ করে ১০০ দ্বারা গুন করে শতাংশ হিসেব প্রকাশ করা হয়েছে। নিম্নে একটি সূত্রের সাহায্যে গাণিতিক হিসাব দেখানো হলো

$$IN_{ds} = \frac{CP_{tsd} - Cp_{tsbd}}{CP_{tsbd}} \times 100$$

IN ds = Index Number of a Decade for a species

Cp tsd = cultivation percentage of species in that decade

cp tsbd= cultivation percentage of that species in base decade

(1960s is the base decade of this study)

এই সূত্র ব্যবহার করে, ১৯৬০ দশকের প্রজাতি সংখ্যাকে ধ্রুবক ধরে অন্য দশক গুলোর প্রজাতির তালিকা গননা করা হল। ধ্রুবক দশক থেকে কোনো কোনো প্রজাতির সংখ্যার হ্রাস পেতে পারে আবার কোনো প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি ও পেতে পারে। গননা তালিকায় যদি কোন মান ঋনাত্বক আসে তা হলে সেটিকে প্রজাতির হ্রাস হিসাবে এবং ধনাত্বক মানকে প্রজাতির বৃদ্ধি হিসেবে ধরা হয়েছে। IUCN,s এর নিয়ম অনুযায়ী প্রজাতি সমূহের লাল তালিকা (red list) তৈরি করা হয়েছে। যদি ধ্রুবক দশক থেকে প্রজাতি সংখ্যা কমতে থাকে তা হলে তাকে প্রজাতি হ্রাস হিসাবে ধরা হবে। এই প্রজাতি গুলো মানুষের সঠিক পরিচর্যা ছাড়া বৃদ্ধি পেতে পারে না। সুতরাং বলা যায় যে মানুষের চাষ পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন ভাবে প্রজাতি হ্রাস বা বৃদ্ধি পেতে পারে না। বিগত প্রতি দশ বছরে প্রজাতি কত পরিমাণে হারিয়েছে তার ওপর নির্ভর করে প্রজাতিগুলোকে সংঙ্কটপূর্ণ, বিলুপ্ত, বিলুপ্তপ্রায়, হুমকি সম্মুখীন, হুমখির সম্মুখীন নয় এই কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে । যদি কোনো প্রজাতি বিগত দশ বছরে ৮০ শতাংশ হ্রাস পায় তাহলে এটি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার তালিকায় পরে (২০০০ IUCN)।

৩.৬ মূল মানচিত্র বিশ্লেষণ (base map collection and analysis)

সর্ব প্রথম ভূ-উপগ্রহ হতে ১৯৮৯ থেকে ২০১৫ সালের ইমেজে সংগ্রহ করা হয়েছে। Glovis থেকে নির্দিষ্ট এলাকার ১৯৮৯, ১৯৯৪, ২০০০, ২০০৪, ২০০৮ ও ২০১৪ সালের ইমেজ ডাইনলোড করা হয়েছে। সংগ্রহ করা ইমেজগুলোকে layer Stacking করার জন্য Erdas image 2010 ব্যবহার করা হয়েছে। Erdas image 2010 ব্যবহার করে focal analysis, Haze analysis, Noise analysis, Geometric corrections, radiometric corrections যেমন cosmetic and atmospheric corrections এবং removing noise করা হয়েছে। এর পর Erdas image 2010 এর Raster Image processing এর মাধ্যমে Supervised Classification করা হয়েছে। এর পর GIS মানচিত্র ব্যবহার করে মানচিত্র তথ্য থেকে ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা এলাকার চারটি ইউনিয়নের মোট ১৬টি মৌজার মানচিত্র চিহ্নিত করে গবেষণা এলাকার অক্ষ ও দ্রাঘিমা রেখা নদীর গতিপথ, বনজ ভূমি, চড় এলাকা আবাসিক এলাকা ইত্যাদি অবয়ব চিহ্নিত করা হয়েছে। এর পর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ LGED প্রকাশিত মানচিত্র থেকে অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ খাল নদী ও বনভূমি ১৬টি মৌজার নতুন মানচিত্র অংকন করা হয়েছে। পূর্ববর্তি মানচিত্র ও ভূ-উপগ্রহ মানচিত্রের অবয়বের সাথে মিলিয়ে সেখান থেকে গবেষণা এলাকার আবাস ও বিভিন্ন ভূমি চিহ্নিত করে আলাদা করা হয়েছে।

৩.৭ GIS পদ্ধতিতে মানচিত্র বিশ্লেষণ (GIS Mapping and Analysis)

প্রাথমিকভাবে সংগ্রহ করা তথ্য থেকে প্রজাতি সমূহকে একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা আকারে সাজাতে হবে। প্রথমত, গবেষণা এলাকার মানচিত্র স্ক্যানার দ্বারা স্ক্যান করে জিআইএস ৯.৩ সফটওয়্যার দ্বারা কাজ সম্পাদিত করা হয়েছে। তারপর একটি ব্যক্তিগত ডাটাবেস খোলে তথ্যকে আর্ক জিআইএস এর মাধ্যমে ডাটাবেসের বৈশিষ্ট্য অনুসারে টেবিলের মধ্যে এনকোড করা হয়েছে। অবশেষে মানচিত্র সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। এই মানচিত্রে সব স্থানিক বৈশিষ্ট্যাবলীর তথ্য সুন্দরভাবে জিআইএস ম্যাপিং এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় সম্পাদনা করা হয়। জিআইএস সফটওয়্যার এর সকল নিয়ম অনুসরণ করে সংগ্রহ করা সব তথ্যকে বিভিন্ন স্তরে বিশ্লেষণ করে তথ্য কোডিং এর মাধ্যমে নতুন মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে।

৩.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitation of the study)

বর্তমান গবেষণায় শুধুমাত্র আশুগঞ্জ উপজেলা অবধি সীমিত রয়েছে। এই গবেষণা পুরো দেশজুড়ে পরিচালিত করা উচিত, কিন্তু সময় কনস্ট্রেইন্ট অর্থাৎ সীমা নির্দেশক এবং বাজেট সীমাবদ্ধতার কারণে তা করা সম্ভব হয়নি। গবেষণা করার সময় বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ৫০ বছরের আগের কোনো বেইজ মানচিত্র পাওয়া যায়নি। সে ক্ষেত্রে ১৯৩০ সালের বিট্রিশদের করা মানচিত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৯১৫-১৯ সালে করা ও ১৯৫০ সালে প্রকাশিত মানচিত্র নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। এলাকায় যেয়ে প্রশ্নপত্রের উত্তর পেতে কষ্ট হয়েছে। অনেকে সঠিক উত্তর দিতে চায়নি। কোনো কোনো প্রসাশনিক কর্মকর্তা উত্তর পত্র দেয়নি। আবার কেউ কেউ অনেক দেরী করে উত্তর পত্র পাঠিয়েছে। এলাকায় ঘুরে ঘুরে এলাকাবাসির সাথে কথা বলে প্রশ্নপত্রের উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে কঠিন ও পায়ে হেটে যাওয়া সম্ভব নয় এমন এলাকাগুলেতে যেতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে।

অধ্যায় চতুর্থ
এলাকা পরিচিতি

৪.১ উপজেলার পটভূমি ঃ

আশুগঞ্জ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প নগরী ও বাণিজ্য শহর। বিদেশেও আশুগঞ্জের পরিচিতি কম নয়। জাতীয় অর্থনীতিতে আশুগঞ্জ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এখানে দেশের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থাপনা তথা শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সারকারখানা কোম্পানী লিমিটেড, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড, আশুগঞ্জ খাদ্যগুদাম সাইলো, শহিদ আবদুল হালিম রেলওয়ে সেতু (King George bridge), বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য মৈত্রী সেতু, ভাস্কর্য 'জাগ্রত বাংলাদেশ' জিটিসিএল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারী শিল্প ছাড়াও আশুগঞ্জ বাংলাদেশের অন্যতম বাণিজ্য নগরী হিসেবে পরিচিত। বিশেষ করে ধান ও চাউলের ব্যবসার জন্য আশুগঞ্জ ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। এখানে ছোট-বড় তিন শতাধিক চাতাল ও অটো রাইস মিল রযেছে। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণেই ধান-চাউলের এ বিশাল বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া দেশের অন্যতম বৃহৎ সেচ প্রকল্প "আশুগঞ্জ সবুজ প্রকল্প" এখানে অবস্থিত। বৃটিশ শাসনামলে আশুগঞ্জ পাটের বড় বাজার হিসাবে পরিচিতি ছিল। তখন ইংরেজদের অনেক পাট ক্রয় কেন্দ্র ছিল বিধায় তাদের পদচারণায় মুখরিত ছিল এই গবেষণা অঞ্চল আশুগঞ্জ। ফলে তখন থেকেই আশুগঞ্জ বিদেশে পরিচিতি লাভ করতে থাকে। আশা করা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই রূপান্তরিত গ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মাণের কাজ শুরু হবে। সড়ক যোগাযোগের জন্য ভারতীয় ট্রানজিটের নৌ-বন্দর ব্যবহারের জন্য ভারতীয় উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আশুগঞ্জের গুরুত্ব আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে।

৪.২ নামকরণ ঃ

সবুজ-শ্যামল ছায়া সুনিবিড় মেঘনা পাড়ের আশুগঞ্জ মূলতঃ চরচারতলা, আড়াইসিধা, যাত্রাপুর, বড়তল্লা, সোনারামপুর, বৈকুণ্ঠপুর, তালশহর, সোহাগপুর, বাহাদুরপুর গ্রামকে ঘিরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে গোড়াপত্তন হয়। আশুগঞ্জ প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভৈরববাজারে ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসা করতেন ভৈরববাজারের মালিক ভৈরব বাবু কর্তৃক আরোপিত অত্যাধিক কর ভারে মেঘনার পূর্ব পাড়ের ক্রেতা-বিক্রেতারা অতিষ্ট হয়ে সোনারামপুর মাঠের ওপর হাট বসায়। তৎকালীন সরাইল পরগনার জমিদার কাশিম বাজারের মহারাজা আশুতোষ নাথ রায় আশাব্যঞ্জক এ সংবাদ জানতে পেরে তিনি উদ্যোক্তাদের ডেকে পাঠান। উদ্যোক্তাগণ মহারাজার ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের দুর্গতি অবসানের জন্য মহারাজার নামের সাথে মিল রেখে ঐ হাটকে "আশুগঞ্জ" নামকরণ করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালের ১৮ জুলাই ৭টি ইউনিয়ন নিয়ে আশুগঞ্জ উপজেলা বাস্তবায়িত হয়।

৪.৩ উল্লেখযোগ্য স্থান বা স্থাপনা ঃ

আশুগঞ্জ সারকারখানা কোম্পানী লিঃ, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ, সাইলো (খাদ্য গুদাম), শহীদ আব্দুল হালিম রেলওয়ে সেতু (King George bridge), বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য মৈত্রী সেতু, ভাস্কর্য "জাগ্রত বাংলাদেশ"। সরকারী হাসপাতাল: নাই (ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে), স্বাস্থ্যকেন্দ্র/ ক্লিনিক: স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র-০১টি, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র-০২টি, বেসরকারী হাসপাতাল-০২টি। পোস্ট অফিস: ০৮টি, হাট-বাজার: ০৭টি, ব্যাংক: ১৪টি।

৪.৪ গবেষণা এলাকার অবস্থান ও আয়তন ঃ

আশুগঞ্জ উপজেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মধ্যাংশে অবস্থিত। এ উপজেলা কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল, পূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, দক্ষিণে নবীনগর এবং পশ্চিমে কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব ও নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলা দ্বারা বেষ্টিত। উপজেলাটি প্রায় ২৩°৫৮′ ও ২৪° ০৪′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৫৮′ ও ৯১° ০৫′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। উপজেলাটির মোট আয়তন প্রায় ৬৭৫৯ বর্গ কিলোমিটার, তন্মধ্যে মানচিত্রায়িত নদী ও পুকুর প্রায় ৫৪৯ বর্গ কিলোমিটার।

৪.৫ প্রশাসনিক কাঠামো ঃ

আশুগঞ্জ উপজেলায় মোট ৭টি ইউনিয়নে ২৯টি মৌজা রয়েছে। নিম্নে ইউনিয়নের নাম, আয়তন ও জনসংখ্যা দেয়া হলো।

টেবিল ৪.১: ইউনিয়নের নাম, আয়তন ও জনসংখ্যা

ইউনিয়ন ও পৌরসভার নাম	আয়তন হেক্টর)	জনসংখ্যা

দূর্গাপুর	১,২২৯	২৬,৮৩১
আশুগঞ্জ	১,১৩৩	৩০,২৮২
তাল শহর	১,১৩৮	১৭,৯৫৪
চর চারতলা	৬৩৬	২৩,৫৫৫
আড়াইসিধা	৫৯৪	১৫,৪৮২
লালপুর	৭৩৭	১৪,২০১
সরিফপুর	১,২৯২	১৭,৫২৩
সর্বমোট ৭টি ইউনিয়ন	৬,৭৫৯	১,৪৫,৮২৮

উৎস- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১১

৪.৬ জনসংখ্যা ঃ

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী আশুগঞ্জ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১,৮০,৬৫৪ জন। এ উপজেলায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ২,৬৭৩ জন লোক বাস করে। এ উপজেলায় গড়ে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ প্রায় ০.০৪০ হেক্টর মাত্র। ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ ও ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ উপজেলায় লোকসংখ্য ছিল যথাক্রমে ৯৩,৯৭৪ জন, ১,২৪,৫৫৬ জন ও ১,৪৫,৮২৮ জন। এতে দেখা যায় যে, ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল এবং ১৯৯১ হতে ২০০১ সালের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার যথাক্রমে শতকরা ৩২৫ এবং ১৭২ ও ১২৩ ভাগ (তথ্য সূত্র বি বি এস ২০১১)।

টেবিল ৪.২: গবেষণা মৌজা পরিচিতি

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	আয়তন (একর)	পরিবারের সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	শিক্ষারহার (শতকরা)
১	সোনারামপুর	৬৭৮	৩২৭৩	১৬২০০	৫৬৪
২	বাইকুন্ঠাপুর	১২৯	৯০	৫৬৯	৭১৭
৩	বড়তল্লা	৫৯২	১০৬৩	৫৬৫১	৪৩০০
৪	জগদিশপুর	২৪২	২২০	১১২০	৩৬১
৫	নাওঘাট	৪৮৯	৬৪৯	৩৩৬৭	৪২২
৬	তাজপুর	১৬৫	৩৩৯	২১০২	৪০২
৭	যাত্রাপুর	৬৬৯	১৫২১	৮২০৩	৩৭৪
৮	চরচারতলা	১৫৭২	৫০৩৩	২৫৭৮৯	৫৫
৯	সোহাগপুর	৮৭৪	১৯০৮	১১৩১১	৬১৯
১০	খড়িয়ালা	২৯৫	৭২৯	৩৯২৮	৫১২
১১	দূর্গাপুর	৪৯৭	১১৭৪	৬৭২৭	৪৩৫
১২	বাহদুরপুর	৮১৩	১১৭৫	৬৭০৮	৪৪২
১৩	তালশহর	১১২০	১৮৬৮	১০৩৫৪	৫২০০
১৪	বাসুতারা	২৩১	৫৩	৩৩৩	৫২৯
১৫	কামরুরা	১৭৩	৩০১	১৬২০	৩৬৬
১৬	মইসাইর	৬০৫	১২৫৩	৭৪৭১	৪০০০

উৎস- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০১১)

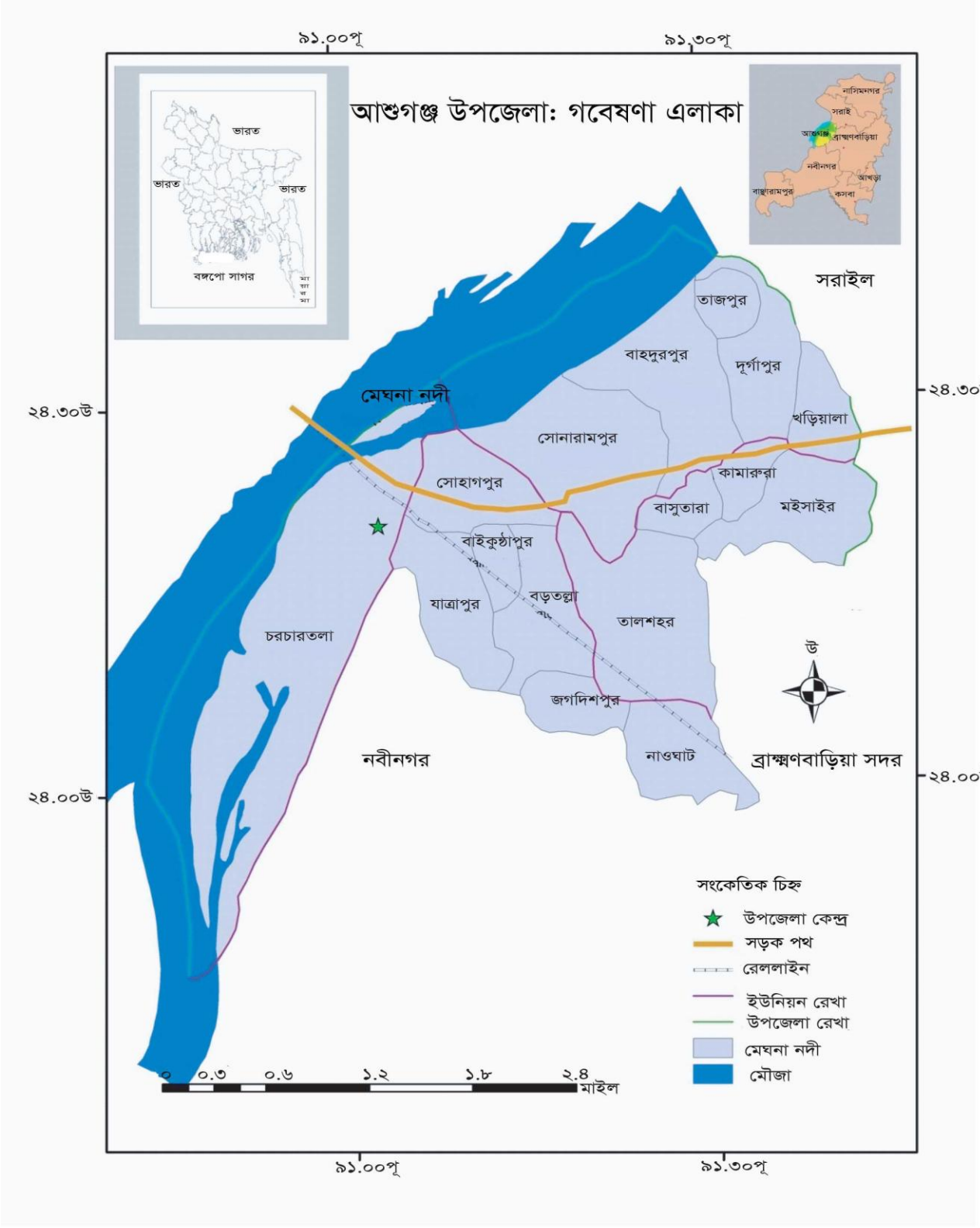

মানচিত্র ৪.১: আশুগঞ্জ উপজেলার গবেষণা এলাকা

উৎস: মূল মানচিত্র এল জি ই ডি ২০০৮

৪.৭ গবেষণা এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ

এ উপজেলার যাতায়াত ব্যবস্থা বেশ উন্নত। রাজধানী ঢাকাসহ পার্শ্ববতী জেলা শহর কুমিল্লা, হবিগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জের সাথে রেল ও পাকা সড়ক পথে যোগাযোগ রয়েছে। পার্শ্ববতী সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর ও নবীনগর উপজেলা সদরের সাথে সড়কপথে এবং অন্যান্য উপজেলার সাথে নৌপথে যোগাযোগ রয়েছে। উপজেলার অন্তর্গত সব ইউনিয়ন সদরের সাথে সারা বছর মোটর যান চলাচলের উপযোগী কাঁচা ও পাকা রাস্তার সংযোগ রয়েছে।

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ৭ কিলোমিটার অংশ উপজেলার উত্তর দিকে পূর্বে-পশ্চিম বরাবর অতিক্রম করেছে। এ উপজেলায় মোট ৪৭ কিলোমিটার পাকা সড়ক ও ১৭০ কিলোমিটার কাঁচা সড়ক এবং ৭ কিলোমিটার রেলপথ রয়েছে। উপজেলার পশ্চিমে প্রবাহিত মেঘনা নদী নৌকা চলাচলের উপযোগী উপজেলার ভিতর ও বাইরের জনজীবনের যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়েছে ট্রেন, বাস, রিক্সা, অটোরিক্সা, লঞ্চ এবং দেশীও যন্ত্রচালিত নৌকা (এস আর ডি আই ২০১৩)।

৪.৮ গবেষণা এলাকার ভূমিরূপ গঠন ঃ

সমুদ্র থেকে উঠে আসা এক কালের দ্বীপময় ভূমি আজকের বাংলাদেশ (হাসান, ১৯৯৫)। দেশের মোট ভূমির প্রায় ৮০ শতাংশই নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত। অবশিষ্ট ২০ শতাংশ গঠিত হয়েছে টারশিয়ারি পাহাড়সমূহের (১২শতাংশ) এবং কোয়ার্টারনারী যুগের প্লাইস্টোসিন সোপান সমূহের (৮শতাংশ) দ্বারা (বাংলাপিডিয়া, ভলিউম, ৬)। আমাদের গবেষণা এলাকা নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত। বাংলাদেশের পাহাড়িয়া ও চত্বর এলাকা ব্যতীত প্রায় সমগ্র অঞ্চল সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন ধরনের পালিত মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত। এই মৃত্তিকার আয়তন ৪৭০০০ বর্গমাইলেরও বেশি। এ মৃত্তিকা প্রতিবছর নদী দ্বারা প্লাবিত হয় এবং অনেক স্থানে প্রচুর পলিমণ্ডিত হওয়ায় এর গঠন ক্রিয়াশীল ও মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনশীল। গবেষণা এলাকাটি মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। মেঘনা নদী দ্বারা বাহিত শত শত মিলিয়ন পলি দ্বারা এটি গঠিত। এর ভূমিরূপ সমতল। মেঘনা নদীর মোহনা খাল-বিল ও নালার সমারোহে সমগ্র এলাকাটিতে জটিল নিস্কাশন ব্যবস্থা রয়েছে। ঋতুভিত্তিক বৃষ্টির পানি পলিজ সঞ্চায়ন পানির অনুপ্রবেশ গবেষণা এলাকাটিতে ভূমির তিন ধরনের অবস্থান উচু, মধ্যম নিচু ও নিচু। গবেষণা এলাকার ভূমি ব্যবহারে দেখা যায় যে, আশুগঞ্জ, দূর্গাপুর, চর চারতলা ও তালশহর ইউনিয়ন গুলোতে গড়ে ৫ শতাংশ করে উচ্চ ভূমি রয়েছে। আশুগঞ্জ, তালশহর ও দূর্গাপুর ইউনিয়নে সব চেয়ে বেশি মাঝারি নিচু ভূমি রয়েছে। এছাড়া তালশহর এলাকাটি সবচেয়ে বেশি মাঝারি ৪০ শতাংশ মাজারি উচু ভূমি এবং চর চারতলা ইউনিয়নের সবচেয়ে বেশি ৮৫ শতাংশ নিচু ভূমি রয়েছে। এখানে বলা যায় যে, তালশহর এলাকাটি নদীর থেকে বেশ অনেকটা দূরে অবস্থান করছে বলে এখানে মাঝারি উচুভূমি পরিলক্ষিত হয়। চর চারতলা মেঘনা নদীর পাড়ে অবস্থান করছে বলে এখানে সব চেয়ে বেশি নিচু ভূমি রয়েছে। উচুভূমি গুলো বন্যার পানি দ্বারা প্লাবিত হয় না। কিন্তু নিম্নভূমি প্রায় ৫-৬ মাস জলাবদ্ধ অবস্থান থাকে (এস আর ডি আই ২০১৩)।

টেবিল ৪.৩: গবেষণা এলাকার ভূমির শ্রেনি বিভাগ

ইউনিয়নের নাম	ভূমির শ্রেনি বিভাগ			
	উচ্চ ভূমি	মধ্যম ভূমি	মধ্যম নিম্ন ভূমি	নিম্ন ভূমি
আশুগঞ্জ	০৫	১০	৮৫	-
চর চারতলা	০৫	০৫	০৫	৮৫
দূর্গাপুর	০৫	১৫	৮০	-
তালশহর	০৫	৪০	৫৫	-

উৎস: ভূমি ব্যবহার রিপোর্ট: আশুগঞ্জ উপজেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২০০৮

৪.৮ ক) গবেষণা এলাকার পুরাতন মেঘনা মোহনা পললভূমি ঃ

মোট আয়তন ৫,০৮১ হেক্টর, উপজেলার শতকরা প্রায় ৭৫১৭ ভাগ। এ অঞ্চলটি উপজেলার পশ্চিমাংশ ছাড়া সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এ ভূ-প্রকৃতিতে ডাংগা ও প্রশস্ত বিলের (বেসিনের) মাঝামাঝি সমতল ভূমি বিদ্যমান। এ এলাকায় অনেক বছর ধরে নতুন করে পলি জমা হয় না।

৪.৮ খ) গবেষণা এলাকার মধ্য মেঘনা পললভূমি ঃ

মোট আয়তন ৪৫৯ হেক্টর, উপজেলার শতকরা প্রায় ৬৭৬ ভাগ। এ অংশ উপজেলার পশ্চিমাংশে অবস্থিত নতুন সৃষ্ট পলি মাটি দ্বারা গঠিত। এ এলাকাটি নদী-ভাঙ্গনের আশংকাযুক্ত এবং প্রতি বছরই এ এলাকা পলি দ্বারা কম-বেশী আবৃত হয়। এলাকাটি প্রায় সমতল নিচু বিল নিয়ে গঠিত।

৪.৯ গবেষনা এলাকার মৃত্তিকা ও পানি ঃ

মৃত্তিকা বা মাটি হচ্ছে উদ্ভিদ বৃদ্ধির সহায়ক শিলাকনা, বায়ূ ও জলকণা সহযোগে গঠিত জৈব পদার্থের একটি মিশ্রণ (হাসান ও অন্যান্য, ১৯৯৫)। বিভিন্ন খনিজ ও জৈব পদার্থের সমন্বয়ে মৃত্তিকা গঠিত হয়। মৃত্তিকার ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়া এবং বিবর্তনের সাথে মিল রেখে মৃত্তিকার শ্রেণীবিন্যাসের ধরন পর্যলোচনা করলে দেখা যায় যে, আশুগঞ্জ এলাকাটি নবযুগিয় পলল মৃত্তিকা দ্বারা সংগঠিত অঞ্চলের অর্ন্তভুক্ত। পলল মৃত্তিকার ৬টি শ্রেনীর ভাগ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সমভূমি এলাকার মৃত্তিকা মাঝারি থেকে উচ্চ অম্লতা যুক্ত ত্বকমৃত্তিকা এবং ভঙ্গুর ও প্রবেশ্য গুনসম্পন্ন চুনযুক্ত কালচে খয়েরি থেকে কালচে ধূসর বর্ণের।
এই শ্রেনিবিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, আশুগঞ্জ যেহেতু ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অর্ন্তগত একটি উপজেলা সেহেতু এই এলাকার মাটিও নদী বাহিত পললের ওপর বেশি নির্ভর করে বিকাশ লাভ করেছে। আশুগঞ্জ উপজেলার মৃত্তিকা অম্লতা যুক্ত বেলে দো-আঁশ পলি মাটি দ্বারা গঠিত। এছাড়া আশুগঞ্জ এলাকার মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী চর চুন বিহীন বেলে দোআঁশ মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি হয়েছে। আশুগঞ্জ এলাকার মৃত্তিকার পিএইচ এর মাত্রা ৫৩-৬৬। এলাকাটি স্বাদু পানির অর্ন্তভূক্ত। ঋতুভেদে এর অম্লতার মাত্রার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এখানকার মৃত্তিকার উর্বরতা ক্ষেত্রে এটি নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

টেবিল ৪.৪: গবেষণা এলাকার মাটির প্রকৃতি

ইউনিয়নের নাম	মাটির পি এইচ	AEZ	মাটির গঠন
আশুগঞ্জ	৫৫-৬৩	১৯	পলি (Silty) কাঁদা-কাঁদা (Clay-Clay) দো-আঁশ (Loam)
চর চারতলা	৫৩-৬৫	১৯	দো-আঁশ (Loam) কাঁদা (Clay) দো-আঁশ (Loam)
দূর্গাপুর	৫৫-৬৩	১৯	দো-আঁশ (Loam) কাঁদা (Clay) দো-আঁশ (Loam)
তালশহর	৫৩-৬৬	১৯	পলি (Silty) কাঁদা-কাঁদা (Clay-Clay) দো-আঁশ (Loam)

উৎসঃ ভূমি ব্যবহার রিপোর্ট: আশুগঞ্জ উপজেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২০০৮

৪.১০ গবেষণা এলাকার পানি সম্পদ ঃ

গবেষণা এলাকার মধ্যে মেঘনা নদী রয়েছে। নদী থেকে সৃষ্ট খাল বিল নালা ও জলাশয় পুরো এলাকাটিতে জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে। গ্রীষ্মকালে যখন নদীর নাব্যতা কমে যায় তখন নদীতে পানির প্রবাহ কমে যায়। তখন অনেক খাল, বিল, পুকুর ডোবা শুকিয়ে যায়। আবার বর্ষার মৌসুমে ঐ সব খাল বিল গুলোতে পানি প্রবাহিত হতে দেখা যায়।

৪.১০.১ গবেষণা এলাকার ভূপৃষ্ঠস্থ পানি ঃ

ভূপৃষ্ঠস্থ পানির প্রধান উৎস হচ্ছে নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি। গবেষণা এলাকার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে মেঘনা নদী প্রবাহিত। মেঘনা নদীতে সারা বছরই সেচের জন্য পানি থাকে এবং জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয়। মেঘনা নদীর সাথে সংযুক্ত ছোট কিছু খাল এবং আরো কিছু শাখা নদী উপজেলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে সেগুলো থেকে সেচের মাধ্যমে পানি পাওয়া যায়। মরা নদী

খালগুলো সংস্কার করে সেচের জন্য পানি সংরক্ষণ করা যায়। এ উপজেলায় ৭৬৩টি ছোট বড় পুকুর রয়েছে। তার মধ্যে মজা পুকুর নাই, আবাদী পুকুরের সংখ্যা ৭৬৩টি এবং খাস পুকুরের সংখ্যা ৪২টি। বেশিরভাগ পুকুর বসতবাটি বা বাজার সংলগ্ন। অধিকাংশ পুকুর সাধারণত মাছ চাষ ও পারিবারিক কাজে ব্যবহৃত হয়। এ উপজেলার চাষাবাদ পদ্ধতি প্রধানত সেচ নির্ভর (এস আর ডি আই ২০১৩)।

৪.১০.২ গবেষণা এলাকার ভূগর্ভস্থ পানি ঃ

চাষাবাদের জন্য যথেষ্ট ভূগর্ভস্থ পানি রয়েছে। গবেষণা এলাকার চাষাবাদ পদ্ধতি প্রধানত সেচনির্ভর। বর্তমানে এ উপজেলায় ৩২০টি অগভীর নলকূপ (৮৬টি বিদ্যুৎ চালিত ও ২৩৪টি ডিজেল চালিত) রয়েছে। এ উপজেলায় আরও অধিক গভীর/অগভীর নলকূপ স্থাপন করে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে সেচ ব্যবস্থার প্রসার লাভ সম্ভব।

৪.১১ গবেষণা এলাকার সেচ ব্যবস্থা ঃ

শুষ্ক মৌসুমে ছোট ছোট পুকুর ও কূপের পানি দিয়ে কিছু কিছু এলাকায় বসতবাটির আশে পাশে শাক-সবজি আবাদ করা হয়। শুষ্ক মৌসুমে গভীর/অগভীর নলকূপের সাহায্যে আধুনিক জাতের বোরো ধানের আবাদ করা হয়। এ উপজেলায় ৩২০টি অগভীর নলকূপের মাধ্যমে ১,২৫০ হেক্টর, ২২৩টি লো লিফট (এলএলপি) -এর মাধ্যমে ২,১৫০ হেক্টর এবং অন্যান্য সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে ১,৮০০ হেক্টর জমি আবাদ করা হয়ে থাকে। অন্যান্য সেচের মাধ্যমে যেমন-আশুগঞ্জ এগ্রো ইরিগেশন প্রজেক্ট (সবুজ প্রকল্প) সরাসরি ১,৬৫০ হেক্টর জমি এবং জোয়ার-ভাটার ওপর ১৫০ হেক্টর জমি সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ করা হয়। সেচযন্ত্রের আওতায় সেচ এলাকা বৃদ্ধি প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে সেচযন্ত্র সমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চত করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা আবশ্যক। সেচবিহীন বিল এলাকায় ১০০ হেক্টর জমি আবাদ করা হয় (এস আর ডি আই ২০১৩)।

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার জরিপ থেকে জানা যায় যে, গবেষণা এলাকায় যে অধিকাংশ গভীর ও অগভীর নলকূপ মাঝারি উঁচু জমির ও মাঝারি নিচু জমির 'চন্দিনা ' ও ' দেবিদ্বার' মৃত্তিকা দলে অবস্থিত এবং এগুলো দিয়ে মাঝারি উঁচু এবং মাঝারি নিচু জমিতে বোরো ধানের আবাদ করা হয়। 'চন্দিনা' মৃত্তিকা দলে পানি আটকাবার ক্ষমতা কম বলে পানির অপচয় অধিক এবং বোরো ধান চাষের জন্য উপযোগী নয়। পক্ষান্তরে এ মাটি গোল আলু, গম, ফুটি, বাংগি, তরমুজ শাকসবজি ইত্যাদি আবাদের জন্য যথেষ্ট উপযোগী। 'চান্দিনা' মৃত্তিকা দলের মাঝারি নিচু জমিগুলোতে রবিশস্য যথা-সরিষা, গম আলু, প্রভৃতি রবি শাকসবজি চাষ এবং 'দেবিদ্বার' ও 'বুড়িচাং' মৃত্তিকা দলে বোরো ধানের আবাদ করে সেচ এলাকা বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। অধিকন্তু, যেসব সেচনালা 'চান্দিনা' মৃত্তিকা দলের ওপর দিয়ে গেছে সেসব নালা পাকা করে অথবা অন্য কোন উপায়ে পানির অপচয় বন্ধ করে সেচ এলাকা বৃদ্ধির সম্ভাবনা যাচাই করা প্রয়োজন।

ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের সাথে ভূপৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। এ এলাকার মরা পুকুর খাল ও নদী সংস্কার এবং নদী থেকে সংযোগ খাল কেটে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করে সেচ এলাকা বাড়ানো সম্ভব। এসব বিষয় বাস্তবায়ন সম্ভাব্যতা নিরূপণের জন্য জরিপ পরীক্ষা করা অতি প্রয়োজন।

৪.১২ গবেষণা এলাকাটির জলবায়ু ঃ

যে কোন দেশের প্রাণী ও উদ্ভিদ বিশেষ করে অরণ্যের বিতরণ ও বৃক্ষরাজির বৈশিষ্ট্য সেই দেশের ভূ-প্রকৃতি জলবায়ুর ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আবার নির্দিষ্ট জলবায়ুপূর্ণ দেশে তার ভূ-প্রকৃতি ও মৃত্তিকার পার্থক্যের কারণে উদ্ভিজ্জে স্থানীয় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় (শামসুর, ১৯৯৮)। যে কোন দেশের উদ্ভিদকূল ও উদ্ভিজ্জের গঠনগত বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে সেই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলের উদ্ভিদকূল ও এই দেশের আবহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাংলাদেশের আবহাওয়া ক্রান্তীয় প্রভাব বিদ্যমান। কারণ কর্কটক্রান্তি রেখা বাংলাদেশকে উত্তর ও দক্ষিণ এ দুটি প্রায় সমান অংশে বিভক্ত করেছে ফলে এর উত্তরার্ধ উপক্রান্তীয় ও দক্ষিণার্ধ ক্রান্তীয় মন্ডলে অবস্থিত। কিন্তু ঠিক আশুগঞ্জ এলাকাটির মধ্য দিয়েই কর্কটক্রান্তি রেখাটি প্রবাহিত হওয়ায় এ অঞ্চলের জলবায়ু পুরোপুরি ক্রান্তিয় জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নিম্নে গবেষণা এলাকার আবহাওয়া ও জলবায়ুর বর্ণনা দেওয়া হল।

তাপমাত্রার দিক থেকে বাংলাদেশের জলবায়ুকে অনেক সময় সমভাবাপন্ন বলা হয়ে থাকে। কারণ সারাবছর এ দেশের বিভিন্ন স্থানের তাপের তারতম্য খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের বাৎসরিক গড় তাপমাত্রার পার্থক্য যথাক্রমে ১০ সেঃ থেকে ৬° সেঃ এলাকার শীতকালের গড় তাপমাত্রা ২০১° সেলসিয়াস, গ্রীষ্মকালের গড় তাপমাত্রা ২৭৮° সেলসিয়াস থাকে এবং বাংলাদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা

২৫৭৪° সেলসিয়াস (বিবিএস ২০১৪) এই তাপমাত্রা গাছপালার বৃদ্ধি ও প্রজননের জন্য বেশ উপযোগী। ঋতুভেদে ও পরিসরের সাথে গবেষণা এলাকাটির তাপমাত্রা পরিবর্তন হয়ে থাকে। বৎসরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এপ্রিল-মে মাসে হয়ে থাকে, এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হল ৩৫°। অক্টোবরের প্রথমদিক থেকে তাপমাত্রা সহসা হ্রাস পায় এবং জানুয়ারী মাসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় না পৌছানো পর্যন্ত হ্রাস পেতে থাকে।

৪.১৩ গবেষণা এলাকার পলল ও ক্ষয়ীভবন ঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড.সাজ্জাদুর রশীদের মতে "প্রতি বৎসর বাংলাদেশের নদীগুলো বাইরে থেকে প্রায় ২ বিলিয়ন টন পলি নিয়ে এসে বাংলাদেশে জমা করে।" আসামের লুসাই পাহাড়ে বারাক নদীর উৎপত্তি। এই নদীটি বাংলাদেশে প্রবেশ করে মেঘনা নাম হয়। এই নদীর পাড়ে আশুগঞ্জ এলাকাটি অবস্থিত। গবেষণা এলাকাটি মেঘনা নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠা একটি অঞ্চল। নুড়ি, বালি, কাঁদা নদী বাহিত পলল দ্বারা এই উপজেলার ভূ-উপরিস্থ মৃত্তিকা গঠিত হয়েছে। সমগ্র অঞ্চলটি উচু, মাঝারি উচু, মধ্যম নিচু ও নিচু এই কয়েকটি ভাগে বিভাজন করা যায়। গবেষণা এলাকাটি নদীর সাথে সংযুক্ত থাকায় সর্বাধিক পলি নিয়ে আসে। বর্তমান কালে নদীর মাঝে পানি বাহিত পলি জমা হয়ে নদীর মাঝে চর প্রতিবছর একটু একটু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া গবেষণা এলাকাটির চরচারতলা ইউনিয়নটি নব চরে গঠিত হওয়া একটি এলাকা যা এখন আশুগঞ্জ এলাকার সাথে সম্পূর্ণভাবে মিলে গেছে। অতিরিক্ত পলি জমা হওয়ার কারণে নদীর নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে এবং ছোট ছোট খাল বিল নালা শুকিয়ে যাচ্ছে।
অপরদিকে গবেষণা এলাকায় ক্ষয়ীভবনের মাত্রা তেমন ব্যপকভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। বর্ষকালে পানির প্রবাহ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে কোন কোন স্থানে ক্ষয় কার্য হতে দেখা যায়। তবে তা খুবই সামান্য। সুতরাং দেখা যায় যে, আশুগঞ্জ উপজেলায় নদী দ্বারা বাহিত পলি জমা হয়ে একদিকে যেমন পলল সম্বৃদ্ধ সমভূমি গড়ে উঠছে ঠিক তার উল্টো দিকে কিছু কিছু এলাকায় নদীর ভাঙ্গনের ও সৃষ্টি হচ্ছে। গবেষণা এলাকায় নদীর ক্ষয় ও সঞ্চয় দুই ধরনের প্রবনতাই দেখা যায়।

৪.১৪ গবেষণা এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ঃ

গবেষণা এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে উপজেলার জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ২৭৮৮ শতাংশ, অকৃষি শ্রমিক ৬৫৬ শতাংশ, শিল্প ১৭৯ শতাংশ, ব্যবসা ২৩৫৫ শতাংশ, পরিবহণ ও যোগাযোগ ২২৪ শতাংশ, চাকরি ১৪১০ শতাংশ, নির্মাণ ২০২ শতাংশ, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ৩৫৭ শতাংশ এবং অন্যান্য ১৮২৯ শতাংশ। কৃষিভূমির মালিকানা ভূমিমালিক ৫৩০৪ শতাংশ, ভূমিহীন ৪৬৯৬ শতাংশ। শহরে ৪৯৫৩ শতাংশ এবং গ্রামে ৫৩৯৯ শতাংশ পরিবারের কৃষিজমি রয়েছে (বি বি এস ২০০৮)।

৪.১৫ গবেষণা এলাকার বসতি ও জনসংখ্যা বিন্যাস ঃ

গবেষণা এলাকা সম্পর্কে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে পাওয়া তথ্যের মাধ্যমে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকাটিতে ১৯৬১ সালে বসতি সংখ্যা ছিল ৪৯০৩ টি। ২০১১ সালে বসতির সংখ্যা হয় ১৮৭৮৯ টি। গবেষণা এলাকাটির জনসংখ্যা বিন্যাস দেখা যায় যে, ১৯৬১ সালে গবেষণা এলাকায় জনসংখ্যা ছিল ২৭৮৫৯ জন এর মধ্যে নারীর সংখ্যা ছিল ১৪৪৪১ ও পুরুষের সংখ্যা ছিল ১৩৪১৮ জন। ২০১১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে জনসংখ্যা হয় ১০১১৪৮ জন এর মধ্যে নারীর সংখ্যা ৫০৬২৯ জন ও পুরুষের সংখ্যা ৫০৫১৯ জন (বি বি এস ২০১১)।

টেবিল ৪.৫: গবেষণা এলাকার বসতি ও জনসংখ্যা বিন্যাস

	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
বসতি সংখ্যা	৪৯০৩	৬০৮৪	৮০৬০	১১৩৮৩	১৪৮৩২	১৮৭৮৯
জনসংখ্যা	২৭৮৫৯	৩২৬৫৯	৫০৭৪০	৬৮৪৭৯	৮৪১৮১	১০১১৪৮
ছেলে	১৩৪১৮	১৪১৬১	২৭৩৪৪	৩৬১৬৯	৪৪০২৯	৫০৫১৯

মেয়ে	১৪৪৪১	১৮৩৯৮	২৩৩৯৬	৩২৩১০	৪০১৫২	৫০৬২৯

উৎস- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (১৯৬১-২০১১)

চিত্র ৪.১: গবেষণা এলাকার বসতি ও জনসংখ্যার বিন্যাস

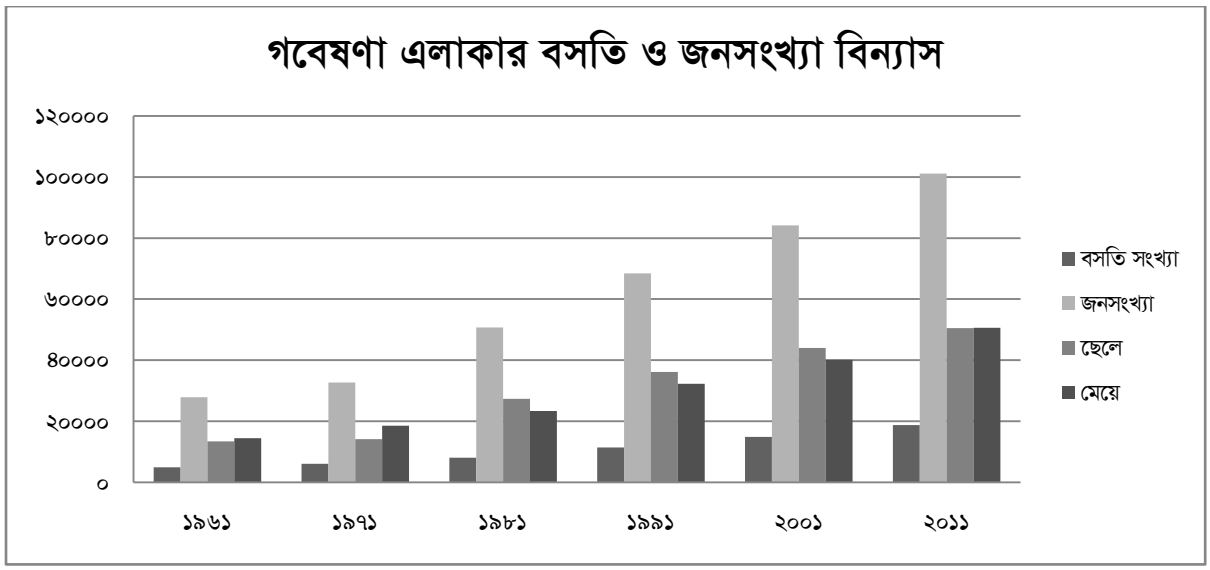

উৎস- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (১৯৬১-২০১১)

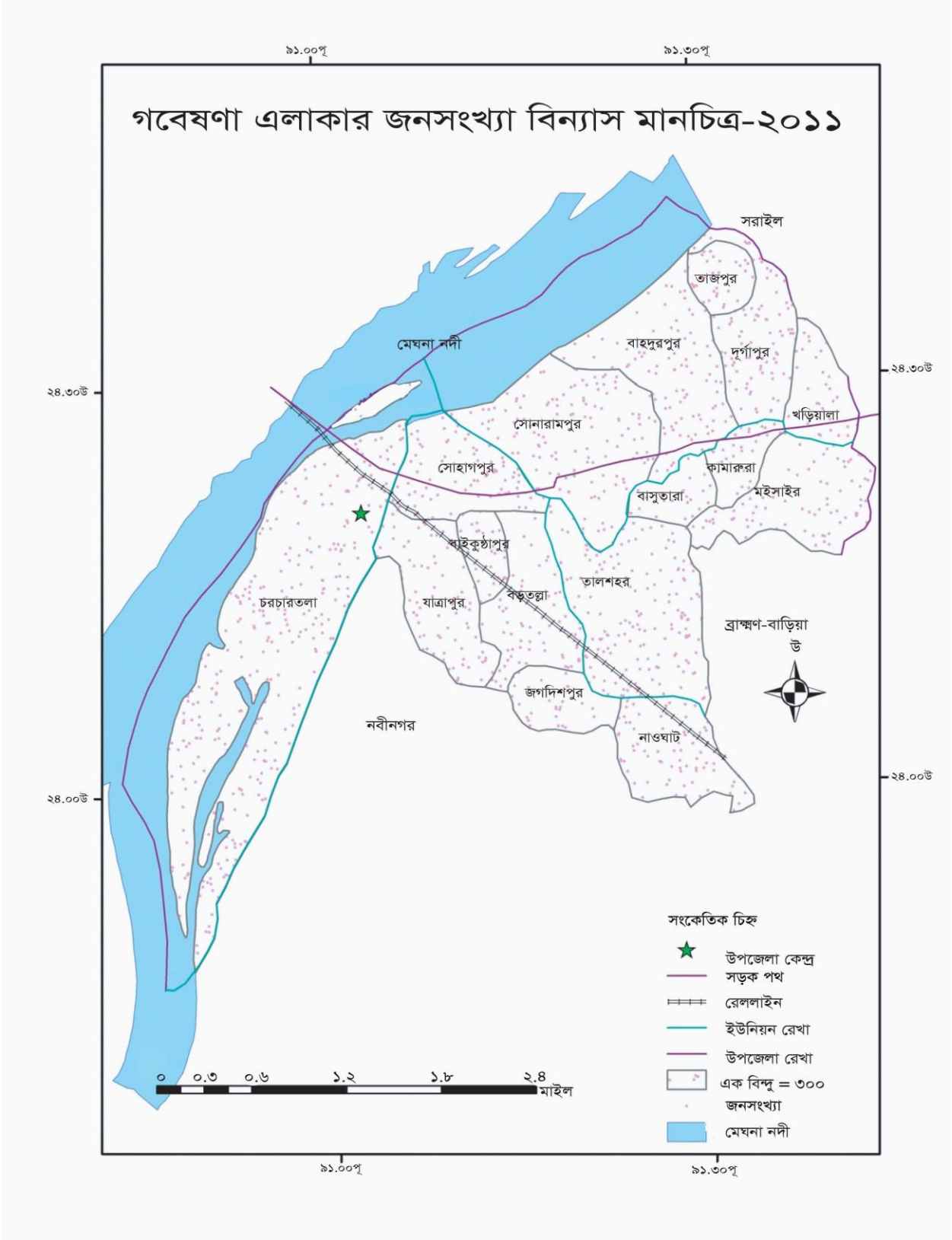

মানচিত্র ৪.২: গবেষণা এলাকার জনসংখ্যা বিন্যাস

উৎস- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১১

৪.১৬ গবেষণা এলাকার জনসংখ্যাকে বয়স ভিত্তিক বিশ্লেষণ

গ্রাফচিত্র ৪.২ তে গবেষণা এলাকার জনসংখ্যাকে বয়স ভিত্তিক ভাগ করে দেখানো হয়েছে। গ্রাফচিত্র ৪.২ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৮১ সালে গবেষণা এলাকায় ০-৯ বয়সের জনসংখ্যার ছিল ৩২৪৬ শতাংশ এবং ২০১১ সালে ০-৯ বয়সি জনসংখ্যা হয় ২৯৩৮ শতাংশ। ১৯৮১ সালে ১০-১৭ বয়সের জনসংখ্যা ছিল ১৭২০ যা ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২২৩৯ শতাংশ। গবেষণা এলাকার ১৮-৬৪ বয়সি জনসংখ্যা ১৯৮১ সালে ৪৫৭৪ ছিল যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ৪১৬৮ শতাংশ হয়েছে। গবেষণা এলাকায় ৬৪+ বয়সি জনসংখ্যা ১৯৮১ সালে ছিল ৪৬০ শতাংশ, ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬২ শতাংশ । গবেষণা এলাকাটির বয়স ভিত্তিক জনসংখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১০-৬৪ বয়সি জনসংখ্যা ১৯৮১ সালে ছিল ৬২৯৪ শতাংশ, এবং ২০১১ সালে এই জনসংখ্যা হয় ৬৮০৭ শতাংশ। গবেষণা এলাকাটি ১৯৮১ সালে ০-৯ ও ৬৪ বয়সি জনসংখ্যা একত্রে ছিল ৩৭.০ শতাংশ। ২০১১ সালে দেখা যায় যে, ০-৯ ও ৬৪+ বয়সি জনসংখ্যা একত্রে ৩৫.৫৮ শতাংশ। গ্রাফচিত্র ৪.২ থেকে জানা যায় যে গবেষণা এলাকাটি কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি এবং কর্মক্ষম নয় এমন জনসংখ্যার হার কম।

চিত্র ৪.২: গবেষণা এলাকার জনসংখ্যাকে বয়স ভিত্তিক বিশ্লেষণ

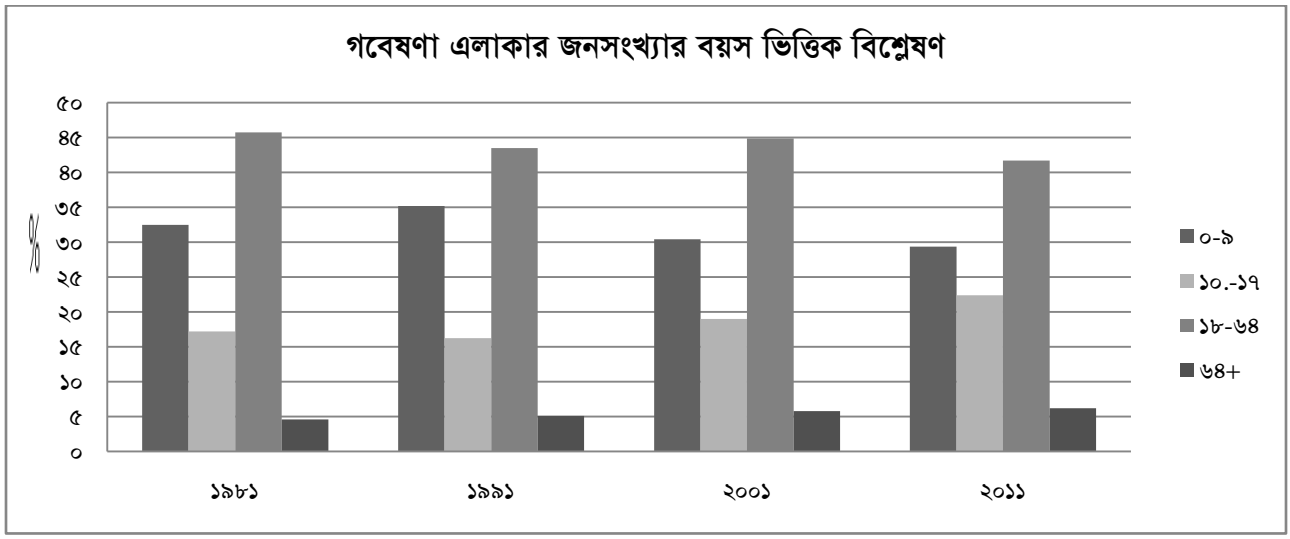

উৎস- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (১৯৮১-২০১১)

৪.১৭ গবেষণা এলাকার স্কুল গমনকারি জনসংখ্যা বিশ্লেষণঃ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর থেকে পাওয়া ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ সালের তথ্য গবেষণা করে দেখা যায় যে, ১৯৮১ সালে গবেষণা এলাকায় ৯-১৩ বয়সি স্কুল গমনকারি জনসংখ্যার শতকরা হার ছিল ৪ শতাংশ। স্কুল গমন করে না জনসংখ্যা ছিল ৩০১ শতাংশ। ২০১১ সালে তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকায় ৭৭৯ শতাংশ স্কুলে যায়। এবং ৮০৯ শতাংশ স্কুলে যায় না। গ্রাফচিত্র:৪.৩ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৮১ সালে গবেষণা এলাকার স্কুল গমনকারী ১৪-২০ বয়সি ছেলেমেয়ের ৪৬৬ শতাংশ স্কুলে যায়। ১৩০২ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় না। ২০১১ সালের তথ্য থেকে দেখা যায় যে ১৫৩৬ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় ও ১৮৬৬ শতাংশ ছেলে মেয়ে স্কুলে যায় না। ২১-২৫ বয়সি ছেলেমেয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৮১ সালে ১৮৩ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় এবং ৪৬৩৮ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলে যায়না। অপর দিকে ২০১১ সালে দেখা যায় ৫.০ শতাংশ স্কুলে যায় ও ৪৭১ শতাংশ স্কুলে যায় না। তবে তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০০১ সালে স্কুল গমনকারি জনসংখ্যা সব চেয়ে বেশি ছিল।

চিত্র ৪.৩: গবেষণা এলাকার স্কুল গমনকারী জনসংখ্যা বিশ্লেষণ:

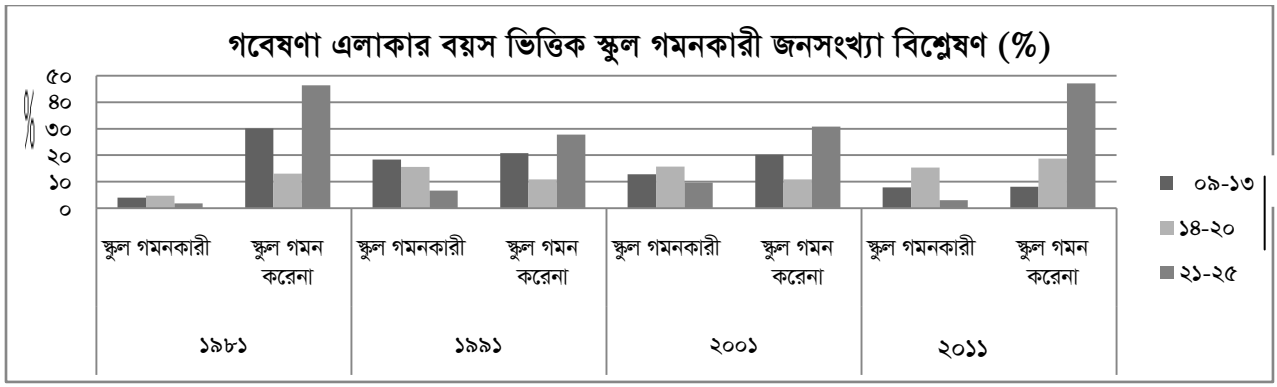

উৎস- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (১৯৮১-২০১১)

৪.১৮ গবেষণা এলাকার পেশা অনুসারে জনসংখ্যার বিশ্লেষণ

এই গ্রাফচিত্র ৪.৪ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটির জনগণ বিভিন্ন রকম পেশার সাথে সংযুক্ত রয়েছে। ১৯৮১ সালে গবেষণা এলাকাটিতে কাজ করে না এমন লোকের সংখ্যা ছিল ২০৪৯ শতাংশ এবং ২০১১ সালে দেখা যায় এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৬৬৫ শতাংশ হয়েছে। ১৯৮১ সালে কাজ খুঁচ্ছে এমন লোকের সংখ্যা ছিল ৩৪৯ শতাংশ, ২০১১ সালে কাজ খুঁচ্ছে এমন লোকের সংখ্যা হলো ০২১ শতাংশ। গৃহস্থালি/ আবাসিক কাজ করে এমন লোকের সংখ্যা ১৯৮১ সালে ছিল ৩৬৫০শতাংশ, ২০১১ সালে এই সংখ্যা হয় ৮৬২ শতাংশ। ১৯৮১ সালে শিল্প উৎপাদনে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ছিল ০৩৩ শতাংশ, ২০১১ সালে এই সংখ্যা হয় ২৮৮ শতাংশ। গবেষণা এলাকাটিতে ১৯৮১ সালে কৃষি কাজে নিয়োজিত লোক সংখ্যা ছিল ১৭২২ শতাংশ, ২০১১ সালে কৃষিকাজে নিয়োজিত লোক সংখ্যা হল ২৭৬ শতাংশ। পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস শিল্পে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ছিল ১৯৮১ সালে ০ শতাংশ হলেও ২০১১ সালে এই সংখ্যা হয় ১০৭৯ শতাংশ। নির্মাণ কাজে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ছিল ১৯৮১ সালে ০৪৩ শতাংশ, ২০১১ সালে এই সংখ্যা হয় ২৬২৮ শতাংশ। পরিবহন কাজে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ছিল ১৯৮১ সালে ০৭১ শতাংশ, ২০১১ সালে এই সংখ্যা হয় ১২২৭ শতাংশ। ব্যবসায়ী লোকের সংখ্যা ছিল ১৯৮১ সালে ৫৮৪ শতাংশ, ২০১১ সালে এই সংখ্যা হয় ১০৩৬ শতাংশ। চাকরিজীবী লোকের সংখ্যা ছিল ১৯৮১ সালে ৪৩৭ শতাংশ, ২০১১ সালে এই সংখ্যা হয় ৫১৩ শতাংশ। অন্যান্য কাজে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ছিল ১৯৮১ সালে ১০১১ শতাংশ, ২০১১ সালে এই সংখ্যা হয় ১৪০১ শতাংশ। গ্রাফচিত্র ৪.৪ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকায় সবচেয়ে বেশি জনগণ কন্সট্রাশন এর কাজে নিয়োজিত। এর পর বেশি লোক ইলেক্ট্রিসিটির কাজে জড়িত রয়েছে। যদিও গবেষণা এলাকায় ১৯৮১ সালে ইলেক্ট্রিক কাজে নিয়োজিত লোক সংখ্যা শূন্য ছিল।

চিত্র ৪.৪: গবেষণা এলাকার পেশা অনুসারে জনসংখ্যার বিশ্লেষণ

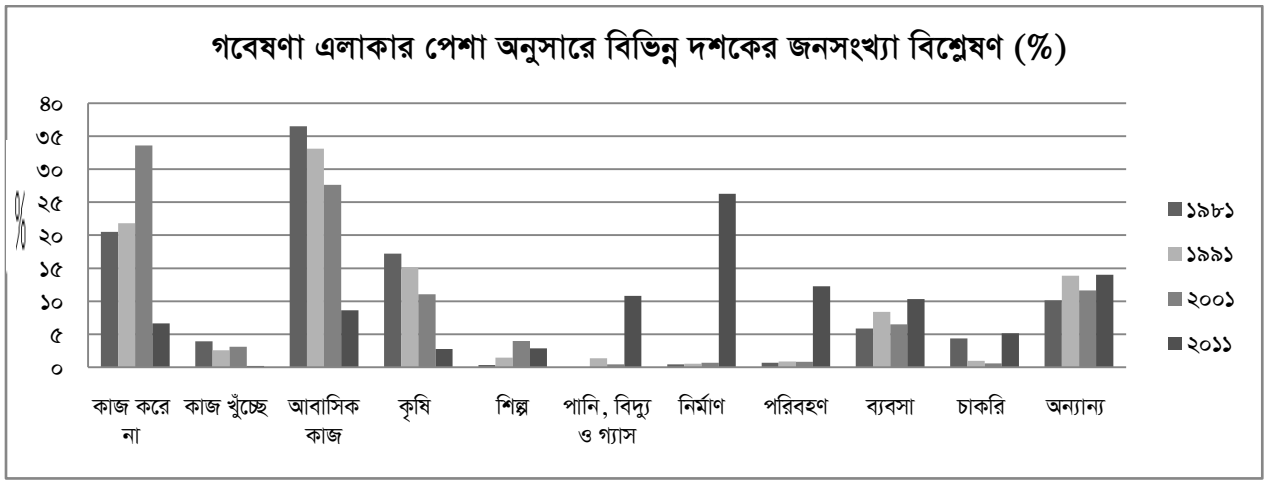

উৎস- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (১৯৮১-২০১১)

৪.১৯ গবেষণা এলাকার মূল আয়ের উৎসের ওপর ভিত্তি করে বসতি বিন্যাস পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে গ্রাফচিত্র ৪.৫ তৈরি করা হয়। গ্রাফচিত্র ৪.৫ থেকে দেখা যায় মূল আয়ের ওপর ভিত্তি করে এলাকাটির বসতি বিন্যাসের ক্ষেত্রে শুধু মাত্র ১৯৯১ ও ২০০১ সালের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। ১৯৯১ সালে

কৃষক ছিল ২৭৭১ শতাংশ, ২০০১ সালে কৃষকের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয় ১৩৭৪ শতাংশ। বন ও মৎস্য কাজে নিয়োজিত বসতি সংখ্যা ১৯৯১ সালে ছিল ২৩৩ শতাংশ, ২০০১ সালে হয় ১১৮। কৃষি কাজ করে না এমন বসতি সংখ্যা ১৯৯১ সালে ছিল ৬৬৭ শতাংশ, ২০০১ সালে হয় ৬৫৪ শতাংশ। কৃষি শ্রমিক ১৯৯১ সালে ছিল ৬৯৭ শতাংশ, ২০০১ সালে হয় ৫৩৯ শতাংশ। কৃষি কাজ করে না এমন বসতি ১৯৯১ সালে ছিল ৬৯৭ শতাংশ, ২০০১ সালে হয় ৬৫৪ শতাংশ। তন্তু জাতীয় ব্যবসায়ী ১৯৯১ সালে ছিল ০০২ শতাংশ, ২০০১ সালে হয় ২৩৪ শতাংশ। ব্যবসা করে এমন বসতি ছিল ১৯৯১ সালে ১৭৫২ শতাংশ, ২০০১ সালে ২১৪৯ শতাংশ। নির্মাণ কাজে নিয়োজিত বসতি ১৯৯১ সালে ০৭৭ শতাংশ, ২০০১ সালে ১০৬ শতাংশ। পরিবহন কাজে নিয়োজিত বসতি সংখ্যা ১৯৯০ সালে ছিল ১৮৯ শতাংশ, ২০০১ সালে হয় ২০১ শতাংশ। শিল্প কাজে নিয়োজিত বসতি সংখ্যা ১৯৯১ সালে ছিল ০৪৯ শতাংশ, ২০০১ সালে হয় ৫১১ শতাংশ। চাকরিতে নিয়োজিত বসতি সংখ্যা ১৯৯১ সালে ছিল ২০৭৬ শতাংশ, ২০০১ সালে হয় ১৯৭১ শতাংশ। গ্রাফচিত্র ৪.৪ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কৃষকের পরিমাণ কমেছে এবং ব্যবসা ও চাকরিজীবী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ।

চিত্র ৪.৫: মূল আয়ের উৎসের ওপর ভিত্তি করে গবেষণা এলাকাটির বসতি বিন্যাস পর্যবেক্ষণ

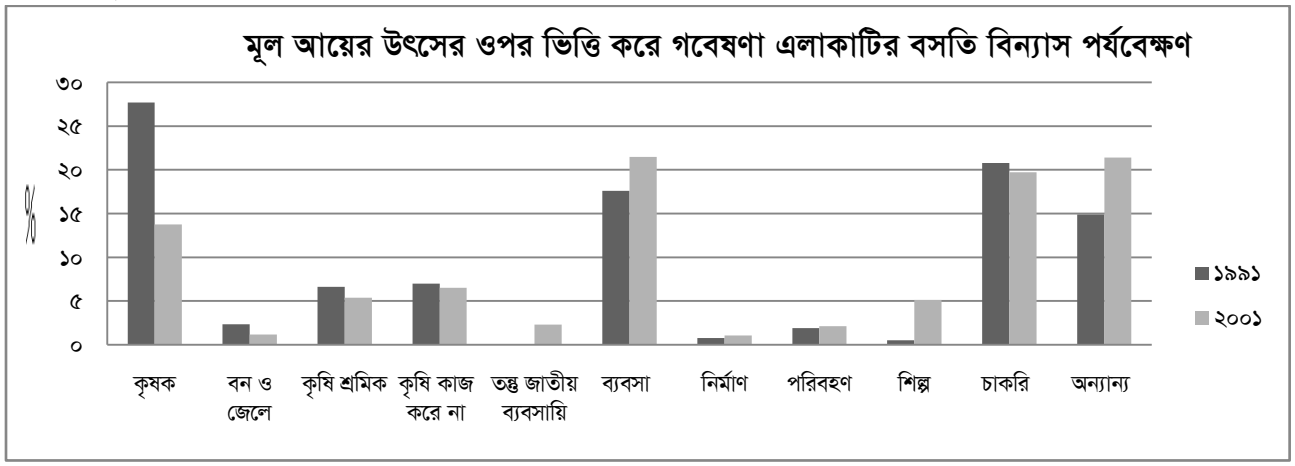

উৎস- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (১৯৯১-২০১১)

৪.২০ গবেষণা এলাকার কৃষি খামার ভিত্তিক শ্রেনী বিন্যাস ঃ

গ্রাফচিত্র ৪.৬ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকাটিতে ১৯৮৩ সালে কৃষি বসতি নয় এমন পরিবারের সংখ্যা ছিল ৩৪১১টি। ২০০৮ সালে কৃষি বসতি নয় এমন খামারের সংখ্যা হয় ১০৪৪২টি। ১৯৮৩ সালে কৃষি বসতি ছিল ৫১৫৮টি, ২০০৮ সালে কৃষক পরিবারের সংখ্যা হয় ৫৩৭২টি। এ থেকে বুঝা যায় যে, এলাকাটিতে কৃষি কাজ হ্রাস পেয়েছে এবং অন্য সকল চাকরি ও ব্যবসায়ী বসতি সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ৪.৬: কৃষি খামার ভিত্তিক শ্রেনী বিন্যাস গবেষণা এলাকা আশুগঞ্জ

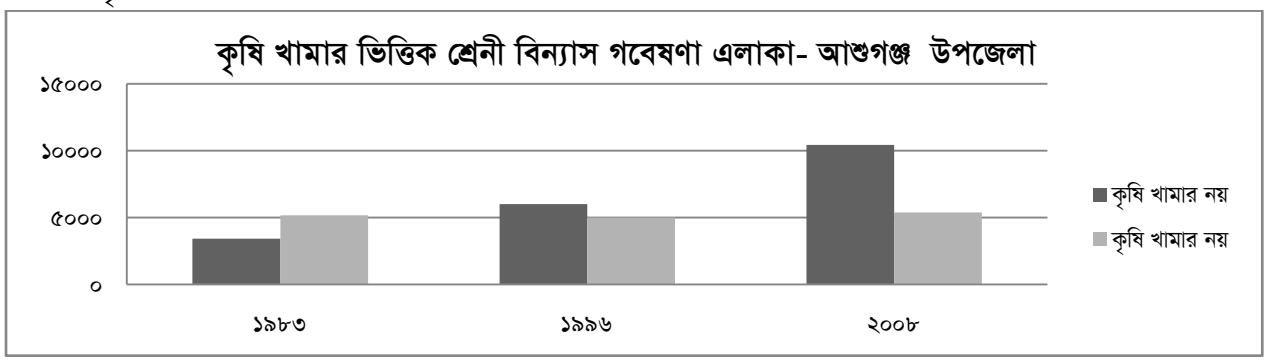

উৎস- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (১৯৮৩-২০০৮)

৪.২১ গবেষণা এলাকার কৃষি খামারের আকার সংখ্যা বিশ্লেষণ

গ্রাফচিত্র ৪.৭ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় গবেষণা এলাকাটির মূল কৃষি বসতি গুলোকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। কৃষকের জমির পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে গবেষণা এলাকার কৃষি খামার গুলোকে ছোট মধ্যম ও বড় এই তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। ১৯৮৩ সালে এলাকাটিতে ছোট খামার সংখ্যা ছিল ৪৫৩২টি, ২০০৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯৩৯টি হয়েছে। ১৯৮৩

সালে মধ্যম আকারের খামার সংখ্যা ছিল ৫৯১টি ২০০৮ সালে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৪১৮টি। ১৯৮৩ সালে বড় কৃষি খামারের সংখ্যা ছিল ৩৫টি। ২০০৮ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, তা হ্রাস পেয়ে ১৫টি হয়েছে।

চিত্র ৪.৭: কৃষি খামারের আকার ভিত্তিক গবেষণা এলাকার বিশ্লেষণ:

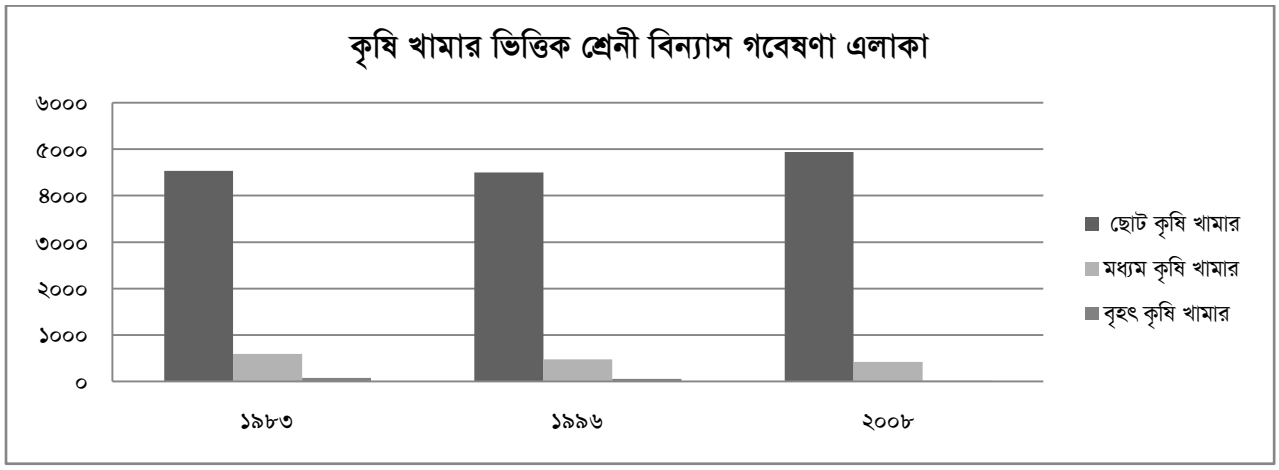

উৎস- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (১৯৮৩-২০০৮)

৪.২২ গবেষণা এলাকার কৃষি জমির অবস্থান

গ্রাফচিত্র ৪.৮ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় গবেষণা এলাকাটির কৃষি জমির অবস্থান ভিত্তিক ভাগ দেখানো হয়েছে। কৃষকের জমির পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে গবেষণা এলাকার কৃষির অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। ১৯৮৩ সালে এলাকাটিতে কৃষি জমি ছিল ৫৮৭৪ একর, ২০০৮ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৪১৯০ একর হয়েছে। সেচ এলাকা ১৯৮৩ সালে ছিল ৩১৪২ একর, ২০০৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪৭১ একর হয়েছে। ১৯৮৩ সালে শিল্প উৎপাদন এলাকা ছিল ১৬৬ একর, ২০০৮ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বৃদ্ধি পেয়ে ১০১১ একর হয়েছে।

চিত্র ৪.৮: গবেষণা এলাকার কৃষি জমির অবস্থান ভিত্তিক বিশ্লেষণ

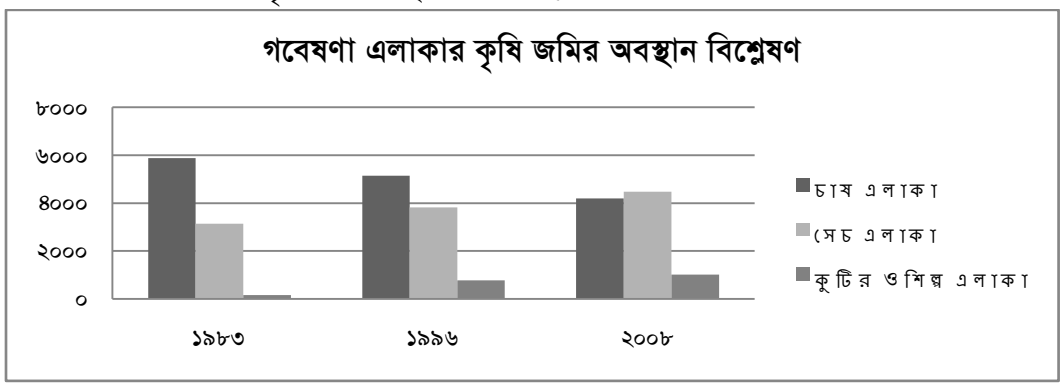

উৎস- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (১৯৮৩-২০০৮)

৪.২৩ গবেষণা এলাকার আবাসভূমি তৈরির মাধ্যম ঃ

গবেষণা এলাকাটির আবাসভূমি বা গৃহ কোন মাধ্যমে তৈরি তার ওপর ভিত্তি করে গবেষণা এলাকার গৃহকে কাঁচা, আধাকাঁচা ও পাকা এই তিনটি শ্রেনিতে বিভক্ত করা হয়। ১৯৮১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার গৃহ তৈরির মাধ্যম গ্রাফচিত্র ৪.৯ এ দেখানো হল। এই সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকাটিতে ১৯৮১ সালের

পরিসংখ্যানে কাঁচা গৃহ ছিল ২৪ শতাংশ। ২০১১ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫ হয়েছে। আধকাঁচা গৃহের সংখ্যা ছিল ১৯৮১ সালে ৬৬ শতাংশ ২০১১ সালে গৃহের সংখ্যা হয়েছে ৩১ শতাংশ । পাকা গৃহের সংখ্যা ছিল ১৯৮১ সালে ১০ শতাংশ। ২০১১ সালের হিসাব অনুসারে পাকা গৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ শতাংশ হয়েছে।

চিত্র ৪.৯: গবেষণা এলাকার গৃহ তৈরির মাধ্যম বিশ্লেষণ

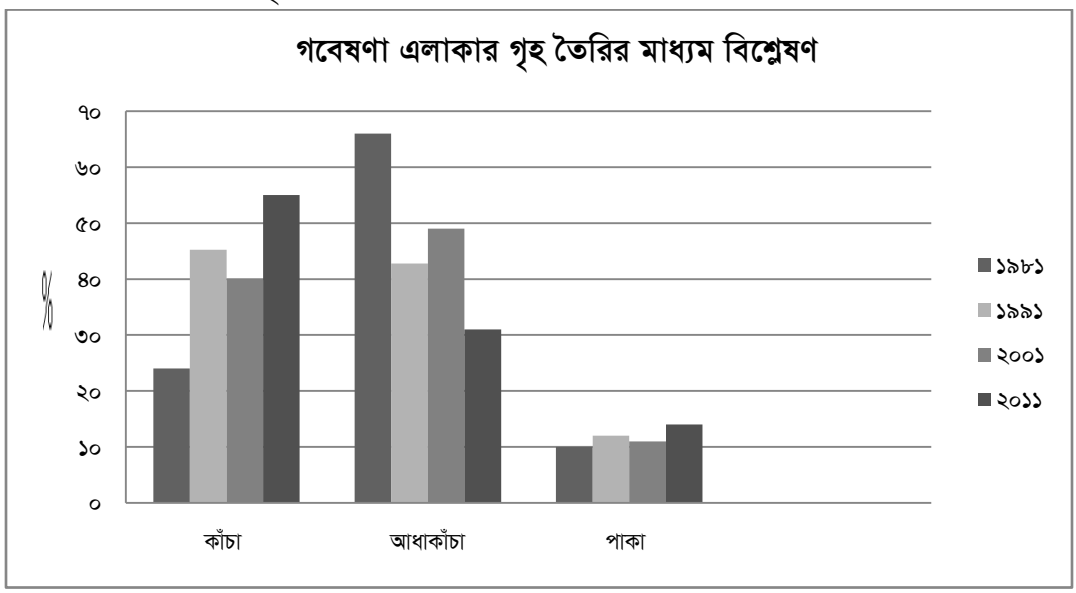

উৎস- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (১৯৮১-২০১১)

৪.২৪ গবেষণা এলাকার খাবার পানির উৎস হিসাবে বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে পাওয়া ১৯৮১, ৯৯১, ২০০১, ২০১১ সালের তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষণা এলাকার তথ্য সন্নিবেসিত করে গ্রাফচিত্র ৪.১০ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সারণির তথ্য থেকে বলা যায় যে, গবেষণা এলাকাটিকে ১৯৮১ সালে টিউ-বয়েল এর সংখ্যা ছিল ৮১১৩ শতাংশ । বর্তমান এলাকা জরিপ ২০১৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৭৩৪ শতাংশ হয়েছে। ১৯৮১ সালে ৬৯২ শতাংশ মানুষ পুকুরের পানি, ৪৭৫ শতাংশ মানুষ নদীর পানি খাবার কাজে ব্যবহার করত। বর্তমানে ২০১৪ সালে এখন কেউ খাবারের প্রয়োজনে পুকুর বা নদীর পানি ব্যবহার করে না।

চিত্র ৪.১০: গবেষণা এলাকার খাবার পানির উৎস হিসাবে বিশ্লেষণ

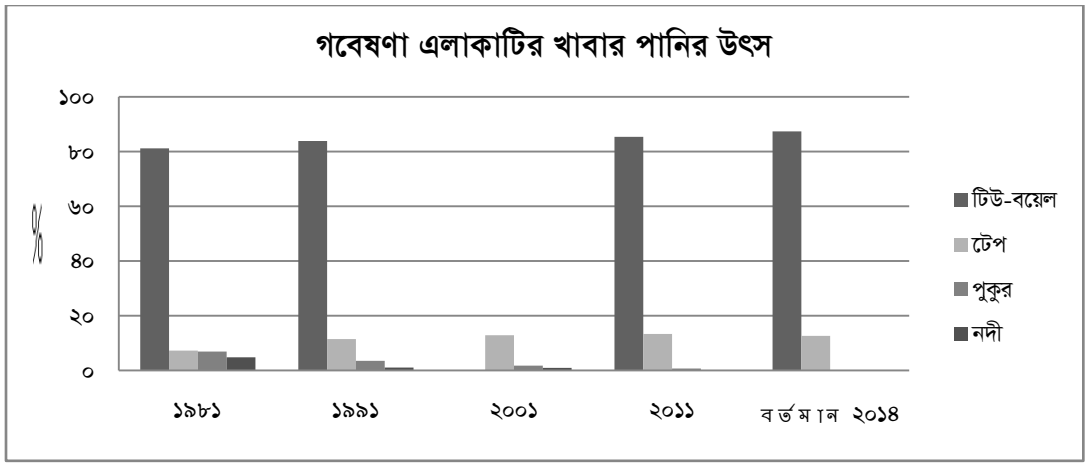

উৎস- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (১৯৮১-২০১১)

৪.২৫ গবেষণা এলাকার এলাকাটির পয়নিস্কাশন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে পাওয়া ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ সালের তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষণা এলাকার তথ্য সন্নিবেসিত করে গ্রাফচিত্র ৪.১১ নং উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সারণির তথ্য থেকে বলা যায় যে, গবেষণা এলাকাটিকে ১৯৮১ সালে সেনিটারির সংখ্যা ছিল ৬২২ শতাংশ। ২০১১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৮৭৮ শতাংশ হয়েছে। ১৯৮১ সালে আঁধা কাঁচা পয়নিস্কাশন বা টিন সেনিটারি সংখ্যা ছিল ১৯৮১ সালে ৩৪৭৮ শতাংশ। বর্তমানে এলাকা জরিপে দেখা গিয়েছে ৬৮৭৮ শতাংশ। ১৯৮১ সালে কাঁচা পয়নিস্কাশন ব্যবস্থা ছিল ৪৮৩৯ শতাংশ । বর্তমানে ২০১৪ সালের জরিপ কাজে কাঁচা পয়নিস্কাশন ব্যবস্থা রয়েছে ০৩২ শতাংশ ।

চিত্র ৪.১১: গবেষণা এলাকাটির পয়নিস্কাশন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ

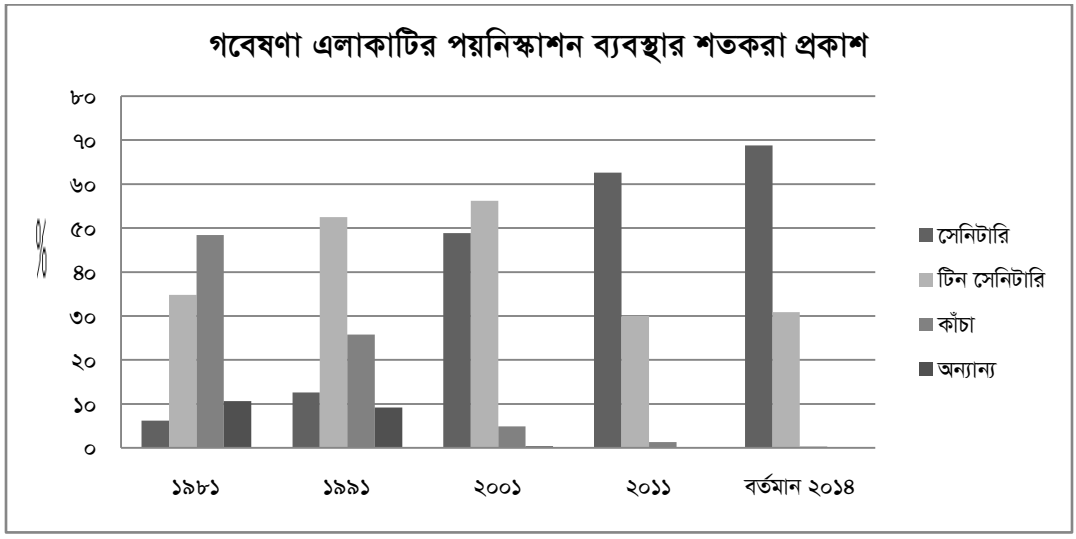

উৎস- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (১৯৮১-২০১১)

অধ্যায় পঞ্চম

ভূ-দৃশ্যগত পরিবর্তন বিশ্লেষণ

ভূমিকা

১৯৩৭ সালে ব্রিটিশের তৎকালীন ৬ষ্ঠ রাজা মেঘনা নদীর উপর "King gorge Bridge'' নামে রেলসেতু নির্মান করেন। ঢাকা-চট্টগ্রামের সঙ্গে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় আশুগঞ্জ উপজেলার গুরুত্ব অনেক অংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানি সরকারের আর্থিক সহায়তায় আশুগঞ্জ বিদুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। জার্মানির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স বিবিসি, মেসার্স ব্যাবকক এন্ড উইলকক্স আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন এবং জার্মানির মেসার্স ফিশেনার কোম্পানি উপদেষ্টা হিসাবে নির্মাণ কাজ তদারকি করেন। ১৯৬৮ সালে শুরু হয়ে ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দু'টি ইউনিট চালু হয়। আশুগঞ্জ বানিজ্যিক নগরী হিসাবে গড়ে উঠা ও বর্তমানে এলাকাটির অধিক সংখ্যাক অধিবাসী বিদ্যুৎ ও গ্যাস ক্ষেত্রের কাজ করার পেছনে বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আশুগঞ্জে ১০টি বিদুৎ ইউনিট চালু রয়েছে। আশুগঞ্জ–ভৈরব রেলসেতুর সন্নিকটে এবং আশুগঞ্জ রেল স্টেশনের দক্ষিণ পাশে মেঘনার পূর্ব তীর ঘেঁষে প্রায় ৩৬ একর জমির উপর নির্মিত হয় দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ সাইলো। ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন 'আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি গঠন করা হয়। যা আশুগঞ্জ সারকারখানা নামে পরিচিত। আশুগগঞ্জের ভূ-দৃশ্যগত বড় পরিবর্তনগুলোর মধ্যে আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি, আশুগঞ্জ সারকারখানা, সাইল, মেঘনার ব্রীজ ও বর্তমানে আশুগঞ্জ আর্ন্তজাতিক নদী বন্দর হিসাবে ঘোষিত হওয়া উল্লেখযোগ্য।

৫.১ গবেষণা এলাকার মানচিত্র বিশ্লেষণ

গবেষণা এলাকাটির বিট্রিশ সময়ে তৈরি মৌজা মানচিত্র থেকে দেখা যায় যে, ১৯৩৭ সালে এলাকাটিতে শুধুমাত্র একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল রেললাইন। এই সময়ে আশুগঞ্জ ও তালশহর এই দুটি ইউনিয়নে দুটি রেল স্টেশন ছিল। এই অঞ্চলের মানুষ তখন এই রেল পথের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে চলত। সে সময়ে যোগাযোগ মাধ্যমের জন্য রেল পথের আয়তন ছিল ৭ কিলোমিটার। সে সময় সম্পূর্ণ এলাকা জুড়ে শুধু মাত্র কৃষি কাজের প্রচলন ছিল।

গবেষণা এলাকার ২০০৮ সালের মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৩৮ সালে এই অঞ্চলে যোগাযোগ মাধ্যম ছিল একটি শুধু মাত্র রেললাইন। বর্তমানে এই যোগাযোগ মাধ্যমটি পরিবর্তন হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পর অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে প্রশাসন দৃষ্টি দেয়। বর্তমানে এলাকাটির ২০০৮ সালের মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে এলাকাটিতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক বরাবর ৭ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া উপজেলাতে ৪৭ কিলোমিটার পাকা সড়ক ও ১৭০ কিলোমিটার কাঁচা সড়ক পথ রয়েছে।

১৯৫০ সালের মানচিত্র থেকে জানা যায়, সে সময়ে এলাকাটিতে বেশি ভাগ কৃষি ভিত্তিক অঞ্চল ছিল। ২০০৮ সালের মানচিত্র থেকে দেখা যায় বর্তমান প্রসাশন এলাকাটিকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করা করেছেন। এই অঞ্চলগুলো হল কৃষি অঞ্চল, কৃষি নগরায়ণ অঞ্চল, মৎস্য অহরণ অঞ্চল ও শিল্পাঞ্চল। এলাকাটির বাইকুণ্ঠাপুর, বড়তলা, জগদিশপুর, নাওঘাট, যাত্রাপুর ও তালশহর এলাকাটি হল কৃষি ভিত্তিক এলাকা। এলাকার সম্পূর্ণ আয়তন হল ১৩১২১৬২ হেক্টর। দূর্গাপুর, বাহদুরপুর ও তাজপুর ও চর চারতলা দক্ষিণ অংশ এলাকায় মৎস্য চাষ হয়, এই এলাকার আয়তন ১০০২ হেক্টর। সোনারামপুর, চরচারতলা সোহাগপুর, খড়িয়ালা, বাসুতারা, কামারুরা, ও মইসাইর এলাকা জুড়ে রয়েছে কৃষি নগরায়ণ এলাকার আয়তন ১৭৯২৭১। কৃষি নগরায়ণের মধ্যে এলাকাটির বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সারকারখানা ও সাইলোকে কেন্দ্র করে ২৭৭৯২ হেক্টর ভূমিতে সম্পূর্ণ নগর গড়ে উঠেছে। এছাড়া এলাকাটির যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এলাকাটির রেল লাইল অংশের দুই পাশে এখনও কৃষি জমি রয়েছে। এবং সড়ক পথকে কেন্দ্র করে এর দুই পাশের প্রায় বেশি ভাগ অংশ জুড়ে নগরায়ণ তৈরি হচ্ছে।

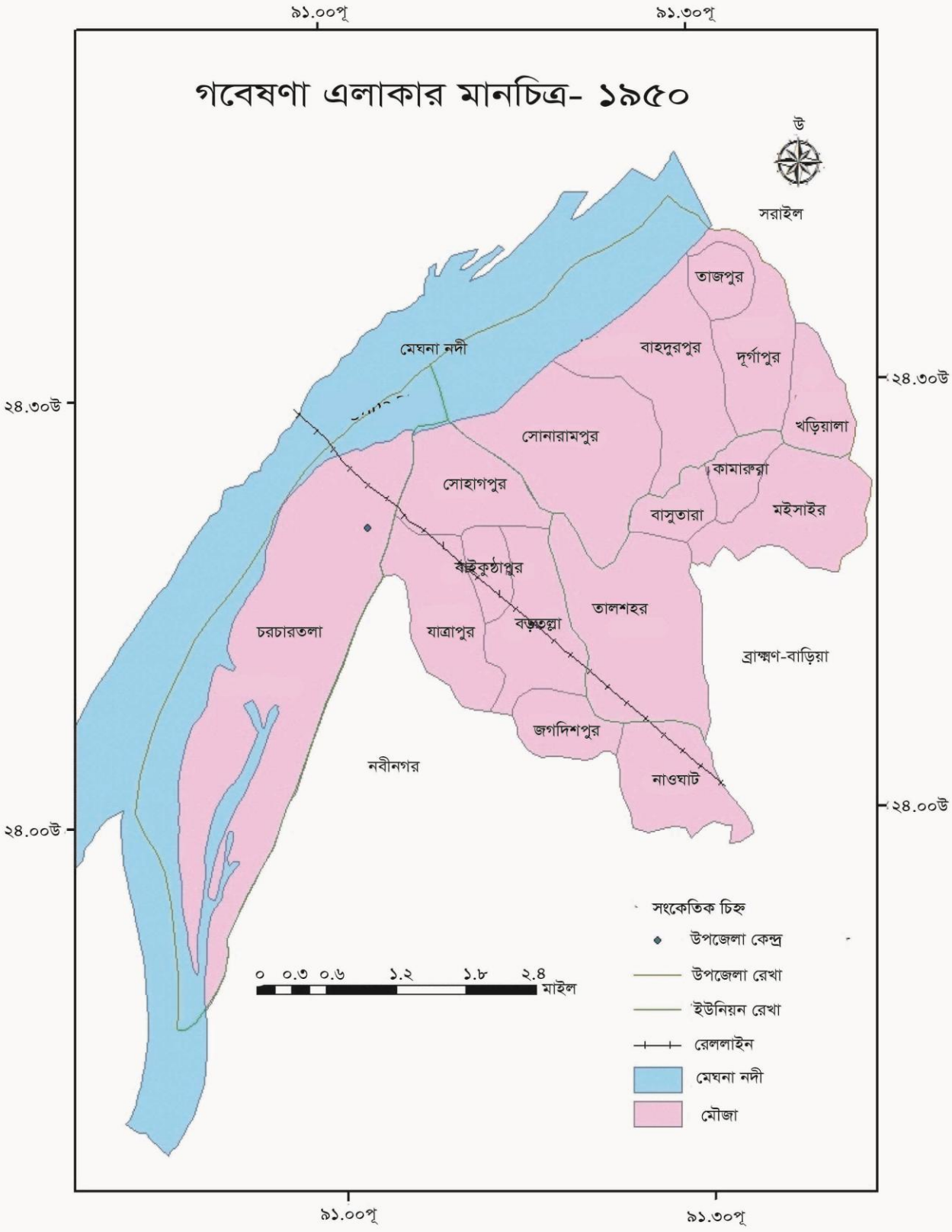

৯১.০০পূ
৯১.৩০পূ
গবেষণা এলাকার মানচিত্র- ১৯৫০
উ
সরাইল
তাজপুর
মেঘনা নদী
বাহদুরপুর
দূর্গাপুর
২৪.৩০উ
খড়িয়ালা
সোনারামপুর
কামারুল্লা
সোহাগপুর
মইসাইর
বাসুতারা
তালশহর
চরচারতলা
যাত্রাপুর
ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া
জগদিশপুর
নবীনগর
নাওঘাট
২৪.০০উ
সংকেতিক চিহ্ন
উপজেলা কেন্দ্র
০ ০.৩ ০.৬ ১.২ ১.৮ ২.৪ মাইল
উপজেলা রেখা
ইউনিয়ন রেখা
রেললাইন
মেঘনা নদী
মৌজা

৯১.০০পূ
৯১.৩০পূ
গবেষণা এলাকার মানচিত্র-২০১৪
সরাইল

মানচিত্র ৫.২ গবেষণা এলাকার মানচিত্র ২০১৪

উৎস: মূল মানচিত্র ২০০৮ আশুগঞ্জ উপজেলা ভূমি মন্ত্রালয়

৫.১.ক গবেষণা এলাকার ১৯৫০ ও ২০১৪ সালের মানচিত্র পর্যবেক্ষণ

গবেষণা কাজের জন্য ১৯৫০ সালে প্রকাশিত ষোলটি এলাকার মৌজা নকশা সংগ্রহ করা হয়। এই নকশা থেকে ১৯৫০ সালের কৃষি জমি, বসতি, জলাশয় ও গ্রামীন বনভূমি নির্ণয় করা হয়। এবং ভূ-উপগ্রহ থেকে এলাকাটির বর্তমান ভূমি ব্যবহার নির্ণয়

করা হয়। গবেষণা এলাকার ভূমি ব্যবহার জরিপে দেখা যায় যে, সেই সময়ে ৩৩৬০৮৫ হেক্টর কৃষিজমি, ২৭৯ হেক্টর বসতি, গ্রামীণ বনভূমি ৩২২ হেক্টর ও জলাশয় ছিল ৮৩৬৬২ হেক্টর। ২০১৪ সালে গবেষণা এলাকায় ২২৫০ হেক্টর কৃষি জমি, ৬৪৫৯৯ হেক্টর বসতি, গ্রামীণ বনভূমি ১০৯৩৬ হেক্টর ও জলাশয় ছিল ৩৬৫৬৫ হেক্টর ও নগর অঞ্চল দেখা যায় ১৪২৭৩৮ হেক্টর।

টেবিল ৫.১: গবেষণা এলাকার ১৯৫০ ও ২০১৪ সালের ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহারের নাম	১৯৫০ হে	২০১৪ হে
কৃষি জমি	৩৩৬০৮৫	২২৫০০৮
বসতি	২৭৯	৬৪৫৯৯
নগর	০	১৪২৭৩৮
গ্রামীন বনভূমি	৩২২	১০৯৩৬
জলাশয়	৮৩৬৬২	৩৬৫৬৫

উৎস: মৌজা মানচিত্র সেটেলমেন্ট অফিস ১৯৫০ ও ভূ-উপগ্রহ চিত্র ২০১৪

৫.১.খ গবেষণা এলাকার ১৯৫০ ও ২০১৪ সালের মানচিত্রের শতকরা ভূমিব্যবহারের পরিবর্তন বিশ্লেষণ

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলগুলো শতকরা হার নির্ণয় করে প্রতি বছর কত শতাংশ ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে তা নির্ণয় করা হয়। গবেষণা এলাকাটির ভূমি ব্যবহারের পরির্তন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকাটিতে প্রতি বছরই নগরায়ণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এলাকার ভূমি ব্যবহার জরিপে দেখা যায় যে, ১৯৫০ সালে ৭০০৪ শতাংশ কৃষিজমি, ৫৮১ শতাংশ বসতি, গ্রামীণ বনভূমি ৬৭১ শতাংশ ও ১৭৪৩ শতাংশ জলাশয় ছিল। ২০১৪ সালে গবেষণা এলাকায় ৪৬৮৯ শতাংশ কৃষিজমি, ১৩৪৬ শতাংশ বসতি, গ্রামীণ বনভূমি ২২৭ শতাংশ ও জলাশয় ছিল ৭৬২ শতাংশ ও ২৯৭৪ শতাংশ নগর অঞ্চল দেখা যায়। গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৯৫০ ও ২০১৫ সালের মধ্যে এলাকাটিতে কৃষিজমি ২৩১৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং বসতি ৭৬৫ শতাংশ নগর ২৯৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ বনভূমি ৪৪৩ শতাংশ ও জলাশয় ৯৮১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

টেবিল ৫.২: ১৯৫০ ও ২০১৫ সালের ভূমি ব্যবহারের শতকরা হার

ভূমি ব্যবহারের নাম	১৯৫০ %	২০১৫ %	হ্রাস বৃদ্ধির হার
কৃষি জমি	৭০০৪	৪৬৮৯	-২৩১৯
বসতি	৫৮১	১৩৪৬	৭৬৫
নগর	০	২৯৭৪	২৯৭৪
গ্রামীণ বনভূমি	৬৭১	২২৭৯	-৪৪৩
জলাশয়	১৭৪৩	৭৬২	-৯৮১

উৎস: মৌজা মানচিত্র সেটেলমেন্ট অফিস ১৯৫০ ও ভূ-উপগ্রহ চিত্র ২০১৪

চিত্র ৫.১: ১৯৫০ ও ২০১৫ সালের ভূমি ব্যবহারের শতকরা হার

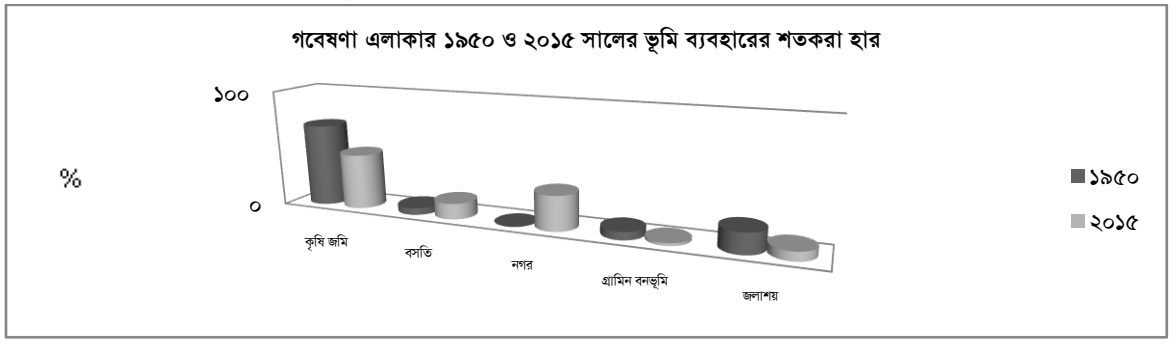

৯১.০০পূ
৯১.৩০পূ
গবেষণা এলাকার মানচিত্র-২০১৪
সরাইল
তাজপুর
দুর্গাপুর
বাহাদুরপুর
মেঘনা নদী
২৪.৩০উ
২৪.৩০উ
খড়িয়ালা

মানচিত্র ৫.৫: গবেষণা এলাকার মানচিত্র ২০১৪
উৎস: ভূ-উপগ্রহ চিত্র ২০১৪

৫.২ ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ

ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করার জন্য LGRD থেকে আশুগঞ্জ উপজেলার মানচিত্র ও USGS GLOVIS Land set থেকে নির্দিষ্ট এলাকার মানচিত্রের পাত সংগ্রহ করা হয়। USGS GLOVIS Land set থেকে সংগ্রহ করা মানচিত্র গুলো ERDS IMAGINE এর মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। LGRD থেকে সংগ্রহ করা আশুগঞ্জ উপজেলার মানচিত্র থেকে Arc GIS এর মাধ্যমে গবেষণা এলাকা চিহ্নিত করা। গবেষণা এলাকায় মোট ৪৮৭৩ হেক্টর এলাকার পরিমাপ করা হয়। এই পরিমাপ থেকে বিভিন্ন সালে কতটুকু জমি কি কাজে ব্যবহার করা হয় তা নির্ণয় করা হয়েছে।

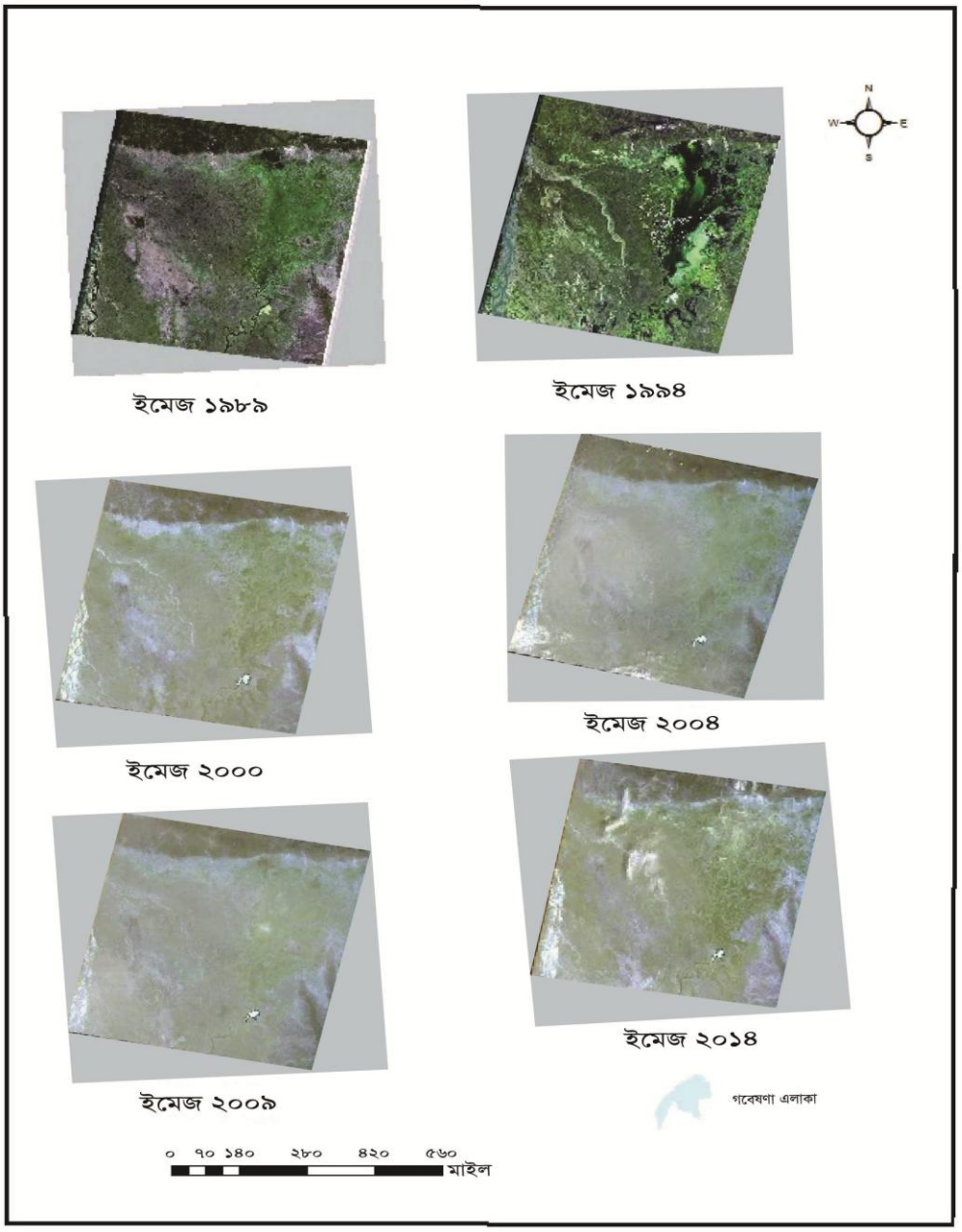

চিত্র ৫.৫: গবেষণা এলাকার ইডাজ ইমেজিং প্রক্রিয়া।

উৎস: ইডাজ ইমেজ (১৯৮৯-২০১৪) প্রক্রিয়া

এই ইমেজ থেকে আর্ন্তজাতিক ভূগোল সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত রং অনুসারে এলাকা চিহ্নিত করে সে রং অনুসারে বিন্যাস করা হয়েছে। এখানে বসতি ভূমি গাঢ় লাল, বসতি সংলগ্ন অনাবাদি ভূমি হালকা লাল, উদ্যান কৃষি গাঢ় বেগুনী, বৃক্ষ ও অন্যান্য স্থায়ী ফসল হালকা বেগুনী, শস্য ভূমি গাঢ় বাদামী, উন্নত স্থায়ী চারণ ভূমি হালকা সবুজ, বনভূমি গাঢ় সবুজ, জলাশয় নীল, উৎপাদন বিহীন ভূমি ধূসর। খোলা প্রান্তর সাদা এই রং অনুসারে সম্পূর্ণ এলাকাটি ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগ থেকে জলাশয়, কৃষি জমি, খোলা প্রান্তর, নগরায়ণ বসতি ও গ্রামীণ বন ভূমি পরিমাপ করা হয়। এই পরিমাপকৃত অংশ থেকে বিভিন্ন সালে কতটুকু হ্রাস পেয়েছে তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

টেবিল ৫.৩: ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ এলাকার পরিমাপ হেক্টরে (১৯৮৯-২০১৪)

নাম	১৯৮৯	১৯৯৪	২০০০	২০০৪	২০০৯	২০১৪

অশ্রেণীকৃত	৬৬৩৩	৬৫০৭	৩৩১২	৩২৮	৩২৬৯	৩২৭৬
নগরায়ণ	৪৩৪৬১	৫৭৩৩৫	৮৬৩৮৩	১০৯০৯৬	১২১৬৮৯	১৪২৭৩৮
কৃষি	৩০২৬২৭	২৬৭৯৮৪	২৮১৮৩১৫	২৭৪৬৯৫	২৫৭৮০৪	২২৫০০৮
জলাশয়	৮০৬২২	৭৫২৯৮	৫৫৮২২	৪৬০	৪০০	৩৬৫৬৫
খোলা প্রান্তর	২৭০	৩৮৭০৮	২৯৪১৫	২৯৮১২	৪৯৪৩২	৬৪৫৯৯
গ্রামীণ বনায়ন	২৭২	৪১৫৪৪	২৬৯৫৫	১৯২০১	১০৮৯৯	১০৯৩৬

উৎস:ইডাজ ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

৫.২.১ ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন বিশ্লেষণ (শতকরা)

গবেষণা থেকে প্রাপ্তফল গুলো শতকরা হার নির্ণয় করে। প্রতি বছর কত শতাংশ ভূমি কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে তা নির্ণয় করা হয়। গবেষণা এলাকাটির ভূমি ব্যবহারের পরির্তন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় গবেষণা এলাকাটিতে প্রতি বছরই নগরায়ণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মাত্রা বৃদ্ধির হার ১৯৮৯ সালে ছিল ২৭৫ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় ১৯৯৪ সালের পর থেকে এর মূল কারণ মেঘনার ব্রীজ তৈরি। ১৯৮৯ সালের পূর্বে এলাকাটিতে চলাচলের মাধ্যম ছিল ফেরি, ফেরির মাধ্যমে এই এলাকার মানুষ রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। কিন্তু মেঘনার ব্রীজ চালু হবার পর এই স্থানের সঙ্গে অন্য স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সহজ হয়। ফলে নগরায়ণ বৃদ্ধির হার বেশি ছিল। এই বৃদ্ধির হার মধ্যবর্তি সময়ে একটু কম হয় ২০০৯ সালের পর আবার বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এখন গবেষণা এলাকাটির আশুগঞ্জে আন্তর্জাতিক নৌ বন্দর তৈরি করা হচ্ছে ও দ্বিতীয় রেল সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। যে জন্য এলাকাটির নগরায়ণের মাত্রা আরো দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাবে। গবেষণা সারণি ৫.২.১ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, নগরায়ণ যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক একই হারে কৃষি জমি, জলাশয়, গ্রামীণ বনায়নের শতকরা হার কমচ্ছে। কৃষি জমি প্রতি বছরই ১ শতাংশ করে কমছে। কিন্তু দেখা যায় যে, ২০০৪ সালের পর থেকে এই হ্রাসের পরিমাণ বেশি হয়েছে। ২০০৯ সালে ৩ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে এই হার ৯ শতাংশ হ্রাস হতে দেখা যায়। জলাশয়ের পরিমাণ একই নিয়মে কমে যাচ্ছে। এই গবেষণা পরিসংখ্যানে ৫.৪ নং টেবিলে দেখা যায় যে, প্রতি বছরই ১ শতাংশ করে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন হয়েছে।

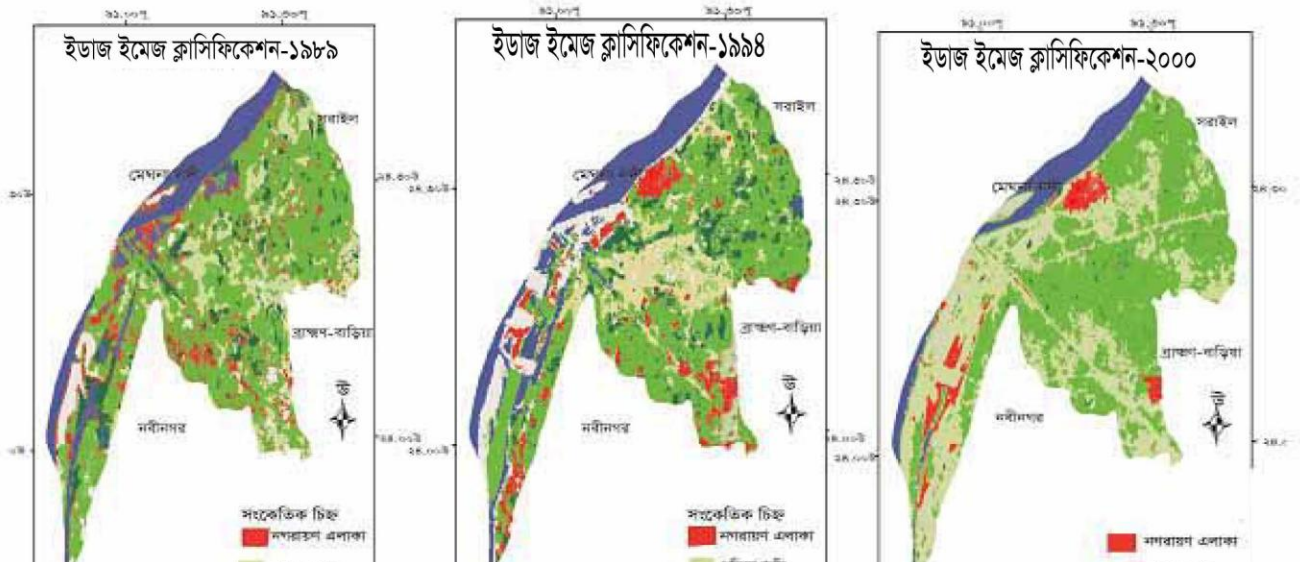

চিত্র ৫.৬: গবেষণা এলাকার বিভিন্ন সালের ইডাজ ইমেজ ক্লাসিফিকেশন ১৯৮৯-২০১৪

উৎস: ইডাজ ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

টেবিল ৫.৪: ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের শতকরা হার বিশ্লেষণ

নাম	১৯৮৯	১৯৯৪	২০০০	২০০৪	২০০৯	২০১৪	১৯৯৪-১৯৮৯	২০০০-১৯৯৪	২০০৪-২০০০	২০০৯-২০০৪	২০১৪-২০০৯
নগর ও বসতি	৮৯১	১১৬৬	১৭৮৫	২২৬৩	২৫১৮	২৯.৫৪	২৭৫	৬১৯	৪৭৮	২৫৫	৪৩৬
কৃষি	৬২০৭	৫৫৮৯	৫৮২৬	৫৬৯৮	৫৩৩৬	৪৬.৫৭	-২১৮	২.৩৭	-১২৮	-৩৬২	-৮৭৯
জলাশয়	১৬১৭	১৫১৩	১১৫৪	৯৫৪	৮২৭	৭.৫৬	-১০৪	-৩৫৯	-১৯৯	-১২৭	-০৭২
খোলা প্রান্তর	৫৫৩	৭৭৮	৬০৮	৬১৮	১০২৩	১৩.৭৭	২২৫	-১৭	০১	৪০৫	৩৫৪
বনায়ণ	৫৫৭	৮৩৫	৫৫৭	৩৯৮	২২৫	২.২৬	২৭৮	-২৭৮	-১৫৯	-১৭৩	০০১

উৎস: ইডাজ ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

চিত্র ৫.২: গবেষণা এলাকার বিভিন্ন সালের ভূমি ব্যবহারের হ্রাস বৃদ্ধি মূল্যায়ন (শতকরা হার)

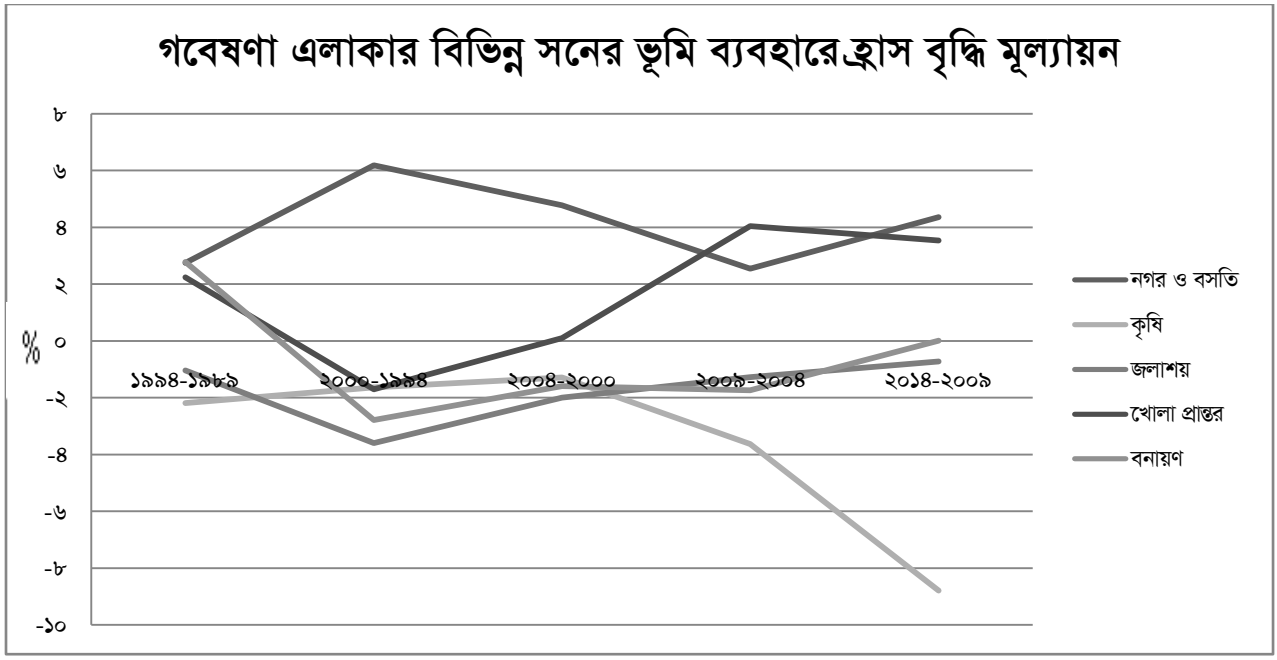

উৎস: ইডাজ ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

৫.২.২ গবেষণা এলাকাটির ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ

গবেষণা এলাকাটির ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ১৯৮৯, ১৯৯৪, ২০০০, ২০০৪, ২০০৯ ও ২০১৪ সালের ইমেজ সংগ্রহ করা হয়। এই সকল মানচিত্র গুলো বিশ্লেষণ করে এখান থেকে গবেষণা এলাকার বসতি ও নগরায়ণ, কৃষি জমি, নদী, খোলা স্থান, ও বসতি সংলগ্ন বনভূমিকে পৃথক করা হয়েছে। গবেষণা সারণি ৫.২.২ থেকে দেখা যায় যে এলাকাটিতে ১৯৮৯ সালে যে রূপ ভূমি ব্যবহার ছিল সে রূপ ভূমি ব্যবহার বর্তমান সময়ে নেই। এলাকাটিতে ১৯৮৯ সালে ৮৯১ শতাংশ নগর ও বসতি ছিল । ২০১৪ সালে এসে দেখা যায় যে এই অঞ্চললের ২৯৫৪ শতাংশ নগরায়ণ ও বসতির আওতায় রয়েছে।

চিত্র ৫.২: ভূ-উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণ (১৯৮৯-২০১৪)

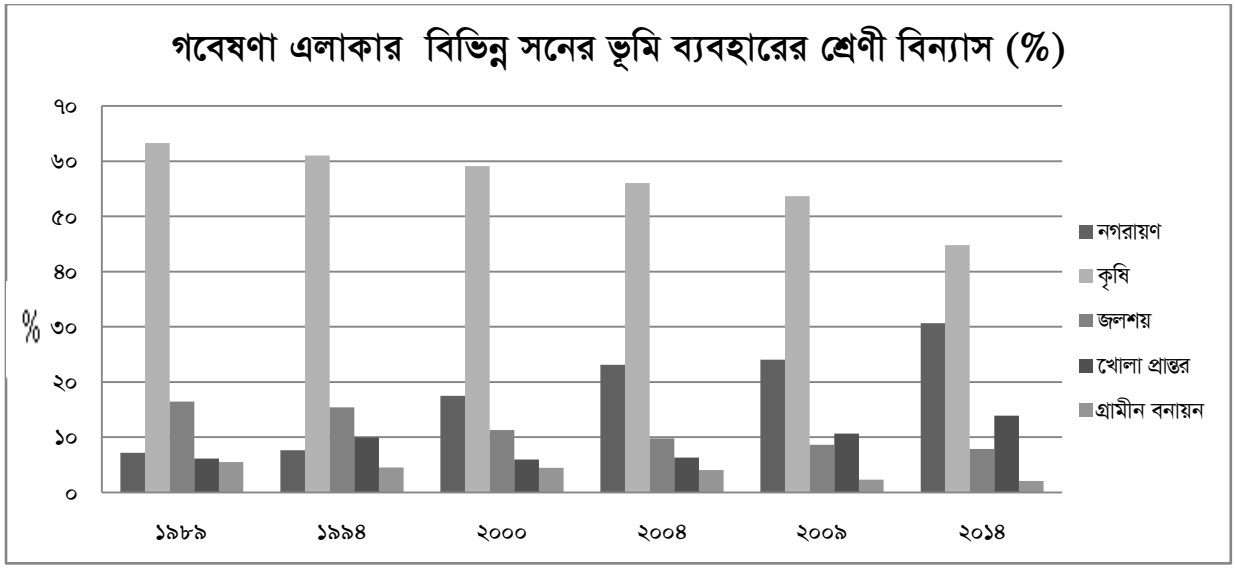

উৎস: ইডাজ ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

একই ভাবে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সালে ৬২.০৭ শতাংশ ভূমি কৃষিজমির অধিনে ছিল। ২০১৪ সালে কৃষিজমির অধিনে রয়েছে ৪৪.৫৭ শতাংশ ভূমি। ১৯৮৯ সালে ১৬.১৭ শতাংশ জলাশয় ছিল, ২০১৪ সালে জলাশয় রয়েছে ৭.৬৭ শতাংশ। খোলা ভূমি ১৯৮৯ সালে ছিল ৫.৫৩ শতাংশ। বর্তমানে ২০১৪ সালে খোলা ভূমি রয়েছে ১৩.৭৭ শতাংশ। ১৯৯৮ সালে গ্রামীণ বনভূমি ছিল ৫.৫৭ শতাংশ। ২০১৪ সালের ইমেজ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গ্রামীণ ভূমি রয়েছে ২.২৬ শতাংশ। এই গ্রাফচিত্রটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটিতে বিপুল পরিমাণে ভূমির পরিবর্তন হয়েছে। যে পরিবর্তনটি এলাকাটির জীববৈচিত্র্য হ্রাসের মূল কারণ বলা যায়।

৫.২.৩ গবেষণা এলাকার ১৯৮৯ ও ২০১৪ সালের ভূ-উপগ্রহ মানচিত্র বিশ্লেষণ

Landsat TM image এর মাধ্যমে ১৯৮৯ ও ২৯১৪ সালের ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় এলাকাটিতে ভূ-দৃশ্যের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৮৯ সালে গবেষণা এলাকাটিতে নগরের পরিমাণ ছিল ৮.৯১ শতাংশ। ২০১৪ সালে এসে দেখা যায় নগরের পরিমাণ হয়েছে ২৯.৫৪ শতাংশ। বিগত ২৫ বছরে গবেষণা এলাকাটির নগরায়ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.৬৩ শতাংশ । গবেষণা এলাকাটিতে ১৯৮৯ সালে কৃষি জমির পরিমাণ ছিল ৬২.০৭ শতাংশ। ২০১৪ সালে কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে বর্তমানে কৃষিজমি রয়েছে ৪৬.৫৭ শতাংশ। বিগত ২৫ বছরে কৃষিজমি হ্রাস পেয়েছে ১৫.৫০ শতাংশ। গবেষণা এলাকাটিতে ১৯৮৯ সালে জলাশয়ের পরিমাণ ছিল ১৬.১৭ শতাংশ। ২০১৪ সালে জলাশয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে বর্তমানে জলাশয় রয়েছে ৭.৫৬ শতাংশ। বিগত ২৫ বছরে জলাশয় হ্রাস পেয়েছে ৮.৬১ শতাংশ। গবেষণা এলাকাটিতে ১৯৮৯ সালে খোলা প্রান্তর পরিমাণ ছিল ৫.৫৩ শতাংশ। ২০১৪ সালে খোলা প্রান্তর বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে খোলা প্রান্তর রয়েছে ১৩.৭৭ শতাংশ। বিগত ২৫ বছরে খোলা প্রান্তর বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.২৪ শতাংশ। গবেষণা এলাকাটিতে ১৯৮৯ সালে বনভূমির পরিমাণ ছিল ৫.৫৭ শতাংশ। ২০১৪ সালে বনভূমি হ্রাস পেয়ে বর্তমানে বনভূমির পরিমাণ রয়েছে ২.২৬ শতাংশ। বিগত ২৫ বছরে বনভূমি হ্রাস পেয়েছে ৩.৩১ শতাংশ। এলাকাটিতে নগরায়ণ বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত নগরায়ণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.৬৩ শতাংশ ও কৃষি জমি হ্রাস পেয়েছে ১৫.৬০ শতাংশ। এলাকাটির ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত নগরায়ণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.৬৩ শতাংশ ও বনভূমি হ্রাস পেয়েছে ৩.৩১ শতাংশ। এলাকাটির ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত নগরায়ণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.৬৩ শতাংশ ও জলাশয় হ্রাস পেয়েছে ৮.৬১ শতাংশ। এলাকাটির ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত জলাশয় হ্রাস পেয়েছে ৮.৬১ শতাংশ ও কৃষি জমি হ্রাস পেয়েছে

মানচিত্র ৫.৭: গবেষণা এলাকার ১৯৮৯ ও ২০১৪ সনের ভূ-উপগ্রহ মানচিত্র বিশ্লেষণ

উৎস: ইডাজ ইমেজ ক্লাসিফিকেশন ১৯৮৯-২০১৪

৫.২.৪ নগরায়ণ বসতি এলাকা ও কৃষি জমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ

সারণি ৫.২ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, যেখানে ১৯৮৯ সালে নগরায়ণ বসতি ছিল ৮.৯১ শতাংশ ও কৃষি জমির পরিমাণ ছিল ৬২.০৭ শতাংশ। এর পর থেকে ১৯৯৪ সালে ১১.৬৬ শতাংশ, ২০০০ সালে ১৭.৮৫ শতাংশ, ২০০৪ সালে ২২.৬৩ শতাংশ, ২০০৯ সালে ২৫.১৮ শতাংশ , ২০১৫ সালে ২৯.৫৪ শতাংশ নগর ও বসতি ছিল। প্রতি বছরই নগর ও বসতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অন্যদিকে একইভাবে কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে ১৯৮৯ সালে ছিল ৬২.০৭ শতাংশ, ১৯৯৪ সালে ৫৫.৮৯ শতাংশ, ২০০০ সালে ৫৮.২৬ শতাংশ, ২০০৪ সালে ৫৬.৯৮ শতাংশ, ২০০৯ সালে ৫৩.৩৬ শতাংশ ও অবশেষে ২০১৪ সালে ৪৪.৫৭

শতাংশ কৃষি জমি পরিলক্ষিত হয়। এই তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, নগর ও বসতি ১৯৯৪-১৯৮৯ সালে ২.৭৫ শতাংশ, ২০০০-১৯৯৪ সালে ৬.১৯ শতাংশ, ২০০৪-২০০০ সালে ৪.৭৮ শতাংশ, ২০০৯-২০০৪ সালে ২.৫৫ শতাংশ ও ২০১৪-২০০৯ সালে ৪.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষিজমির পরিমাণ ১৯৯৪-১৯৮৯ সালে ২.১৮ শতাংশ, ২০০৪-২০০০ সালে ১.২৮ শতাংশ, ২০০৯-২০০৪ সালে ৩.৬২ শতাংশ ও ২০১৪-২০০৯ সালে ৮.৭৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া ২০০০-১৯৯৪ সালে ২.৩৯ শতাংশ কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় কিন্তু পরবর্তিতে এই পরিমাণ আবারও হ্রাস পেতে শুরু করে।

চিত্র ৫.৩: নগরায়ণ এলাকা ও কৃষি জমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ

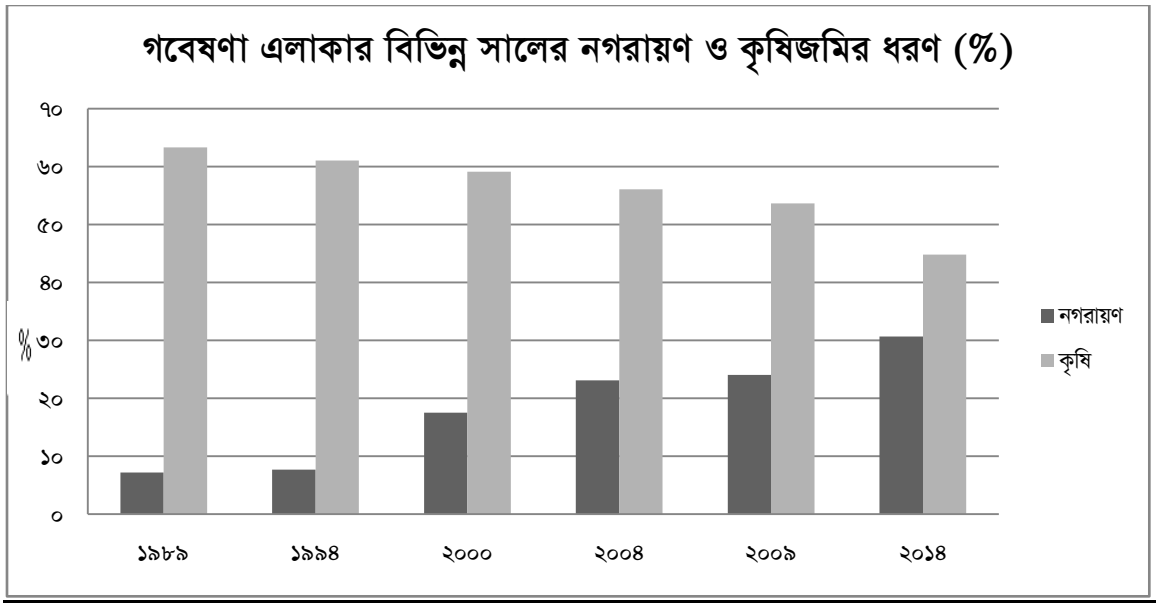

উৎস: ইডাজ ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

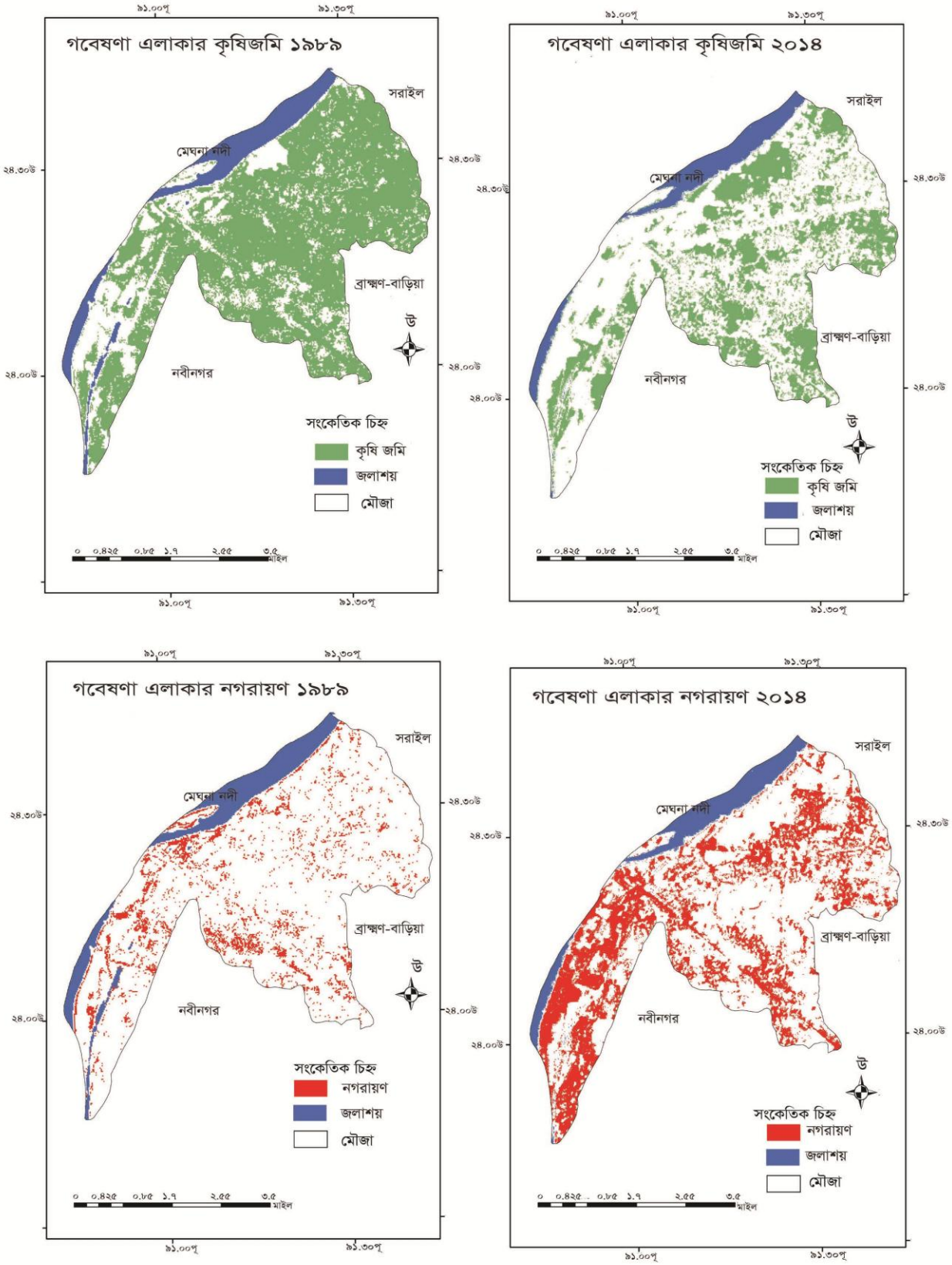

মানচিত্র ৫.৮: গবেষণা এলাকার ১৯৮৯ ও ২০১৪ সালের কৃষিভূমি ও নগরায়ণের ব্যবহার
উৎস: ইডাজ ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

৫.২.৪ নগরায়ণ এলাকা ও গ্রামীণ বনায়ন সম্পর্ক বিশ্লেষণ

টেবিল ৫.২ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, যেখানে ১৯৮৯ সালে নগরায়ণ বসতির ছিল ৮.৯১ শতাংশ ও গ্রামীণ বনায়নের পরিমাণ ছিল ৫.৫৭ শতাংশ। এর পর থেকে ১৯৯৪ সালে ১১.৬৬ শতাংশ, ২০০০ সালে ১৭.৮৫ শতাংশ, ২০০৪ সালে ২২.৬৩ শতাংশ, ২০০৯ সালে ২৫.১৮ শতাংশ, ২০১৫ সালে ২৯.৫৪ শতাংশ নগর ও বসতি ছিল। তথ্য বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় প্রতি বছরই নগর ও বসতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অন্যদিকে একইভাবে গ্রামীণ বনায়নের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮৯ সালে ছিল ৫.৫৭ শতাংশ, ১৯৯৪ সালে ৮.৩৫ শতাংশ, ২০০০ সালে ৫.৫৭ শতাংশ, ২০০৪ সালে ৩.৯৮ শতাংশ, ২০০৯ সালে ২.২৫ শতাংশ ও অবশেষে ২০১৪ সালে ২.৭৮ শতাংশ গ্রামীণ বনায়ন পরিলক্ষিত হয়। এই তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, নগর ও বসতি ১৯৯৪-১৯৮৯ সালে ২.৭৫ শতাংশ, ২০০০-১৯৯৪ সালে ৬.১৯ শতাংশ, ২০০৪-২০০০ সালে ৪.৭৮ শতাংশ, ২০০৯-২০০৪ সালে ২.৫৫ শতাংশ ও ২০১৪-২০০৯ সালে ৪.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গ্রামীণ বনায়নের পরিমাণ ২০০০-১৯৯৪ সালে ২.৭৮ শতাংশ, ২০০৪-২০০০ সালে ১.৫৯ শতাংশ, ২০০৯-২০০৪ সালে ১.৭৩ শতাংশ ও ২০১৪-২০০৯ সালে ০.০১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া ১৯৯৪-১৯৮৯ সালে ২.৭৮ শতাংশ গ্রামীণ বনায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় কিন্তু পরবর্তিতে এই পরিমাণ আবারও হ্রাস পেতে শুরু করে। ভূ-চিত্র গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, এলাকাটিতে নগরায়ণ এর সঙ্গে গ্রামীণ বনায়ন হ্রাসের সম্পর্ক রয়েছে। নগরায়ণ বসতি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এলাকাটির গ্রামীণ বনায়নের পরিমান হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র ৫.৪: গবেষণা এলাকার নগরায়ণ ও গ্রামীন বনভূমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ

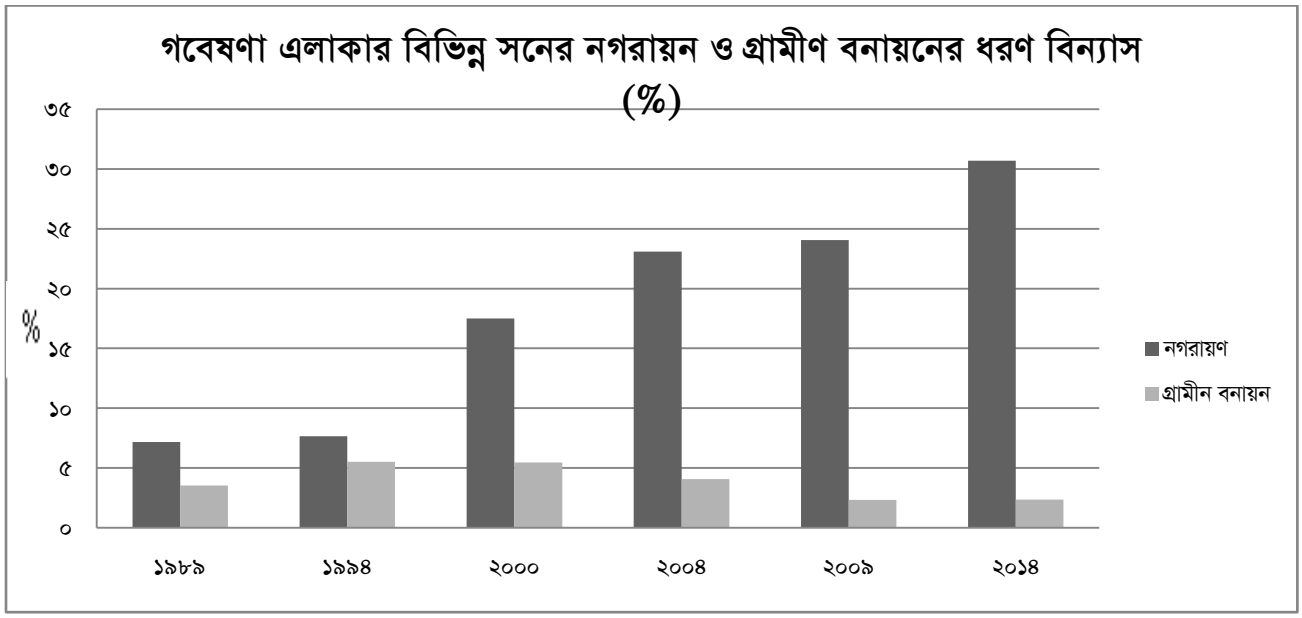

উৎস: ইডাজ ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

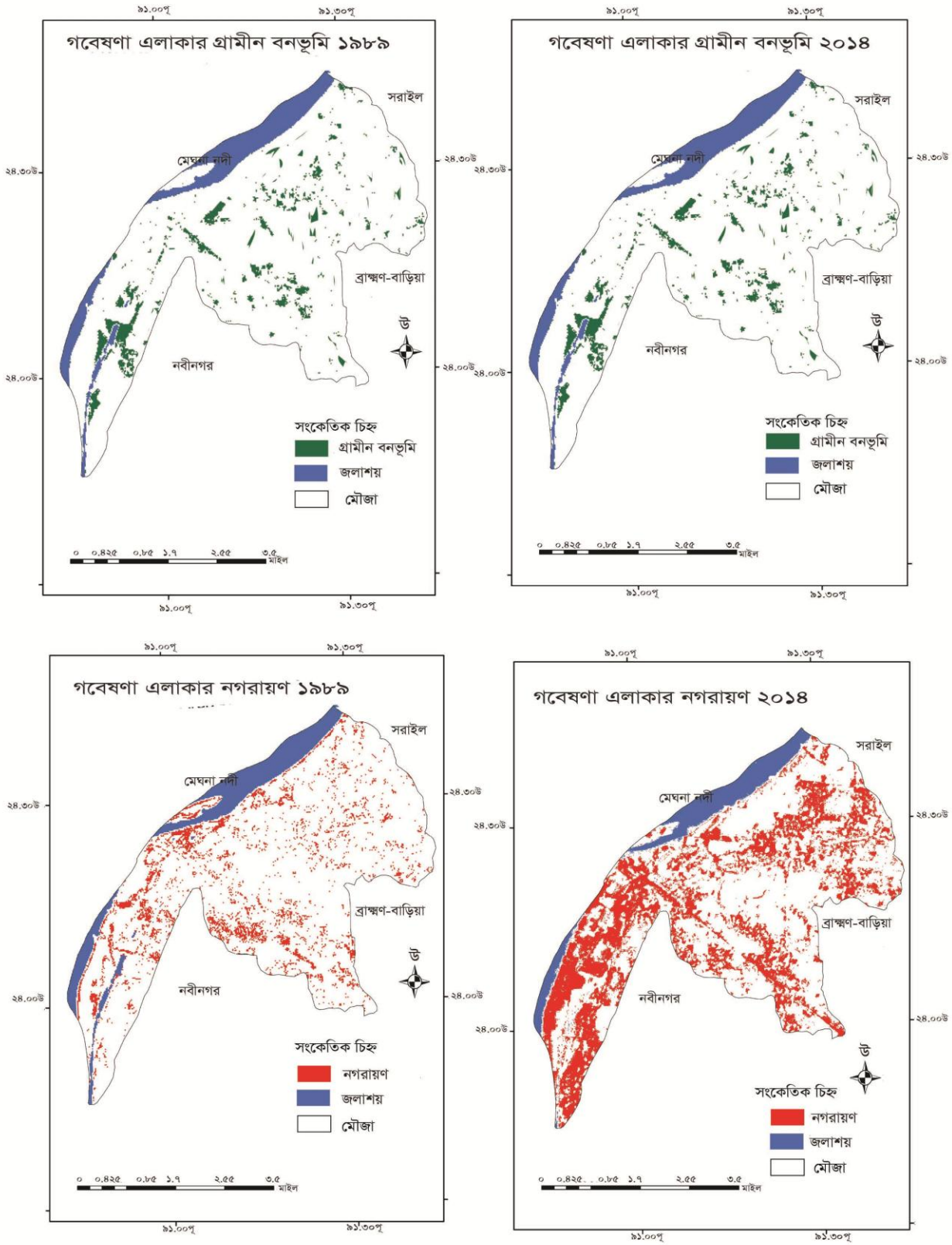

৫.৯ মানচিত্র: গবেষণা এলাকার ১৯৮৯ ও ২০১৪ সালের নগরায়ণ ও গ্রামীণ বনায়ন ভূমি ব্যবহার
উৎস: ইডাজ ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

৫.২. ৫ নগরায়ণ এলাকা ও জলাশয় সম্পর্ক বিশ্লেষণ

ভূচিত্র থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে পাওয়া গবেষণা টেবিল ৫.২ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে যেখানে ১৯৮৯ সালে নগরায়ণ বসতীর পরিমাণ ছিল ৮.৯১ শতাংশ ও জলাশয়ের পরিমাণ ছিল ১৬.১৭ শতাংশ। এর পর থেকে ১৯৯৪ সালে ১১.৬৬ শতাংশ, ২০০০ সালে ১৭.৮৫ শতাংশ, ২০০৪ সালে ২২.৬৩ শতাংশ, ২০০৯ সালে ২৫.১৮ শতাংশ, ২০১৫ সালে ২৯.৫৪ শতাংশ নগর ও বসতি ছিল। তথ্য বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় প্রতি বছরই নগর ও বসতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অন্যদিকে একইভাবে জলাশয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮৯ সালে ছিল ১৬.১৭ শতাংশ, ১৯৯৪ সালে ১৫.১৩ শতাংশ, ২০০০ সালে ১১.৫৪ শতাংশ, ২০০৪ সালে ৯.৫৪ শতাংশ, ২০০৯ সালে ৮.২৭ শতাংশ ও অবশেষে ২০১৪ সালে ৭.৫৬ শতাংশ জলাশয় পরিলক্ষিত হয়। এই তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, নগর ও বসতি ১৯৯৪-১৯৮৯ সালে ২.৭৫ শতাংশ, ২০০০-১৯৯৪ সালে ৬.১৯ শতাংশ, ২০০৪-২০০০ সালে ৪.৭৮ শতাংশ, ২০০৯-২০০৪ সালে ২.৫৫ শতাংশ ও ২০১৪-২০০৯ সালে ৪.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জলাশয়ের পরিমাণ ১৯৯৪-১৯৮৯ সালে ১.০৪ শতাংশ, ২০০০-১৯৯৪ সালে ৩.৫৯ শতাংশ, ২০০৪-২০০০ সালে ১.৯৯ শতাংশ, ২০০৯-২০০৪ সালে ১.২৭ শতাংশ ও ২০১৪-২০০৯ সালে ০.৭২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ভূ-চিত্র গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, এলাকাটিতে নগরায়ণ এর সঙ্গে জলাশয় হ্রাসের সম্পর্ক রয়েছে। নগরায়ণ বসতি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এলাকাটির জলাশয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র ৫.৫: গবেষণা এলাকার নগরায়ণ ও জলাশয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ

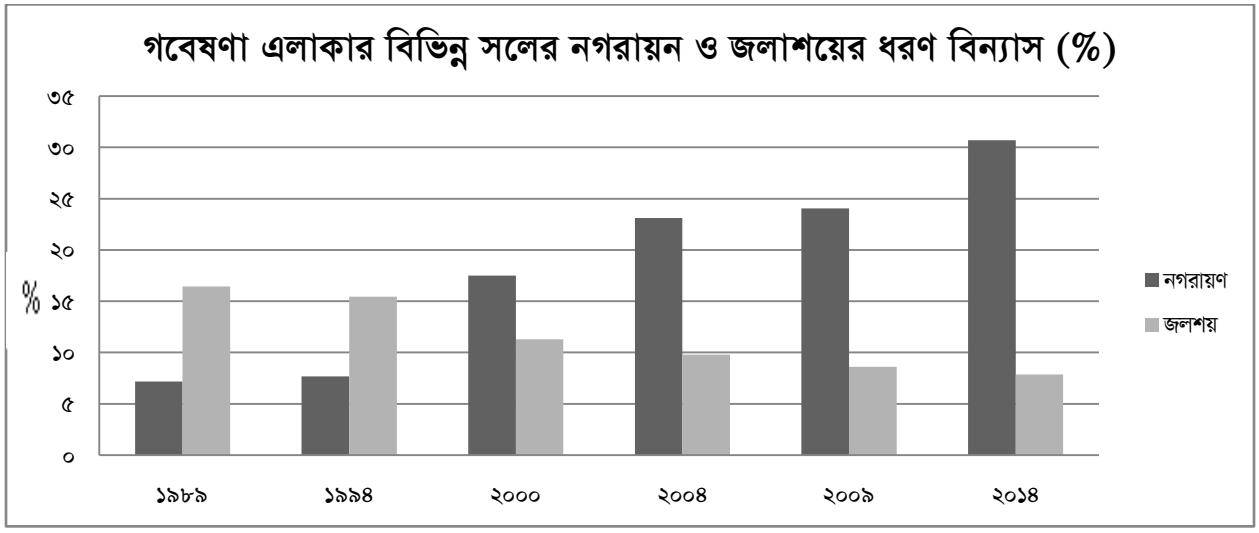

উৎস: ইডাজ ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

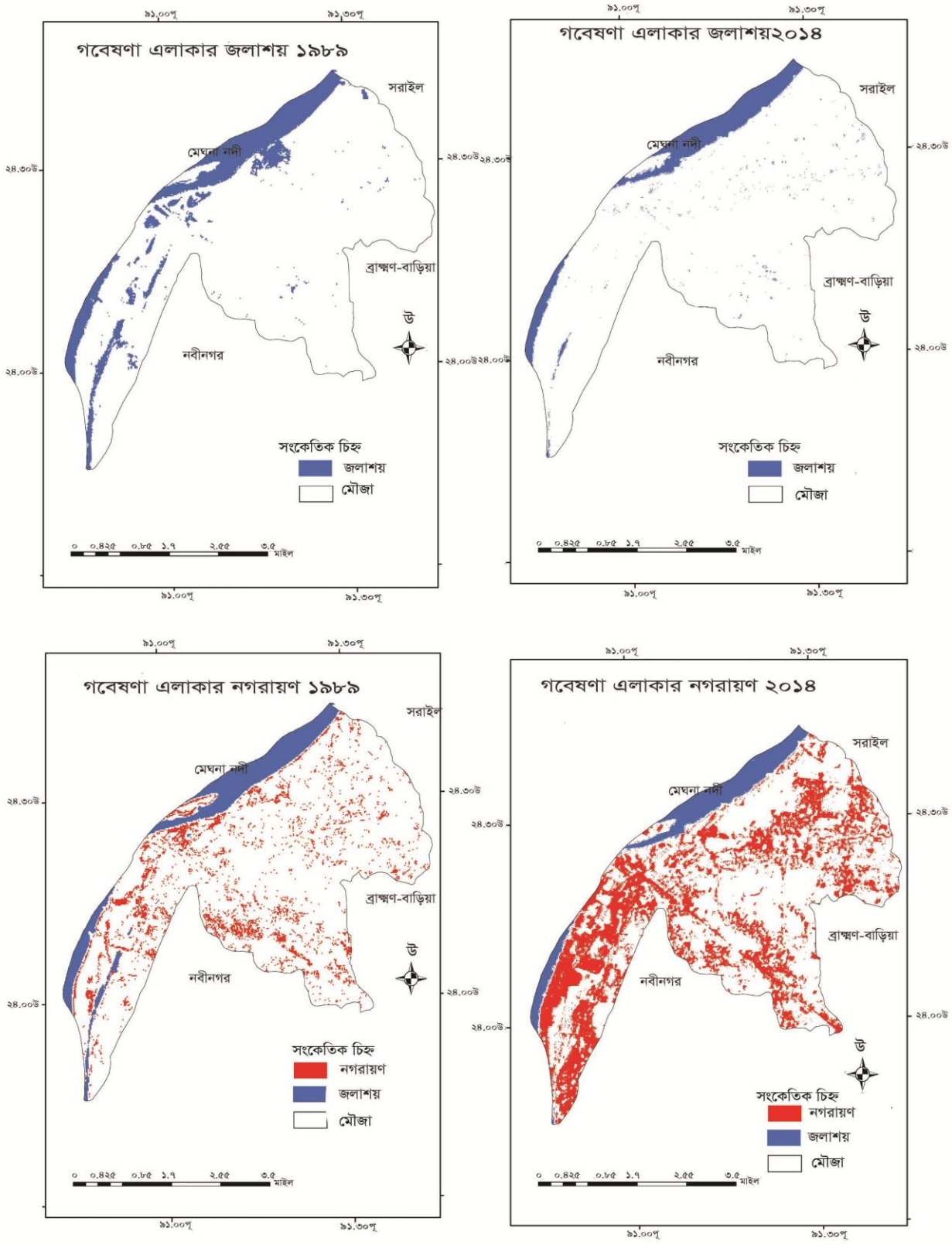

মানচিত্র ৫.১০: গবেষণা এলাকার ১৯৮৯ ও ২০১৪ সালের নগরায়ণ ও জলাশয়ের ভূমি ব্যবহার
উৎস: ইডাজ ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

৫.২.৬ কৃষি জমি ও জলাশয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ

ভূ-চিত্র থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষণা টেবিল ৫.২ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে ১৯৮৯ সালে ছিল ৬২.০৭ শতাংশ, ১৯৯৪ সালে ৫৫.৮৯ শতাংশ, ২০০০ সালে ৫৮.২৬ শতাংশ, ২০০৪ সালে ৫৬.৯৮ শতাংশ, ২০০৯ সালে ৫৩.৩৬ শতাংশ ও অবশেষে ২০১৪ সালে ৪৪.৫৭ শতাংশ কৃষি জমি পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে একইভাবে জলাশয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮৯ সালে ছিল ১৬.১৭ শতাংশ, ১৯৯৪ সালে ১৫.১৩ শতাংশ, ২০০০ সালে ১১.৫৪ শতাংশ, ২০০৪ সালে ৯.৫৪ শতাংশ, ২০০৯ সালে ৮.২৭ শতাংশ ও অবশেষে ২০১৪ সালে ৭.৫৬ শতাংশ জলাশয় পরিলক্ষিত হয়। কৃষিজমির পরিমাণ ১৯৯৪-১৯৮৯ সালে ২.১৮ শতাংশ, ২০০৪-২০০০ সালে ১.২৮ শতাংশ, ২০০৯-২০০৪ সালে ৩.৬২ শতাংশ ও ২০১৪-২০০৯ সালে ৮.৭৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া ২০০০-১৯৯৪ সালে ২.৩৯ শতাংশ কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় কিন্তু পরবর্তিতে এই পরিমাণ আবারও হ্রাস পেতে শুরু করে। অন্য দিকে দেখা যায়, জলাশয়ের পরিমাণ ১৯৯৪-১৯৮৯ সালে ১.০৪ শতাংশ, ২০০০-১৯৯৪ সালে ৩.৫৯ শতাংশ, ২০০৪-২০০০ সালে ১.৯৯ শতাংশ, ২০০৯-২০০৪ সালে ১.২৭ শতাংশ ও ২০১৪-২০০৯ সালে ০.৭২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ভূ-চিত্র গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, এলাকাটিতে কৃষিজমির সঙ্গে জলাশয় হ্রাসের সম্পর্ক রয়েছে। জলাশয়ের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ফলে এলাকাটির কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র ৫.৬: গবেষণা এলাকার কৃষি ও জলাশয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ

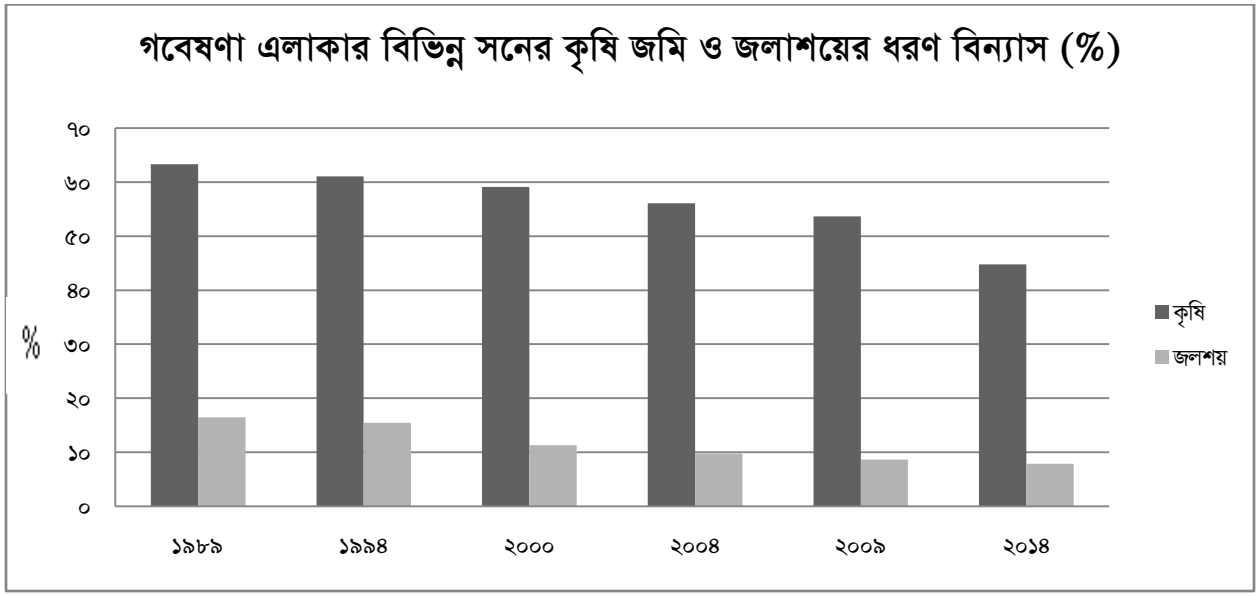

উৎস: ইডাজ ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

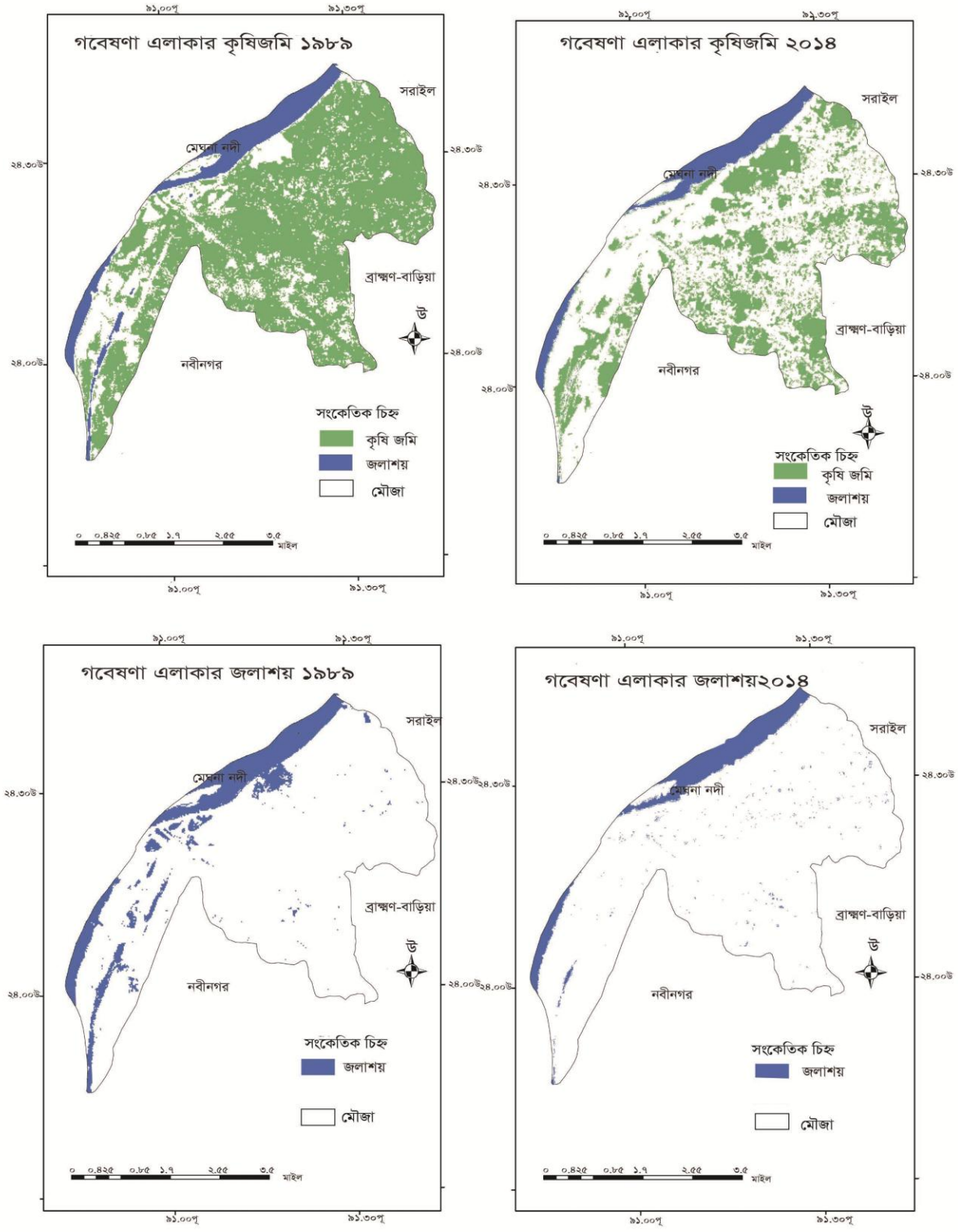

মানচিত্র ৫.১১: গবেষণা এলাকার ১৯৮৯ ও ২০১৪ সালের কৃষি জমি ও জলাশয়ের ভূমি ব্যবহার
উৎস: ইডাজ ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

৫.২.৭ কৃষি জমি পতিত ও খোলা জমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ

ভূ-চিত্র গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, এলাকাটিতে পতিত জমির পরিমাণ বেশি ছিল ১৯৮৯ সালে পতিত জমির পরিমাণ ছিল ১৪.৯৮ শতাংশ। ২০১৪ সালে এসে দেখা যায় যে, পতিত জমির পরিমাণ ২৬.৭৩ শতাংশ। এ থেকে বলা যায় যে, পতিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য দিকে দেখা যায় যে, একই রূপে কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮৯ সালে কৃষি জমির পরিমাণ ছিল ৫০.৫ শতাংশ, ২০১৪ সালে এসে দাড়িয়েছে ২৩.০৩ শতাংশে। অপর দিকে খোলা ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীতে চর জেগেছে। বালু চরে তেমন কোন ফসল উৎপাদন হয় না। তা ছাড়া এলাকাটিতে অনেক চাতাল রয়েছে। এই গুলো খোলা জমির অন্তভূক্ত। খোলা জমির পরিমাণ ছিল ১৯৮৯ সালে ৬.১৭ শতাংশ যা ২০১৪ সালে এসে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩.৮৮ শতাংশ হয়েছে। ভূ-চিত্র থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষণা টেবিল ৫.২ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে ১৯৮৯ সালে ছিল ৬২.০৭ শতাংশ, ১৯৯৪ সালে ৫৫.৮৯ শতাংশ, ২০০০ সালে ৫৮.২৬ শতাংশ, ২০০৪ সালে ৫৬.৯৮ শতাংশ, ২০০৯ সালে ৫৩.৩৬ শতাংশ ও অবশেষে ২০১৪ সালে ৪৪.৫৭ শতাংশ কৃষি জমি পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে একইভাবে খোলা প্রান্তারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৯ সালে ছিল ৫.৫৩ শতাংশ, ১৯৯৪ সালে ৭.৭৮ শতাংশ, ২০০০ সালে ৬.০৮ শতাংশ, ২০০৪ সালে ৬.১৮ শতাংশ, ২০০৯ সালে ১০.২৩ শতাংশ ও অবশেষে ২০১৪ সালে ১৩.৭৭ শতাংশ জলাশয় পরিলক্ষিত হয়। কৃষিজমির পরিমাণ ১৯৯৪-১৯৮৯ সালে ২.১৮ শতাংশ, ২০০৪-২০০০ সালে ১.২৮ শতাংশ, ২০০৯-২০০৪ সালে ৩.৬২ শতাংশ ও ২০১৪-২০০৯ সালে ৮.৭৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া ২০০০-১৯৯৪ সালে ২.৩৯ শতাংশ কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় কিন্তু পরবর্তিতে এই পরিমাণ আবারও হ্রাস পেতে শুরু করে। অন্য দিকে দেখা যায়, খোলা প্রান্তর ১৯৯৪-১৯৮৯ সালে ২.২৫ শতাংশ, ২০০৪-২০০০ সালে ০.১ শতাংশ, ২০০৯-২০০৪ সালে ৪.০৫ শতাংশ ও ২০১৪-২০০৯ সালে ৩.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ২০০০-১৯৯৪ সালে ১.৭ শতাংশ খোলা প্রান্তর হ্রাস পেয়েছিল কিন্তু পরবর্তিতে এই পরিমাণ আবারও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ভূ-চিত্র গবেষণা থেকে দেখা যায় যে এলাকাটিতে কৃষি জমি, পতিত ও খোলা জমির মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। এখানে বলে রাখা ভাল যে, পতিত জমি হল সে জমি যে জমিতে এক মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা হয় ও অন্য মৌসুমে ফেলে রাখা হয়। তখন এটিতে কোন ফসল উৎপাদন করা যায় না।

চিত্র ৫.৭: গবেষণা এলাকার কৃষি জমি, পতিত জমি ও খোলা স্থানের বিশ্লেষণ

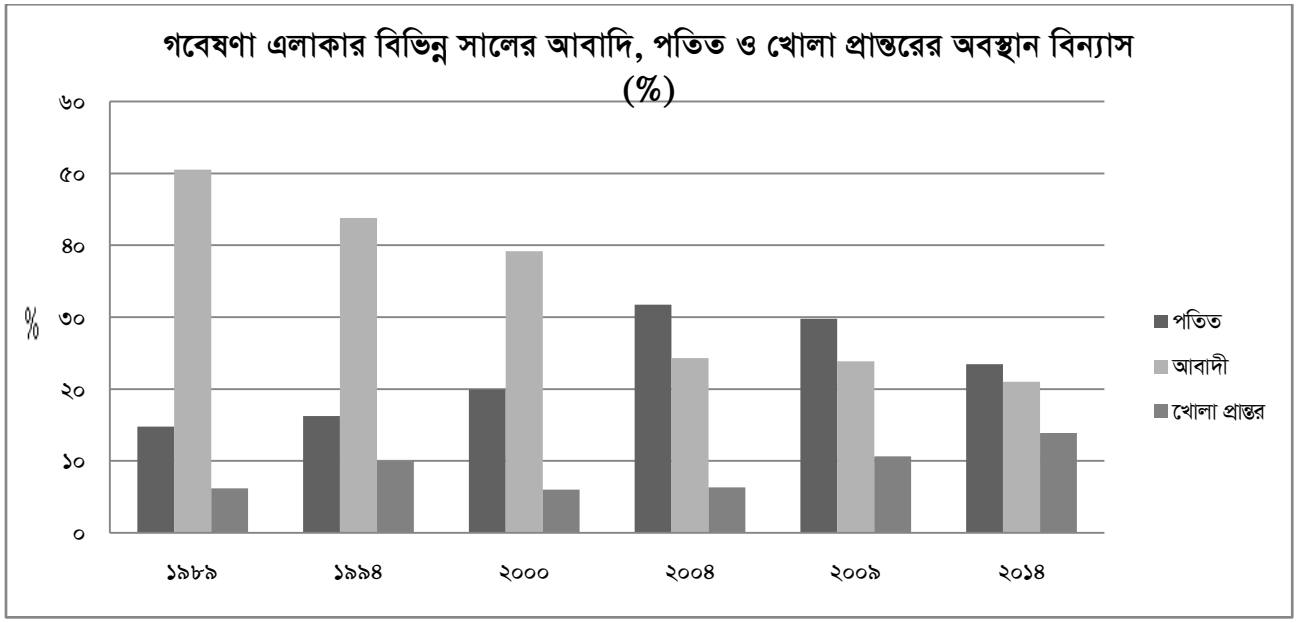

উৎস: ইডাজ ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

অধ্যায় ষষ্ঠ
গবেষণা এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু বলতে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট সময়ের বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, শিশিরপাত, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি, কুয়াশা ও আর্দ্রতা সংবলিত গড় আবহাওয়াকে বুঝায়। বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার পরিমাণ প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো উদ্ভিদ ও ফসলের ধরন নির্ধারণ করে। তাই ঋতুভেদে বিভিন্ন ফসল বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মায়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে বৃষ্টিপাত হয়। এ উপজেলার আবহাওয়া মাঝারি প্রকৃতির, শীতকালে শুষ্ক থাকে এবং বর্ষাকালে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের আর্দ্রতাও বেড়ে যায়। জলবায়ুর উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মতো এই গবেষণা এলাকাটি ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে ষড়ঋতুর মধ্যে প্রধানত: তিনটি মৌসুম জোরালোভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই সময়ে ৮৪ শতাংশ বৃষ্টি হয়। শীতকাল আরম্ভ হয় নভেম্বর মাসে এবং শেষ হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল, কখনো কখনো সামান্য বৃষ্টি হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস বইতে থাকে, যাকে 'কালবৈশাখী' বলা হয়। এ সময় কিছু শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে। গবেষণা এলাকাটিতে সুনির্দিষ্ট কোনো আবহাওয়া মনিটরিং সেল না থাকায় আশুগঞ্জ এলাকার আবহাওয়া তথ্য গবেষণা করার জন্য শ্রীমঙ্গল ও কুমিল্লা স্টেশন দুটি কেন্দ্রের আবহাওয়া তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬.১ বৃষ্টিপাত সংঘটনের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার জলবায়ুগত পরিবর্তন নিম্নে দেওয়া হল:-

শ্রীমঙ্গল ও কুমিল্লা স্টেশনের বিগত ৬৪ বছরের বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনশীলতা আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২০৩০০মি. মি। ১৯৫০-২০১৪ সাল অর্থাৎ গত ৬৪ বছরে কুমিল্লা ও শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বার্ষিক সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। ১৯৭৬ সালের জুন মাসে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে সর্বোচ্চ ১২৮৫ মি.মি. বৃষ্টিপাত ও ১৯৫৪ সালের জুন মাসে কুমিল্লা স্টেশনে সর্বোচ্চ ৯৭৯ মি. মি. বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়। নির্দিষ্টি সময়ে একটি নিদিষ্ট এলাকায় সংঘটিত বৃষ্টিপাত নির্ভর করে ঋতু ও মহাকাশগত অবস্থার ওপর। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ও ভাসমান বায়ুকণার ওপর নির্ভর করে এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম বেশি হয়ে থাকে। গবেষণা কাজের সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ এলাকার গত ৬৪ বছরের জলবায়ুর প্রতি ১০ বছর করে গড় উপাত্ত নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে।

৬.১.১ শ্রীমঙ্গল অঞ্চলের বৃষ্টিপাত সংঘটনের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার জলবায়ুগত পরিবর্তন

সারণি ৬.১ বিশ্লেষণ করে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে বিগত ৬৪ বছরের মাসিক বৃষ্টিপাতের প্রতি ১০ বছরের গড় উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হল। দেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় গবেষণা এলাকায় মোটামুটি মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়:-

১) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ১৯৭১-১৯৮০ দশকের জুন মাসে সর্বোচ্চ গড় বৃষ্টিপাত ৬২৯.২৮ মি.মি. ও ১৯৭১-৮০ দশকের জানুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন গড় ০.৬ মি. মি. বৃষ্টিপাত হয়। শ্রীমঙ্গল স্টেশনে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন দেখতে পাই। প্রতি বছরই বৃষ্টিপাতের তারতম্য হচ্ছে।

চিত্র ৬.১: শ্রীমঙ্গল স্টেশনে বিগত ৬৪ বছরের মাসিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিশ্লেষণ

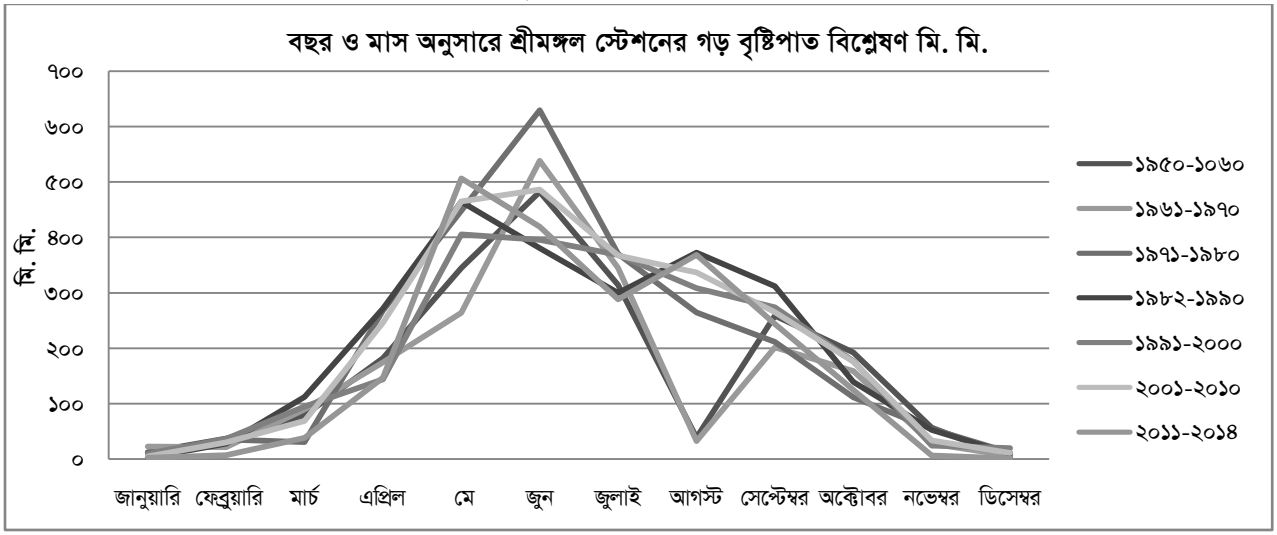

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৫০-২০১৪)

২) ৬.১ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৭১-৮০ দশকের জানুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন গড় ০.৬ মি. মি. বৃষ্টিপাত হয়। ১৯৭১-৮০ দশকের নভেম্বর মাসে গড় সর্বোচ্চ ৫৪.৪ মি. মি. বৃষ্টিপাত হয়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম হয়। বেশিভাগ বছরগুলোতে বৃষ্টিপাত হয় না। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়। মাঝে মাঝে কোনো কোনো বছর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

৩) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গলে ১৯৮১-৯০ দশকের এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ গড় ২৭১.১ মি. মি. বৃষ্টিপাত ও ১৯৭১-৮০ দশকের মার্চ মাসে সর্বনিম্ন গড় বৃষ্টিপাত ৩০.৮৫ মি. মি. পরিলক্ষিত হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উতপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে 'কালবৈশাখী' বলা হয়। এ সময় কিছু শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে।

৪) ৬.১ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৭১-৮০ দশকের জুন মাসে সর্বোচ্চ গড় বৃষ্টিপাত ৬২৯.২৮ মি. মি. ও ১৯৭১-৮০ দশকের অক্টোবর মাসে সর্বনিম্ন গড় বৃষ্টিপাত ১১১.৩৩ মি.মি.। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ সময় ৮৪ শতাংশ বর্ষণ হয়ে থাকে।

৬.১.২ কুমিল্লা অঞ্চলের বৃষ্টিপাত সংঘটনের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার জলবায়ুগত পরিবর্তন

সারণি ৬.১.২ বিশ্লেষণ করে কুমিল্লা স্টেশনে বিগত ৬৪ বছরের মাসিক বৃষ্টিপাতের প্রতি ১০ বছরের গড় উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হলো। দেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় গবেষণা এলাকায় মোটামুটি মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়:-

১) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.২ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কুমিল্লা স্টেশনে ১৯৬১-১৯৭০ দশকের জুন মাসে সর্বোচ্চ গড় বৃষ্টিপাত হয় ৫৫২.৭৫ মি.মি. ও ২০১১-১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বনিম্ন গড় ০.৬ মি. মি. বৃষ্টিপাত হয়। কুমিল্লা স্টেশনে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই বৃষ্টিপাতের তারতম্য হচ্ছে।

চিত্র ৬.২: কুমিল্লা স্টেশনে বিগত ৬৪ বছরের মাসিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিশ্লেষণ

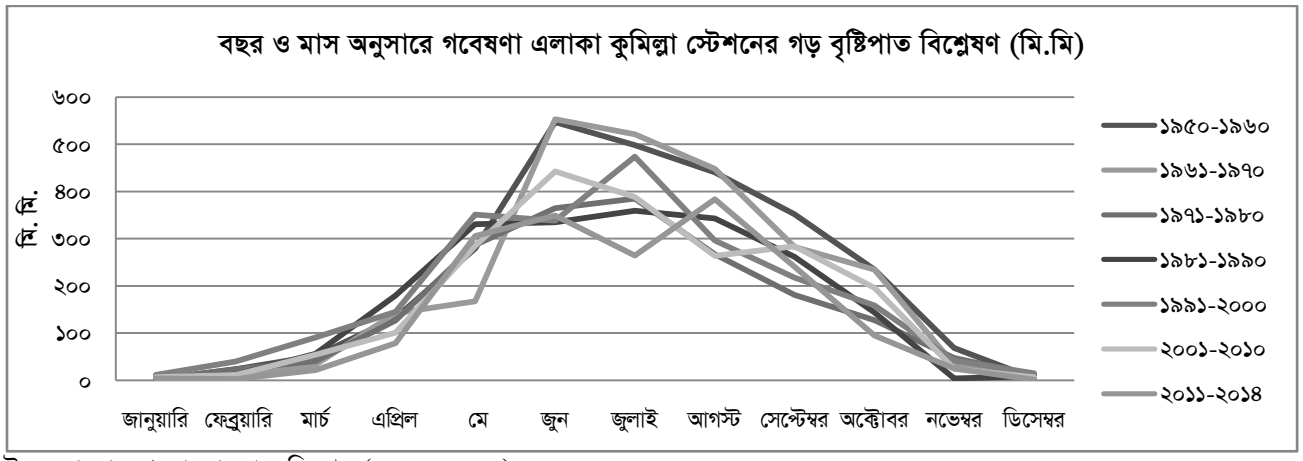

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৫০-২০১৪)

২) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.২ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে কোনো কোনো বছর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। ২০১১-১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বনিম্ন গড় ১.৫ মি. মি. বৃষ্টিপাত হয়। ১৯৭১-৮০ দশকের নভেম্বর মাসে সর্বোচ্চ গড় ৪৭.৫ মি.মি. বৃষ্টিপাত হয়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম হয়। বেশির ভাগ বছরগুলোতে এই সময় বৃষ্টিপাত হয় না। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়।

৩) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.২ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৮১-৯০ দশকের এপ্রিল মাসে কুমিল্লা স্টেশনে সর্বোচ্চ গড় ১৭৯.৫ মি. মি. বৃষ্টিপাত হয় ও ২০১১-১৪ সালের মার্চ মাসে সর্বনিম্ন গড় ২২ মি. মি. বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়। এই সময় মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে 'কালবৈশাখী' বলা হয়। এ সময়ে কিছু শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে।

৪) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.২ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ১৯৬১-৭০ দশকের জুন মাসে সর্বোচ্চ গড় বৃষ্টিপাত ৫৫২.৭৫ মি. মি. ও ২০১১-১৪ সালের অক্টোবর মাসে সর্বনিম্ন গড় ৯৪.৭৫ মি. মি. বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ সময় ৮৪ শতাংশ বর্ষণ হয়ে থাকে।

বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার পরিমাণ প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো উদ্ভিদ ও ফসলের ধরণ নির্ধারণ করে। তাই ঋতুভেদে বিভিন্ন ফসল বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মায়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে বৃষ্টিপাত হয়। এ উপজেলায় আবহাওয়া মাঝারি প্রকৃতির, শীতকালে শুষ্ক থাকে এবং বর্ষাকালে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের আর্দ্রতা ও বেড়ে যায়।

৬.২ তাপমাত্রার ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার জলবায়ুগত পরিবর্তন নিম্নে দেওয়া হল:-

শ্রীমঙ্গল ও কুমিল্লা স্টেশনের বিগত ৫০ বছরের তাপমাত্রা পরিবর্তনশীলতা আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ২৬.১ ডিগ্রী সেলসিয়াস, এছাড়া শীত কালে গড় তাপমাত্রা হয় ১৮.৭২ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও গ্রীষ্মকালে গড় তাপমাত্রা ২৭.৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। বর্ষাকালে গড় তাপমাত্রা ২৬৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস দেখা যায়। ১৯৫০-২০১৪ সাল অর্থাৎ গত ৬৫ বছরে কুমিল্লা ও শ্রীমঙ্গল স্টেশনে বার্ষিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বিশ্লেষণ করা হয়। ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে সর্বোচ্চ ৪৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে কুমিল্লা স্টেশনে সর্বোচ্চ ৪১৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। গবেষণা কাজের সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ এলাকার গত ৬৪ বছরের জলবায়ুর উপাত্ত থেকে ১০ বছর করে গড় উপাত্ত নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে।

৬.২.১ সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ভিত্তিতে শ্রীমঙ্গল স্টেশনের জলবায়ুগত পরিবর্তন

১) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৩ নং সারণি বিশ্লেষণ করে প্রতি দশ বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ১৯৮১-১৯৯০ দশকের মে মাসে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩৬১৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও ১৯৫০-৬০ দশকের এপ্রিল মাসে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ২৮০৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস দেখা যায়। ২০১১-২০১৪ সালে বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস দেখা যায়। শ্রীমঙ্গল স্টেশনে গড় বার্ষিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই তাপমাত্রার তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

চিত্র ৬.৩: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বিশ্লেষণ

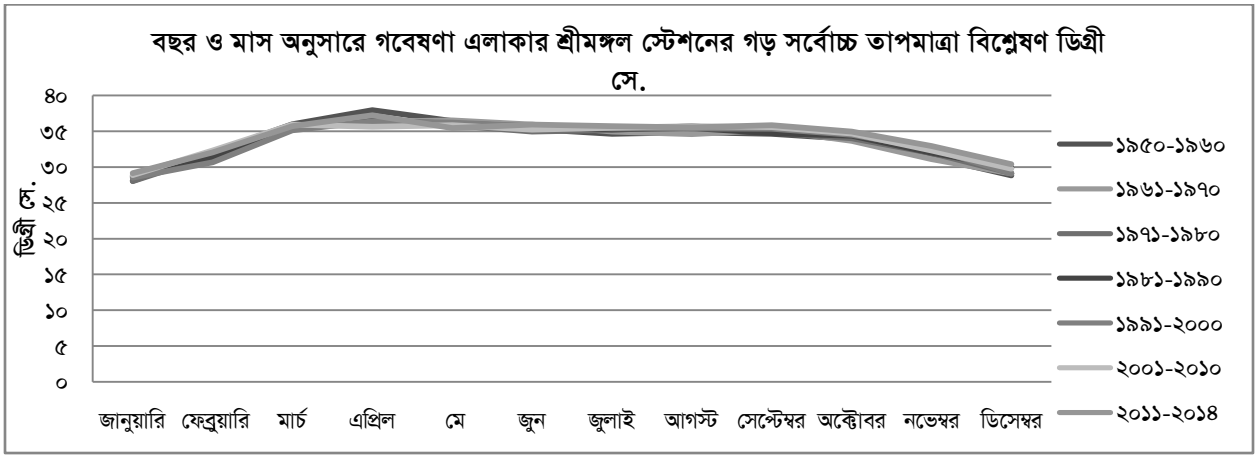

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৫০-২০১৪)

২) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৩ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৫০-৬০ দশকে জানুয়ারি মাসে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ২৮০৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯১-২০০০ দশকের নভেম্বর মাসে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩২৫৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস দেখা যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পরিমাণ খুব কম হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়।

৩) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৩ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এই সময়ে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ১৯৫০-৬০ দশকে এপ্রিল মাসে গড় সর্বোচ্চ ৩৭৯২ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ২০১১-১৪ সালের মার্চ মাসে কম সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩৫৭০ ডিগ্রী সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে 'কালবৈশাখী' বলা হয়।

৪) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৩ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৬১-৮০ দশকের জুন মাসে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩৬৫১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং একই দশকের অক্টোবর মাসে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৩৩৬৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস হয়। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ৮৪ শতাংশ বর্ষণ এ সময় হয়ে থাকে।

৬.২.২ সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ভিত্তিতে কুমিল্লা স্টেশনের জলবায়ুগত পরিবর্তন

১) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৪ নং সারণি বিশ্লেষণ করে প্রতি দশ বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, কুমিল্লা স্টেশনে ১৯৫১-১৯৬০ দশকের এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩৭৬৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস হয়। ২০১১-১৪ সালের জানুয়ারি মাসে গড় তাপমাত্রা ২৮৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস দেখা যায়। কুমিল্লা স্টেশনে গড় বার্ষিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই।

চিত্র ৬.৪: কুমিল্লা স্টেশনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বিশ্লেষণ

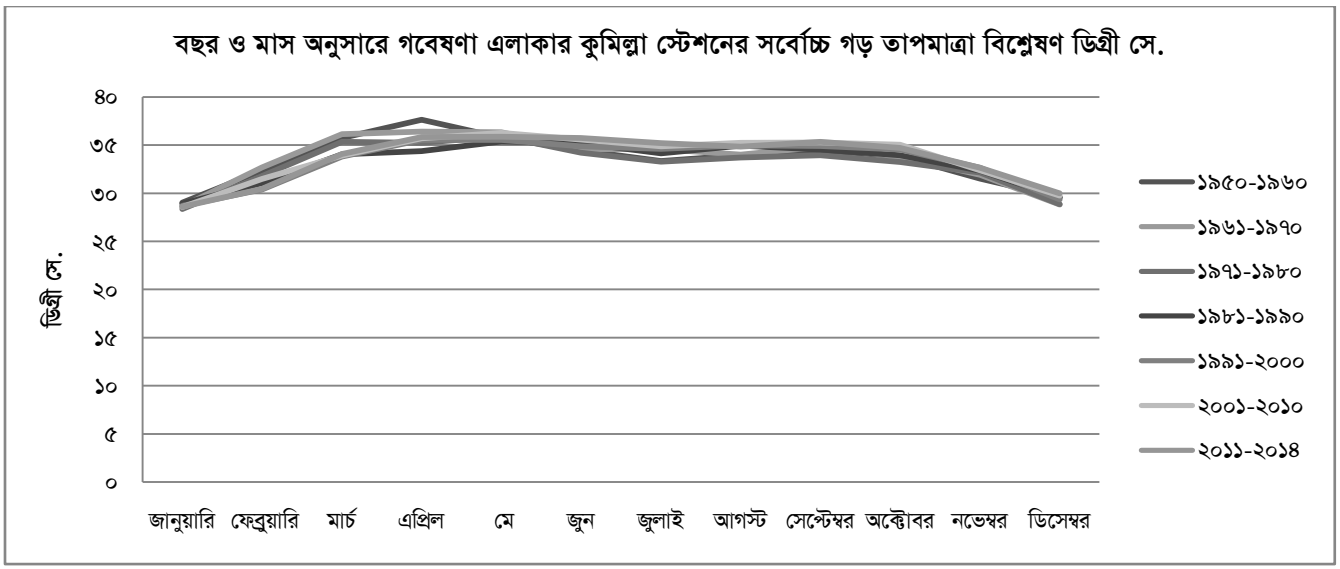

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৫০-২০১৪)

২) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৪ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০১১-১৪ দশকে জানুয়ারি মাসে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ২৮৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯৫১-৬০ দশকের ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩২৩৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে তাপমাত্রার পরিমাণ খুব কম হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়।

৩) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৪ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কুমিল্লা স্টেশনে ১৯৮১-৯০ দশকের এপ্রিল মাসে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭৬৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও ১৯৯১-২০০০ দশকের মার্চ মাসে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩৮৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উতপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে।

৪) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৪ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৬১-৭০ দশকের মে মাসে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩৬৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও ১৯৭১-৮০ দশকের জুলাই মাসে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩৩২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস দেখা যায়। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

একক ভাবে কুমিল্লা স্টেশনে দেখা যায় যে, ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে সর্বোচ্চ কম গড় তাপমাত্রা ২৬১ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি ৪১৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়।

৬.২.৩ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিশ্লেষণ

১) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৫ নং সারণি বিশ্লেষণ করে প্রতি দশ বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ১৯৫১-১৯৬০ দশকের জানুয়ারি মাসে গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪৭৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও ১৯৫০-৬০ দশকের জুলাই মাসে গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮০৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমঙ্গল স্টেশনে গড় বার্ষিক সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই তাপমাত্রার তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

২) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৫ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ১৯৭১-১৯৮০ দশকের নভেম্বর মাসে গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২৮৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস দেখা যায়। ১৯৫০-৬০ দশকে জানুয়ারি মাসে গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪৭৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। গবেষণা থেকে দেখা যায়, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পরিমাণ খুব কম হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়।

চিত্র ৬.৫: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিশ্লেষণ

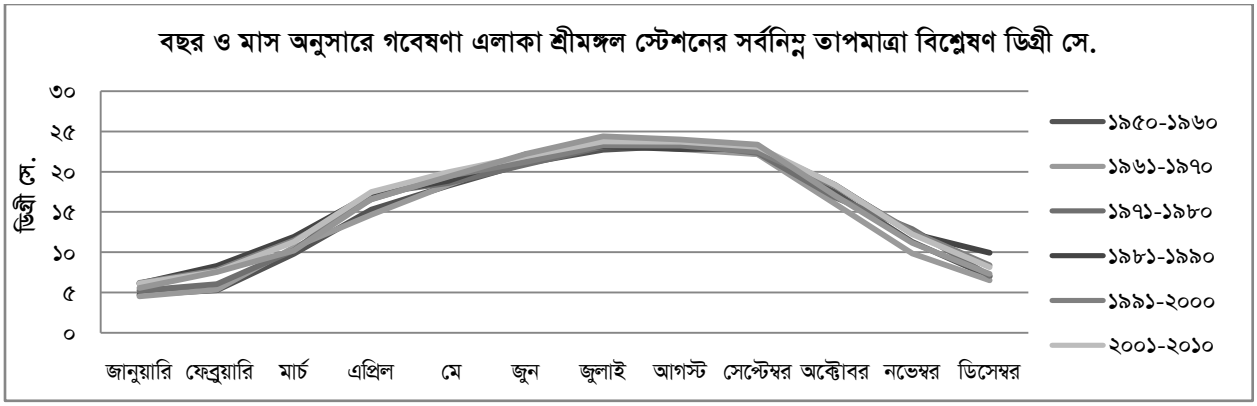

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৫০-২০১৪)

৩) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৫ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ১৯৭১-৮০ দশকের এপ্রিল মাসে গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও ১৯৬১-৭০ দশকের মার্চ মাসে গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উতপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে 'কালবৈশাখী' বলা হয়।

৪) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৫ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৬১-৮০ দশকের জুলাই মাসে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ২৩৬২ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং একই দশকে গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা অক্টোবর মাসে ১৬০৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও প্রতি মাসের গড় তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রী করে বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২ ডিগ্রী বৃদ্ধি পেয়েছে জুলাই মাসে। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ৮৪ শতাংশ বর্ষণ এ সময় হয়ে থাকে।

৬.২.৪ কুমিল্লা স্টেশনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিশ্লেষণ

১) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৬ নং সারণি বিশ্লেষণ করে প্রতি দশ বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, কুমিল্লা স্টেশনে ২০১১-১৪ সালের জুলাই মাসে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ২৪৪৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস হয়। ২০১১-১৪ সালের জানুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। কুমিল্লা স্টেশনে গড় বার্ষিক সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

২) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৬ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০১১-১৪ সালের জানুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯৭১-৮০ সালের নভেম্বর মাসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫০৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস দেখা যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে তাপমাত্রার পরিমাণ খুব কম হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়।

চিত্র ৬.৬: কুমিল্লা স্টেশনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিশ্লেষণ

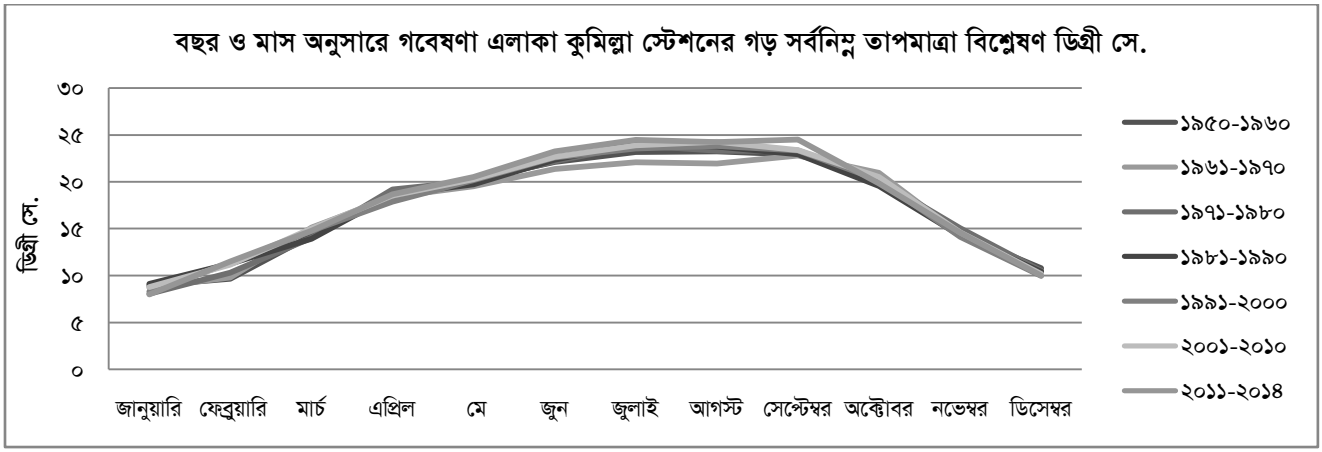

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৫০-২০১৪)

৩) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৬ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এই সময়ে কুমিল্লা স্টেশনে ১৯৭১-৮০ দশকের এপ্রিল মাসে গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯১৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১৯৭১-১৯৮০ দশকের মার্চ মাসে ১৪০১ ডিগ্রী

সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উতপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে।

৪) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৬ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৮১-৯০ দশকের অক্টোবর মাসে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১৯৫৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ২০১১-১৪ দশকে জুলাই মাসে ২৪৪৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস হয়ে থাকে। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

এছাড়া গড় হিসাব থেকে দেখা যায় যে, সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১৯৮১-৯০ দশকে সব চেয়ে বেশি ছিল। এর পর আবার কমেছে। তবে এই গড় তাপমাত্রা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে জানুয়ারি, ডিসেম্বর ও অক্টোবর মাসে তাপমাত্রা কমেছে। ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন আগস্ট ও নভেম্বর মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে প্রায় ১ ডিগ্রী সেলসিয়াস করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। জুলাই সেপ্টেম্বর মাসে ১ ডিগ্রীর বেশি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.২.৫ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের শুষ্ক তাপমাত্রা বিশ্লেষণ

১) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৭ নং সারণি বিশ্লেষণ করে প্রতি দশ বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ১৯৫১-১৯৬০ দশকের জানুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন গড় শুষ্ক তাপমাত্রা ১৪৫১ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও ২০০১-১০ দশকের আগস্ট মাসে সর্বোচ্চ গড় শুষ্ক তাপমাত্রা ২৮.২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। প্রতি দশ বছরের গড় থেকে শ্রীমঙ্গল স্টেশনের শুষ্ক তাপমাত্রার পরিবর্তশীনলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই শুষ্ক তাপমাত্রার তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

২) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৭ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়। এই সময় ১৯৫০-৬০ দশকের জানুয়ারি মাসে গড় সর্বনিম্ন শুষ্ক তাপমাত্রা ১৪৫১ ডিগ্রী সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯১-০০ দশকের নভেম্বর মাসে গড় সর্বোচ্চ শুষ্ক তাপমাত্রা ২২.৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস দেখা যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে শুষ্ক তাপমাত্রার পরিমাণ খুব কম হয়।

চিত্র ৬.৭: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের শুষ্ক তাপমাত্রা বিশ্লেষণ

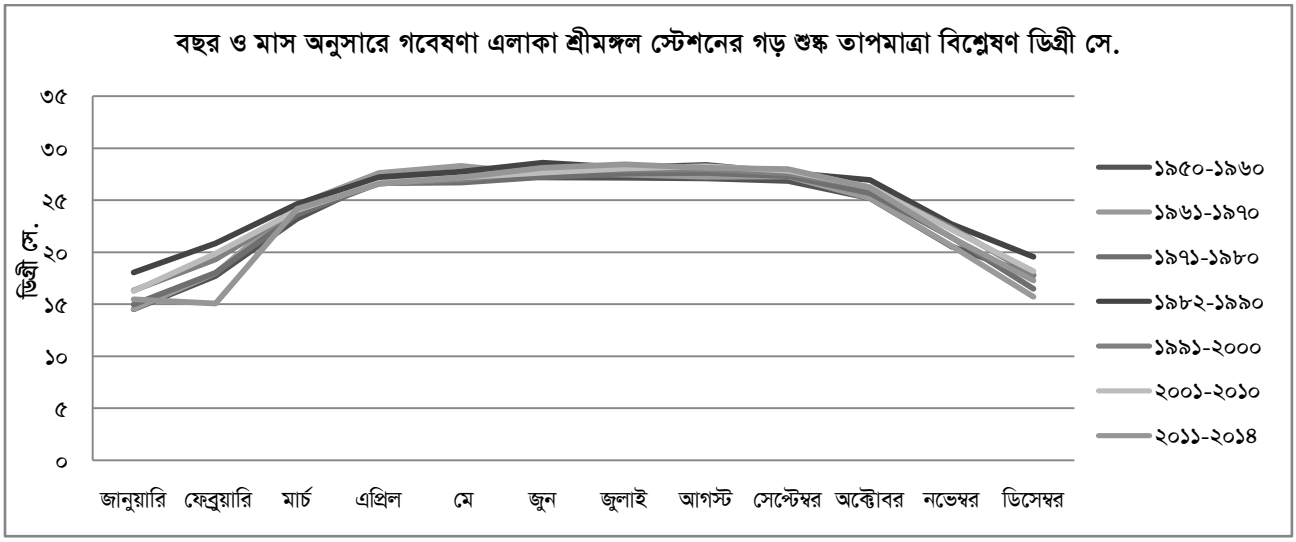

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৫০-২০১৪)

৩) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৭ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ১৯৮১-৯০ দশকের এপ্রিল মাসে গড় সর্বোচ্চ শুষ্ক তাপমাত্রা ২৭২৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯৫১-৬০ দশকের মার্চ মাসে গড় সর্বনিম্ন শুষ্ক তাপমাত্রা ২৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উতপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে 'কালবৈশাখী' বলা হয়।

৪) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৭ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০০০-১০ দশকের আগস্ট মাসে সর্বোচ্চ গড় শুষ্ক তাপমাত্রা ২৮.২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং ১৯৭১-৮০ দশকের মে মাসে গড় সর্বনিম্ন শুষ্ক তাপমাত্রা ২৬০৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

এছাড়াও প্রতি দশকের গড় তাপমাত্রা কোন কোন মাসের ক্ষেত্রে এক থেকে দুই ডিগ্রী করে বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২ ডিগ্রী বৃদ্ধি পেয়েছে জুলাই মাসে।

৬.২.৬ কুমিল্লা স্টেশনের শুষ্ক তাপমাত্রা বিশ্লেষণ

১) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৮ নং সারণি বিশ্লেষণ করে প্রতি দশ বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, কুমিল্লা স্টেশনে ১৯৬১-৭০ দশকের মে মাসে সর্বোচ্চ শুষ্ক গড় তাপমাত্রা ২৮৯২ ডিগ্রী সেলসিয়াস হয়। ১৯৬১-৭০ দশকের ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন শুষ্ক গড় তাপমাত্রা ১৫০৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। কুমিল্লা স্টেশনে গড় বার্ষিক শুষ্ক তাপমাত্রার পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই শুষ্ক তাপমাত্রার তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

২) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৮ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৭১-৮০ সালের নভেম্বর মাসে সর্বোচ্চ শুষ্ক তাপমাত্রা ২৪৫৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও ১৯৬১-৭০ দশকে ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন শুষ্ক তাপমাত্রা ১৫০৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস দেখা যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে তাপমাত্রার পরিমাণ খুব কম হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়।

চিত্র ৬.৮: কুমিল্লা স্টেশনের শুষ্ক তাপমাত্রা বিশ্লেষণ

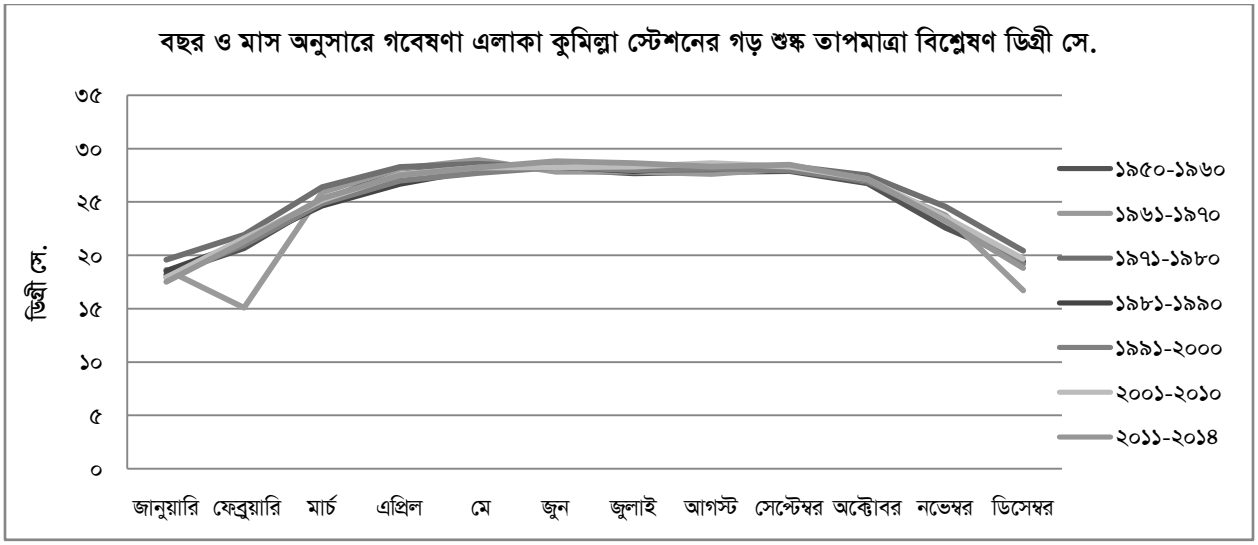

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৫০-২০১৪)

৩) মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৮ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এই সময়ে কুমিল্লা স্টেশনে ১৯৭১-৮০ দশকের এপ্রিল মাসে গড় শুষ্ক তাপমাত্রা ২৮২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও ১৯৮১-১৯৯০ দশকের মার্চ মাসে গড় শুষ্ক তাপমাত্রা ২৪৬৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে।

৪) সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ষা মৌসুম স্থায়ী হয়। গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৮ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৮১-৯০ দশকের অক্টোবর মাসে সর্বনিম্ন শুষ্ক গড় তাপমাত্রা ২৬৭৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও ১৯৬১-৭০ দশকে মে মাসে সর্বোচ্চ শুষ্ক গড় তাপমাত্রা ২৮৯২ ডিগ্রী সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি মাসের গড় তাপমাত্রা প্রায় ১ ডিগ্রী করে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা জীব বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর।

৬.৩ আর্দ্রতার ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার জলবায়ুগত পরিবর্তন নিম্নে দেওয়া হল:-

৬.৩.১ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

১) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৯ নং সারণি বিশ্লেষণ করে প্রতি দশ বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ১৯৮১-১৯৯০ দশকে গড় সর্বনিম্ন আর্দ্রতা মার্চ মাসে ৬২ শতাংশ ১৯৫১-৬০ দশকের সেপ্টেম্বর মাসে গড় সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ৮৮৫৪ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমঙ্গল স্টেশনে গড় বার্ষিক আর্দ্রতার পরিবর্তন দেখতে পাই। প্রতি বছরই আর্দ্রতা প্রবাহের তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

২) নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে আর্দ্রতার পরিমাণ খুব কম হয়। গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৯ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৮১-১৯৯০ দশকে ফেব্রুয়ারি মাসে গড় সর্বনিম্ন আর্দ্রতা ৬২৭ শতাংশ ও ১৯৫০-৬০ দশকে নভেম্বর মাসে সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ৮৮২০ শতাংশ দেখা যায়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়। মাঝে মাঝে এই সময় আর্দ্রতা প্রবাহ বেশি পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র ৬.৯: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

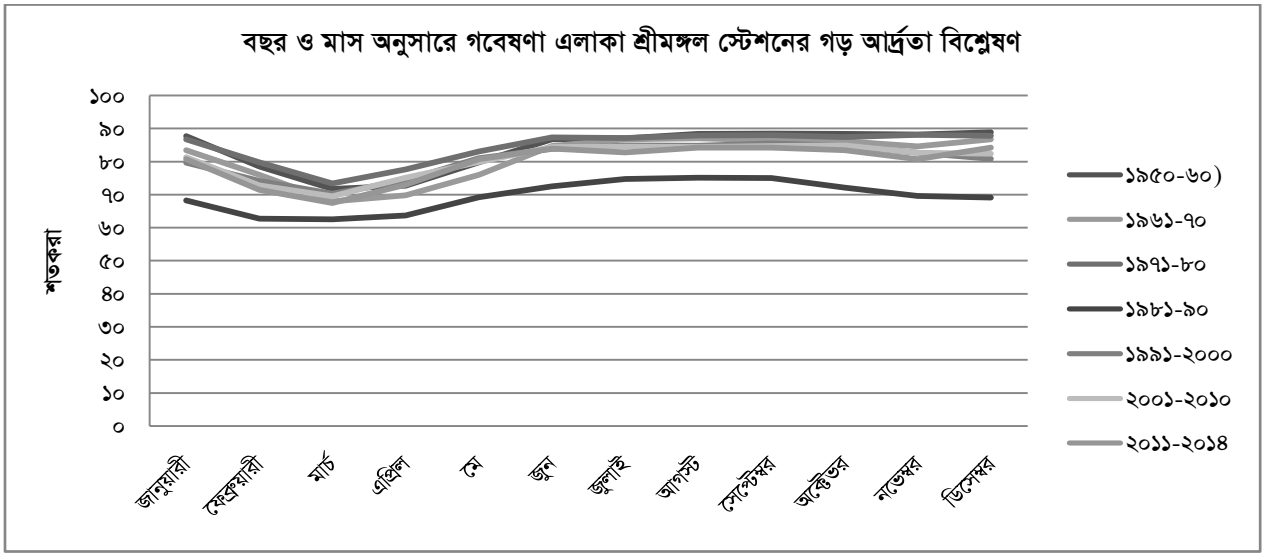

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৫০-২০১৪)

৩) মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৯ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনের ১৯৭১-৮০ দশকে এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ৭৭৬২ শতাংশ ও ১৯৮১-৯০ দশকে মার্চ মাসে সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ৬২ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়। এ সময় বাতাস খুবই উতপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে 'কালবৈশাখী' বলা হয়।

৪) বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গবেষণা এলাকার জন্য ৬.৯ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৫১-৬০ দশকের সেপ্টম্বর মাসে সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ৮৮৫৪ শতাংশ এবং ১৯৮১-৯০ দশকের অক্টোবর মাসে সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ৭২ শতাংশ দেখা যায় ।

৬.৩.২ কুমিল্লা স্টেশনের আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

১) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১০ নং সারণি বিশ্লেষণ করে প্রতি দশ বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, কুমিল্লা স্টেশনে ১৯৫১-৬০ দশকের জুলাই মাসে সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ৯৫৫ শতাংশ ও ১৯৭১-৮০ দশকে ফেব্রুয়ারী মাসে সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ৫৯১১ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়। কুমিল্লা স্টেশনে গড় বার্ষিক আর্দ্রতার পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই আর্দ্রতা প্রবাহ তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

২) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১০ নং সারণি বিশ্লেষণ করে প্রতি দশ বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭১-৮০ দশকে ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ৫৯১১ শতাংশ ও ১৯৫১-৬০ দশকের নভেম্বর মাসে সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ৮৮৯ শতাংশ দেখা যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে তাপমাত্রার পরিমাণ খুব কম হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়।

চিত্র ৬.১০: কুমিল্লা স্টেশনের আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

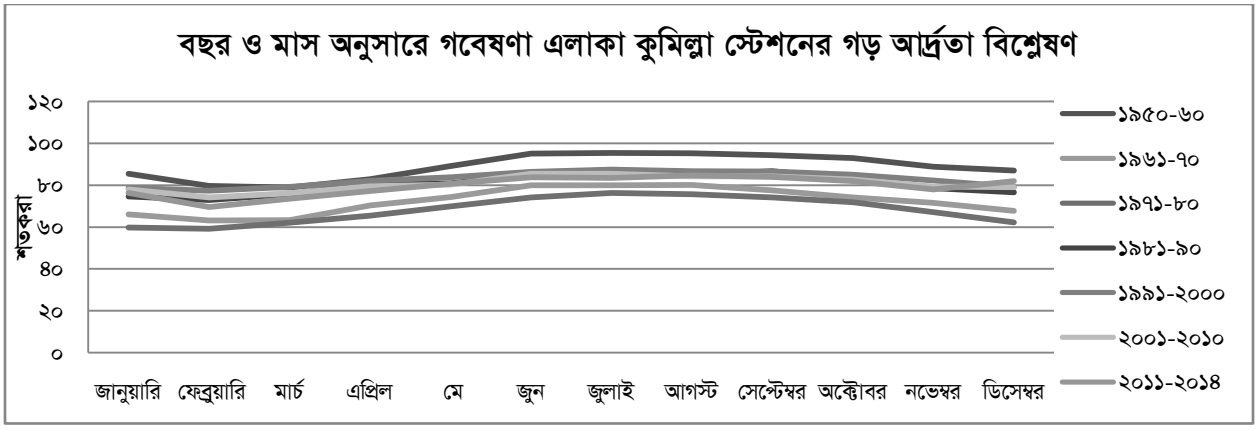

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৫০-২০১৪)

৩) মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১০ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এই সময়ে কুমিল্লা স্টেশনের ১৯৭১-৮০ দশকে মার্চ মাসে সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ৬২ শতাংশ ও ১৯৫১-১৯৬০ দশকের এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ৮২২ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়। এ সময় বাতাস খুবই উতপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে।

৪) বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ১৯৭১-৮০ সালের মে মাসে সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ৬৯ শতাংশ ও ১৯৫১-৬০ দশকে জুলাই মাসে সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ৯৫.৪ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়।
গবেষণা এলাকার আর্দ্রতা বিশ্লেষণের হিসাব থেকে দেখা যায় গড় আর্দ্রতার পরিমাণ ১-৮% হ্রাস পেয়েছে।

৬.৪ বায়ু প্রবাহের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার জলবায়ুগত পরিবর্তন নিম্নে দেওয়া হল:-

৬.৪.১ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ

১) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১১ নং সারণি বিশ্লেষণ করে প্রতি দশ বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ১৯৬১-১৯৭০ দশকের নভেম্বর মাসে গড় সর্বনিম্ন বায়ু প্রবাহ ০২ কান্ট ও ১৯৭১-৮০ দশকের এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ গড় বায়ু প্রবাহ ৬৬ কান্ট পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমঙ্গল স্টেশনে দশ বছরের গড় বার্ষিক বায়ু প্রবাহের পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই বায়ু প্রবাহের তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

চিত্র ৬.১১: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ

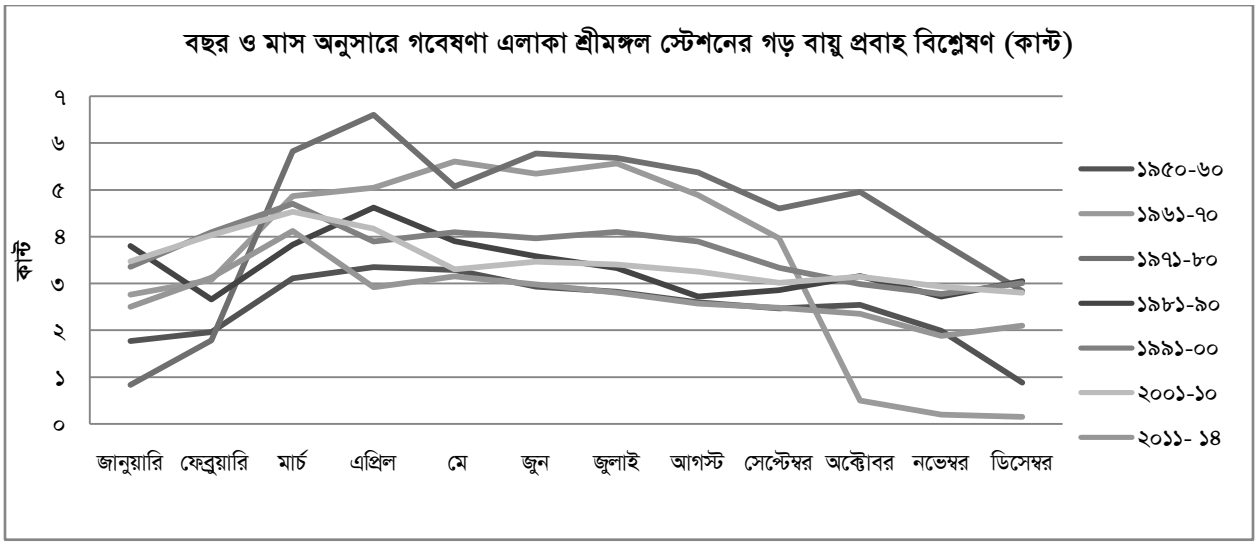

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৫০-২০১৪)

২) নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে বায়ু প্রবাহের পরিমাণ খুব কম হয়। গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১১ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ১৯৯১-২০০০ দশকের ফেব্রুয়ারি মাসে ৪০৯ কান্ট ও ১৯৬১-১৯৭০ দশকের নভেম্বর মাসে গড় বায়ু প্রবাহ ০২ কন্ট দেখা যায়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়। মাঝে মাঝে এই সময় বায়ু প্রবাহ বেশি পরিলক্ষিত হয়।

৩) মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১১ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ১৯৭১-৮০ দশকের এপ্রিল মাসে গড় বায়ু প্রবাহ ৬৬ কান্ট ও ২০১১-১৪ দশকের এপ্রিল মাসে গড় বায়ু প্রবাহ ২৯২ কান্ট পরিলক্ষিত হয়। এ সময় বাতাস খুবই উতপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে 'কালবৈশাখী' বলা হয়।

৪) বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ১৯৭১-৮০ দশকের জুলাই মাসে সর্বোচ্চ বায়ু প্রবাহ ৫৭৭ কান্ট এবং ১৯৬১-৭০ দশকের অক্টোবর মাসে গড় বায়ু প্রবাহ ০৫ কান্ট পরিলক্ষিত হয়।

৬.৪.২ কুমিল্লা স্টেশনের গড় বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ

১) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১২ নং সারণি বিশ্লেষণ করে প্রতি দশ বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, কুমিল্লা স্টেশনে ১৯৯১-০০ দশকের মে মাসে গড় বায়ু প্রবাহ ১৪৮৮ কান্ট এবং ১৯৫১-৬০ ও ২০১১-১৪ দশকের ডিসেম্বর মাসে গড় বায়ু প্রবাহ ২ কান্ট পরিলক্ষিত হয়। কুমিল্লা স্টেশনে গড় বায়ু প্রবাহের পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই বায়ু প্রবাহের তারতম্য হচ্ছে।

চিত্র ৬.১২: কুমিল্লা স্টেশনের গড় বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ

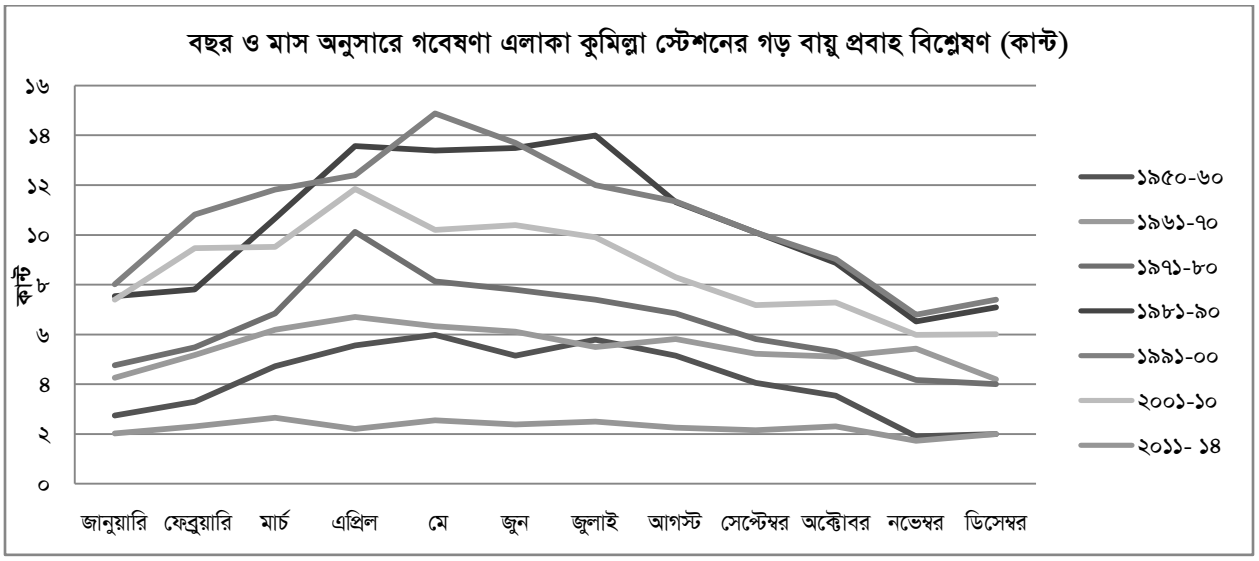

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৫০-২০১৪)

২) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১২ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৫১-৬০ ও ২০১১-১৪ দশকে ডিসেম্বর মাসে সর্বনিম্ন বায়ু প্রবাহ ২ কান্ট। ১৯৯১-০০ দশকের ফেব্রুয়ারি মাসে বায়ু প্রবাহ ১০৮২ কান্ট দেখা যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে তাপমাত্রার পরিমাণ খুব কম হয়।এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়।

৩) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১২ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৮১-৯০ দশকের এপ্রিল মাসে গড় বায়ু প্রবাহ ২২ কান্ট ও ২০০১-১৪ দশকের এপ্রিল মাসে বায়ু প্রবাহ ১৩৫৮ কান্ট পরিলক্ষিত হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উতপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে।

৪) বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১২ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০১১-১৪ সালের অক্টোবর মাসে সর্বনিম্ন বায়ু প্রবাহের গড় ২৩ কান্ট ও ১৯৯১-২০০০ দশকের মে মাসে সর্বোচ্চ বায়ু প্রবাহের গড় ১৪৮৮ কান্ট দেখা যায়।

৫) ৬.৫. বাষ্পীভবনের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার জলবায়ুগত পরিবর্তন নিম্নে দেওয়া হল:-

গবেষণা এলাকার দুটি স্টেশনের বাষ্পীভবনের ক্ষেত্রে ১৯৮৫-২০১৩ সাল পর্যন্ত ২৯ বছরের তথ্য পাওয়া যায়। এই তথ্য থেকে পরিসংখ্যানিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার কুমিল্লা স্টেশনে ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে সর্বোচ্চ বাষ্পীভবন ৬৪ মি.লি. এবং ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বনিম্ন বাষ্পীভবন ১৬ মি.লি. ছিল। গবেষণা এলাকার শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ বাষ্পীভবন ১১৮ মিলিমিটার এবং ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন বাষ্পীভবন ১৭ মিলিমিটার ছিল। গবেষণার সুবিধার

জন্য ২৯ বছরের তথ্য থেকে প্রতি ৫ বছরের তথ্য নিয়ে গড় করে সারণি তৈরি করা হয়েছে। এই সারণি বিশ্লেষনের তথ্য নিম্নে আলোচনা করা হল।

৬.৫.১. শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বাষ্পীভবন বিশ্লেষণ

১) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১৩ নং সারণি বিশ্লেষণ করে প্রতি পাঁচ বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ১৯৮৯-৮৫ সালের এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ গড় বাষ্পীভবন ৯৩.৩৩ মিলিমিটার ও ২০১৩-২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বনিম্ন গড় বাষ্পীভবন ২১ মিলিমিটার পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমঙ্গল স্টেশনের পাঁচ বছরের গড় বার্ষিক বাষ্পীভবনের পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই বাষ্পীভবনের তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

চিত্র ৬.১৩: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বাষ্পীভবন বিশ্লেষণ

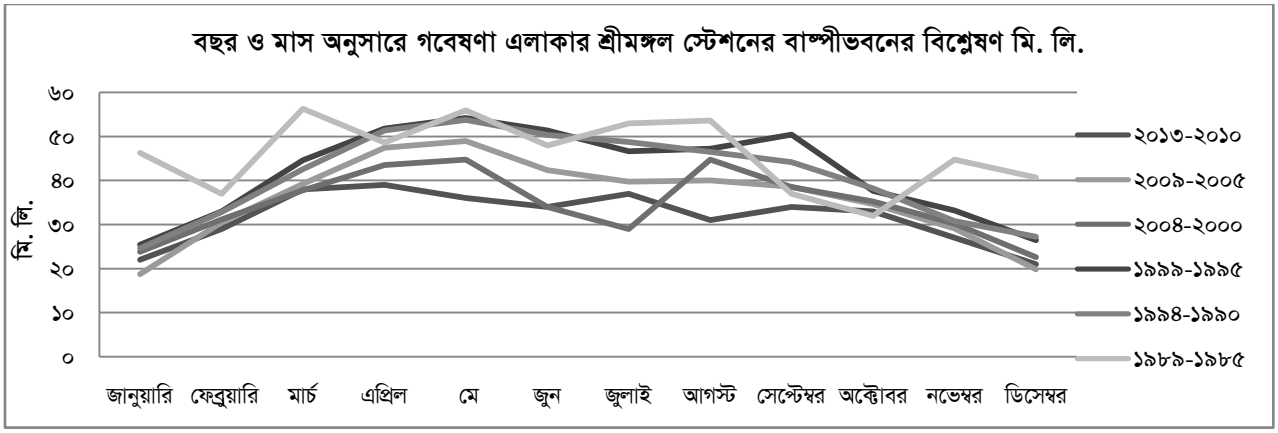

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৮৯-২০১৩)

২) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১৩ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০১৩-২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বনিম্ন গড় বাষ্পীভবন ২১ মিলিমিটার। ১৯৮৯-১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বোচ্চ গড় বাষ্পীভবন ৭০ মিলিমিটার দেখা যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে বাষ্পীভবনের পরিমাণ খুব কম হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়। মাঝে মাঝে এই সময় বাষ্পীভবন কম পরিলক্ষিত হয়।

৩) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১৩ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ১৯৮৯-৮৫ সালের এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ গড় বাষ্পীভবন ৯৩.৩৩ মিলিমিটার ও ১৯৯৪-১৯৯০ সালের মার্চ মাসে সর্বনিম্ন গড় বাষ্পীভবন ৩৮ মিলিমিটার ছিল। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উতপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে 'কালবৈশাখী' বলা হয়।

৪) বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১৩ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ১৯৮৯-৮৫ সালের জুন মাসে সর্বোচ্চ গড় বাষ্পীভবন ৬১৫ মিলিমিটার এবং ২০১৩-২০১০ সালের মে মাসে সর্বনিম্ন গড় বাষ্পীভবন ৩০ মিলিমিটার পরিলক্ষিত হয়।

৬.৫.২ কুমিল্লা স্টেশনের বাষ্পীভবন বিশ্লেষণ

১) গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১৪ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কুমিল্লা স্টেশনে ১৯৮৯-৮৬ সালের মার্চ মাসে গড় সর্বোচ্চ বাষ্পীভবন ৫৬.৩৩ মিলিমিটার ও ২০০৯-০৫ সালের জানুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন গড় বাষ্পীভবন ১৮.৭৫ মিলিমিটার পরিলক্ষিত হয়। কুমিল্লা স্টেশনে গড় বাষ্পীভবনের পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই বাষ্পীভবনের তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

চিত্র ৬.১৪: কুমিল্লা স্টেশনের বাষ্পীভবন বিশ্লেষণ

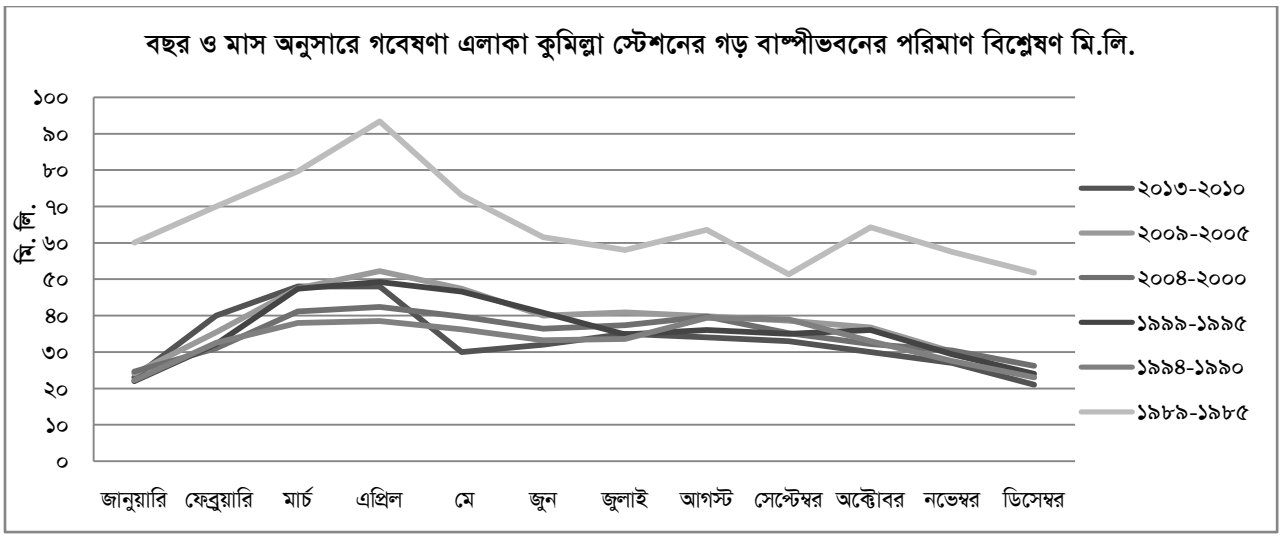

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৮৯-২০১৩)

২) নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে তাপমাত্রা পরিমাণ খুব কম হয়। গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১৪ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৮৯-৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে সর্বোচ্চ গড় বাষ্পীভবন ৪৬.৩৩ মিলিমিটার ও ২০০৯-০৫ সালের জানুয়ারি মাসে গড় সর্বনিম্ন বাষ্পীভবন ১৮.৭৫ মিলিমিটার। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়।

৩) মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১৪ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কুমিল্লা স্টেশনে ২০০০-০৪ সালের মার্চ মাসে সর্বনিম্ন গড় বাষ্পীভবন ৩৭.৭৫ মিলিমিটার ও ১৯৮৫-৮৯ সালের মার্চ মাসে সর্বোচ্চ গড় বাষ্পীভবন ৫৬.৩৩ মিলিমিটার পরিলক্ষিত হয়। এ সময় বাতাস খুবই উতপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে।

৪) বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গবেষণা এলাকার জন্য ৬.১৪ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০১১-১৪ সালের জুলাই মাসে সর্বনিম্ন গড় বাষ্পীভবন ২৯ মিলিমিটার ও ১৯৮৯-৮৫ বছরের মে মাসে সর্বোচ্চ গড় বাষ্পীভবন ৫৬ মিলিমিটার পরিলক্ষিত হয়।

৬.৬ জলবায়ু পরিবর্তনে জলবায়ুর নিয়ামকগুলো সঙ্গে অন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণের তালিকা

৬.৬.১ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের জলবায়ুর আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ

৬.১৫ নং টেবিল থেকে শ্রীমঙ্গল স্টেশনের জলবায়ুর আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০১৪-২০১০, ২০১০-২০০০ সালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ছিল ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ১৯৮০-১৯৭০ সালে ০৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস কমেছিল কিন্তু ১৯৯০-১৯৮০ সালের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২১ সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। একই ভাবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ক্ষেত্রে ১৯৯০-১৯৮০ সালের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ০৮৬ ডিগ্রী বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন সালের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেশি ভাগ ক্ষেত্রেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুষ্ক তাপমাত্রার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ১৯৯০-১৯৮০ সালের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ শুষ্ক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৪৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ২০১৪ ও ২০১০ সনের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তাপমাত্রা ৫২ ডিগ্রী সেলসিয়াস হ্রাস পেয়েছে। সার্বিক আর্দ্রতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ২০০০-১৯৮০ সালের আন্তঃসম্পর্কে আর্দ্রতা ১১০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়া অন্য সব সালের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে দেখা যায় আর্দ্রতা কমেছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেখা যায় যে, ১৯৮০-১৯৭০ সালের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ ২২৪১ সি মি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-২০১০ সালের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২৮১৩ সি. মি কমেছে। বায়ু প্রবাহের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেণে দেখা যায় যে প্রতি দশকেই বায়ু প্রবাহের পরিমাণ কমেছে।

চিত্র ৬.১৫: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের জলবায়ুর আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ

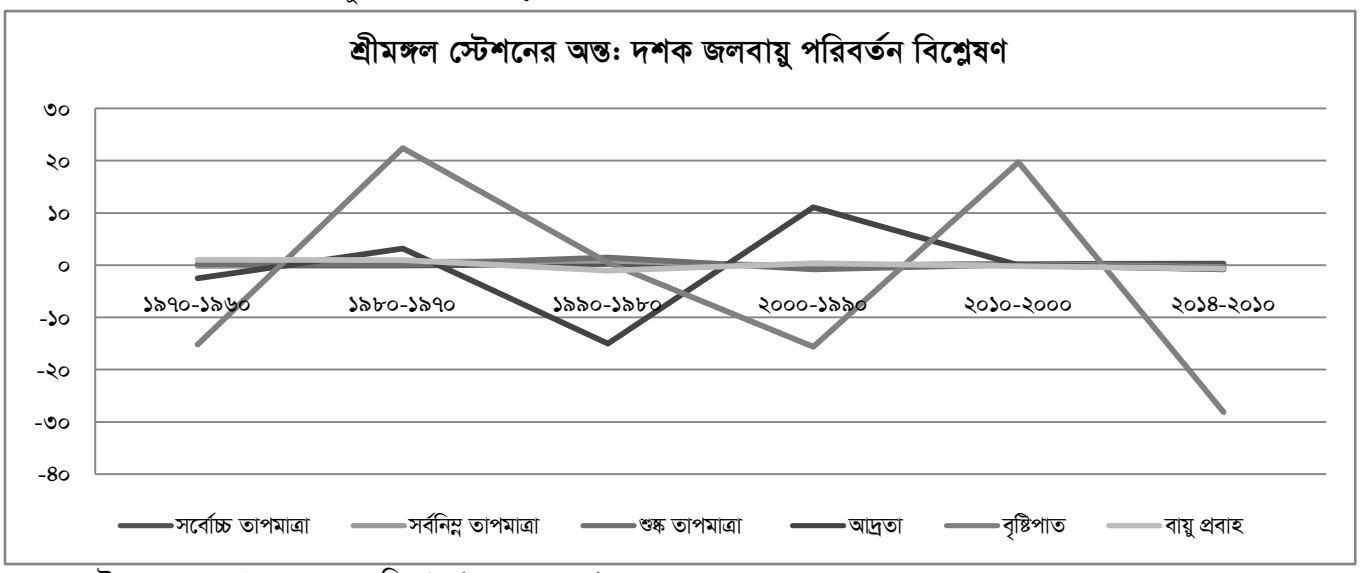

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৫০-২০১৪)

৬.৬.২ কুমিল্লা স্টেশনের জলবায়ুর আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ

৬.১৬ নং টেবিল থেকে জানা যায়, শ্রীমঙ্গল স্টেশনের জলবায়ুর আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০১০-২০০০ সালের আন্তঃসম্পর্ক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ০৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং যদিও ১৯৮০-১৯৭০ সালের আন্তঃপার্থক্যের ০৫৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস কমেছিল কিন্তু ১৯৯০-১৯৮০ সালের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ০২৩ সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। একই ভাবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ২০১০-২০০০ সালের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ০২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন সালের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১৯৯০ থেকে ২০১৪ দশক পর্যন্ত প্রতি দশকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৬০-১৯৮০ দশক পর্যন্ত প্রতি দশকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হ্রাস পেয়েছে। শুষ্ক তাপমাত্রার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ২০১০-২০০০ সালের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ শুষ্ক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল ০৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯৯০-১৯৮০ সনের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তাপমাত্রা ০৭৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস কমেছে। সার্বিক আর্দ্রতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১৯৯০-১৯৮০ সালের আন্তঃসম্পর্কে আর্দ্রতা ১২২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়া অন্য সব সালের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে দেখা যায় আর্দ্রতা কমেছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেখা যায় যে, ২০০০-১৯৯০ সালের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ ১১৭৯ সি.মি. বৃদ্ধি ও ২০১৪-২০১০ সালের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ ২৪০৩ সি. মি. হ্রাস পেয়েছে। বায়ু প্রবাহের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৪-২০১০ সালে বায়ু প্রবাহ ৫৩৭ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯০-১০৮০ সালের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে ৩৯৮ কান্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ৬.১৬: কুমিল্লা স্টেশনের জলবায়ুর আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ

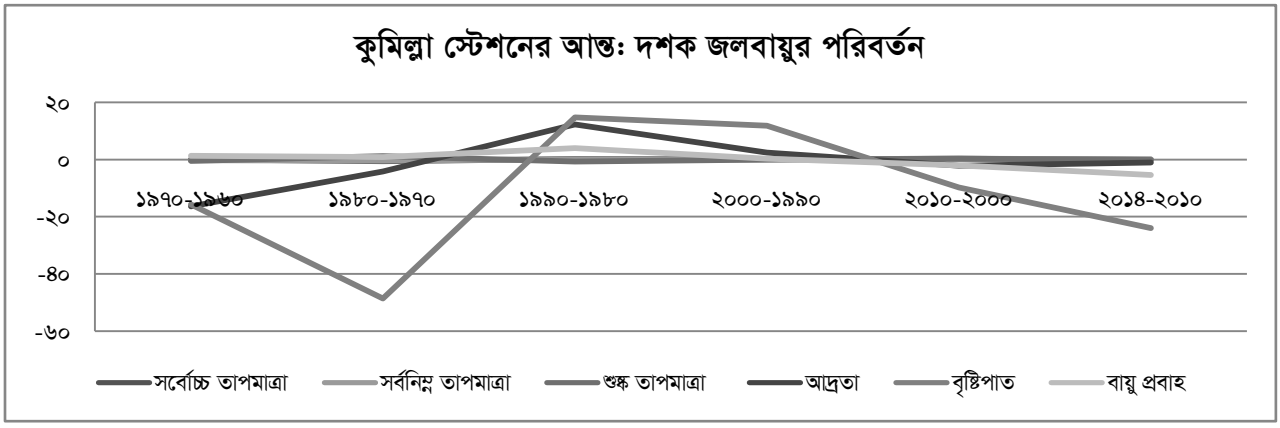

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৫০-২০১৪)

৬.৭ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বার্ষিক জলবায়ু বিশ্লেষণ

৬.৭.১ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বার্ষিক তাপমাত্রা বিশ্লেষণ

গ্রাফচিত্র ৬.১৭ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনের তাপমাত্রা ১৯৫০ সালে থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বার্ষিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কখনও অধিক বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে । ১৯৫২ ও ১৯৬০ সালে বার্ষিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৩.৩ ও ৪১.০৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯৭১ ও ১৯৮৫ সালে বার্ষিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.১৬ ও ৩২.৮৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯৯১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বার্ষিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৯ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে রয়েছে। শ্রীমঙ্গল স্টেশনের সর্বনিম্ন বার্ষিক তামপাত্রা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৬৮ ও ১৯৬৪ সালে বার্ষিক সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮ ও ৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯৯৫ সালে ৮৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস, ২০০২ সালে ৭৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও ২০১৪ সালে সর্বনিম্ন বার্ষিক তাপমাত্রা ছিল ৭৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। শ্রীমঙ্গল স্টেশনের শুষ্ক তাপমাত্রা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৭৬ ও ১৯৮৩ সালে বার্ষিক শুষ্ক তাপমাত্রা ছিল ১৫.৯ ও ১৬.১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯৮৪ ও ১৯৮৭ সালে শুষ্ক বার্ষিক তাপমাত্রা ছিল ২৫.৯৫ ও ২৫.৯৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস ।

চিত্র ৬.১৭: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বার্ষিক তাপমাত্রা বিশ্লেষণ

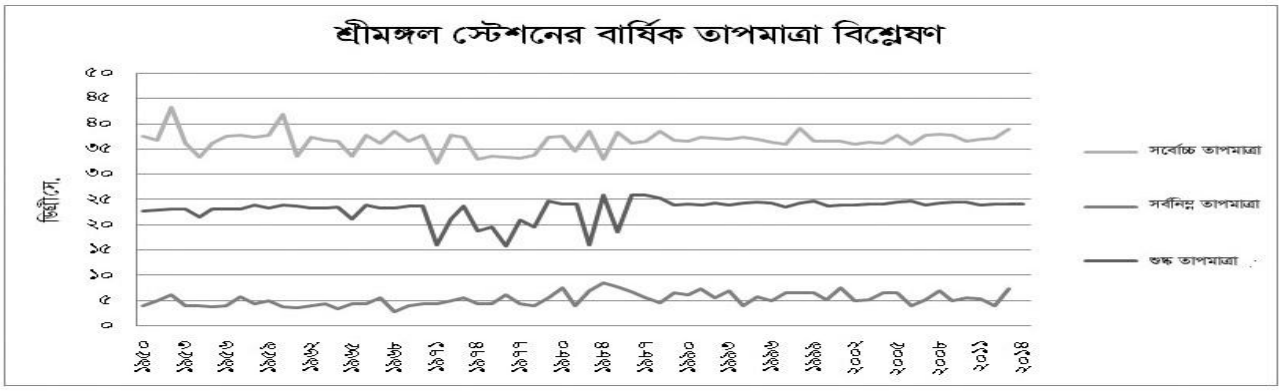

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৫০-২০১৪)

৬.৭.২ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বার্ষিক বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ

গ্রাফচিত্র ৬.১৮ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বার্ষিক বৃষ্টিপাত কখনও অধিক বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে। ১৯৫৬ সালে ২৭৯৯, ১৯৬৪ সালে ২৮.৬১ ও ১৯৭৬ সালে বার্ষিক সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ছিল ৩৬.৬৮ সেন্টিমিটার ছিল। ১৯৬০ সালে ১৪, ১৯৭২ সালে ১৩.২২ ও ১৯৯৫ সালে সর্বনিম্ন বার্ষিক বৃষ্টিপাত ছিল ৯৪৬ সেন্টিমিটার। শ্রীমঙ্গলে বার্ষিক বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৬২ ও ১৯৯৬ সালে বার্ষিক সর্বোচ্চ বায়ু প্রবাহ ছিল ৫.৯৯ ও ৫.৫০ কান্ট। ১৯৭৭ ও ১৯৮৫ সালে সর্বনিম্ন বার্ষিক বায়ু প্রবাহ বেশি ছিল ২ ও ১.৬১ কান্ট। শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বার্ষিক আর্দ্রতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৫০ সালে ৭৭, ১৯৫৩ সালে ৭৬ ও ১৯৭৪ সালে বার্ষিক সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ছিল ৭৬ শতাংশ। ১৯৮৪ ও ১৯৮৬ সালে বার্ষিক সর্বনিম্ন আর্দ্রতা ছিল ৭৩ ও ৭২ শতাংশ ।

চিত্র ৬.১৮: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বার্ষিক বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ

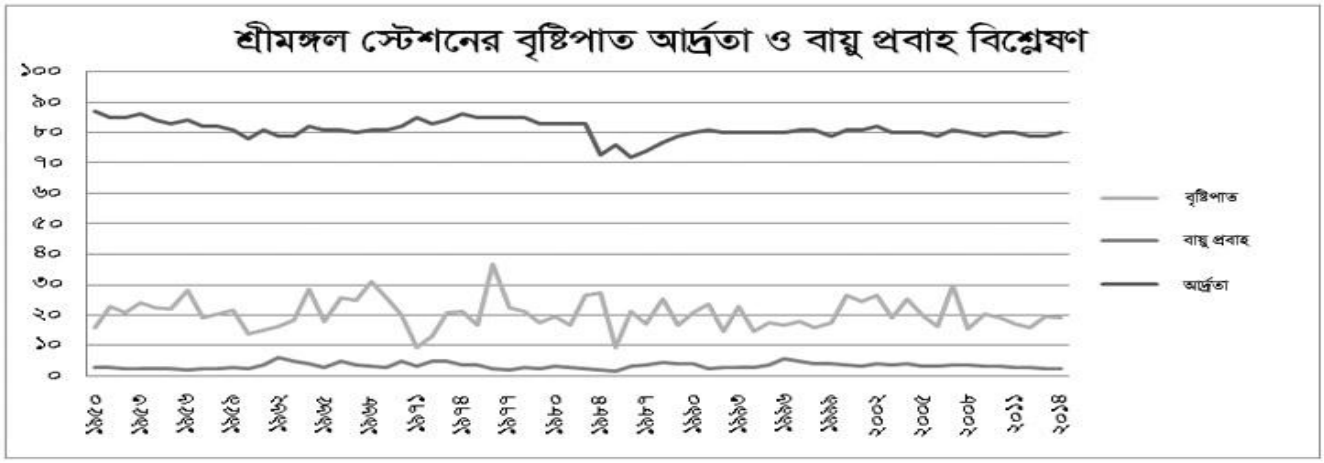

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৫০-২০১৪)

৬.৮ কুমিল্লা স্টেশনের বার্ষিক জলবায়ু বিশ্লেষণ

৬.৮.১ কুমিল্লা স্টেশনের বার্ষিক তাপমাত্রা বিশ্লেষণ

গ্রাফচিত্র ৬.১৯ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কুমিল্লা স্টেশনে ১৯৬০ সালে ৪১৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস, ১৯৭৯ সালে ৩৯৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও ২০১৪ সালে সর্বোচ্চ বার্ষিক তাপমাত্রা ছিল ও ৩৯.৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯৭১ সালে সর্বোচ্চ বার্ষিক তাপমাত্রা ৩২.০৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস ছিল। কুমিল্লা স্টেশনের বার্ষিক সর্বনিম্ন তামপাত্রা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৯৩ সালে ৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস, ১৯৯৫ সালে ৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও ২০১৩ সালে বার্ষিক সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৫৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯৫২ সালে ১০৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস, ১৯৬৬ সালে ১০৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস, ও ২০১৪ সালে সর্বনিম্ন বার্ষিক তাপমাত্রা ও ৯৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস ছিল। কুমিল্লা স্টেশনের শুষ্ক তামপাত্রা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৭১ সালে বার্ষিক শুষ্ক তাপমাত্রা ছিল ২১৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে শুষ্ক বার্ষিক তাপমাত্রা বেশি ছিল যার পরিমাণ ২৬১৫ ও ২৬১৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস ।

চিত্র ৬.১৯: কুমিল্লা স্টেশনের বার্ষিক তাপমাত্রা বিশ্লেষণ

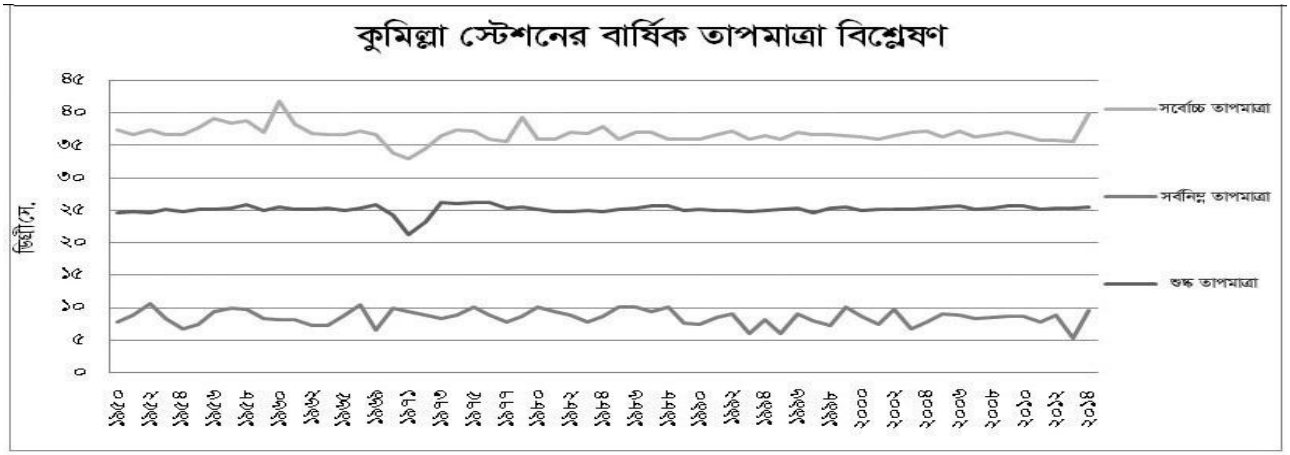

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৫০-২০১৪)

৬.৮.২ কুমিল্লা স্টেশনের বার্ষিক বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ

গ্রাফচিত্র ৬.২০ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কুমিল্লা স্টেশনে ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বার্ষিক বৃষ্টিপাত কখনও অধিক বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে। ১৯৫২ সালে ৩৪৩৯ সেন্টিমিটার, ১৯৬৮ সালে ২৪৩৪ সেন্টিমিটার ও ১৯৯১ সালে বার্ষিক সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ছিল ২৪২৮ সেন্টিমিটার। ১৯৭২ সালে ১২১৩ সেন্টিমিটার, ১৯৭৯ সালে ১২১৭ সেন্টিমিটার, ১৯৮৯ সালে ১১৯৯ সেন্টিমিটার, ১৯৯২ সালে ১০৩৩ সেন্টিমিটার ও ১৯৯৪ সালে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ছিল ও ১১৫৩ সেন্টিমিটার। কুমিল্লা স্টেশনের বার্ষিক বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৬১ সালে ৬৩৪ কান্ট, ১৯৭৫ সালে ৭২৬ কান্ট ও ১৯৭৭ সালে বার্ষিক সর্বোচ্চ বায়ু প্রবাহ ছিল ৭৯৯ কান্ট। ১৯৫৩ সালে ৩২৩ কান্ট, ২০১১ সালে ২০২ ও ২০১২ সালে বার্ষিক সর্বনিম্ন বায়ু প্রবাহ ছিল ২০৫ কান্ট। কুমিল্লা স্টেশনের বার্ষিক আর্দ্রতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৫৪ সালে ৮৪ শতাংশ, ১৯৭০ সালে ৮৫ শতাংশ ও ১৯৭১ সালে বার্ষিক সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ছিল ৮৫ শতাংশ। ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে বার্ষিক সর্বনিম্ন আর্দ্রতা ছিল ৭২ ও ৭৩ শতাংশ ।

চিত্র ৬.২০: কুমিল্লা স্টেশনের বার্ষিক বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ

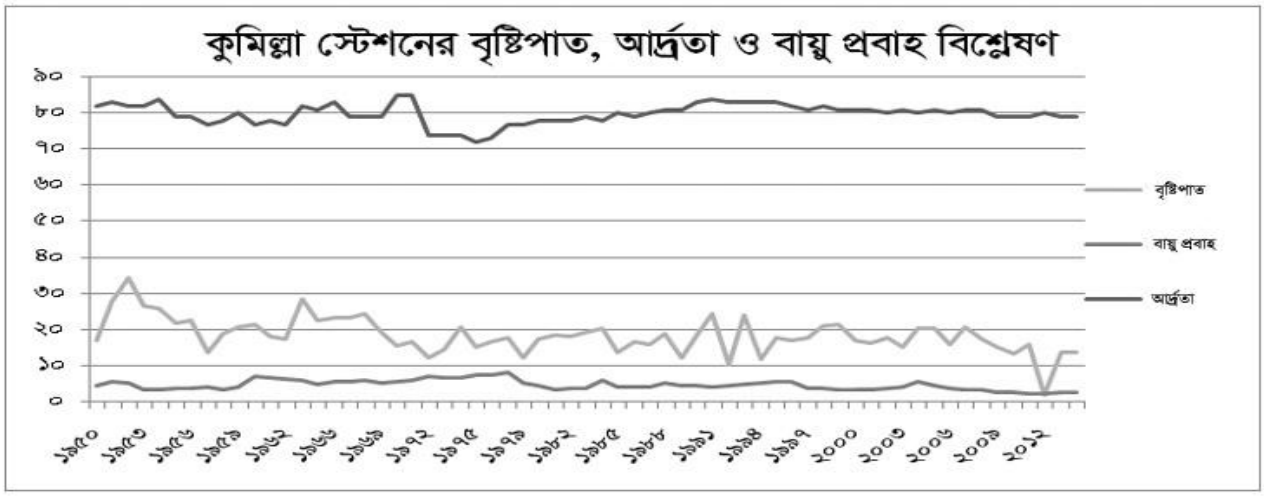

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (১৯৫০-২০১৪)

অধ্যায় সপ্তম

ইকোলজিক্যাল পরিবর্তন

জীবন্ত জীব সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ নির্ভর করে কোনো একটি এলাকার অজৈব সম্পদ ও পরিবেশের অবস্থানের উপর। বিভিন্ন প্রজাতির জীব একই স্থানে নিজেদের মধ্যে এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে একটি নিবিড় ও জটিল সম্পর্ক গড়ে তোলে। একটি পরিবেশের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক উপাদানগুলোর মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন দেখা দিলে সেখানকার পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাঘাত ঘটে। এ সব পরিবর্তন অবশ্যই ধীর ও ধারাবাহিক। এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য সেখানে বসবাসরত জীবের মধ্যেও পরিবর্তন সাধিত হয়, ফলে জীববৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় পরিবেশগত জীববৈচিত্র্য। একটি ক্ষুদ্র, ছোট পুকুরের পরিবেশে যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসতি গড়ে উঠে, তা নদীর পরিবেশ থেকে ভিন্ন। বন, তৃণভূমি, হ্রদ, নদী জলাভূমি প্রভৃতি পরিবেশে গড়ে ওঠে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ এক একটি জীবসম্প্রদায়। বিভিন্ন ধরনের ইকোসিস্টেম বিভিন্ন প্রকার ভেজিটেশন ধারণ করে। বনের ইকোসিস্টেম, সাগরের ইকোসিস্টেম, চারণভূমির ইকোসিস্টেম, বদ্ধ পানির ইকোসিস্টিম যেমন ভিন্নতর, তেমনই এদের ভেজিটেশনও ভিন্নতর। ইকোলজিক্যাল ডাইভারসিটিতে বিভিন্ন ভৌগোলিক কেন্দ্র বিন্দু যেমন- উচ্চ বৈচিত্র্য কেন্দ্র, মহাদেশিয় ও মহাসাগরীয় দ্বীপ, এনডেমিক অঞ্চল ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জীবসমূহের ঠিকে থাকার জন্য ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন কার্যকরি উপাদান গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কোন একটি ইকোসিস্টেম থেকে বিশেষ কোনো প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেলে ঐ ইকোসিস্টেমের কার্যের পরিবর্তন দেখা দিতে পারে, যার ক্ষতির প্রভাব এর পাশাপাশি অবস্থিত অন্যান্য ইকোসিস্টেমে পরতে পারে। ঠিক তেমনই ইকোসিস্টেমের ভৌত ও রাসায়নিক যে কোন একটি উপাদানের পরিবর্তন হলে জীববৈচিত্র্য অধিক পরিমানে হ্রাস হবে। কাজেই জীববৈচিত্র্য ইকোলজিক্যাল ডাইভারসিটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

ইকোসিস্টেমের ভৌত উপাদান এর মধ্যে রয়েছে জলবায়ুও বিভিন্ন পরিবেশীয় শর্ত যেমন তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, এবং সূর্যালোক, আর্দ্রতা, বায়ূপ্রবাহ ইত্যাদি তবে এই গুলোকে জলবায়ুগত পরিবর্তন বলা হয় বলে এই পরিবতর্নগুলো জলবায়ু অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে মৃত্তিকা, জল ও মৃত্তিকা এবং জলে দ্রবীভূত জৈব এবং অজৈব পুষ্টি উপাদান। তাছাড়া জলজ বাস্তুতন্ত্রে লবণাক্ততা একটি বিশেষ ভৌত উপাদান। এই অধ্যায়ে মাটির পি এইচ, জৈব পদার্থ, অম্লত্ব, মাটির আর্দ্রতা, পানি প্রবাহ ও জোয়ার ভাটার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৭.১ মাটির আর্দ্রতার পরিবর্তনশীলতা পরীক্ষা

মাটির আর্দ্রতার পরিবর্তনশীলতা পরীক্ষা করার জন্য গবেষণা এলাকা কুমিল্লা ও শ্রীমঙ্গল এই দুটি স্টেশনের ৫ সেন্টিমিটার, ১০ সেন্টিমিটার, ২০ সেন্টিমিটার, ৩০ সেন্টিমিটার ও ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতার ক্ষেত্রে ২০০৩-২০১৩ সাল পর্যন্ত ১১ বছরের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এই তথ্য থেকে পরিসংখ্যানিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার কুমিল্লা স্টেশনে ২০০৯ সালের মার্চ মাসে ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন আর্দ্রতা ৯.৬১ শতাংশ এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ৫২.৫৬ শতাংশ ছিল। গবেষণা এলাকার শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ২৬.৫৪ শতাংশ এবং ২০১০ সালের মার্চ মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন আর্দ্রতা ৬.৪২ শতাংশ ছিল। গবেষণার সুবিধার জন্য ১৩ বছরের উপাত্ত থেকে প্রতি চার বছরের তথ্য নিয়ে গড় করে সারণি তৈরি করা হয়েছে। এই সারণি বিশ্লেষণের তথ্য নিম্নে আলোচনা করা হল।

৭.২.১ শ্রীমঙ্গল স্টেশনে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

১) গবেষণার জন্য ৭.১ নং সারণি বিশ্লেষণ করে জানা যায় শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ২০১১-১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১১.০৫ শতাংশ ও ২০০৩-০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৪.৬৩ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমঙ্গল স্টেশনে প্রতি চার বছরের গড় থেকে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতার পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

২) ৭.১ সারণি হতে দেখা যায় শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ২০১১-১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১১.০৫শতাংশ ও ২০১১-১৩ সালের নভেম্বর মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২০.৫৪শতাংশ দেখা যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতার পরিমাণ খুব কম

হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়। তার পরও মাঝে মাঝে এই সময় মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র ৭.১: শ্রীমঙ্গল স্টেশনে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতার বিশ্লেষণ

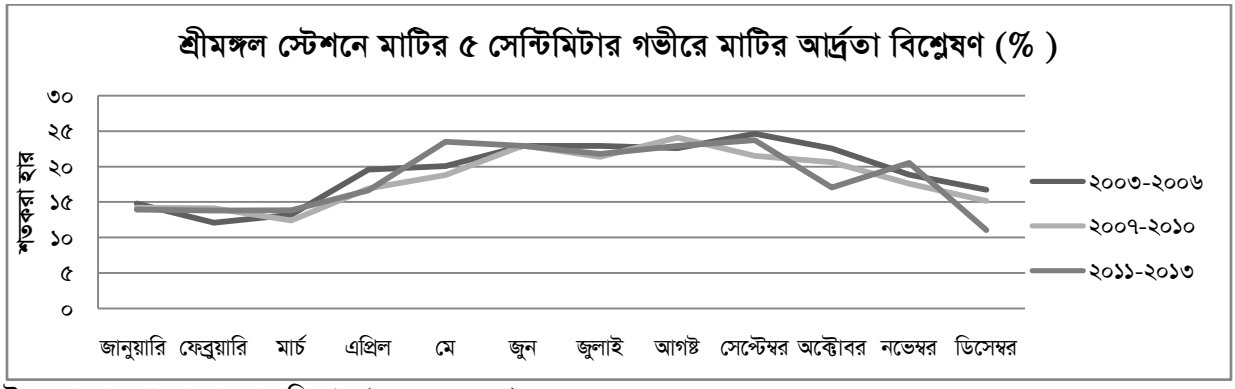

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (২০০৩-২০১৩)

৩) গবেষণার ৭.১ নং সারণি বিশ্লেষণ করে জানা যায় শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ২০০৩-০৬ সালের এপ্রিল মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ১৯.৫৮ শতাংশ ও ২০০৭-২০১০ সালের মার্চ মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১২.৪১শতাংশ দেখা যায়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। পরিসংখ্যানিক গড় থেকে দেখা যায় যে, এ সময় বাতাস খুবই উতপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে 'কালবৈশাখী' বলা হয়।

৪) বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গবেষণার এলাকার ৭.১ নং সারণি হতে দেখা যায় যে, ২০০৩-০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৪.৬৩ শতাংশ এবং ২০১১-১৩ সালের অক্টোবর মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৭.০৫ শতাংশ দেখা যায়।

৭.২.২ কুমিল্লা স্টেশনে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

১) গবেষণা সারণি ৭.২ নং থেকে জানা যায় যে, কুমিল্লা স্টেশনে ২০০৭-১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ৪৩.২৯ শতাংশ ও ২০০৭-০৯ সালের জানুয়ারী মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৯.২৫ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়। কুমিল্লা স্টেশনে প্রতি চার বছরের গড় থেকে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতার পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

২) গবেষণা সারণি ৭.২ নং থেকে জানা যায় ২০০৯-০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ২০.৮৭ শতাংশ ও ২০০৭-২০১০ সালের নভেম্বর মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ৩২.২৬ শতাংশ। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে তাপমাত্রার পরিমাণ খুব কম হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়।

চিত্র ৭.২: কুমিল্লা স্টেশনে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ (শতাংশ)

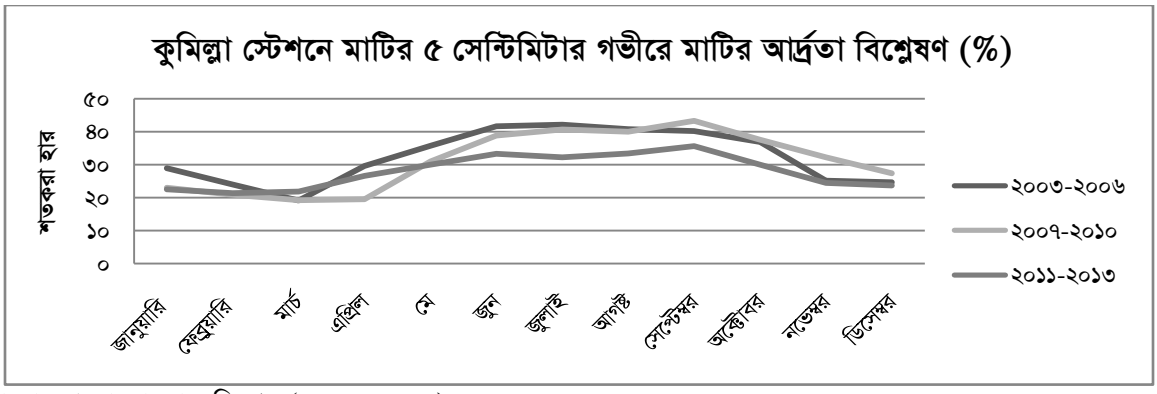

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (২০০৩-২০১৩)

৩) গবেষণার ৭.২ নং সারণি থেকে দেখা যায়, এই সময়ে কুমিল্লা স্টেশনে ২০০৭-১০ সালের র্মাচ মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৯.২৫ শতাংশ ও ২০০৩-২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৯.৫৯ শতাংশ দেখা যায়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উতপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে।

৪) বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গবেষণা সারণি ৭.২ নং থেকে দেখা যায় ২০১১-১৪ সালের অক্টোবর মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ৩০.০৪ শতাংশ ও ১৯৮৯-৮৫ সালের সেপ্টম্বর মাসে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ৪৩.২৯শতাংশ দেখা যায়।

৭.৩. মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

পরিসংখ্যানিক উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার কুমিল্লা স্টেশনে ২০০৯ সালের মার্চ মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন আর্দ্রতা ৯.৬১ শতাংশ এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ৫২.৫৬ শতাংশ ছিল। গবেষণা এলাকার শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ২৫.২৬ শতাংশ এবং ২০১২ সালের মার্চ মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন আর্দ্রতা ৭.৫৯ শতাংশ ছিল। গবেষণার সুবিধার জন্য ১৩ বছরের তথ্য থেকে চার বছরের তথ্য নিয়ে গড় করে সারণি তৈরি করা হয়েছে। সারণি বিশ্লেষণের তথ্য নিম্নে আলোচনা করা হল।

৭.৩.১ শ্রীমঙ্গল স্টেশনে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

১) গবেষণা এলাকার ৭.৩ নং সারণি বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ২০১৩-২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১০.২৭ শতাংশ। ২০০৩-০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৩.৪৪ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমঙ্গল স্টেশনে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতার পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতার তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

২) গবেষণা এলাকার জন্য ৭.৩ নং সারণি হতে দেখা যায় যে, ২০১১-১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১০.২৭ শতাংশ। ২০১১-১৩ সালের নভেম্বর মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ১৯.১১ শতাংশ দেখা যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে বায়ু প্রবাহের পরিমাণ খুব কম হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়। এই সময় মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাঝে মাঝে মাটির আর্দ্রতা কম পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র ৭.৩: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

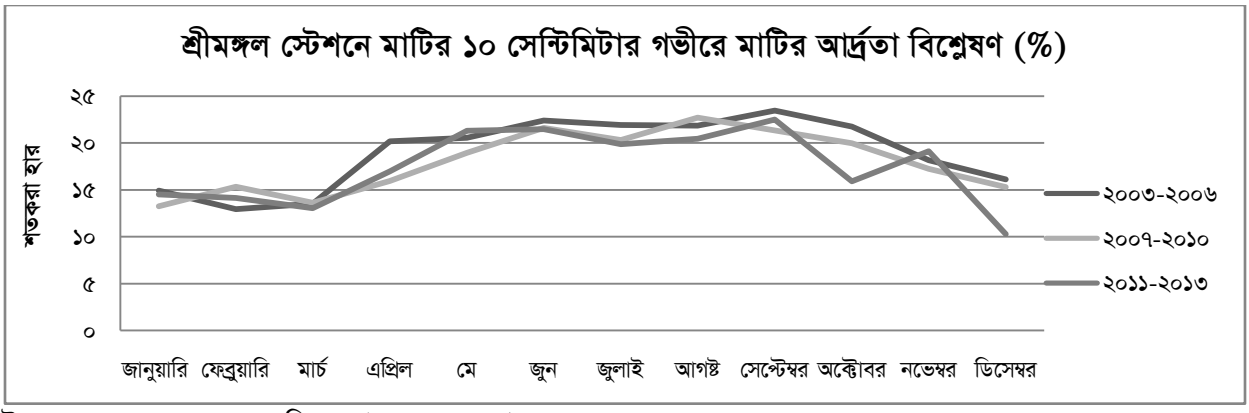

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (২০০৩-২০১৩)

৩) গবেষণার ৭.৩ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ২০০৩-২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২০.১৭৫ ও ২০১১-১৩ সালের মার্চ মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৩.০৩ শতাংশ ছিল। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উতপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে 'কালবৈশাখী' বলা হয়।

৪) বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গবেষণার ৭.৩ নং সারণি হতে দেখা যায় যে, ২০০৩-২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৩.৪৪ শতাংশ এবং ২০১৩-২০১১ সালের অক্টোবর মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৫.৮৯ শতাংশ পরিলক্ষিত হয় ।

৭.৩.২ কুমিল্লা স্টেশনে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

১) গবেষণার ৭.৪ নং সারণি বিশ্লেষণ করে প্রতি চার বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, কুমিল্লা স্টেশনে ২০০৩-০৬ সালের অক্টোবর মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ৩২.৩০ শতাংশ। ২০০৭-১০ সালের মার্চ মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৮.২০ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়। কুমিল্লা স্টেশনে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির গড় আর্দ্রতার পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

২) গবেষণার ৭.৪ নং সারণি থেকে জানা যায় যে, ২০০৯-০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৮.৪১ শতাংশ ও ১৯৮৯-৮৫ সালের নভেম্বর মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৫.৩৩ শতাংশ ছিল। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে তাপমাত্রার পরিমাণ খুব কম হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়।

চিত্র ৭.৪: কুমিল্লা স্টেশনে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

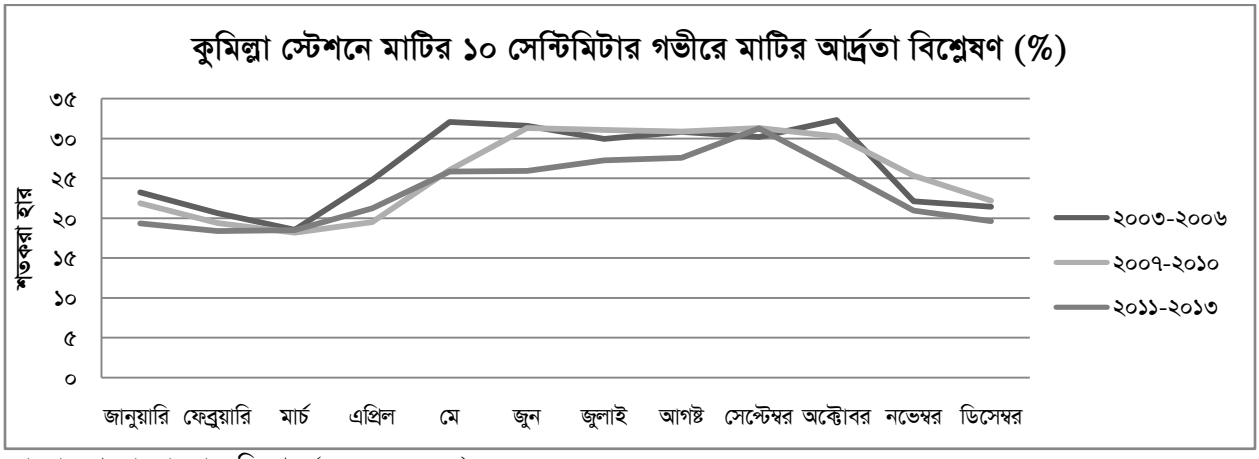

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (২০০৩-২০১৩)

৩) গবেষণা সারণি ৭.৪ নং দেখা যায় যে, কুমিল্লা স্টেশনে ২০০৭-১০ সালের মার্চ মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৮.২০ শতাংশ ও ২০০৩-০৬ সালের এপ্রিল মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৪.৮০ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উতপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে।

৪) বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গবেষণা এলাকার ৭.৪ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০১১-১৩ সালের মে মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ২৫.৮৫ শতাংশ ও ২০০৩-০৬ সালের অক্টোবর মাসে মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ৩২.৩০ শতাংশ ছিল।

৭.৪. মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

গবেষণা এলাকার পরিসংখ্যানিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার কুমিল্লা স্টেশনে ২০০৯ সালের মার্চ মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১১.৯৩ শতাংশ এবং মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ৩০.৯৮ শতাংশ। গবেষণা এলাকার শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ২০১৩ সালের মে মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ছিল ২৭.৩৭ শতাংশ এবং ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ছিল ২০০৬ সালের মার্চ মাসে ৮.২৯ শতাংশ। গবেষণার সুবিধার জন্য ১৩ বছরের তথ্য থেকে চার বছরের তথ্য নিয়ে গড় করে সারণি তৈরি করা হয়েছে। এই সারণি বিশ্লেষণের তথ্য নিম্নে আলোচনা করা হল।

৭.৪.১ শ্রীমঙ্গল স্টেশনে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

১) গবেষণার ৭.৫ নং সারণি বিশ্লেষণ করে প্রতি চার বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ২০১৩-২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১০.২৯ শতাংশ। ২০০৭-২০১০ সালের আগস্ট মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২১.১৭ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমঙ্গল স্টেশনে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতার গড়ের পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতার তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

২) গবেষণার ৭.৫ নং সারণি হতে দেখা যায় যে, ২০১৩-২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১০.২৯ শতাংশ। ২০১১-১৩ সালের নভেম্বর মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ১৮.০৩ শতাংশ দেখা যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতার পরিমাণ খুব কম হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়। তার পরও মাঝে মাঝে এই সময় মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা কম পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র ৭.৫: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

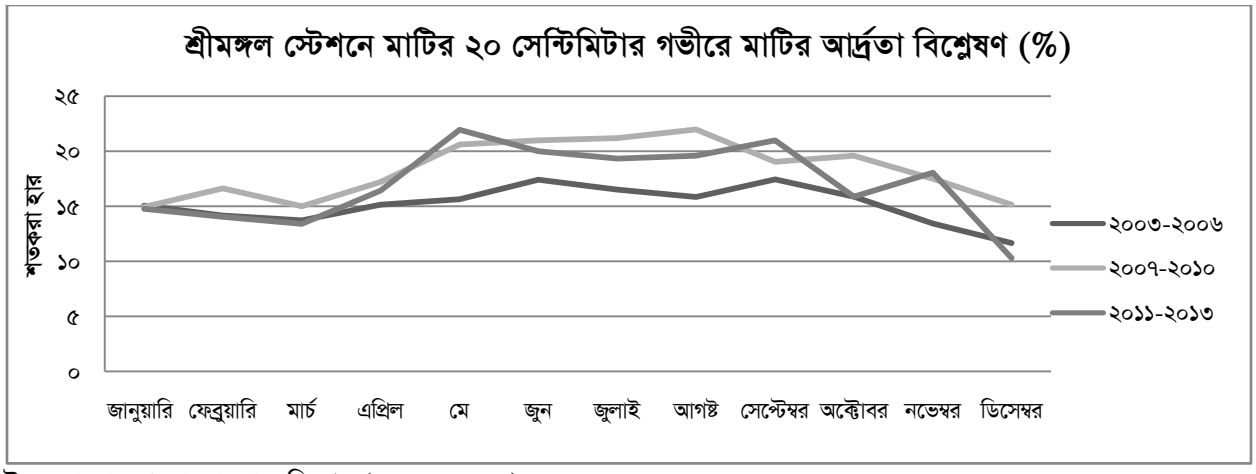

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (২০০৩-২০১৩)

৩) গবেষণার ৭.৫ নং সারণি বিশ্লেষণ করে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ২০১১-১৩ সালের এপ্রিল মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ১৬.৪২ শতাংশ ও ২০০৩-০৬ সালের মার্চ মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৩.৭৩ শতাংশ ছিল। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে 'কালবৈশাখী' বলা হয়।

৪) বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গবেষণার ৭.৫ নং সারণি হতে দেখা যায় যে, ২০০৭-১০ সালের আগস্ট মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২১.৯৬ শতাংশ এবং ২০০৩-০৬ সালের মে মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৫.৬২ শতাংশ দেখা যায়।

৭.৪.২ কুমিল্লা স্টেশনে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

১) গবেষণা সারণি ৭.৬ নং থেকে প্রতি চার বছরের গড় করে দেখা যায় যে, কুমিল্লা স্টেশনে ২০০৭-১০ সালের জুন মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা হয় ২৮.২০ শতাংশ ও ২০১১-১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হয় ১৬.৪৫ শতাংশ। কুমিল্লা স্টেশনে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির গড় আর্দ্রতার পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

২) গবেষণা সারণি ৮.৬ নং থেকে জানা যায় ২০১১-১৩ সালের জানুয়ারী মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৬.৪৫ শতাংশ। ২০০৭-১০ সালের নভেম্বর মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৪.৩৯ শতাংশ হয়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে তাপমাত্রা পরিমাণ খুব কম হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়।

চিত্র ৭.৬: কুমিল্লা স্টেশনের ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

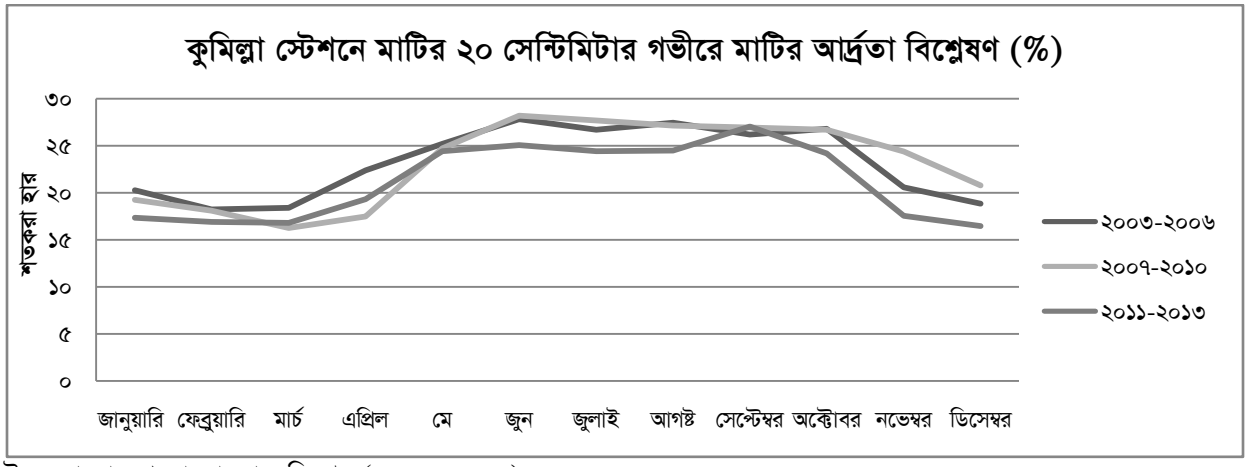

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (২০০৩-২০১৩)

৩) গবেষণা সারণি ৭.৬ নং এ দেখা যায় যে, এই সময়ে কুমিল্লা স্টেশনে ২০১১-১৩ সালের র্মাচ মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৬.২৪ শতাংশ ও ২০০৩-২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২২.৪০ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়।

৪) বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গবেষণা সারণি ৭.৬ নং এ দেখা যায় ২০১১-১৩ সালের অক্টোবর মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ২৪.১৯ শতাংশ ও ২০০৭-১০ সালের জুন মাসে মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৮.২০ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়।

৮.৫ মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

পরিসংখ্যানিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার কুমিল্লা স্টেশনে ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১১.৭ শতাংশ এবং ২০০৭ সালের জুলাই মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ৩০.০৮ শতাংশ ছিল। গবেষণা এলাকার শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ২০০৭ সালের মে মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ছিল ২৯.১ শতাংশ ও ২০১২ সালের মার্চ মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ছিল ১১.২১ শতাংশ। গবেষণার সুবিধার জন্য ১৩ বছরের তথ্য থেকে চার বছরের তথ্য নিয়ে গড় করে সারণি তৈরি করা হয়েছে। এই সারণি বিশ্লেষণের তথ্য নিম্নে আলোচনা করা হলো।

৭.৫.১ শ্রীমঙ্গল স্টেশনে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

১) গবেষণার ৭.৭ নং সারণি বিশ্লেষণ করে প্রতি চার বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ২০১৩-২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১০.৪২ শতাংশ। ২০০৩-০৬ সালের জুন মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৩.৪৮ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমঙ্গল স্টেশনে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতার পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতার তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

২) গবেষণার ৭.৭ নং সারণি হতে দেখা যায় যে, ২০১৩-২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১০.৪২ শতাংশ। ২০০৭-১০ সালের নভেম্বর মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ১৮.২৩ শতাংশ দেখা যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা পরিমাণ খুব কম হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়। তার পরও মাঝে মাঝে এই সময় মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা কম পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র ৭.৭: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

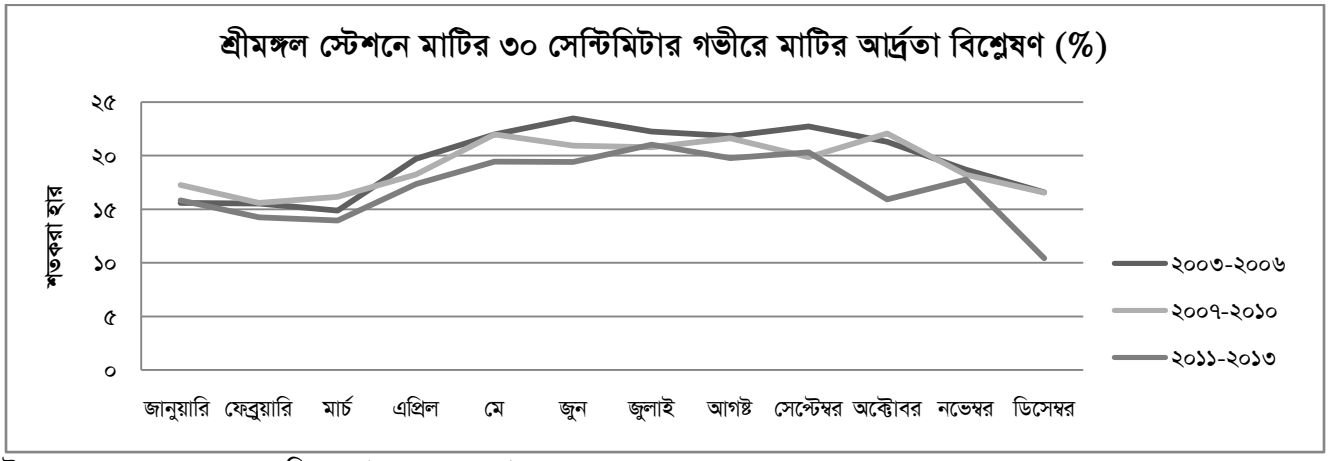

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (২০০৩-২০১৩)

৩) গবেষণার ৭.৭ নং সারণি বিশ্লেষণ করে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ২০০৩-০৬ সালের এপ্রিল মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ১৯.৭২ শতাংশ ও ২০১১-১৩ সালের মার্চ মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৩.৯৫ শতাংশ ছিল। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে 'কালবৈশাখী' বলা হয়।

৪) বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গবেষণার ৭.৭ নং সারণি হতে দেখা যায় যে, ২০০৩-০৬ সালের জুন মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৩.৪৮ শতাংশ এবং ২০১৩-২০১১ সালের অক্টোবর মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৫.৯১ শতাংশ ছিল।

৭.৫.২ কুমিল্লা স্টেশনের মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

১) গবেষণা সারণি ৭.৮ নং প্রতি চার বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, কুমিল্লা স্টেশনে ২০০৭-২০১০ সালের জুন মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৭.৯৫ শতাংশ ও ২০১১-১৩ সালের মার্চ মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হয় ১৬.১৭শতাংশ। কুমিল্লা স্টেশনে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতার পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

২) গবেষণা সারণি ৭.৮ নং থেকে জানা যায় ২০১১-১৩ সালের নভেম্বর মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৫.২১ শতাংশ ও ২০০৭-২০১০ সালের নভেম্বর মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৩.১৭ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে তাপমাত্রার পরিমাণ খুব কম হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়।

চিত্র ৭.৮: কুমিল্লা স্টেশনে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

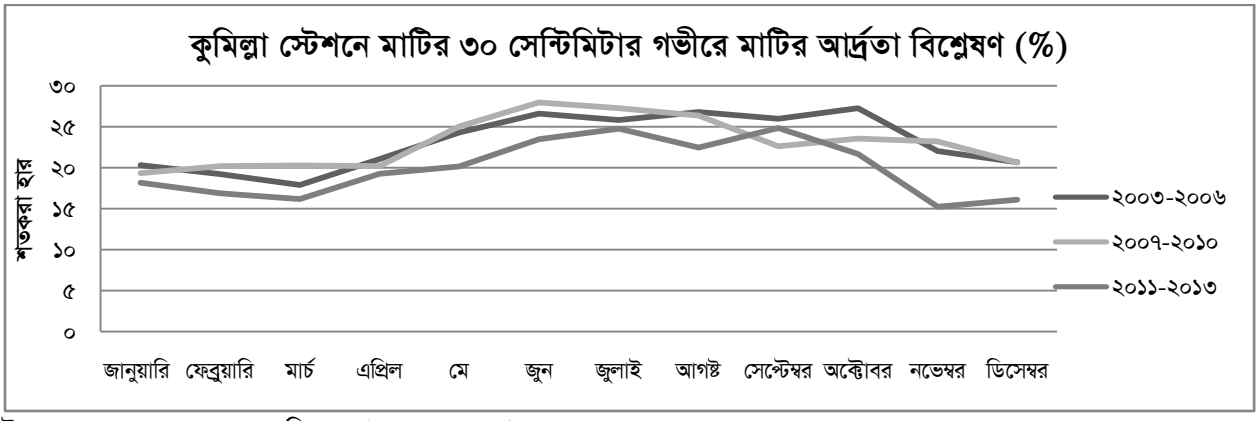

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (২০০৩-২০১৩)

৩) গবেষণা সারণি ৭.৮ নং বিশ্লেষণ করে দেখা যায় কুমিল্লা স্টেশনে ২০১১-১৩ সালের মার্চ মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৬.১৭ শতাংশ ও ২০০৩-০৬ সালের এপ্রিল মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হয় ২১.০৭ শতাংশ। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে।

৪) বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গবেষণা সারণি ৭.৮ নং দেখা যায় ২০০৩-০৬ সালের মে মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ২০.১৭ শতাংশ ও ২০০৭-১০ সালের জুন মাসে মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৭.৯৫ শতাংশ দেখা যায়।

৭.৬. মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

পরিসংখ্যানিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার কুমিল্লা স্টেশনে ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১২.৩০ শতাংশ এবং ২০০৭ সালের জুলাই মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ছিল ৩২.০৬ শতাংশ। গবেষণা এলাকার শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ২০০৭ সালের মে মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ৩১.২৯ শতাংশ এবং ২০০৬ সালের মার্চ মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১১.৭ শতাংশ ছিল। গবেষণার সুবিধার জন্য ১৩ বছরের তথ্য থেকে প্রতি চার বছরের তথ্য নিয়ে গড় করে সারণি তৈরি করা হয়েছে। এই সারণি বিশ্লেষণের তথ্য নিম্নে আলোচনা করা হল।

৭.৬.১ শ্রীমঙ্গল স্টেশনের মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

১) গবেষণার ৭.৯ নং সারণি বিশ্লেষণ করে প্রতি চার বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ২০১৩-২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১০.৮৫ শতাংশ। ২০০৩-০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৪.৭৯ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমঙ্গল স্টেশনে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির গড় আর্দ্রতার পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতার তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

২) গবেষণার ৭.৯ সারণি হতে দেখা যায় যে, ২০১৩-২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১০.৮৫ শতাংশ ছিল। ২০০৩-০৬ সালের নভেম্বর মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২০.৪৮ শতাংশ দেখা যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে মাটির গড় আর্দ্রতা পরিমাণ খুব কম হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়। তার পরও মাঝে মাঝে এই সময় মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা কম পরিলক্ষিত হয়।

৩) চিত্র ৭.৯: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

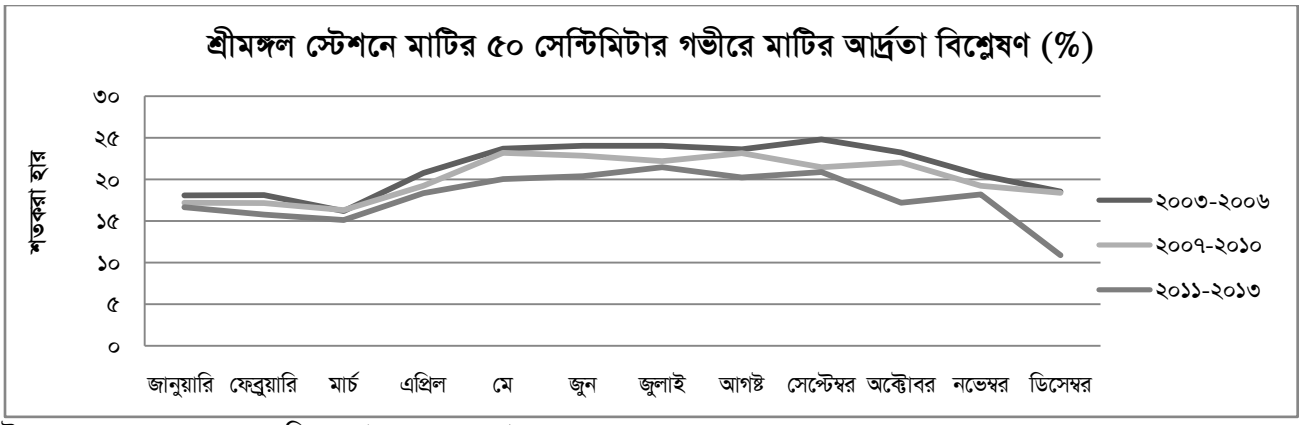

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (২০০৩-২০১৩)

৪) গবেষণার ৭.৯ নং সারণি থেকে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ২০০৩-০৬ সালের এপ্রিল মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২০.৭৩ শতাংশ ও ২০১১-১৩ সালের মার্চ মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৫.১১ শতাংশ ছিল। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উতপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে 'কালবৈশাখী' বলা হয়।

৫) বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গবেষণার ৭.৯ নং সারণি হতে দেখা যায় যে, ২০০৩-২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৪.৭৯ শতাংশ এবং ২০১৩-২০১১ সালের অক্টোবর মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৭.১৭ শতাংশ।

৭.৬.২ কুমিল্লা স্টেশনে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

১) গবেষণা সারণি ৭.১০ নং বিশ্লেষণ করে প্রতি চার বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, কুমিল্লা স্টেশনে ২০০৩-০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা হয় ১৫.২৭ শতাংশ ও ২০০৭-১০ সালের জুলাই মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৯.২৫ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়। কুমিল্লা স্টেশনে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির গড় আর্দ্রতার পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

২) গবেষণা সারণি ৭.১০ নং থেকে জানা যায় যে, ২০০৩-০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৫.২৭ শতাংশ ও ২০০৭-১০ সালের নভেম্বর মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৬.০৮ শতাংশ দেখা যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে তাপমাত্রার পরিমাণ খুব কম হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়।

চিত্র ৭.১০: কুমিল্লা স্টেশনে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ

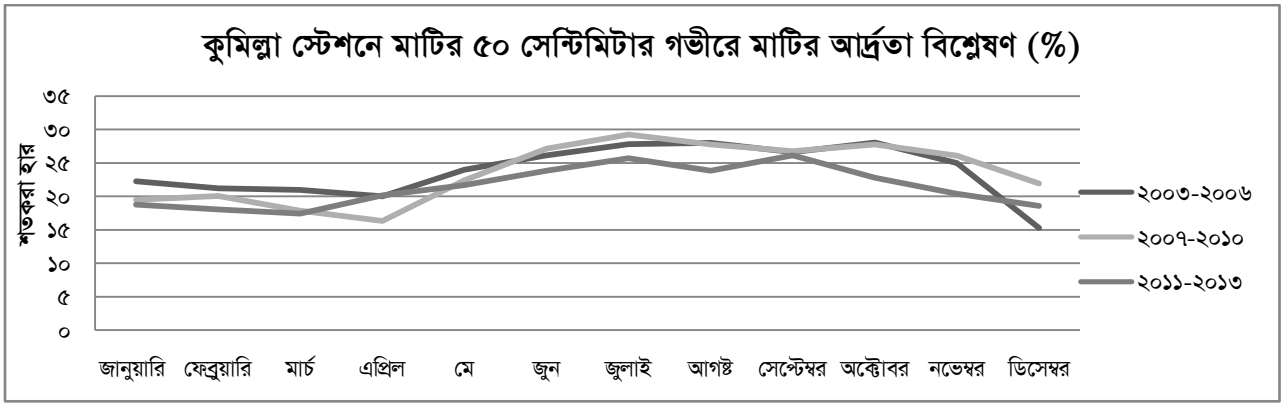

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (২০০৩-২০১৩)

৩) মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। গবেষণা সারণি ৭.১০ নং দেখা যায় যে, কুমিল্লা স্টেশনে ২০০৩-০৬ সালের মার্চ মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২০.৯৮ শতাংশ ও ২০০৭-১০ সালের এপ্রিল মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ১৬.৩১ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়।

৪) বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গবেষণা সারণি ৭.১০ নং থেকে দেখা যায় যে, ২০১১-১৩ সালের মে মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বনিম্ন গড় আর্দ্রতা ২১.৬৯ শতাংশ ও ২০০৭-১০ সালের জুলাই মাসে মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ২৯.২৫ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়।

৭.৭ মেঘনা নদীর পানির পরিবর্তনশীলতা নির্ণয়

মেঘনা নদীর পানির জোয়ারের পরিবর্তনশীলতা পরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে গবেষণা এলাকার ২৪.০৫২৭ অক্ষাংশ ও ৯১.০০ দ্রাঘিমাংশ রেখায় সুরমা-মেঘনা নামক SW273 নং ভৈরব বাজার স্টেশন থেকে জোয়ার ভাটার পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ১৯৬৮ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত মোট ১৬৪৪৩টি জোয়ার ভাটার তালিকা সংগ্রহ করে পর্যবেক্ষণ করা হয়। ১৯৬৮ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত মোট ৪৬ বছরের জোয়ার ভাটার পরিবর্তনের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এই তথ্য থেকে পরিসংখ্যানিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে গবেষণা এলাকার SW273 নং ভৈরব বাজার স্টেশনে ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে সর্বোচ্চ জোয়ারের মাত্রা ছিল ৭.২০ মিটার ও ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন জোয়ারের মাত্রা ১.৩৯ মিটার ছিল। গবেষণার সুবিধার জন্য ৪৬ বছরের তথ্য থেকে প্রতি আট বছরের তথ্য নিয়ে গড় করে সারণি তৈরি করা হয়েছে। এই সারণি বিশ্লেষণের তথ্য নিম্নে আলোচনা করা হল।

৭.৭.১ ভৈরব বাজার স্টেশনের জোয়ার বিশ্লেষণ

১) গবেষণার ৭.১১ নং সারণি বিশ্লেষণ করে প্রতি আট বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, ভৈরব বাজার স্টেশনে ১৯৮৬-১৯৯৪ সালের সর্বনিম্ন জোয়ারের গড় ছিল জানুয়ারি মাসে ১.৬১ মিটার। ভৈরব বাজার স্টেশনে ১৯৬৮-১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে সর্বোচ্চ জোয়ারের গড় ৬.৩৯ মিটার পরিলক্ষিত হয়। ভৈরব বাজার স্টেশনে জোয়ারের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করে পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই জোয়ারের তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

চিত্র ৭.১১: ভৈরব বাজার স্টেশনের জোয়ারের হার বিশ্লেষণ

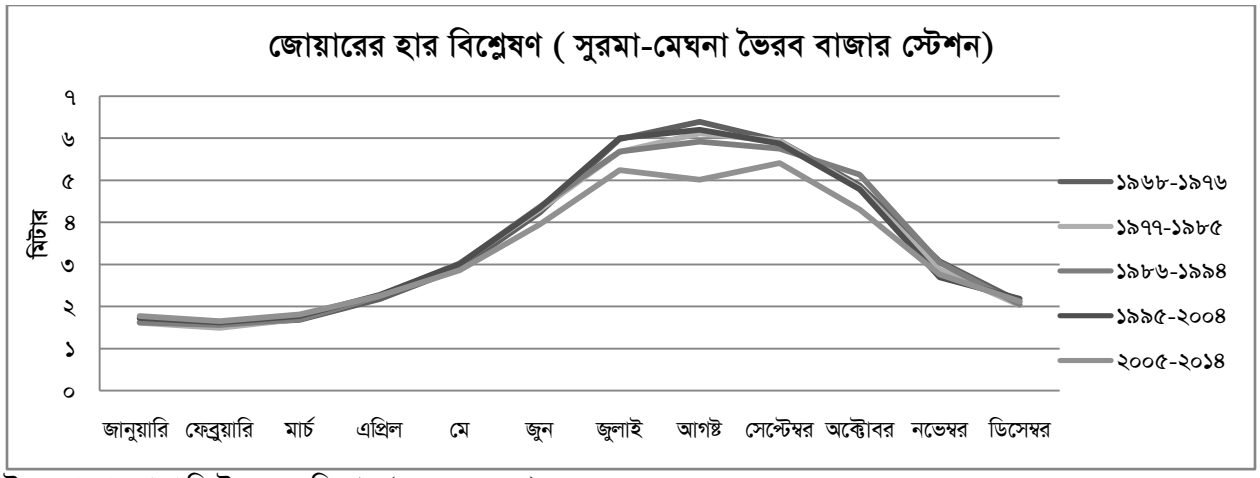

উৎস: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন অধিদপ্তর (১৯৬৮-২০১৪)

২) গবেষণার ৭.১১ নং সারণি হতে দেখা যায় যে, ১৯৮৬-১৯৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে সর্বনিম্ন জোয়ারের গড় ১.৬১৫ মিটার ও ১৯৬৮-১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে সর্বোচ্চ জোয়ারের গড় ৩.০৭৫ মিটার দেখা যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে বায়ু প্রবাহের পরিমাণ খুব কম হয়। এই সময় অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হওয়াতে জোয়ার ভাটার পরিমানের ভিন্নতা দেখা যায়।

৩) গবেষণার ৭.১১ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ভৈরব বাজার স্টেশনে ১৯৯৫-২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে জোয়ারের সর্বোচ্চ গড় ২.২৭ মিটার ও ১৯৬৮-১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে সর্বনিম্ন জোয়ারের গড় ছিল ১.৬৮ মিটার। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উতপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে।

৪) গবেষণার ৭.১১ নং সারণি হতে দেখা যায় যে, ১৯৬৮-১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে জোয়ারের সর্বোচ্চ গড় ৬.৩৯ মিটার এবং ২০০৫-২০১৪ সালের মে মাসে জোয়ারের সর্বনিম্ন গড় ২.৮৬ মিটার। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই সময়ে বন্যা হয়। গবেষণা এলাকার বন্যা সংঘটিত হওয়ার সময় মে হতে অক্টোবর মাস ধরা হয়।

৭.৭.২ ভৈরব বাজার স্টেশনের ভাটা বিশ্লেষণ

১৯৬৮ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত মোট ৪৬ সালের জোয়ার ভাটার পরিবর্তনের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এই তথ্য থেকে পরিসংখ্যানিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার SW273 নং ভৈরব বাজার স্টেশনে ১৯৯৪ ও ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে সর্বনিম্ন ভাটা মাত্রা ১.২০ মিটার ও ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে সর্বোচ্চ ভাটা মাত্রা ছিল ৭.২০ মিটার। গবেষণার সুবিধার জন্য ৪৬ বছরের তথ্য থেকে প্রতি আট বছরের তথ্য নিয়ে গড় করে সারণি তৈরি করা হয়েছে। এই সারণি বিশ্লেষণের তথ্য নিম্নে আলোচনা করা হল।

১) গবেষণা সারণি ৭.১২ নং বিশ্লেষণ করে প্রতি আট বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, ভৈরব বাজার স্টেশনে ১৯৬৮-৭৬ সালের আগস্ট মাসে সর্বোচ্চ ভাটার গড় ৬.৩৯ মিটার ও ১৯৭৭-৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন ভাটার গড় ১.২৬ মিটার পরিলক্ষিত হয়। ভৈরব বাজার স্টেশনের প্রতি বছরই ভাটার পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই ভাটার তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

চিত্র ৭.১২: ভৈরব বাজার স্টেশনের ভাটা হার বিশ্লেষণ

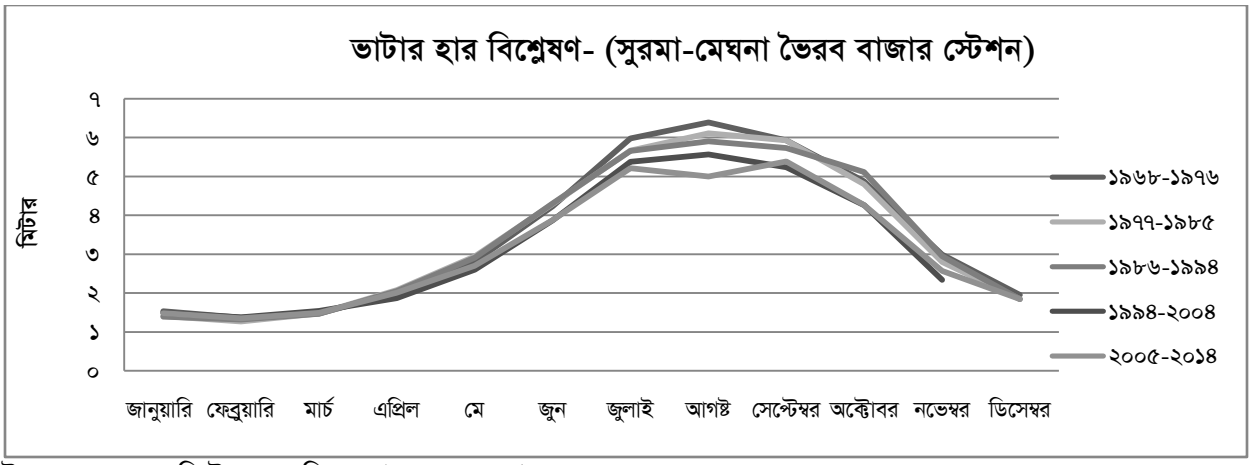

উৎস বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন অধিদপ্তর (১৯৬৮-২০১৪)

২) গবেষণা সারণি ৭.১২ নং থেকে জানা যায় যে, ১৯৭৭-৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন ভাটার গড় ১.২৬ মিটার ও ১৯৬৮-৭৬ সালের নভেম্বর মাসে সর্বোচ্চ ভাটার পরিমাণ ২.৯৮ মিটার দেখা যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে তাপমাত্রার পরিমাণ খুব কম হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়।

৩) গবেষণা সারণি ৭.১২ নং এ দেখা যায় এই সময়ে ভৈরব বাজার স্টেশনে ১৯৮৬-১৯৯৪ সালের র্মাচ মাসে সর্বনিম্ন ভাটার গড় ১.৪৬ মিটার ও ১৯৭৭-৮৫ সালের এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ ভাটার গড় ২.০৭ মিটার পরিলক্ষিত হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে।

৪) বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গবেষণা সারণি ৭.১২ নং এ দেখা যায় ভৈরব বাজার স্টেশনে ১৯৯৪-০৪ সালের মে মাসে সর্বনিম্ন ভাটার গড় ২.৬০ ও ১৯৮৯-৮৫ সালের আগস্ট মাসে সর্বোচ্চ ভাটার গড় ৬.৩৯ মিটার দেখা যায়।

৭.৭.৩ ভৈরব বাজার স্টেশনের পানি নির্গমণ হার বিশ্লেষণ

১৯৭৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত মোট ৪০ বছরের পানির নির্গমন হারের পরিবর্তনের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। ১৯৭৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত মোট ৮০৮টি পানির নির্গমন হার তালিকা সংগ্রহ করে পর্যবেক্ষণ করা হয়। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাসের পানি নির্গমনের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। ১৯৮৮ সালের পর থেকে শুধু মাত্র মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত তথ্য বেশি পাওয়া গিয়েছে। অন্য মাসগুলোর তথ্য ঠিক মত পাওয়া যায়নি। ১৯৭৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সকল তথ্যকে পরিসংখ্যানিক উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার SW273 নং ভৈরব বাজার স্টেশন ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে সর্বোচ্চ পানির নির্গমন হার ছিল ১৪৯৬৬.৬৭ কিউ/সে সর্বনিম্ন পানির নির্গমন হার ছিল ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৩.৪ কিউ/সে। গবেষণার সুবিধার জন্য ৪০ বছরের তথ্য থেকে প্রতি দশ বছরের তথ্য নিয়ে গড় করে সারণি তৈরি করা হয়েছে। এই সারণি বিশ্লেষণের তথ্য নিম্নে আলোচনা করা হল।

১) গবেষণার ৭.১৩ নং সারণি বিশ্লেষণ করে প্রতি আট বছরের গড় থেকে দেখা যায় যে, ভৈরব বাজার স্টেশনে ১৯৭৪-৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পানির নির্গমন হারের সর্বনিম্ন গড় ১২.৭ কিউ/সে ও ১৯৯৫-২০০৪ সালের আগস্ট মাসে পানির নির্গমন হারের সর্বোচ্চ গড় ১১১৭০.৭১ কিউ/সে পরিলক্ষিত হয়। ভৈরব বাজার স্টেশনের প্রতি বছরই পানি নির্গমন হারের পরিবর্তনশীলতা দেখতে পাই। প্রতি বছরই পানির নির্গমন হারের তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

চিত্র ৭.১৩: ভৈরব বাজার স্টেশনের পানি নির্গমণ হার বিশ্লেষণ

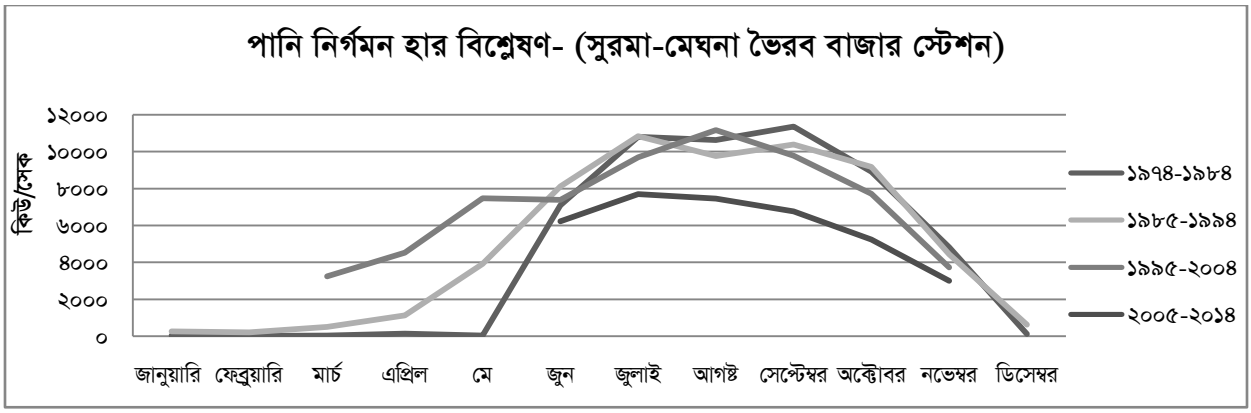

উৎস : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন অধিদপ্তর (১৯৭৪-২০১৪)

২) এই সময়ের খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায়নি। যেটুকু তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা বিশ্লেষণ করে গবেষণার ৭.১৩ নং সারণি হতে দেখা যায় যে, ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পানির নির্গমন হারের সর্বনিম্ন গড় ১২.৭ কিউ/সে ও ১৯৮৫-৯৪ সালের নভেম্বর মাসে পানির নির্গমন হারের সর্বোচ্চ ৪৪৪৩.৭৬ কিউ/ সে দেখা যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে বায়ু প্রবাহের পরিমাণ খুব কম হয়। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল হয়। তার পরও মাঝে মাঝে পানির নির্গমন হার অনেক কম পরিলক্ষিত হয়।

৩) মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উতপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে 'কালবৈশাখী' বলা হয়। গবেষণার ৭.১৩ নং সারণি থেকে জানা যায় যে, ভৈরব বাজার স্টেশনের ১৯৯৫-২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে পানি নির্গমনের সর্বোচ্চ গড় ৪৫২২.৬২ কিউ/সে ও ১৯৮৫-৯৪ সালের মার্চ মাসে পানির সর্বনিম্ন নির্গমন গড় ৪৯০.৫ কিউ/ সে ছিল।

৪) বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গবেষণার ৭.১৩ নং সারণি হতে দেখা যায় যে, ১৯৯৫-০৪ সালের আগস্ট মাসে ভৈরব বাজার স্টেশনের পানির নির্গমন হারের সর্বোচ্চ গড় ১১১৭০.৭১ কিউ/সে এবং ১৯৭৪-৮৪ সালের মে মাসে পানির নির্গমন হারের সর্বনিম্ন গড় ৩১.৫৫ কিউ/সে দেখা যায়।

৭.৮. মৃত্তিকার বিশ্লেষণ

গবেষণা এলাকার মৃত্তিকাকে বিশ্লেষণ করার জন্য বাংলাদেশ মৃত্তিকা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট থেকে মৃত্তিকা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ১৯৯৩ ও ২০১৩ সালের মৃত্তিকার বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে মৃত্তিকার জৈব বিশ্লেষণ, মৃত্তিকার পিএইচ ও মৃত্তিকার অম্লত্ব বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। এই সকল তথ্যের আলোকে গবষেণা এলাকার ২০ বছরের মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। নিম্নে এদের বর্ণনা দেওয়া হল।

গবেষণা এলাকার মৃত্তিকা পরিমাপ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকাটিতে সাত প্রকার মৃত্তিকা রয়েছে। চান্দিনা দোআঁশ মাঝার উঁচু, চান্দিনা দোআঁশ মাঝারি নিচু, দেবীদ্বার এটেল দোআঁশ মাঝারি উঁচু, দেবীদ্বার এটেল দোআঁশ মাঝারি নিচু জমি, বুড়িচং এটেল মাঝারি নিচু জমি, মেঘনার বেলে পলি দোআঁশ অতি নিচু জমি, ও মেঘনার দোআঁশ পলি অতি নিচু জমি। প্রতিটি মাটিরই নিজস্ব ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর যে কোনো একটি পরিবর্তন হলে তা জীব বৈচিত্র্যের পরিবর্তন ঘটাবে। বাংলাদেশ মৃত্তিকা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট থেকে পাওয়া তথ্যের আলোকে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার মৃত্তিকার জৈব পদার্থের পরিবর্তন ঘটেছে।

চিত্র ৭.১৪: মৃত্তিকার জৈব পদার্থ বিশ্লেষণ

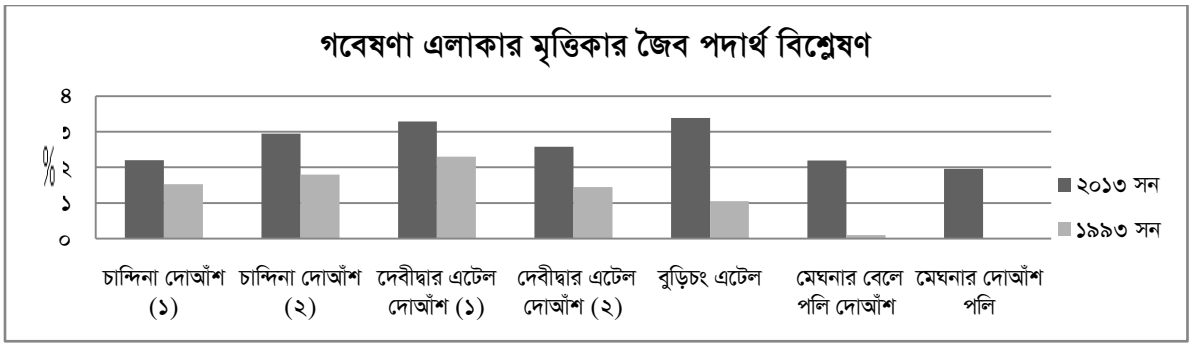

উৎস - বাংলাদেশ মৃত্তিকা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (১৯৯৩-২০১৩)

৭.১৪ নং সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে চান্দিনা দোআঁশ মৃত্তিকায় ১৯৯৩ সালে জৈব পদার্থের পরিমাণ ছিল ১.৫৩ শতাংশ। ২০১৩ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ২.২ হয়েছে। একই ভাবে অন্যান মৃত্তিকার জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে সারনি ৭.১৪ তে তার পরিমাণ দেওয়া আছে।

৭.৮.২ গবেষণা এলাকার মৃত্তিকার পি এইচ বিশ্লেষণ

গবেষণা এলাকায় চান্দিনা দোআঁশ মাঝারি উঁচু, চান্দিনা দোআঁশ মাঝারি নিচু, দেবীদ্বার এটেল দোআঁশ মাঝারি উঁচু, দেবীদ্বার এটেল দোআঁশ মাঝারি নিচু জমি, বুড়িচং এটেল মাঝারি নিচু জমি, মেঘনার বেলে পলি দোআঁশ অতি নিচু জমি, ও মেঘনার দোআঁশ পলি অতি নিচু জমি এই সাত প্রকার মৃত্তিকা রয়েছে। এবং প্রতিটি মৃত্তিকার পিএইচ এর মান ভিন্ন। প্রতিটি মাটির জন্য পি এইচ এর মান আলাদা। গবেষণায় দেখা যায় যে, এলাকাটির প্রতিটি মাটির পিএইচ মান আলাদা আলাদা ভাবে সংগ্রহ করে পরিমাপ করা হয়েছে। এই মান থেকে জানা যায় ১৯৯৩ সালে মৃত্তিকার পিএইচ মান বেশি ছিল। ২০১৩ সালে এসে মৃত্তিকার পিএইচ মান কমে গিয়েছে। যেমন চান্দিনা দোআঁশ মাঝারি উঁচু জমি মৃত্তিকার পিএইচ মান ১৯৯৩ সালে ছিল ৫.৩-৬.৭৫। মৃত্তিকা জরিপে ৭.১৫ নং টেবিলে দেখা যায় যে, চান্দিনা দোআঁশ মাঝারি উঁচু জমির পিএইচ ২০১৩ সালে ৪.৭- ৫.৮ হয়। একই ভাবে গবেষণা এলাকার প্রতিটি মৃত্তিকার পিএইচ মান পরিবর্তন হয়েছে। ৭.১৫ নং টেবিলে মৃত্তিকার পি এইচ মানের পরিবর্তন উপস্থাপন করা হল।

টেবিল ৭.১৫: গবেষণা এলাকার মৃত্তিকার পি এইচ বিশ্লেষণ

সন	চান্দিনা দোআঁশ মাঝারি উঁচু জমি	চান্দিনা দোআঁশ মাঝারি নিচু জমি	দেবীদ্বার এটেল দোআঁশ মাঝারি উঁচু জমি	দেবীদ্বার এটেল দোআঁশ মাঝারি নিচু জমি	বুড়িচং এটেল মাঝারি নিচু জমি	মেঘনার বেলে পলি দোআঁশ অতি নিচু জমি	মেঘনার দোআঁশ পলি অতি নিচু জমি
২০১৩	৪.৭-৫.৮	৫.০-৫.৪	৪.৮-৪.৯	৫-৬	৪.৮-৫.৩	৪.৭-৪.৮	৪.৬-৪.৮
১৯৯৩	৫.৩-৬.৭৫	৬.২-৬.৮	৫.০-৬.৫	৫.৮-৭.২	৫.৬-৬.৭	৫.৬	

উৎস - বাংলাদেশ মৃত্তিকা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (১৯৯৩-২০১৩)

৭.৮.৩ গবেষণা এলাকার মৃত্তিকার বিনিময় যোগ্য অম্লত্ব বিশ্লেষণ

গবেষণা এলাকায় চান্দিনা দোআঁশ মাঝারি উঁচু, চান্দিনা দোআঁশ মাঝারি নিচু, দেবীদ্বার এটেল দোআঁশ মাঝারি উঁচু, দেবীদ্বার এটেল দোআঁশ মাঝারি নিচু জমি, বুড়িচং এটেল মাঝারি নিচু জমি, মেঘনার বেলে পলি দোআঁশ অতি নিচু জমি,ও মেঘনার দোআঁশ পলি অতি নিচু জমি এই সাত প্রকার মৃত্তিকা রয়েছে। এবং প্রতিটি মৃত্তিকার অম্লত্বের মান ভিন্ন। গবেষণায় দেখা যায় যে এলাকাটির প্রতিটি মাটির অম্লত্বের মান আলাদা আলাদা ভাবে সংগ্রহ করে পরিমাপ করা হয়েছে। এই মান থেকে জানা যায় ১৯৯৩ সালে মৃত্তিকার অম্লত্বের মান বেশি ছিল। ২০১৩ সালে এসে মৃত্তিকার অম্লত্বের মান কমে গিয়েছে। যেমন চান্দিনা দোআঁশ মাঝারি উঁচু জমি মৃত্তিকার অম্লত্বের মান ১৯৯৩ সালে ছিল ০.৫৫। মৃত্তিকা জরিপে ৭.১৬ নং টেবিলে

দেখা যায় যে, চান্দিনা দোআঁশ মাঝারি উঁচু জমির অম্লত্ব ২০১৩ সালে হয় ০.২৯। একই ভাবে গবেষণা এলাকার প্রতিটি মৃত্তিকার অম্লত্ব মান পরিবর্তন হয়েছে। ৭.১৬ নং টেবিলে মৃত্তিকার অম্লত্ব মানের পরিবর্তন উপস্থাপন করা হল।

টেবিল ৭.১৬: গবেষণা এলাকার মৃত্তিকার বিনিময় যোগ্য অম্লত্ব বিশ্লেষণ

সন	চান্দিনা দোআঁশ মাঝারি উঁচু জমি	চান্দিনা দোআঁশ মাঝারি নিচু জমি	দেবীদ্বার এটেল দোআঁশ মাঝারি উঁচু জমি	দেবীদ্বার এটেল দোআঁশ মাঝারি নিচু জমি	বুড়িচং এটেল মাঝারি নিচু জমি	মেঘনার বেলে পলি দোআঁশ অতি নিচু জমি	মেঘনার দোআঁশ পলি অতি নিচু জমি
২০১৩	০.২৯	০.২৫	০.৫৫	০.১৪	০.৩৬	০.৫১	০.৫৬
১৯৯৩	০.৫৫	০.২	০.৯	০.৫	০.৫	০০	

উৎস - বাংলাদেশ মৃত্তিকা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (১৯৯৩-২০১৩)

অধ্যায় অষ্টম

গবেষণা এলাকায় বিলুপ্ত উদ্ভিদ, প্রাণী ও কৃষি ফসলের মাঠ জরিপ তথ্য

কৃষি ফসল

ভূমিকা

গবেষণা এলাকার ৮৩টি ফসলের উপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই ফসলগুলোকে দানা জাতীয় শস্য, ডাল জাতীয় শস্য, তৈলবীজ জাতীয় শস্য, অর্থকরী ফসল, তরিতরকারি জাতীয় ফসল, কন্দল জাতীয় ফসল, ফল জাতীয় ফসল, মসল্লা জাতীয় শস্য, গো-খাদ্য, জ্বালানী ও বীজ তলা অনুসারে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ভাগ থেকে আলাদা ভাবে ফসল উৎপাদনের হার সংগ্রহ করে বিলুপ্তকৃত ফসল নির্ণয় করা হয়েছে। নিম্নে এই সকল তথ্যের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৮.১. দানা জাতীয় শস্য

৮.১.১ আউশ ধান বিলুপ্তির হার

৮.১.১ নং গ্রাফচিত্রের বিশ্লেষণ করে ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ ও ১৯৮৫ দশকে দেশি বোনো আউশের সর্বোচ্চ উৎপাদনের হার ছিল যথাক্রমে ১.৯৩ ও ৭.১৮ শতাংশ পরবর্তী ১৯৯৫ দশকে দেশি বোনো আউশের উৎপাদন হার হ্রাস পেয়ে ৫৭.৬৬ শতাংশ হয়। ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে এসে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকায় দেশি বোনো আউশ উৎপাদন হার শূন্য হয়। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ দশকে দেশি রোপা আউশের সর্বোচ্চ উৎপাদনের হার ছিল ২.১৬ শতাংশ পরবর্তী ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে দেশি রোপা আউশের উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১২.৪৬ ও ১৮.৩০৩ শতাংশ হয়। ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে এসে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকায় দেশি রোপা আউশ উৎপাদন হার শূন্য হয়। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ দশকে পাইজম আউশের সর্বোচ্চ উৎপাদনের হার ছিল ৫৬.৬২ শতাংশ পরবর্তী ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে পাইজম আউশের উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৬.৩৬ ও ২৫.৯৩ শতাংশ হয়। ২০১৪ দশকে এসে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকায় দেশি পাইজম আউশের উৎপাদন হার শূন্য হয়। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ দশকে উচ্চ ফলনশীল আউশের উৎপাদনের হার ছিল ০ শতাংশ পরবর্তী ১৯৯৫ দশকে এই উৎপাদন হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.৮৭ শতাংশ হয়। ২০১৪ দশকে এসে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকায় উচ্চ ফলনশীল রোপা আউশ উৎপাদন হার ৪৪.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশি বোনো আউশ, দেশি রোপা আউশ, পাইজম আউশ এই তিনটি ফসল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। দেশি বোনো আউশ দেশি রোপা ও পাইজম আউশ এই তিনটি ফসল ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। শুধু মাত্র উচ্চ ফলনশীল আউশের উৎপাদন ধ্রুবক বছর থেকে বর্তমান সময়ে ৪৪.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ৮.১.১: আউশ ধান বিলুপ্তির হার

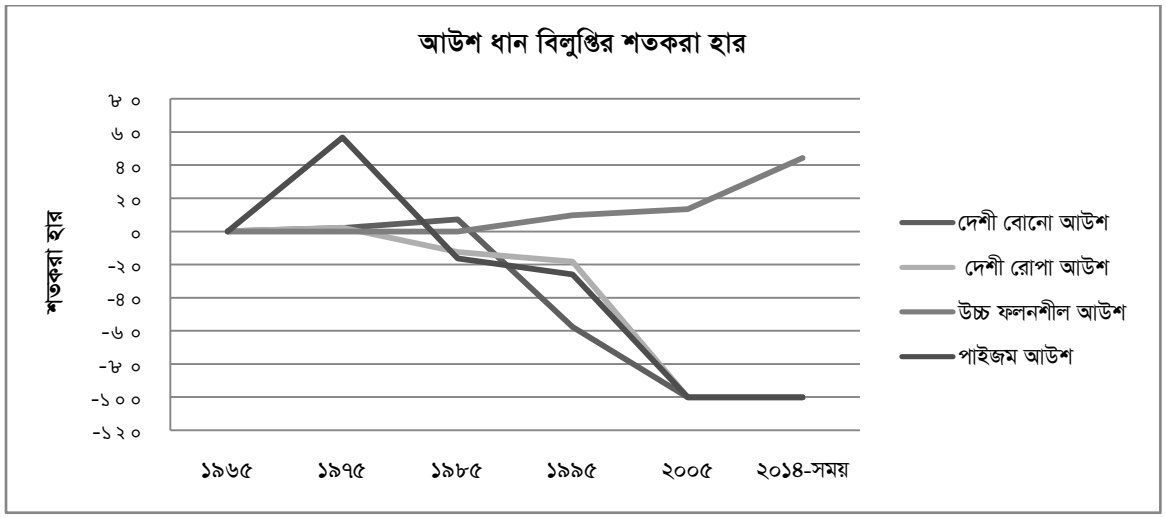

উৎস- বি বি এস (১৯৮৫-২০০৮) ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

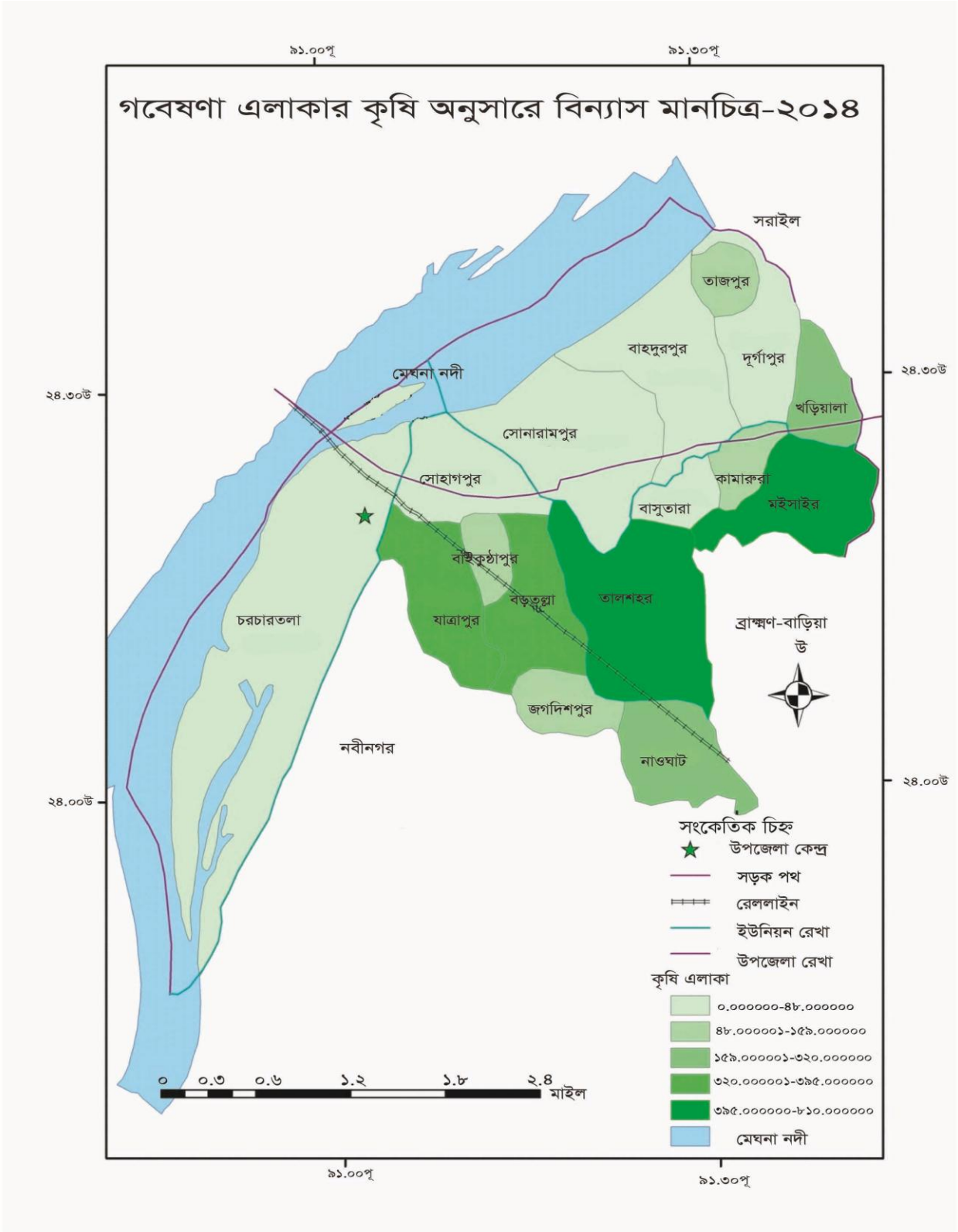

মানচিত্র ৮.১ গবেষণা এলাকার কৃষিজমির মানচিত্র
উৎস- এল জি ই ডি মূল মানচিত্র ২০০৮

৮.১.২ আমন ধান বিলুপ্তির হার

৮.১.২-নং গ্রাফচিত্রের বিশ্লেষণ করে ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ দশক থেকেই দেশি বোনো আমন উৎপাদনের হার হ্রাস পেয়ে ২০.১৩ শতাংশ হয়েছিল, পরবর্তী ১৯৯৫ দশকে এই উৎপাদন হার হ্রাস পেয়ে ৭৫.০৯ শতাংশ হয়। ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে এসে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকায় দেশি বোনো আমন উৎপাদন হার শূন্য হয়। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ দশকে দেশি রোপা আমনের সর্বোচ্চ উৎপাদনের হার ছিল ১১ শতাংশ। পরবর্তী ১৯৯৫ দশকে এই উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ৬৩ শতাংশ হয়। ২০১৪ দশকে এসে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকায় দেশি রোপা আমন উৎপাদন হার শূন্য হয়। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ ও ১৯৮৫ দশকে পাইজম আমনের সর্বোচ্চ উৎপাদনের হার ছিল যথাক্রমে ৬.৪ ও ১০.০৬ শতাংশ। পরবর্তী ২০০৫ দশকে এই উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ৩৩ শতাংশ। ২০১৪ দশকে এসে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকায় পাইজম আমন উৎপাদন হার শূন্য হয়। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ দশকে উচ্চ ফলনশীল আমনের উৎপাদনের হার ছিল ০ শতাংশ পরবর্তী ১৯৯৫ দশকে এই উৎপাদন হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.৩৫ শতাংশ হয়। ২০১৪ দশকে এসে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকায় দেশি রোপা আউশ উৎপাদন হার ১৪১.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চিত্রের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, দেশি বোনো আমন, দেশি রোপা আমন, উচ্চ ফলনশীল আমন, পাইজম আমন এই তিনটি ফসল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ধ্রুবক বছর ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, দেশি বোনো আমন, দেশি রোপা আমন ও পাইজম আমন এই তিনটি ফসল ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। শুধু মাত্র উচ্চ ফলনশীল আমনের উৎপাদন ধ্রুবক বছর থেকে বর্তমান সময়ে ১৪১.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ৮.১.২: আমন ধান বিলুপ্তির হার

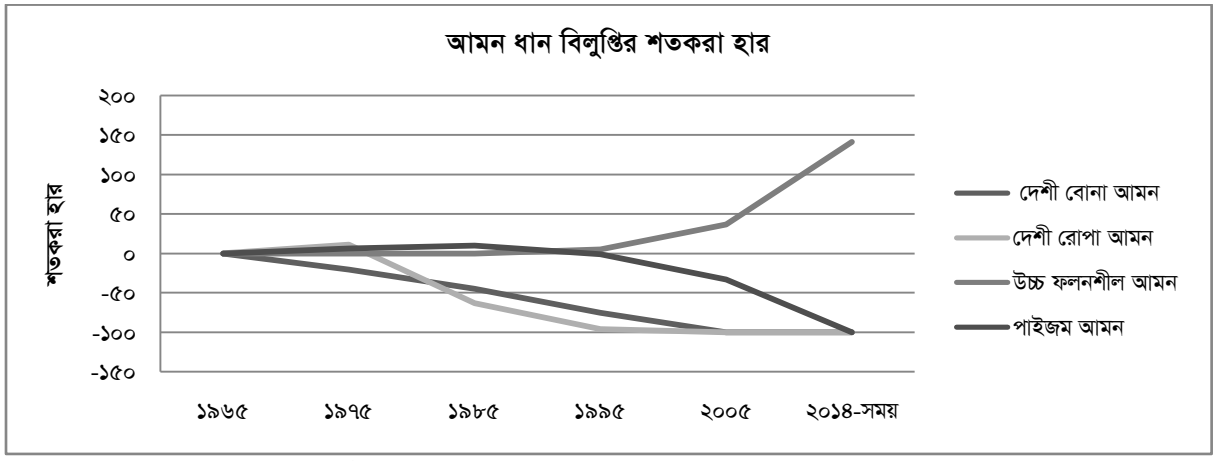

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮.১.৩ বোরো ধান ও গম বিলুপ্তির হার

গবেষণা এলাকায় এই ধান চাষের হার পর্যবেক্ষণ করে ৮.১.৩- নং গ্রাফচিত্রের বিশ্লেষণ করে ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ দশক থেকেই দেশি বোরো উৎপাদনের হার হ্রাস পেয়ে ২.৫০ শতাংশ হয়েছিল। পরবর্তী ১৯৮৫, ১৯৯৫, ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে এসে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকায় দেশি বোরো উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১২.৯২, ২১.৭৪, ৯৪.২২, ৯৯.৩৫ শতাংশ। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ দশকে হাইব্রীড বোরো সর্বোচ্চ উৎপাদনের হার ছিল ০ শতাংশ। পরবর্তী ১৯৯৫ দশকে হাইব্রীড বোরো উৎপাদন হার বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৭৮ শতাংশ হয়। ২০১৪ দশকে এসে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকায় হাইব্রীড বোরো উৎপাদন হার ১৩২.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ দশকে উচ্চ ফলনশীল বোরো উৎপাদনের হার ছিল ০ শতাংশ। পরবর্তী ২০০৫ দশকে এই উৎপাদন হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৪২ শতাংশ হয়। ২০১৪ দশকে এসে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকায় উচ্চ ফলনশীল বোরো উৎপাদন বৃদ্ধি হার ৩৫ শতাংশ হয়েছে।

ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ দশকে গম সর্বোচ্চ উৎপাদনের হার ছিল ৩ শতাংশ। পরবর্তী ১৯৮৫ দশকে এই উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ১০.৩২ শতাংশ। ২০১৪ দশকে এসে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকায় গম উৎপাদন হার শূন্য। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ দশকে উচ্চ ফলনশীল গম উৎপাদনের হার ছিল ০ শতাংশ পরবর্তী ১৯৯৫ দশকে এই উৎপাদন হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৫.৭১ শতাংশ হয়। ২০১৪ দশকে এসে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকায় উচ্চ ফলনশীল গম উৎপাদন

হার ২৪.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গবেষণায় দেখা যায় যে, দেশি বোরো ও দেশি গম উৎপাদনের হার হ্রাস পেয়েছে অন্যদিকে হাইব্রিড বোরো ও উচ্চ ফলনশীল গম উৎপাদন হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র-৮.১.৩: বোরো ও গম বিলুপ্তির হার

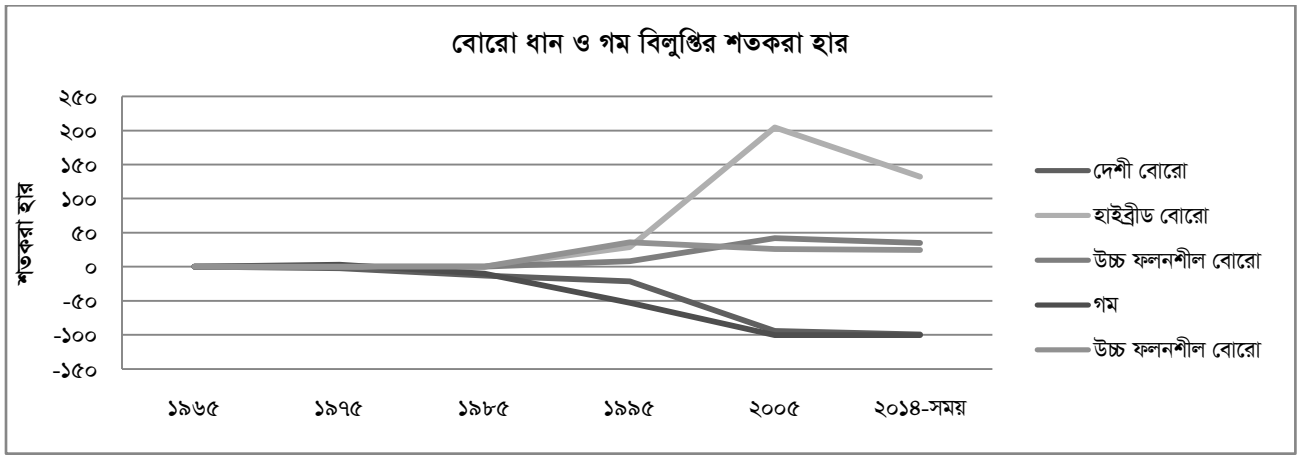

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮.১.৪ ভুট্টা বার্লি যব বিলুপ্তির হার

গ্রাফচিত্র ৮.১.৪ নং দেখা যায় যে, ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ থেকে দেশি ভুট্রা উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ১৯৭৫ দশকে ২০.৫ শতাংশ, ১৯৮৫ দশকে ৫২.৩ শতাংশ, ১৯৯৫ দশকে ৫৪.৫ শতাংশ, ২০০৫ দশকে ৬৫.৯ শতাংশ ও ২০১৪ বর্তমান দশকে ১০০ শতাংশ। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫, ১৯৭৫ ও ১৯৮৫ দশকে হাইব্রীড ভুট্টা উৎপাদন হতে দেখা যায়নি। ১৯৯৫ দশকে ৩৩ শতাংশ, ও ২০০৫ দশকে ১৬৭ শতাংশ ও বর্তমানে ২০১৪ দশকে ২০০ শতাংশ হাইব্রীড ভুট্রা উৎপাদন হতে দেখা যায়। বার্লি ধ্রুবক ১৯৬৫ দশকে থেকে ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫, ২০০৫ দশকে বার্লি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৩১.৭৩, ৬৩.৯১, ৮০.৭৭ ও ১০০ শতাংশ। বর্তমান দশক ২০১৪ তে বার্লি উৎপাদন ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। যব এই ফসলটিও ধ্রুবক বছর থেকে প্রতিবছর একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে ধ্রুবক ১৯৬৫ দশকের পর থেকে যব উৎপাদন হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ২.১৮, ৭.১৪, ৪৬.৬ ও ১০০ শতাংশ। বর্তমান সময়ে যব চাষ এলাকাটিতে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়েছে বলা যায়।

চিত্র ৮.১.৪: ভুট্রা বার্লি যব বিলুপ্তির হার

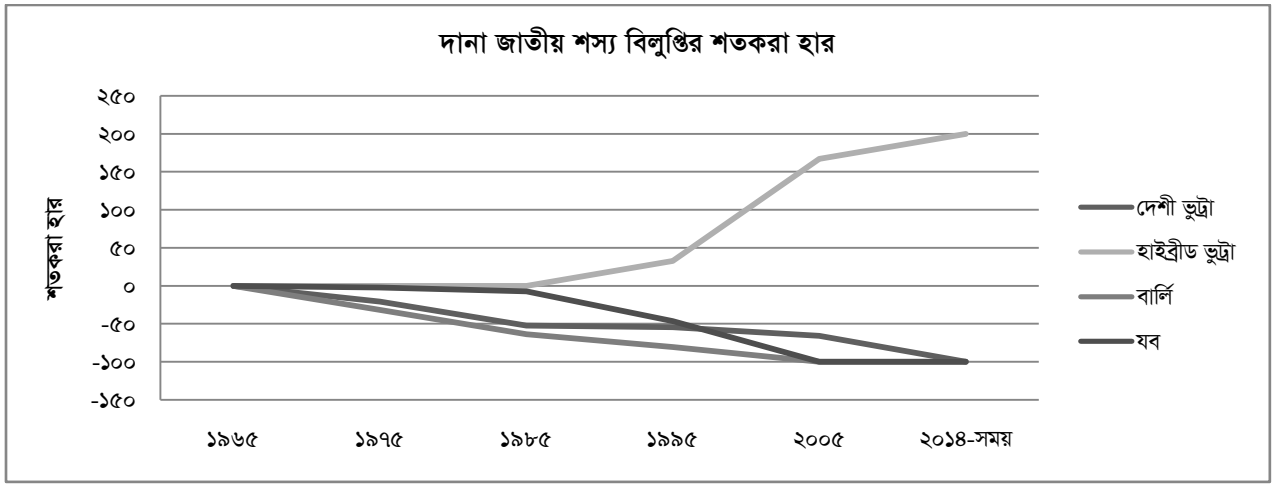

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮.১.৫ জোয়ার বাজরা চীনা কাউন বিলুপ্তির হার

গ্রাফচিত্র ৮.১.৫ নং হতে দেখা যায় যে, ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে জোয়ার উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল যথাক্রমে ১৭.৫৮, ২৬.৯৫ ও ৪৯.৪৫ শতাংশ। ২০০৫ দশকে জোয়ার উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ৯২.১ শতাংশ। বর্তমান ২০১৪ দশকে এলাকাটিতে জোয়ার চাষের হার শূন্য দেখা যায়। এই ফসলটি ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ এর পর থেকে ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে বাজরা উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছিল যথাক্রমে ১০.৬, ৪৭.৩৬ ও ৬৫.১ শতাংশ। ২০০৫ দশকে বাজরা উৎপাদন হার ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০১৪ দশকে বাজরা চাষের হার শূন্য দেখা যায়। ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে চীনা উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৩৯.৯৭, ৫৪.৭৮ ও ৯৮.৭২ শতাংশ। ২০০৫ দশকে চীনা উৎপাদন হার ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান সময়ে চীনা চাষের হার শূন্য দেখা যায়। ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে কাউন উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৭.১২, ৫৮.৮৯ ও ৯৮.৫৪ শতাংশ। ২০০৫ দশকে কাউন উৎপাদন হার ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান সময়ে কাউন চাষ এলাকাটিতে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়েছে বলা যায়। জোয়ার, বাজরা, চীনা ও কাউন এই কয়েকটি ফসল চাষের হার বর্তমান সময়ে ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এই ফসলগুলো এই গবেষণা অঞ্চলে বর্তমানে একদম উৎপাদন হয়না বলেই চলে।

চিত্র ৮.১.৫: জোয়ার, বাজরা, চীনা ও কাউন বিলুপ্তির হার

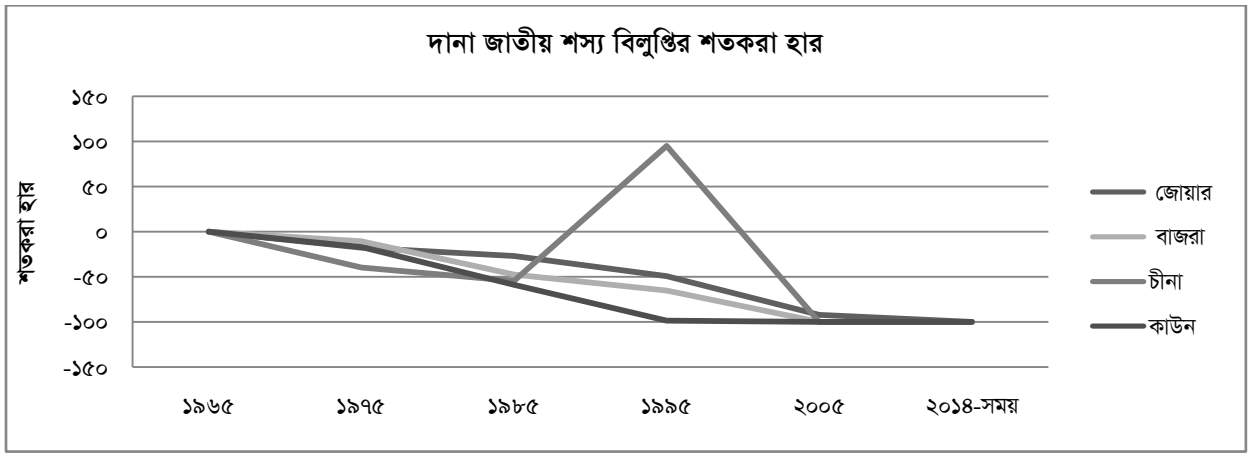

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮.২ ডাল জাতীয় শস্য

৮.২.১ ছোলা অড়হর মটর ও মুগ বিলুপ্তির হার

গ্রাফচিত্র ৮.১.৬ হতে এই গবেষণায় দেখা যায় যে, ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ থেকে ছোলা উৎপাদন হ্রাস হয়েছে ১৯৭৫ দশকে ১৭.৮৪ শতাংশ ও ১৯৮৫ দশকে ৩৪.৯২ শতাংশ। বিগত ১৯৯৫ দশকের দিকে ছোলা উৎপাদন সম্পূর্নরূপে বিলুপ্ত হয়েছিল। কিন্তু ২০০৫ দশকের দিকে ছোলা উৎপাদন হতে দেখা যায়। ২০১৪ দশকে এই ফসলটি ৮৪.০৩ শতাংশ উৎপাদন হ্রাস হতে দেখা যায়। ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে অড়হর উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৩০.৫৯, ৫৫.৫২ ও ৫৫.২২ শতাংশ । ২০০৫ দশকে অড়হর উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ৮৩.৫৮ শতাংশ। ২০১৪ দশকে দেখা যায় যে, অড়হর চাষ এলাকাটিতে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়েছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে মটর উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৮.৩৩, ৩.২৮ ও ৮৭.৮৭ শতাংশ। ২০০৫ দশকে মটর উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ১০০ শতাংশ। বর্তমান সময়ে ২০১৪ দশকে মটর চাষ এলাকাটিতে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়েছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে মুগ উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১১.৫৩, ৮৪.২২ ও ৮৬.১৫ শতাংশ। ২০০৫ দশকে মুগ উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ৮৪.৬১ শতাংশ দেখা যায়। ২০১৪ দশকে এলাকাটিতে ৯১.৯৬ শতাংশ জমিতে মুগ চাষ হয়ে থাকে। গবেষণা এলাকায় ছোলা, অড়হর, মটর ও মুগ এর গবেষণায় দেখা যায় ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ থেকে অড়হর ও মটর এই এলাকা থেকে সম্পূর্ণরূপে হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র-৮.১.৬: ছোলা অড়হর মটর ও মুগ বিলুপ্তির হার

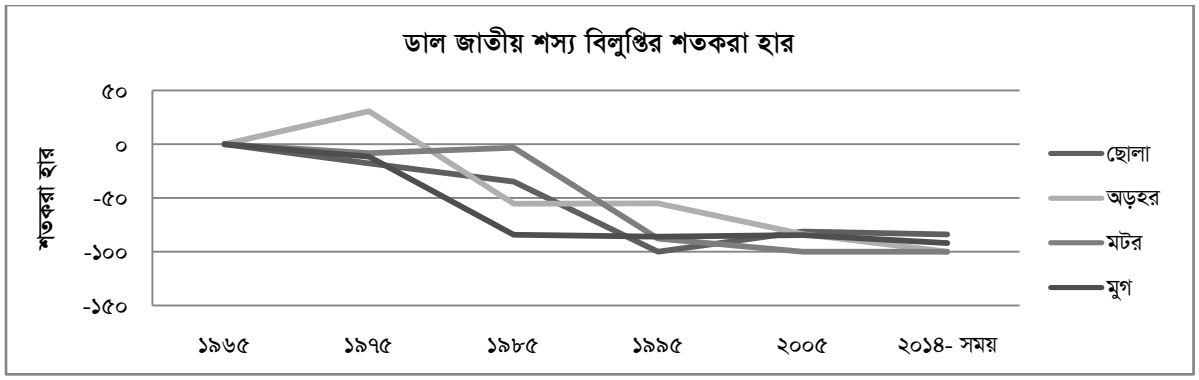

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮.২.২মাস-কলাই খেসারি গাড়ি-কলাই ও ফেলন বিলুপ্তির হার

গ্রাফচিত্র ৮.১.৭ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ধ্রুবক দশক থেকে গবেষণা এলাকায় মাস-কলাই উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ১৯৭৫ দশকে ৩২.১৭ শতাংশ, ১৯৮৫ দশকে ৬৫.৫১ শতাংশ, ১৯৯৫ দশকে ৪৪.৮১ শতাংশ, ২০০৫ দশকে ৬১.৮২ শতাংশ ও ২০১৪ দশকে ৯০,৭২ শতাংশ। ধ্রুবক দশক থেকে গবেষণা এলাকায় খেসারি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ১৯৭৫ দশকে ২৩.৪০ শতাংশ, ১৯৮৫ দশকে ৩৪.৩৪ শতাংশ, ১৯৯৫ দশকে ১১.০৬ শতাংশ, ২০০৫ দশকে ৭২.৩৪ শতাংশ ও ২০১৪ দশকে ৭৫.০০ শতাংশ। ধ্রুবক দশক থেকে গবেষণা এলাকায় গাড়ি-কলাই উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ১৯৭৫ দশকে ১৩.৯২ শতাংশ, ১৯৮৫ দশকে ২২.৭৬ শতাংশ, ১৯৯৫ দশকে ৬৬.৬৬ শতাংশ, ২০০৫ দশকে ৭০.২৩ শতাংশ, ও ২০১৪ দশকে ৮২.৯৭ শতাংশ। ধ্রুবক দশক থেকে গবেষণা এলাকায় ফেলন উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ২০০৫ দশকে ১৪.২৮ শতাংশ ও ২০১৪ দশকে ৪২.৮৫ শতাংশ। দেখা যায় যে, ২০১৪ দশকের পর থেকে এই ফসল উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে ফেলন চাষের হার ৪২.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র-৮.১.৭: মাস-কলাই খেসারি গাড়ি-কলাই ও ফেলন বিলুপ্তির হার

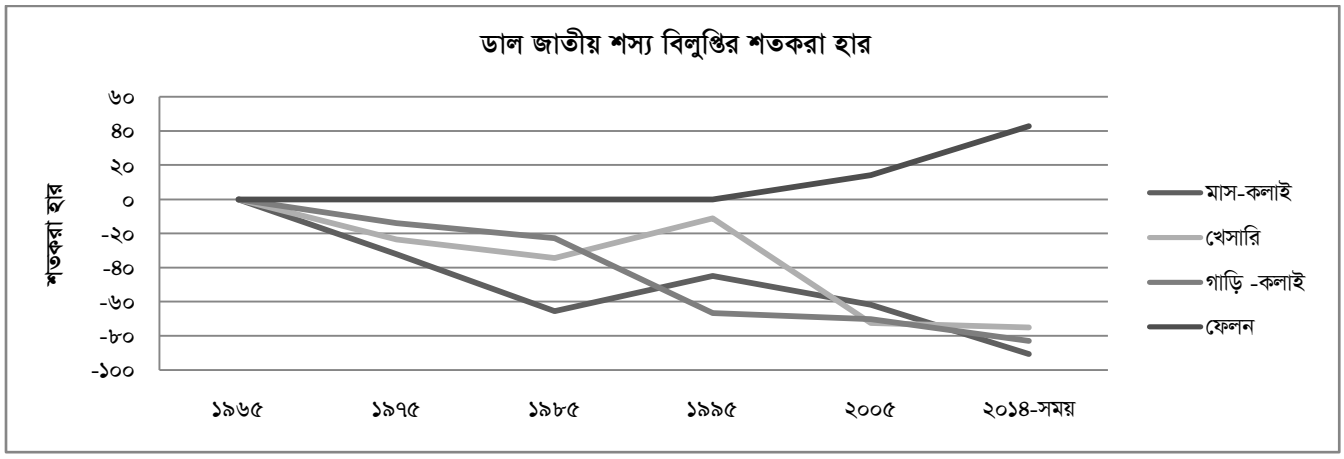

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮.৩. গবেষণা এলাকায় তৈল বীজ বিলুপ্তির হার

৮.৩.১ গবেষণার এলাকার সরিষা রাই তিল তিসি বিলুপ্তির হার

গ্রাফচিত্র ৮.১.৮ দেখা যায় যে, সরিষা এই ফসলটি ধ্রুবক দশক থেকে ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১.৬২, ৩১.০৪, ৯.৬০ ও ২৫.৫৬ শতাংশ। ২০১৪ দশকে সরিষা উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ৭৪.৬০ শতাংশ দেখা যায়। রাই এই ফসলটিও ধ্রুবক দশকের পর থেকে ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৪১.৮৬, ৭২.০৯ ও ৯৫.৩৪ শতাংশ। ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে সরিষা রাই উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ১০০ শতাংশ। তিসি এই ফসলটিও ধ্রুবক দশক থেকে ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৩৬, ৫২.১৯ ও ৭৯.২ শতাংশ। ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে তিসি উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ১০০ শতাংশ। তিল এই ফসলটিও ধ্রুবক দশকের পর থেকে ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫, ২০০৫ দশকে উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৪.৭৮, ৩৮.৫৬, ৬৮.৬ ও ৮৩.৮ শতাংশ। ২০১৪ দশকে এলাকাটিতে তিল উৎপাদন ৮৫.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। গবেষণা এলাকায় সরিষা, রাই তিল ও তিসি উৎপাদনের হার কমে গেছে। সরিষা ৭৪.৬০

শতাংশ, রাই ১০০ শতাংশ, তিল ৮৫.৭০ শতাংশ, তিসি ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। গবেষণা এলাকার পর্যবেক্ষনে দেখা যায় যে রাই ও তিসি গবেষণা এলাকা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তি হয়েছে।

চিত্র ৮.১.৮: সরিষা রাই তিল তিসি বিলুপ্তির হার

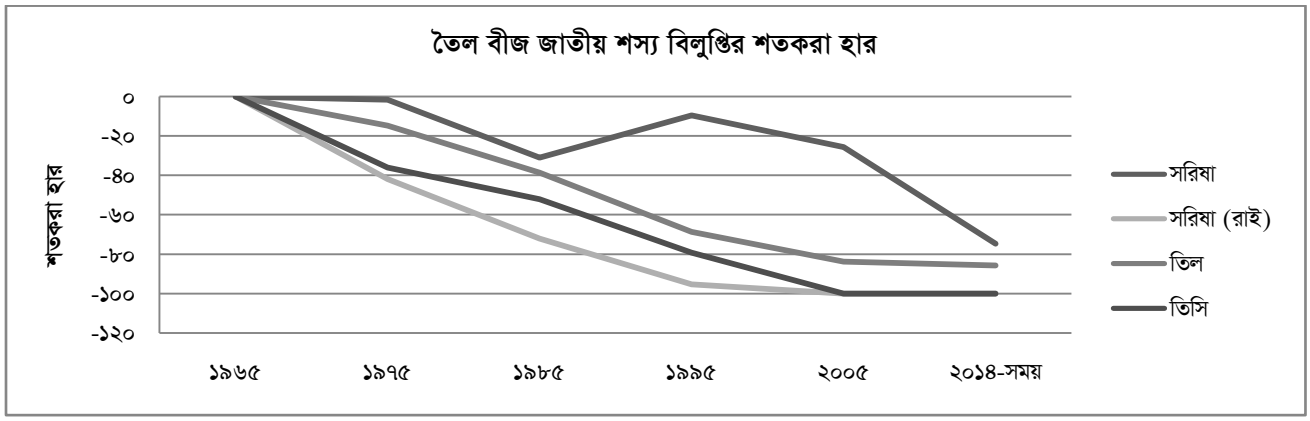

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮.৩.২ চীনা বাদাম রেড়ী (কেস্টার) সূর্যমুখী ও সয়াবিন বিলুপ্তির হার

গ্রাফচিত্র ৮.১.৯ নং পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ এর পর ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫, ২০০৫ দশকে চীনা বাদাম উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৯.০৫, ৩৭.৪৭, ৬৬.৩৭ ও ৬৯.৬৮ শতাংশ। বর্তমান ২০১৪ দশকে চীনা বাদাম চাষ গবেষণা এলাকাটিতে ৮২.৬৮ শতাংশ হয়ে থাকে। রেড়ি (কেস্টার) এই ফসলটিও ধ্রুবক দশক থেকে ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ২৮.৫৭, ৩৫.৭১, ৪২.৮৫ ও ১০০ শতাংশ। ২০১৪ দশকে রেড়ি (কেস্টার) উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ১০০ শতাংশ। সূর্যমূখী ফসলটিও ধ্রুবক দশকের পর থেকে ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৪৮.০০, ৬৮.৮০, ৫২.০০ শতাংশ। ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে সূর্যমূখী উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ১০০ শতাংশ। সয়াবিন এই ফসলটিও ধ্রুবক ১৯৬৫ দশকে পর ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১২.৩, ১৭.৮৯,৭৫.১ শতাংশ। ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে সয়াবীন উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ১০০ শতাংশ। গবেষণা এলাকায় রেড়ী (কেস্টার),সূর্যমূখী ও সয়াবিন ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। চীনা বাদাম ৮২.৬৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এই এলাকায় রেড়ী (কেস্টর), সূর্যমুখী ও সয়াবীন চাষ বর্তমানে একদম হয়না বললেই চলে।

চিত্র ৮.১.৯: চীনা বাদাম, রেড়ী, কেস্টও সূর্যমুখী ও সয়াবিন বিলুপ্তির হার

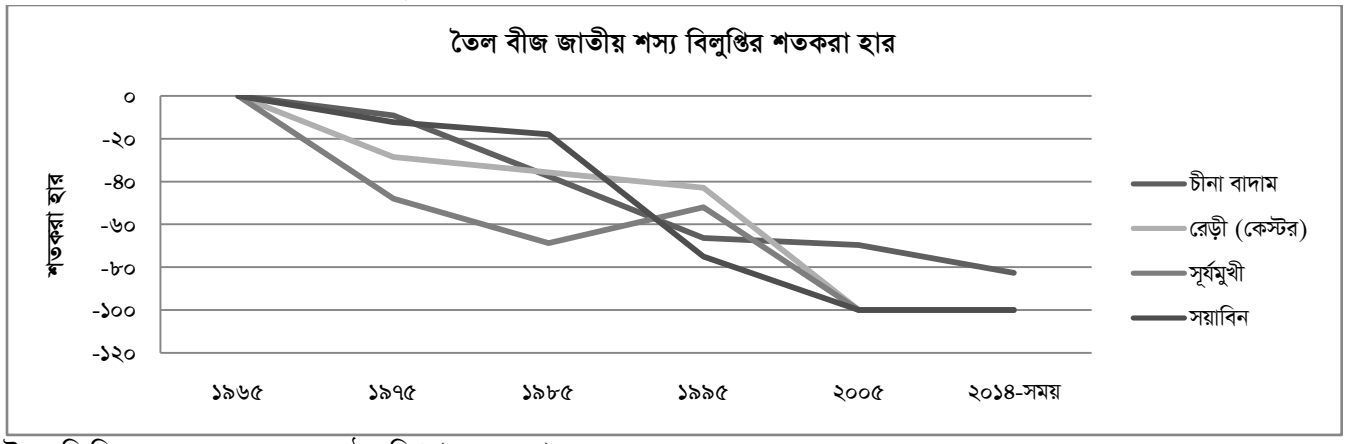

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮.৪ অর্থকরী ফসল

৮.৪.১ পাট মেস্তা শন পাট বিলুপ্তির হার

বাংলাদেশের মোট ফসল গুলোকে যে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় তার মধ্যে একটি হল অর্থকরী ফসল। গবেষণা এলাকার মূল অর্থকরী ফসল হল পাট, মেস্তা, শন পাট। গ্রাফচিত্র ৮.১.১০ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, পাট এই ফসলটিও ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ এর পর ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৩৪.৩৬, ৫৫.৫৪, ৬২.১০ ও ৫৭.০০ শতাংশ। বর্তমান ২০১৪ দশকে পাট চাষ গবেষণা এলাকাটিতে ৫৭.৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। মেস্তা এই ফসলটিও ধ্রুবক দশক থেকে ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৪৮.৮৮, ৭০.১২, ৯৭.৭৭ ও ১০০ শতাংশ। ২০১৪ দশকে মেস্তা উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ১০০ শতাংশ। শন পাট ফসলটিও ধ্রুবক দশকের পর থেকে ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ২৩.৮৮, ২৫.৫২ ও ৫৫.২২ শতাংশ। ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে শনপাট উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ১০০ শতাংশ। গবেষণা অঞ্চলে পাট উৎপাদনের হার ধ্রুবক বছর থেকে ৫৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া মেস্তা ও শন পাট উৎপাদন সম্পূণ রূপে বিলুপ্ত হয়েছে।

চিত্র ৮.১.১০: পাট মেস্তা শন পাট বিলুপ্তির হার

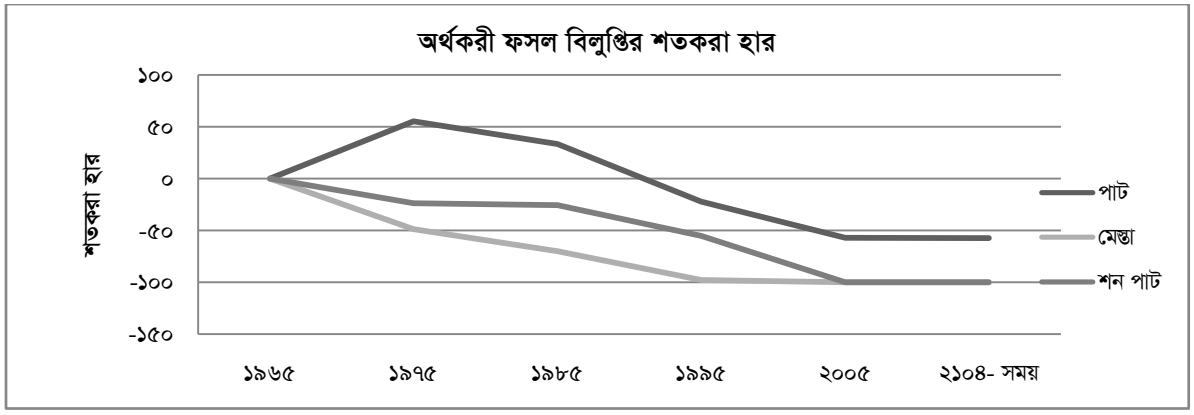

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮.৪.২ তুলা আঁখ তামাক বিলুপ্তির হার

গ্রাফচিত্র-৮.১.১১ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে তুলা উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ২৬.০৮, ৭৮.২৬ ও ১০০ শতাংশ। ২০০৫ দশকে তুলা উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ৯১ শতাংশ। বর্তমান ২০১৪ দশকে তুলা চাষ এলাকাটিতে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়েছে। আঁখ এই ফসলটিও ধ্রুবক দশক থেকে ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৫.৯৭, ৩৩.৯২, ৯৪.৪৫ ও ৯৯.২৮ শতাংশ। ২০১৪ দশকে আঁখ উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ৯৯.৫৩ শতাংশ। ধ্রুবক দশকের পর থেকে ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে তামাক উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ২১.৬৬, ৩৯.১৯ ও ৭৮.৬৭ শতাংশ। ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে তামাক উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ১০০ শতাংশ। গবেষণা এলাকায় বর্তমানে তুলা ও তামাক উৎপাদন হয় না বলা যায়। ধ্রুবক বছর থেকে বর্তমানে তুলা উৎপাদন ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়া আঁখ উৎপাদনে দেখা যায় যে, গবেষণা অঞ্চলে ৯৯.৫৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এ লেখ চিত্র বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, এই এলাকাটিতে তুলা, আঁখ ও তামাক চাষ প্রায় হয়না বললেই বলা যায়।

চিত্র ৮.১.১১: তুলা আঁখ তামাক বিলুপ্তির হার

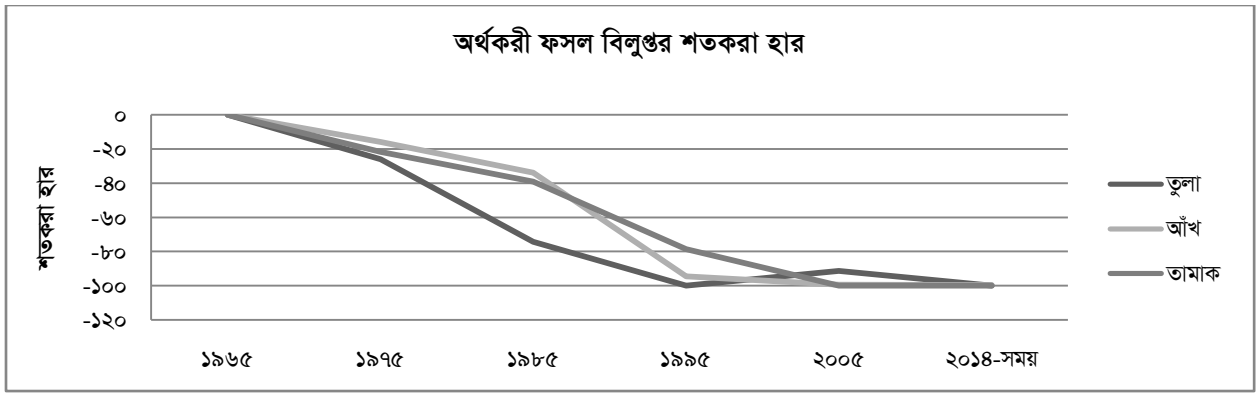

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮.৫ কন্দাল জাতীয় ফসল বিলুপ্তির হার

গবেষণা এলাকার কন্দাল জাতীয় ফসলের অবস্থান নিয়ে পরিক্ষা নিরিক্ষা করা হয়েছে। গ্রাফচিত্র ৮.১৭ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় গবেষণা এলাকাটিতে কন্দাল জাতীয় ফসল গোল আলু, মিষ্টি আলু, কচু ও ওলকচু উৎপাদন করা হয়। পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, গোল আলু এই ফসলটিও ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ এর পর ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে উৎপাদন হার বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৪৭.৯৪, ৩৫.০২, ৩০.৯৬ ও ৩৪.২১ শতাংশ। বর্তমান ২০১৪ দশকে গোল আলু চাষ গবেষণা এলাকাটিতে ২৬.৯২ শতাংশ হয়ে থাকে। মিষ্টি আলু ধ্রুবক দশক থেকে ১৯৭৫ দশকে ৯.২২ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে মিষ্টি আলু উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৪.৩৭, ১৩.৬১ ও ২১.২৭ শতাংশ। ২০১৪ দশকে মিষ্টি আলু উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ৩১.০০ শতাংশ। ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে কচু উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ২৬.৪৭, ৫৫.১৩ ও ৯৮.২৩ শতাংশ। ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে কচু উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ১০০ শতাংশ। ওল কচু উৎপাদন ধ্রুবক দশক থেকে ২০০৫ দশকে ৪.১৬ ও ২০১৪ দশকে ৮.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ৮.১.১২: কন্দাল জাতীয় ফসল বিলুপ্তির হার

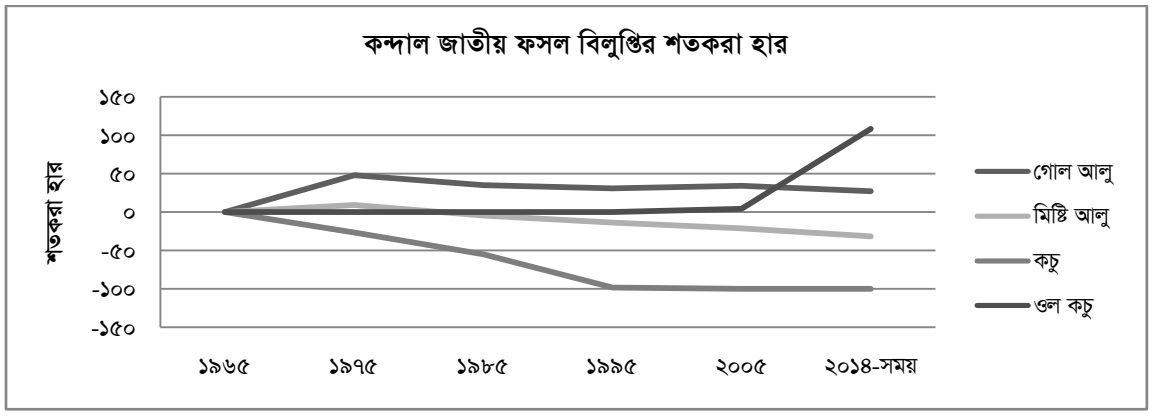

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮.৬ তরি-তরকারী জাতীয় ফসল

গবেষণা এলাকার তরি তরকারি জাতীয় ফসলের অবস্থান নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হয়েছে। এই এলাকাটিতে বেগুন, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, ফুল কপি, ওলকপি, লাউ, টমেটো, মূলা, শিম, পটল, ঢেঁড়স, ঝিঙ্গা, শসা, লালশাক, পুঁই শাক, বরবটি, করলা, গাজর, কাঁকরোল ও শালগম উৎপাদন হয়ে থাকে। নিম্নে এদের উৎপাদন হার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

৮.৬.১ বেগুন মিষ্টি কুমড়া চাল কুমড়া বাঁধা কপি বিলুপ্তির হার

গ্রাফচিত্র ৮.১.১৩ বিশ্লেষণ করে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, ফসলটি ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ এর পর ১৯৭৫ দশকে বেগুন উৎপাদন হার বৃদ্ধি পেয়েছে ২৪.০৬ শতাংশ। ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে বেগুন উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ২০.৪০, ২৯.১৭ ও ৩৭.৫৯ শতাংশ। বর্তমান ২০১৪ দশকে গবেষণা এলাকাটিতে বেগুন উৎপাদন ৫১.১২ শতাংশ হ্রাস হয়ে থাকে। মিষ্টি কুমড়া ধ্রুবক দশক থেকে ১৯৭৫ দশকে ৫.৪১ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে মিষ্টি কুমড়া উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৪.৫৭, ৩২.৯৭ ও ৩২.৪৩ শতাংশ। ২০১৪ দশকে মিষ্টি কুমড়া উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ৫১.৫৩ শতাংশ। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে চাল কুমড়া উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৭.০৭, ৩৬.৪৬, ৯২.০০ ও ৯৫.১২ শতাংশ। বর্তমান ২০১৪ দশকে এলাকাটিতে চাল কুমড়া উৎপাদন ১০০ শতাংশ বিলুপ্ত হয়েছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে বাঁধা কপি উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৩.১২, ২৭.১২, ৩৭.৫০ ও ৬৮.৭৫ শতাংশ। বর্তমান ২০১৪ দশকে এলাকাটিতে বাঁধা কপি উৎপাদন ১০০ শতাংশ বিলুপ্ত হয়েছে। গবেষণা এলাকাটিতে চাল কুমড়া ও বাঁধা কপি উৎপাদন ধ্রুবক দশকের পর থেকে বর্তমান সময়ে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে। বেগুন ও বাঁধা কপি ধ্রুবক বছর থেকে ৫১.১২ ও ৫১.৩৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র ৮.১.১৩: বেগুন মিষ্টি কুমড়া চাল কুমড়া বাঁধা কপি বিলুপ্তির হার

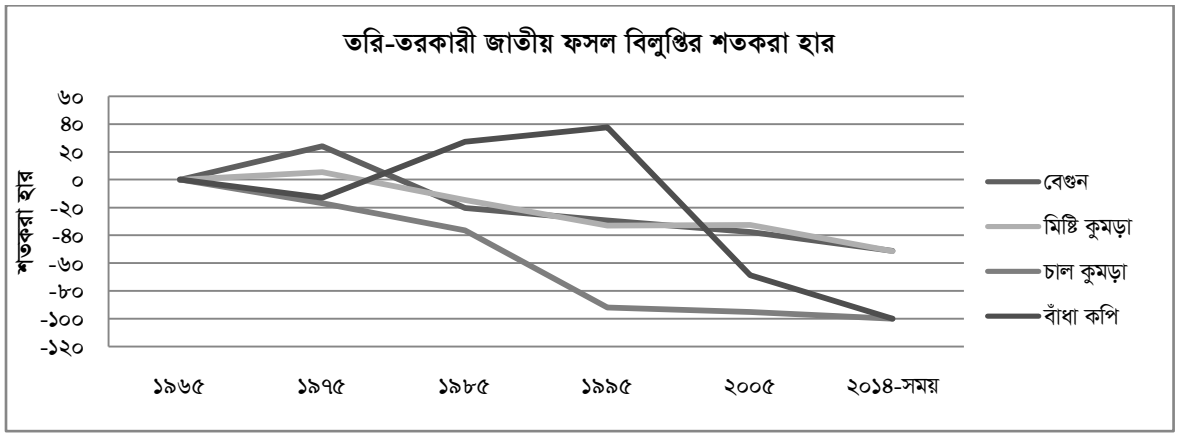

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮.৬.২ ফুলকপি ওলকপি লাউ টমেটো বিলুপ্তির হার

গ্রাফচিত্র ৮.১.১৪ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ধ্রুবক বছর ১৯৬৫ দশকের পর থেকে ফুলকপি উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে ফুলকপি উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ২৯.৫৭, ৫৬.৭৬, ৭৬.৫২ ও ৭১.৮৩ শতাংশ। ২০১৪ দশকে ফুলকপি চাষ এলাকাটিতে ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ এর পর থেকে ওলকপি উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে ওলকপি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ২৫.৩৭, ৬৬.৯২, ৮৫.৬১ ও ১০০ শতাংশ। ২০১৪ দশকে ওলকপি চাষ এলাকাটিতে ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে লাউ উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৮.৯৪, ২৫.১১, ৮৩.০৮ ও ৫১.২২ শতাংশ। ২০১৪ দশকে লাউ চাষ এলাকাটিতে ৬৭.২৫ শতাংশ হ্রাস হয়েছে। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ এর পর থেকে টমেটো উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫, ২০০৫ ও বর্তমান সময়ে টমেটো উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১০.৭১, ২৮.৪৪, ২৭.৮৫ ও ২৮.৫৭ শতাংশ। ২০১৪ দশকে টমেটো এলাকাটিতে ৩২.১৪ শতাংশ হ্রাস হয়েছে। গবেষণা অঞ্চলটিতে ফুল কপি, ওল কপি উৎপাদন ধ্রুবক বছরে উৎপন্ন হলেও বর্তমান সময়ে এই দুটি ফসল সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে। লাউ ও টমোটো উৎপাদন ৬৭.২৫ শতাংশ ও ৩২.১৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র ৮.১.১৪: ফুলকপি ওলকপি লাউ টমেটো বিলুপ্তির হার

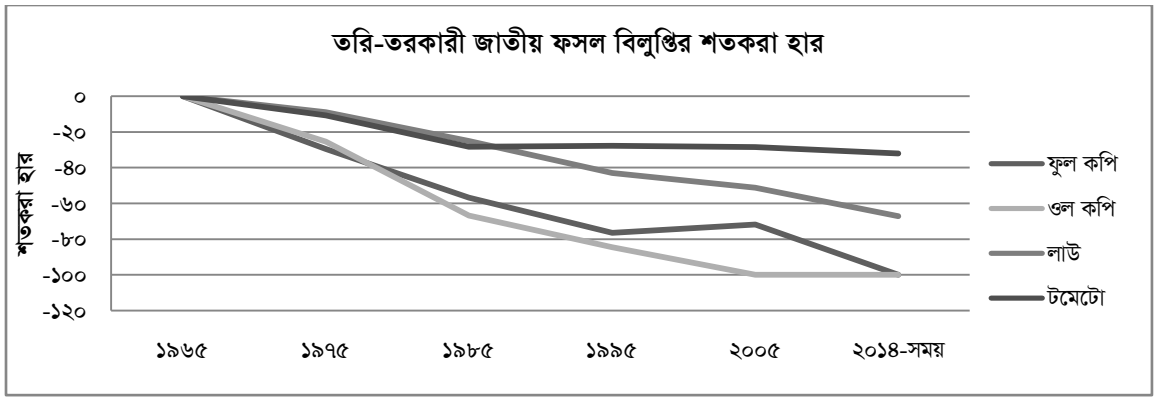

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮.৬.৩ মূলা শিম পটল ঢেঁড়স বিলুপ্তির হার

গ্রাফচিত্র ৮.১.১৫ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ধ্রুবক বছর ১৯৬৫ দশকের পর থেকে মূলা উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে মূলা উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৪.০০, ৩৪.০৬, ৭০.৮০ ও ৯৬.০০ শতাংশ। ২০১৪ দশকে মূলা চাষ এলাকাটিতে ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ এর পর থেকে শিম উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে শিম উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১১.৮২, ৩৭.৫৯, ৪৯.৭৫ ও ৫৫.৬৬ শতাংশ। ২০১৪ দশকে শিম চাষ এলাকাটিতে ৭০.৪৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে পটল উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১০.১৯, ৪২.৪২ ও ১০০ শতাংশ। ২০০৫ দশকে পটল উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ৬১.৫৮ শতাংশ। ২০১৪ দশকে পটল চাষ এলাকাটিতে ১০০ শতাংশ হ্রাস হয়েছে। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ এর পর থেকে ঢেঁড়স উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ বর্তমান সময়ে ঢেঁড়স উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৩২.০০, ৫৮.৭২, ৮৭.২০ ও ৯১.২০ শতাংশ। ২০১৪ দশকে ঢেঁড়স চাষ এলাকাটিতে ১০০ শতাংশ হ্রাস হয়েছে। এলাকাটিতে মূলা, পটল ও ঢেঁড়স উৎপাদন ধ্রুবক বছরের চেয়ে বর্তমানে ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র ৮.১.১৫: মূলা শিম পটল ঢেঁড়স বিলুপ্তির হার

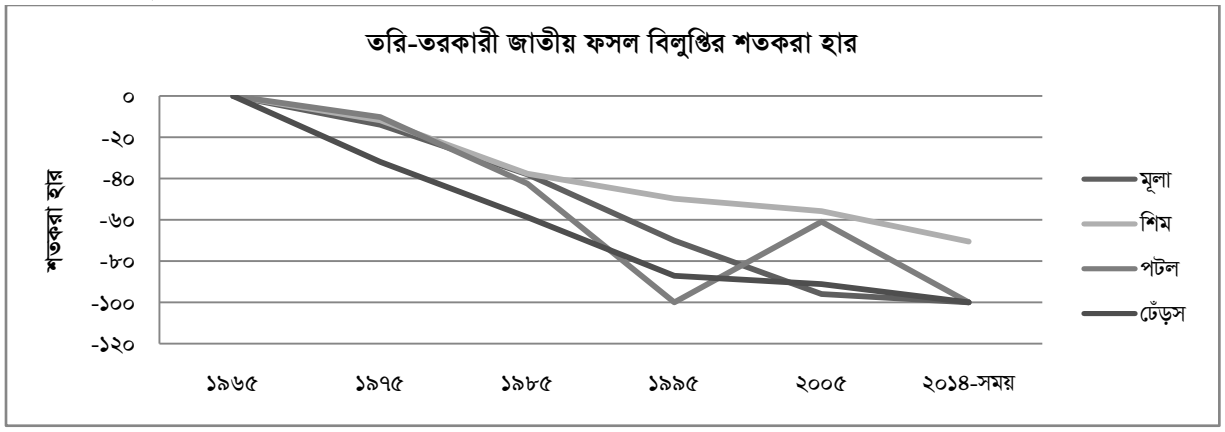

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮.৬.৪ ঝিঙ্গা, শসা, লাল শাক, পুঁই শাক বিলুপ্তির হার

গ্রাফচিত্র ৮.১.১৬ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ধ্রুবক বছর ১৯৬৫ দশকে থেকে ঝিঙ্গা উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে ঝিঙ্গা উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৪.৭১, ৩৬,৫৯, ৯১.৭৬ শতাংশ। ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে জিঙ্গা উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ১০০ শতাংশ দেখা যায়। ধ্রুবক বছর ১৯৬৫ দশকের পর থেকে শসা উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে শসা উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ২৫, ৪০.৯৪ ও ৮২ ও ৭০ শতাংশ। ২০১৪ দশকে এলাকাটিতে শসা উৎপাদন ৮৯.৯৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে লাল শাক উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৫.৭৬, ১৫.৯৩ ও ৩৩.৫৫ ও ৬৩.৭২ শতাংশ। ২০১৪ দশকে লাল শাক চাষ এলাকাটিতে ৭৪.৫৭ শতাংশ হ্রাস হয়েছে। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ এর পর থেকে পুঁই শাক উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে পুঁই শাক উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৮.৬৯, ২৭.০০, ৩৯.১৩ ও ৬০.৮৭ শতাংশ। ২০১৪ দশকে পুঁই শাক চাষ এলাকাটিতে ৫৬.৫২ শতাংশ হ্রাস হয়েছে। এলাকাটিতে ঝিঙ্গা উৎপাদন ধ্রুবক বছরের চেয়ে বর্তমানে ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। শসা, লাল শাক, পুঁই শাক উৎপাদনের হার বর্তমান সময়ে ৮৯.৯৫, ৭৪.৫৭, ৫৬.৫২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র ৮.১.১৬: জিঙ্গা শসা লাল পুঁই শাক বিলুপ্তির হার

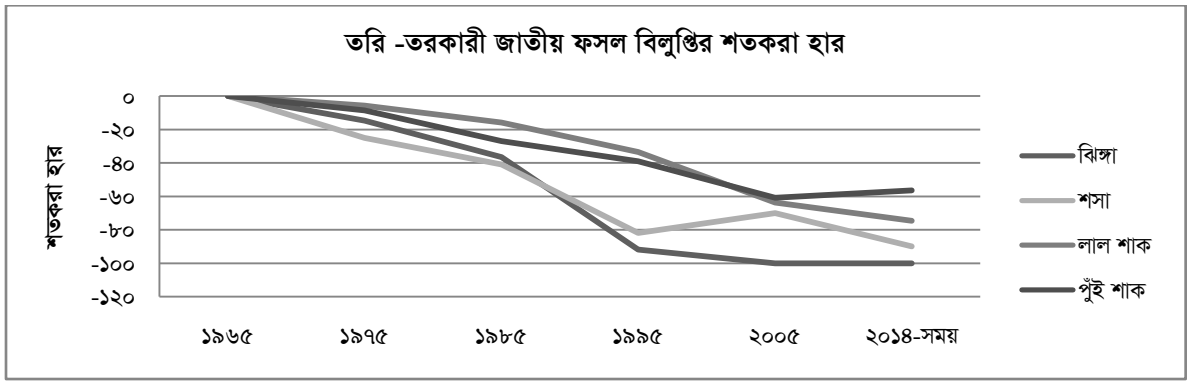

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮.৬.৫ বরবটি করলা গাজর কাঁকরোল শালগম বিলুপ্তির হার

গ্রাফচিত্র ৮.১.১৭ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ধ্রুবক বছর ১৯৬৫ দশকে থেকে বরবটি উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫ দশকে বরবটি উৎপাদন হার বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩.৯২ শতাংশ দেখা যায়। ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে বরবটি উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৩৯.২৫, ২১.৫৬ ও ৬০.৭৮ শতাংশ। ২০১৪ দশকে বরবটি চাষ এলাকাটিতে ৪১.১৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ধ্রুবক বছর ১৯৬৫ দশকের পর থেকে শসা উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে করলা উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ২.৫১, ১৬.৩৬ ও ৩.৬১ শতাংশ। ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে করলা উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ১০০ শতাংশ। ১৯৭৫ ও ১৯৮৫ দশকে গাজর উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ২৫.০০ ও ৮৫.০০ শতাংশ। ১৯৯৫, ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে গাজর চাষ এলাকাটিতে ১০০ শতাংশ হ্রাস হয়েছে। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ এর পর থেকে কাকরোল উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে কাকরোল উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৬.৬৬, ৩৩.২৪ ও ৯৫.৫৬ শতাংশ। ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে কাকরোল চাষ এলাকাটিতে ১০০ শতাংশ হ্রাস হয়েছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ বর্তমান সময়ে শালগম উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ২০.০০, ৫৭.৯০ ও ৯০.০০ শতাংশ। ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে শালগম চাষ এলাকাটিতে ১০০ শতাংশ হ্রাস হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় করলা, গাজর, কাঁকরোল শালগম উৎপাদন বর্তমানে বিলুপ্ত হয়েছে। এলাকাটিতে করলা, গাজর, কাঁকরোল শালগম উৎপাদন ধ্রুবক বছরের চেয়ে বর্তমানে ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র ৮.১.১৭: বরবটি করলা গাজর কাঁকরোল শালগম বিলুপ্তির হার

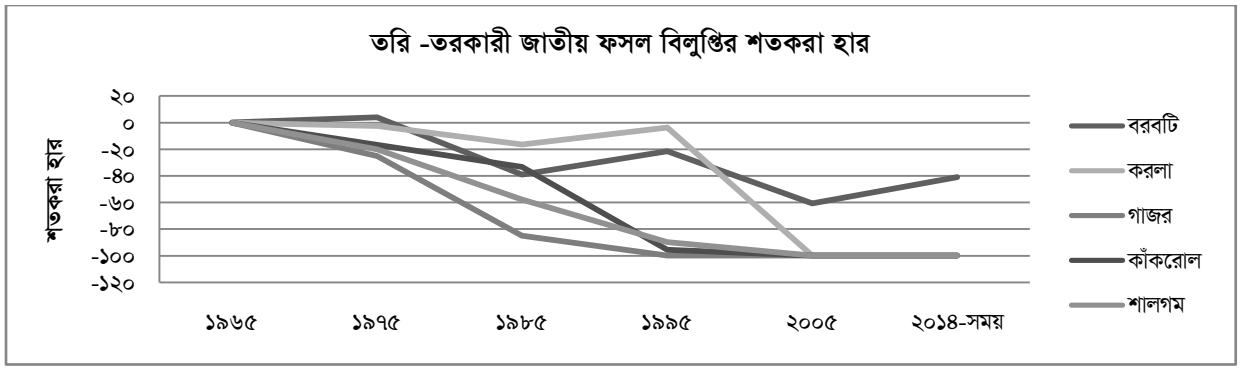

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮.৭ ফল জাতীয় ফসল বিলুপ্তির হার

গবেষণা এলাকার ফল জাতীয় ফসলের অবস্থান নিয়ে পরিক্ষা নিরিক্ষা করা হয়েছে। গ্রাফচিত্র ৮.১.১৮ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ধ্রুবক বছর ১৯৬৫ দশকে থেকে কলা উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে কলা উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৮.২৮, ১৪.৩৭, ৪৩.২৮ ও ৪৬.৪৬ শতাংশ। ২০১৪ দশকে কলা চাষ এলাকাটিতে ৫৮.৭৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ধ্রুবক বছর ১৯৬৫ দশকে থেকে পেঁপে উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে পেঁপে উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৪.০০, ২৪.০০, ৬০.০০ ও ৭৪.০০ শতাংশ। ২০১৪ দশকে এলাকাটিতে পেঁপে উৎপাদন ৭৮.০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে তরমুজ উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৬.২৫, ৪৩.০৭, ৭১.২৫ ও ৮৭.৫ শতাংশ। ২০১৪ দশকে তরমুজ চাষ এলাকাটিতে ১০০ শতাংশ হ্রাস হয়েছে। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ এর পর থেকে বাঙ্গী উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে বাঙ্গী উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৫০.০০,৮৪.০৩, ৮৬.৬৬ ও ৯১.১৫ শতাংশ। ২০১৪ দশকে বাঙ্গী চাষ এলাকাটিতে ১০০ শতাংশ হ্রাস হয়েছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫, ২০০৫ ও বর্তমান সময়ে আনারস উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ২১.৭৩, ২৬.০৮, ৪৩.৪৭ ও ৬০.৮৭ শতাংশ। ২০১৪ দশকে আনারস চাষ এলাকাটিতে ৭৩.৯১ শতাংশ হ্রাস হয়েছে। এই এলাকাটিতে কলা, পেঁপে, তরমুজ, বাঙ্গী ও আনারস উৎপাদন হয়ে থাকে। তবে বর্তমান সময়ে গবেষণা এলাকাটিতে পরিক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই অঞ্চলে তরমুজ ও বাঙ্গী উৎপাদন প্রায় হচ্ছে না। বর্তমান সময়ে তরমুজ চাষ এলাকাটিতে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়েছে।

চিত্র ৮.১.১৮: কলা, পেঁপে, তরমুজ বাঙ্গী আনারস বিলুপ্তির হার

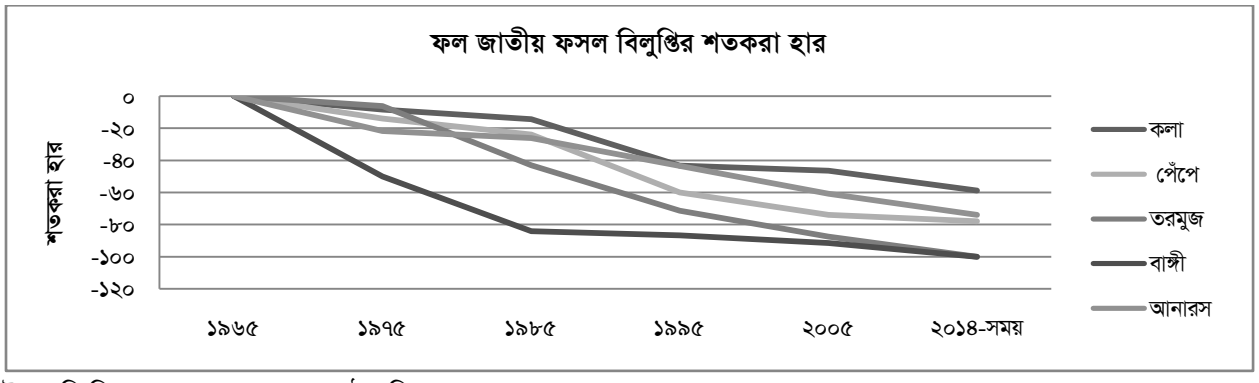

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮. ৮ মসলা জাতীয় ফসল

গবেষণা এলাকার মসলা জাতীয় ফসলের অবস্থান নিয়ে পরিক্ষা নিরিক্ষা করা হয়েছে। এই এলাকাটিতে মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, ধনে, আদা, কালোজিরা মৌরী উৎপাদন হয়ে থাকে।

৮.৮.১ মরিচ পেঁয়াজ রসুন হলুদ বিলুপ্তির হার

গ্রাফচিত্র ৬.১.১৯ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে মরিচ উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ২০.৭৩, ২৬.০২, ২৮.৩৭ ও ৭৮.২৫ শতাংশ। ২০১৪ দশকে মরিচ চাষ এলাকাটিতে ৮৮.৮২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ধ্রুবক বছর ১৯৬৫ দশকে থেকে পেঁয়াজ উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫, ২০০৫ দশকে পেঁয়াজ উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৭.১৯, ২৪.৩৬, ৮১.২৩ ও ৮৯.২৩ শতাংশ। ২০১৪ দশকে এলাকাটিতে পেঁয়াজ উৎপাদন ৯২.৪৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে রসুন উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৬.৬৮, ১২.৪৬, ৩১.৮৪ ও ৬৬.৮৭ শতাংশ। ২০১৪ দশকে রসুন চাষ এলাকাটিতে ৬৯.৯৫ শতাংশ হ্রাস হয়েছে। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ এর পর থেকে হলুদ উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে হলুদ উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৬.৫৬, ৪২.৩৭, ৬৫.৬৬ ও ৬০.৮৪ শতাংশ। ২০১৪ দশকে হলুদ চাষ এলাকাটিতে ৬৬.৮৬ শতাংশ হ্রাস হয়েছে।

চিত্র ৮.১.১৯: মরিচ পেঁয়াজ রসুন হলুদ বিলুপ্তির হার

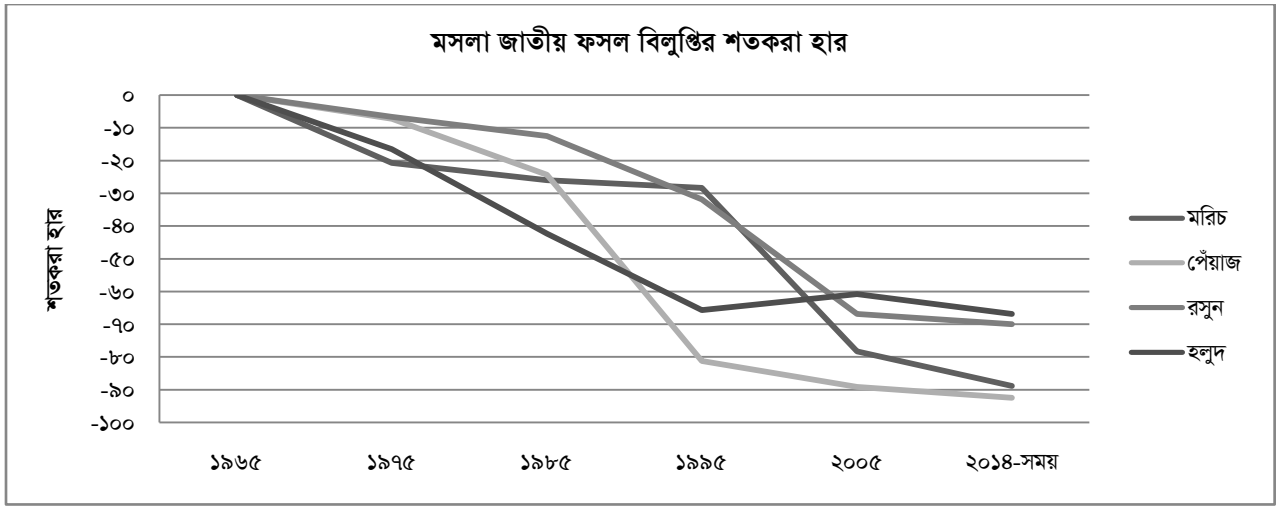

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮.৮.৯ ধনে আদা কালোজিরা মৌরী বিলুপ্তির হার

চিত্র ৮.১.২০ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে ধনে উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৬.৮৮, ৪০.০৭, ৭২.০০ ও ৯১.১০ শতাংশ। ২০১৪ দশকে ধনে চাষ এলাকাটিতে ৯৫.২৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ধ্রুবক বছর ১৯৬৫ দশকে থেকে আদা উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫, ২০০৫ দশকে আদা উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১০.৮৪, ৪৫.৭৮, ৫৬.৬২ ও ৭৫.৯০ শতাংশ। ২০১৪ দশকে এলাকাটিতে আদা উৎপাদন ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে কালোজিরা উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১২.৭৫, ২৯.০৯, ৯৪.৫৪ ও ৯৬.৩৬ শতাংশ। ২০১৪ দশকে কালোজিরা চাষ এলাকাটিতে ৯৮.০০ শতাংশ হ্রাস হয়েছে। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ এর পর থেকে মৌরী উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে মৌরী উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৮.৮৬, ২৬.৪১, ৫৮.৪৯ ও ৬২.২৬ শতাংশ। ২০১৪ দশকে মৌরী চাষ এলাকাটিতে ১০০ শতাংশ হ্রাস হয়েছে। আদা ও মৌরী উৎপাদন বর্তমানে বিলুপ্ত হয়েছে। এলাকাটিতে আদা ও মৌরী উৎপাদন ধ্রুবক বছরের চেয়ে বর্তমানে ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র ৮.১.২০: ধনে আদা কালোজিরা ও মৌরী বিলুপ্তির হার

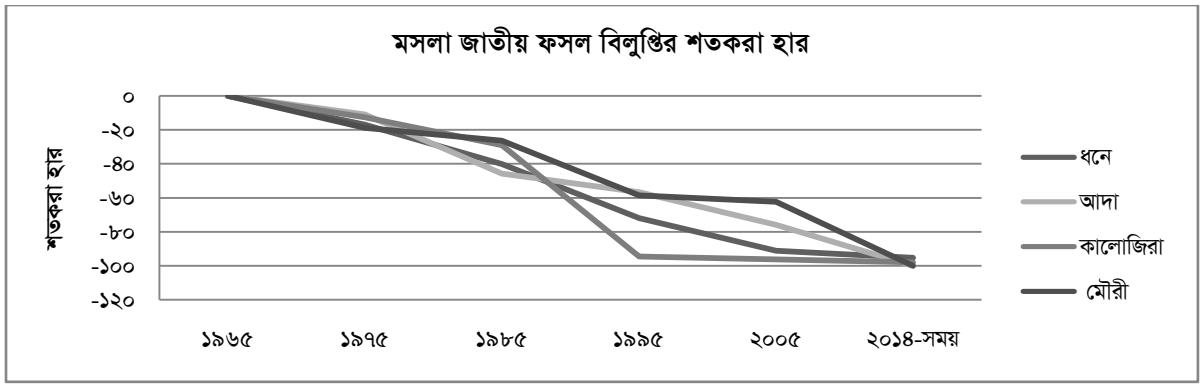

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

৮.৯ গো-খাদ্য জ্বালানী বীজ তলা বিলুপ্তির হার

চিত্র ৮.১.২১ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৭৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ দশকে গো-খাদ্য উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৮.৯১, ৪২.৭৭ ও ৬৮.৯১ শতাংশ। ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে গো-খাদ্য চাষ এলাকাটিতে ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ থেকে জ্বালানী উৎপাদন হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫, ২০০৫ দশকে জ্বালানী উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৪১.০৭, ৭৮.০১, ৮৬.০৭ ও ৯৫.৭১ শতাংশ। ২০১৪ দশকে এলাকাটিতে জ্বালানী উৎপাদন ৯৬.৯৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৫ ও ২০০৫ দশকে বীজতলা উৎপাদন হার বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৫৭.১৪, ১৭২.৩৮ শতাংশ। ২০১৪ দশকে বীজতলা উৎপাদন হার ৩২৪.২৪ শতাংশ দেখা যায়। গবেষণা এলাকায় গো-খাদ্য উৎপাদন ধ্রুবক বছর থেকে ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। জ্বালানী উৎপাদন ধ্রুবক বছর থেকে ৯৬.৯৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র ৮.১.২১: গো-খাদ্য জ্বালানী ও বীজ তলা বিলুপ্তির হার

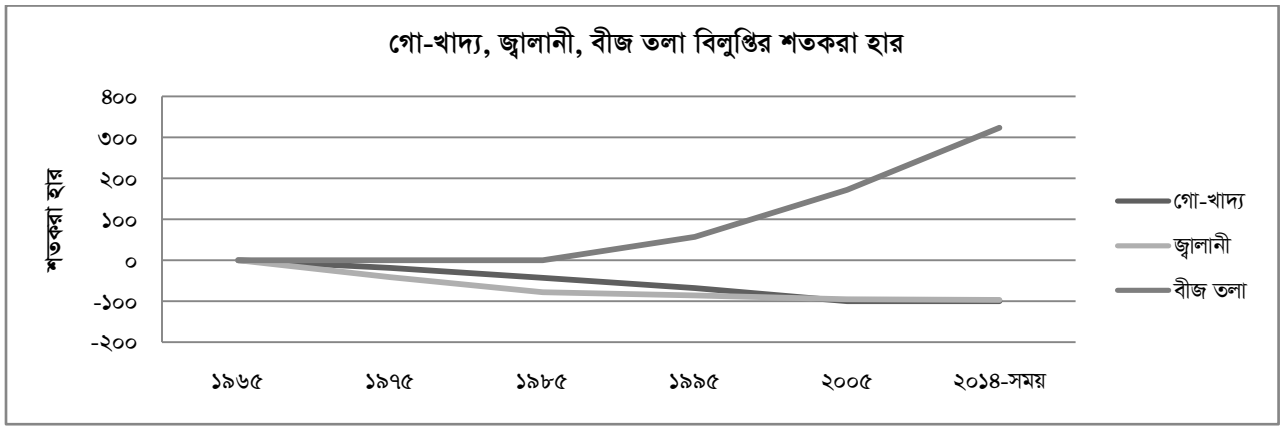

উৎস: বি বি এস ১৯৮৫-২০০৫ ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলায় নিবিড় কৃষিজমি, আবাসস্থল, বসতবাড়ি, বাস্তুতন্ত্র, গৃহায়নবৃক্ষ, মৎস্য খামার, শিল্পকারখানা এবং অন্যান্য কাঠামোগত উন্নয়ন দেখা যায়। বিশাল জলাভূমি এলাকা সাধারণত হাওর ও বিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হাওর ও জলাশয়ে পানি মৎস্য ও পোল্ট্রি শিল্প বিশেষভাবে হাঁসের চাষ ও কৃষি জমির কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কৃষি ফসল ও মৎস্য উৎপাদনে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশগত মান রাখার ক্ষেত্রে জলাভূমি গুরুত্বপূর্ণ্য ভূমিকা পালন করে। আশুগঞ্জ এলাকায় কৃষি জমি ব্যবহারের দিক থেকে অনেক সুবিধা থাকার পর ও এখানে জমির অবস্থান আর্থিক সমস্যা, বন্যা, ভূমিক্ষয়, ফসলের ক্ষতি, খরা, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ ইত্যাদি অনেক কারণই রয়েছে, যে জন্য জীববৈচিত্র্য হ্রাস হয়েছে।

শুষ্ক মৌসুমে পানির সমস্যায় গবেষণা এলাকায় খরার প্রভাব দেখা যায়। মাঝে মাঝে এই তীব্রতা প্রবল আকার ধারণ করে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও কর্মসংস্থানের অভাব সামাজিক জীবন জীবিকার নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি এলাকার জনগণের উপর প্রভাব ফেলছে। এতে

করে উপজেলার জমি এবং মানুষের জীবিকা নির্বাহ বর্তমানে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের চরম প্রভাব এই এলাকাকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। অন্যান্য সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে, বন্যা, প্লাবনের কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা, পানি নিষ্কাশন, নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া, প্রতি বছর পলি জমা হওয়া। এই সব সমস্যার সঠিক সমাধান ও এলাকার উন্নয়নের কথা চিন্তা করে এলাকার প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ করতে হবে।
উপরে দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় গুলো মনে রেখে, এলাকাটির জনগনের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এলাকাটির জমি ব্যবহার এবং তার সমস্যা ও সম্ভাবনার বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন নিম্নে আলোচনা করা হল।

৮.১.১০ গবেষণা এলাকায় ফসল বিলুপ্তির কারণ

গবেষণা এলাকার জনগনের মতে ফসল বিলুপ্তির কারণগুলো হল- জলবায়ু পরিবর্তন, শিল্পকারখানা বৃদ্ধি, নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া, অধিক আয়ের আশায় কৃষকের হাইবিড্র জাতীয় ফসল উৎপাদন, বসতি নির্মাণ, জলাবদ্ধতা, অপরিকল্পিত ভাবে কালর্ভাট নির্মান, আর্দ্রতা কমে যাওয়া, বিদ্যুৎ সমস্যা। নিম্নে এইগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা হল-

চিত্র ৮.১.২২: গবেষণা এলাকায় ফসল বিলুপ্তির কারণ নির্ণয়ে জনগণের মতামত বিশ্লেষণ

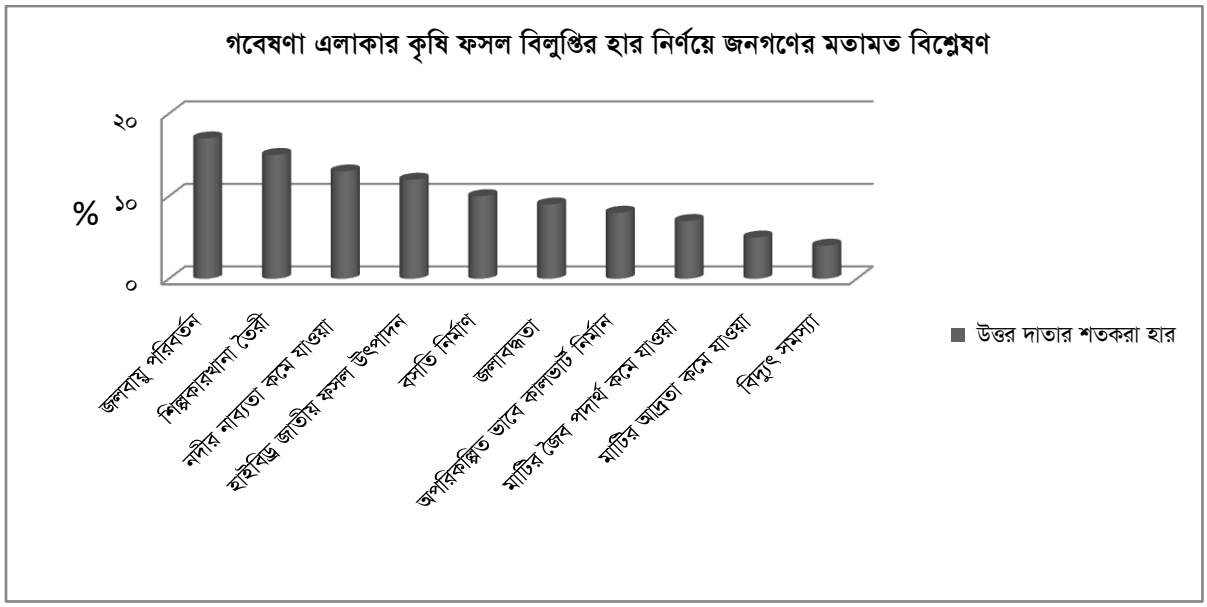

উৎস বি বি এস ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

ক. জলবায়ু পরিবর্তন

গবেষণা এলাকায় প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে এলাকাবাসির মতামত নিয়ে জানা যায় যে, গ্রাফচিত্র ৮.১.২২ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার ১৭ শতাংশ জনগণ মনে করে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে ফসল হারিয়ে যাচ্ছে।

খ.শিল্পকারখানা বৃদ্ধি

গ্রাফচিত্র ৮.১.২২ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকার ১৫ শতাংশ জনগণ মনে করে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বয়লার হোটেল মোটেল ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে বলে ফসল উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। এলাকাবাসির মতে, শিল্পকারখানা ও অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে। এলাকাটিকে কৃষি জমি শুধু কমে যাচ্ছে না বলা যায় যে, কৃষিজমির উপর দ্রুত শিল্পকারখানা তৈরি হচ্ছে ও কৃষি জমিকে অন্য অকৃষিজ জমিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। যা স্থানীয় জনগণের প্রধান উদ্বেগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ.নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া

গ্রাফচিত্র ৮.১.২২ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকার ১৩ শতাংশ অধিবাসি মনে করে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ার কারণে ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে। গবেষণা এলাকার অধিবাসিরা বলেন বেশি ভাগ খাল পলি নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ার জন্য পলি জমে খালগুলো সরু হয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যে জন্য সঠিক সময়ে কৃষি জমিতে পানির ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না।

ঘ.হাইবিড্র জাতীয় ফসল উৎপাদন

গ্রাফচিত্র ৮.১.২২ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার ১২ শতাংশ জনগণ মনে করে হাইবিড্র জাতীয় ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষিজ মৌলিক ফসল উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। অধিকাংশ এলাকাবাসি বলেন হাইবিড্র জাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিক খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষক হাইবিড্র জাতীয় উন্নতজাতের ফসল উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে পরেছে।

ঙ.বসতি নির্মাণ

গ্রাফচিত্র ৮.১.২২ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রশ্নপত্রের উত্তরে এলাকার ১০ শতাংশ জনগণ বলেন অনিয়মিত ভাবে বসতি নির্মানের ফলে ফসল উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। গবেষণা এলাকাটিতে অপরিকল্পিতভাবে বসতি নির্মাণ করা হচ্ছে। ফসলি জমির উপর হাউজিং বাজার ইত্যাদি অপরিকল্পিত ভাবে তৈরি হচ্ছে বলে এলাকাবাসি মনে করেন।

চ. জলাবদ্ধতা

গ্রাফচিত্র ৮.১.২২ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকার ৯ শতাংশ জনগণ মনে করে জলাবদ্ধতা জনিত কারণে কৃষি ফসল বিলুপ্ত হচ্ছে। গবেষণা এলাকার জনগণের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, বর্ষাকালে পানির সঠিক নিষ্কাশণ ব্যবস্থা না থাকায় উচ্চ ফলনশীল বোরো ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। জুন ও আগষ্ট মাসে অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে ও সঠিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকার ফলে কৃষি ও উদ্ভিদ প্রজাতির ক্ষতি হয়ে থাকে। জলাবদ্ধা জনিত কারণে সঠিক সময়ে ফসল বোনা যায় না। আবার ফসল কাটার পূর্বেই বন্যার পানি এসে সব কিছু নষ্ট করে দেয় ইত্যাদি কারণে কৃষক ফসল উৎপাদনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে।

ছ. অপরিকল্পিতভাবে কালভার্ট নির্মাণ

গ্রাফচিত্র ৮.১.২২ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকার ৮ শতাংশ জনগণ মনে করে যে অপরিকল্পিতভাবে কালভার্ট নির্মানের ফলে ফসল বিলুপ্ত হচ্ছে। অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে জলাভূমি ভরাট করা হচ্ছে। অপরিকল্পিত ভাবে কার্লভার্ট ব্রিজ তৈরির জন্য ফসলি জমিতে কৃষিকাজের পানি ব্যবহারে সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

জ. মাটির জৈব পদার্থের বিভিন্নতা

গ্রাফচিত্র ৮.১.২২ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাবাসির ৭ শতাংশ জনগণ মনে করে যে জৈব পদার্থ কোথাও কমেছে কোথাও বেড়েছে যার জন্য ফসল বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মাটিরর জৈব পদার্থ ও রাসায়নিক পদার্থের পরিমান কমে যাওয়ার কারণে অনেক ফসল বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি ফসলের জন্য মাটির জৈব পদার্থ বিভিন্ন হওয়া প্রয়োজন।

ঝ. মাটির আর্দ্রতা কমে যাওয়া

গ্রাফচিত্র ৮.১.২২ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকার ৫ শতাংশ জনগণ মনে করে যে, আর্দ্রতা কমে যাওয়ার জন্য ফসল বিলুপ্ত হচ্ছে। মাটিতে পানির অভাব এবং শুষ্ক মাসে খরা, অপরিহার্য উদ্ভিদ পুষ্টিজনিত সমস্যা এবং ঝুঁকি পূর্ণ্য নিবিড় ফসল চাষ ইত্যাদি কারণে ফসল উৎপাদন কম হচ্ছে।

ঞ. বিদ্যুৎ সমস্যা

গ্রাফচিত্র ৮.১.২২ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকার ৪ শতাংশ জনগণ মনে করে বিদ্যুৎ সমস্যার জন্য ফসল উৎপাদন কম হচ্ছে। এলাকাটিতে বিদ্যুৎ সমস্যা হয়। যে জন্য সঠিক সময়ে ধানি জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয় না।

৮.১.১১ গবেষণা এলাকায় কৃষি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে জনগণের মতামত বিশ্লেষণ

গবেষণা এলাকায় কি ভাবে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। বিলুপ্ত ফসলগুলোকে কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় এই সব বিষয় নিয়ে এলাকাবাসির সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রশ্নমালা জরিপ থেকে তাদের মতামত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নিম্নে ফসল সংরক্ষণে জনগণের মতামতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেওয়া হল।

চিত্র ৮.১.২৩: গবেষণা এলাকায় কৃষি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে জনগণের মতামত বিশ্লেষণ

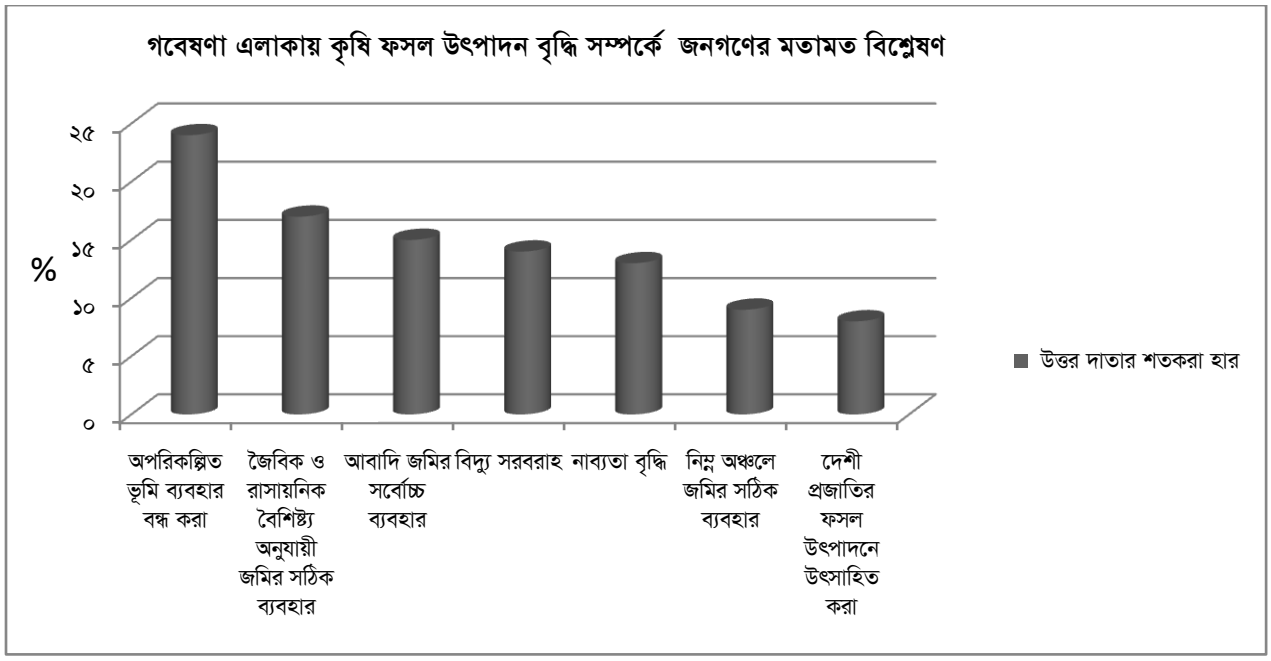

উৎস বি বি এস ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

ক. অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার বন্ধকরা

গ্রাফচিত্র ৮.১.২৩ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার ২৫ শতাংশ জনগণ মনে করে অপরিকল্পি ভূমি ব্যবহার বন্ধ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাবে। এলাকাবাসির সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে জানা যায় যে, কৃষি জমির জন্য ক্ষতিকর অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের অব্যহত দ্বারাকে আইনি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। তিন ফসলি জমির উপর কোনো প্রকার বসতি বা হাউজিং করা যাবে না। বসতি তৈরি করার জন্য একটি সরকারি আইন মেনে চলতে হবে।

খ. জৈবিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জমির সঠিক ব্যবহার

গ্রাফচিত্র ৮.১.২৩ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকার ১৭ শতাংশ জনগণ মনে করে জৈবিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে কৃষি জমির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ফসল সংরক্ষণ করা সম্ভব। এলাকাবাসি বলেন জৈবিক এবং রাসায়ানিক বৈশিষ্ট্য এবং জমির সঠিক গুনগতমান ও ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভূমি ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। জৈবিক এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জমির সঠিক ব্যবহার পরিকল্পনা তৈরির মাধ্যমে জমির অবনতি নিয়ন্ত্রণ করে উন্নয়ন ও ভাল কৃষি ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা যেতে পারে। নিবিড় কৃষি চাষের জন্য আধুনিক ব্যবস্থা কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে রবি ফসল চাষের জন্য উপযুক্ত পাললিক পলি মাটির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

গ. আবাদি জমির সঠিক ব্যবহার

গ্রাফচিত্র ৮.১.২৩ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার ১৫ শতাংশ জনগণ মনে করে আবাদি জমির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে ফসল বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। আবাদি জমিতে আরো ভাল ফসল তৈরি করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

আবাদি জমি গুলোর সর্ব্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চত করতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে খরার সময়ে জমিতে পানি সেচের সঠিক ব্যবস্থা কৌশল নিয়ে আরো একটু ভাবতে হবে। খরা, অনিয়মিত বৃষ্টি এই সমস্যা সমাধানে উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে চিন্তা করতে হবে বলে এলাকাবাসি জানান। জমির আঞ্চলিক আইন এবং গ্রাম উন্নয়ন আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়িত করে। প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সমূহ পরিক্ষামূলক ভাবে পর্যবেক্ষণ করে গ্রামের আইনের সঠিক উন্নয়ন ও প্রয়োগ করা যেতে পারে। কৃষিজমি কে কোন রকম অকৃষিজ কাজে ব্যবহার করা যাবে না। বিশেষ করে কোন তিনফসলি জমিতে কখন শিল্পকারখানা তৈরির অনুমতি দেওয়া যাবে না।

ঘ. বিদ্যুৎ সরবারহ

গ্রাফচিত্র ৮.১.২৩ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার ১৪ শতাংশ জনগণ মনে করে বিদ্যুৎ সরবারহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাবে। এলাকাবাসির সঙ্গে আলোচনা করে জানা যায় যে, বিদ্যুৎ এর কারণে সেচের জন্য ভূ-উপরি ভাগের পানি তোলতে সমস্যা, নিম্ন লিফট পাম্প এবং গভীর নলকূপ দ্বারা কৃষি জমিতে পানি ব্যবহারে অধিক খরচ হয় যা কৃষি কাজের জন্য একটি বড় সমস্যা। সেচ এলাকা প্রসারিত করার মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি সেচ কাজে সহজে ব্যবহার করার সুবিধা তৈরি করে, প্রয়োজন মত সার ও কীটনাশকের সহজ প্রাপ্যতার সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে এলাকার ফসল উৎপাদনের উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব্য। সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যববস্থা করতে হবে। জমির অবনতি নিয়ন্ত্রণ করে উন্নয়ন ও ভাল কৃষি ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে। যে সব অঞ্চলে পানির ফসল উৎপাদনের জন্য বিদ্যুৎ প্রয়োজন সে সব অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ.নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি

গ্রাফচিত্র ৮.১.২৩ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার ১৩ শতাংশ জনগণ মনে করে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এলাকাবাসি বলেন গবেষণা এলাকায় এই সমস্যা দূর করণের একটি সহজ সমাধান হল খাল খনন করা, প্রয়োজনে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য নদী পূর্ণ খনন করতে হবে। এলাকার পুরাতন খালগুলো পূর্ণখনন করার মাধ্যমে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। শুকিয়ে যাওয়া খালগুলোকে নদীর সঙ্গে যুক্ত করে পুনরায় পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। খাল বিল ও পুকুরে অধিক বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

চ. নিম্ন/ নিচু অঞ্চলের জমির সঠিক ব্যবহার

গ্রাফচিত্র ৮.১.২৩ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকার ৯ শতাংশ জনগণ মনে করে নিচু জলাশয় যুক্ত ভূমির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে ফসল বিলুপ্তির হার কমানো সম্ভব। নিম্ন জলাশয়যুক্ত এলাকা ও নিম্ন জলময় ভূমিতে বোরো চাষ করা হয়। বর্ষা মৌসুমে বন্যা জনিত কারণে এই স্থানগুলো পানির নিচে পরিবেষ্টিত থাকে তখন কিছু করা সম্ভব হয় না। গবেষণা এলাকা যখন পানিপূর্ণ থাকে তখন এর সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে সঠিকভাবে মৎস্য চাষ করা, এবং যখন পানি থাকেনা তখন তার সম্পূর্ণটি জুড়ে অধিক ফসল উৎপাদনের বিষয়টি গবেষণার এলাকার মানুষ নিশ্চিত করতে চায়। যখন যে অবস্থাতেই থাকুক না কেনো তার সর্বাধিত ভাল ব্যবহার ও উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

ছ. দেশী প্রজাতির ফসল উৎপাদনে কৃষকশ্রেনীকে উৎসাহিত করা

গ্রাফচিত্র ৮.১.২৩ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকার ৮ শতাংশ জনগণ মনে করে কৃষককে মৌলিক ফসল উৎপাদনে উৎসাহি করে তুলতে হবে। এলাকাবাসিরা বলেন বর্তমান সময়ে প্রতিটি পরিবারের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে খাদ্য চাহিদা। অধিক খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষক হাইবিড্র জাতীয় উন্নতজাতের ফসল উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে পরেছে। এই সব কৃষককে দেশি প্রজাতির ফসল উৎপাদনে উৎসাহি করতে হবে। গবেষণা এই সব মৌলিক ফসলের প্রয়োজনিয়তা সম্পর্কে তাদের জানাতে হবে তা হলে মৌলিক ও আদি ফসলগুলো সংরক্ষন করা সম্ভব হবে।

গবেষণা এলাকার ফসল তথ্য নেওয়ার আগে এলাকার জনগনের মতামতের ভিত্তিতে এলাকাটিতে কি কি ধরণের ফসল হত এবং এখনও হচ্ছে তার একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। নিম্লে তা দেওয়া হল

কৃষি ফসলগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম নিম্লে দেওয়া হল

টেবিল ৮.১.১: দানা জাতীয় শস্যগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম

নাম	*বৈজ্ঞানিক নাম*	ইংরেজি নাম
দেশি আউশ	*Oryza sativa* **/**	Local BR.AUS Rice
উচ্চ ফলনশীল আউশ	*Oryza sativa* **/**	HYV Aus

দেশী বোনা আমন	*Oryza sativa* /	Local BR. Aman
দেশী রোপা আমন	*Oryza sativa* /	HYV TR. Aman
উচ্চ ফলনশীল আমন	*Oryza sativa* /	Local Boro
দেশী বোরো	*Oryza sativa* /	Pajam Boro
হাইব্রীড বোরো	*Oryza sativa* /	HYV Boro
উচ্চ ফলনশীল বোরো	*Oryza sativa* /	
গম	*Triticum aestivum*	wheat
দেশী ভুট্টা	*Zea mays*	Maize
হাইব্রীড ভুট্টা	*Zea mays*	HYV Maize
বার্লি	*Hordeum vulgare*	Barley
যব	*Avena sativa*	Oat
জোয়ার		Great Millet
বাজরা	*Pennisetum glaucum*	Pearl Millet
চীনা		Caon Millet
কাউন (অন্যন)	*Setria italic*	Italian Millet

উৎস মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

টেবিল ৮.১.২: ডাল জাতীয় শস্যগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম

নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি নাম
ছোলা	*Cicer arietinum L.* /	Gram বা Chick pea
অড়হর	*Cajanus cajan (L.) Millsp*	pigeon pea
মসুর	*Leguminosae*	Lentil
মটর	***Pisum sativum***	pea
মুগ	*Vigna radiata.*	Golden gram.
মাস-কলাই	*Vigna mungo*	Black gram
খেসারি	*Lathyrus sativus*	Grass pea/ chuckling Vetch
গাড়ি কলাই		Gari kalai
ফেলন (অন্যান্য)		Felon

উৎস মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

টেবিল ৮.১.৩: তৈল বীজ জাতীয় শস্যগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম

নাম	*বৈজ্ঞানিক নাম*	ইংরেজি নাম
সরিষা	*Brassica spp*	Mustard
সরিষা (রাই)	*Brassica spp*	Mustard (rape)
তিল	*Sesamum indicum* /	Sesame
তিসি	*linum usitatissimum*	Linseed
চীনা বাদাম	*apios americana*	Ground nut
ভেরেন্ডা	*Richinus communis Linn*	Veranda
বাজরা	*Pennisetum glaucum*	Bazra
রেড়ী (কেস্টর)		Castor (Reri)
সূর্যমুখী	*Helianthus annuus*	Sunflower
কুসুম	*Carmanthus tinctorius*	Indian Safflower
সয়াবিন (অন্যান)	*Glycine max*	Soybean

উৎস মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

টেবিল ৮.১.৪: অর্থকরী ফসল শস্যগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম

নাম	*বৈজ্ঞানিক নাম*	ইংরেজি নাম
পাট	*Corchorus capsularis*	jute
মেস্তা	*Hibiscus sabdariffa*	Rosella sorrel
শন পাট	*Crotalaria juncea*	Sun hemp
তুলা	*Gossypium* (genus)	cotton
আঁখ	*saccaram*	sugarcane
তামাক (অন্যান)	*Nicotiana tabacum*	tobacco

উৎস মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

টেবিল ৮.১.৫: কন্দাল জাতীয় ফসলগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম

নাম	*বৈজ্ঞানিক নাম*	ইংরেজি নাম
গোল আলু	*Solanum tuberosum*	potato
মিষ্টি আলু	*Ipomeoa batatas*	Sweet potato
কচু	*Colocassia esculenta*	Colocassia/ arum
ওল কচু	*Alocasia macrorrhiza*	Oal kachu

উৎস মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

টেবিল ৮.১.৬: তরি-তরকারী জাতীয় ফসলগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম

নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি নাম
বেগুন	*lanum melongena*	Brinjal
মিষ্টি কুমড়া	*Cucurbita maxima*	Pumpkin/Sweet gourd
চাল কুমড়া	*Amaranthas gangetica*	White gourd
বাঁধা কপি	*Brassica oleracea*	cabbage
ফুল কপি	*B. oleracea var. botrytis*	cauliflowers
ওল কপি	*Brassica oleracea gongyloides*	Knoll-kal-turnip
লাউ	*Lagenaria siceraria*	Water gourd
টমেটো	*Solanum lycopersicum*	Tomato
মূলা	*Raphanus sativus*	radish
শিম	*Lablab purpurcus*	Beans
পটল	*Trichosanthes dioica*	Pointed gourd
ঢেঁড়স	*Hibiscus esculentus*	Lady's finger
ধুন্দল		Dhundul
ঝিঙ্গা	*Habiscus rosa-Sinensis Linn*	Ribbed gourd
শসা	*Cucumis sativus*	Cucumber
খিরাই	*Cucumis sativus*	Kherai
ডাঁটা শাক		Amaranta
লাল শাক	*Anaranthus oleraceus.*	Red amaramth
পালং শাক	*Spinacea olerocea*	Spinich/ palang shak
পুঁই শাক	*Basella alba Linn*	Malabar Nightshade
বরবটি		Indian spinach
করলা	*Momordica charantea*	Bitter gourd
চিচিঙ্গা	*Trichosanthes cucumerina*	Snake gourd
গাজর	*Daucus carota*	Carrot
কাঁকরোল	*Momordica cochinchinensis*	kaklor

শালগম	*Brassica rapa*	Turnip

উৎস মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

টেবিল ৮.১.৭: ফল জাতীয় ফসলগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম

নাম	*বৈজ্ঞানিক নাম*	ইংরেজি নাম
কলা	*Musa scuminate*	Banana
পেঁপে	*Carica Papaya*	Papaya.
তরমুজ	*Citrullus lanatus*	Water/ melon
বাঙ্গী	*Cucumis melo*	musk- Melon
আনারস	*(Ananas sativus*	pineapple

উৎস মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

টেবিল ৮.১.৮: মসলা জাতীয় ফসলগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম

নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ইংরেজি নাম
মরিচ	*Capsicum annum*	Chillies
পেঁয়াজ	*Allium cepa*	Onion
রসুন	*Allium sativum*	Gaerlic
হলুদ	*Curcuma longa*	Turmeric
ধনে	*Coriandrum sativum*	Coriander seed
আদা	*Zingiber officinale*	Ginger
কালোজিরা	*Nigella sativa linn*	Black cumin seed
মৌরী		Ari seed

উৎস মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

টেবিল ৮.১.৯: গো-খাদ্য, জালানী ও বীজ তলা বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম

নাম	*বৈজ্ঞানিক নাম*	ইংরেজি নাম
গো-খাদ্য	*Brassica rapa*	Fodder
জালানী		Fuel
বীজ তলা		Seed bed

উৎস মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

অধ্যায় নবম
গবেষণা এলাকায় বিলুপ্ত উদ্ভিদ প্রাণী ও কৃষি ফসলের মাঠ জরিপ তথ্য বিশ্লেষণ
উদ্ভিদ প্রজাতি

ভূমিকা

উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করা বেশ দুরূহ কাজ। জলবায়ু, মৃত্তিকা, ভূ-প্রকৃতি প্রভৃতির তারতম্যের কারণে উদ্ভিজ্জে গঠন প্রকৃতিতে বিশেষ তারতম্য সৃষ্টির কারণে এক এক স্থানে এক এক ধরণের উদ্ভিদ দেখা যায়। উদ্ভিদ বৈচিত্র্য. বাস্তসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য, সরকারী ব্যবস্থাপনা, আইনগত ব্যবস্থাপনা, বনবিভাগ কর্তৃক জোনভিত্তিক বাংলাদেশের উদ্ভিদকে বিভিন্ন শ্রেনীতে ভাগ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বনজসম্পদ মূলত ২ ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি ব্যক্তি মালিকানাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনভূমি এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে দেশের সর্বত্র সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন বড় বড় অরণ্য ভূমি। ব্যক্তিমালিকানাধীন ৬.৪ শতাংশ বনভূমিকে বেসরকারী ধরা হয়। যার অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলের সৃষ্ট বন ও গৃহের আশে পাশে রোপনকৃত বৃক্ষাদি নিয়েই গঠিত। এটি দেশের মোট আয়তনের ১৫.৮২ ভাগ (কবীর, ২০০২)। আমাদের গবেষণা এলাকাটি ব্যক্তিমালিকানাধীন বন বিভাগের আওতায় পরেছে। গ্রামাঞ্চলেরর সৃষ্ট বন ও গৃহের আশে পাশে রোপনকৃত বৃক্ষাদি নিয়েই এটি গঠিত। গবেষণা এলাকাটিতে প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে উদ্ভিদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এলাকাটির ১০০০ জন মানুষের কাছ থেকে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ১০০টি প্রশ্নপত্রের উত্তর গ্রহণ করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৯.১ গবেষণা এলাকার বনভূমির ধরন ও আয়তন

গবেষণা এলাকায় বনভূমির ধরনে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকাটিতে সৃষ্ট বন ও গৃহের আশে পাশে, রাস্তার ধারে, পুকুর পাড়, নদীর ধারে ও রেল লাইনের পাশে রোপনকৃত বৃক্ষাদি নিয়ে গঠিত হয়েছে। গবেষণা এলাকাটি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় এই এলাকায় ৪৩১.৩০ হেক্টর ভূমিতে গৃহ সম্বলিত বনভূমি রয়েছে। যা মোট এলাকার ৯.৪৯ শতাংশ। এটি কোনো এলাকার জন্য কাম্য বনভূমি থেকে অনেক কম। যে কোনো এলাকার আবহাওয়া ও জলবায়ু সঠিক মাত্রায় টিকিয়ে রাখার জন্য এলাকাতে কম পক্ষে ২৫% বনভূমি থাকা বাঞ্চনিয়। সেখানে গৃহ ও উদ্ভিদ মিলিয়ে বনভূমি রয়েছে ৯.৪৯ শতাংশ এর কম। যদি এখানে শুধু উদ্ভিদ হিসাব করা হয় তা হলে তা ২ শতাংশ এর ও কম আসবে।

টেবিল ৯.১: গবেষণা অঞ্চলের ইউনিয়ন ভিত্তিক উদ্ভিদজ্জ এলাকা

ইউনিয়নের নাম	ইউনিয়নের আয়তন (হে:)	বনভূমি ধরণ	আয়তন (হে:)	শতকরা আয়তন
আশুগঞ্জ	১১৩৩.১৮	গ্রামীণ বনায়ন	১৩৭.৭১	১২.১৫
চর চারতলা	৬৩৬.৪৩	গ্রামীণ বনায়ন	১৪.৫৯	২.২৯
দূর্গাপুর	১২২৯.৯৬	গ্রামীণ বনায়ন	১৪৫.৯৪	১১.৮৭
তালশহর	১১৩৮.৮৬	গ্রামীণ বনায়ন	১৩৩.০৬	১১.৬৮

উৎস- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১১. মাঠ জরিপ (২০১৪-২০১৫) জি আই এস ডাটা

৯.২ গবেষণা এলাকার ইউনিয়ন ভিত্তিক গাছের তালিকা ও গাছের শতকরা হারঃ

গবেষণার মাঠ জরিপ প্রশ্নপত্র থেকে সংগ্রহিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, এলাকাটিতে আশুগঞ্জ ইউনিয়নে সব চেয়ে বেশি রেইনট্রি রয়েছে ৪১ শতাংশ। তালশহর ৩৯ শতাংশ, দূর্গাপুর ও চর চারতলা ইউনিয়নে ৩৫ শতাংশ রেইনট্রি রয়েছে। আকাশিয়া গাছ আশুগঞ্জ ও চর চারতলায় ১৮ শতাংশ করে রয়েছে। দূর্গাপুর অঞ্চলে ১৫ শতাংশ আকাশিয়া বৃক্ষ রয়েছে। মেহগনি গাছ তালশহর চর চারতলায়

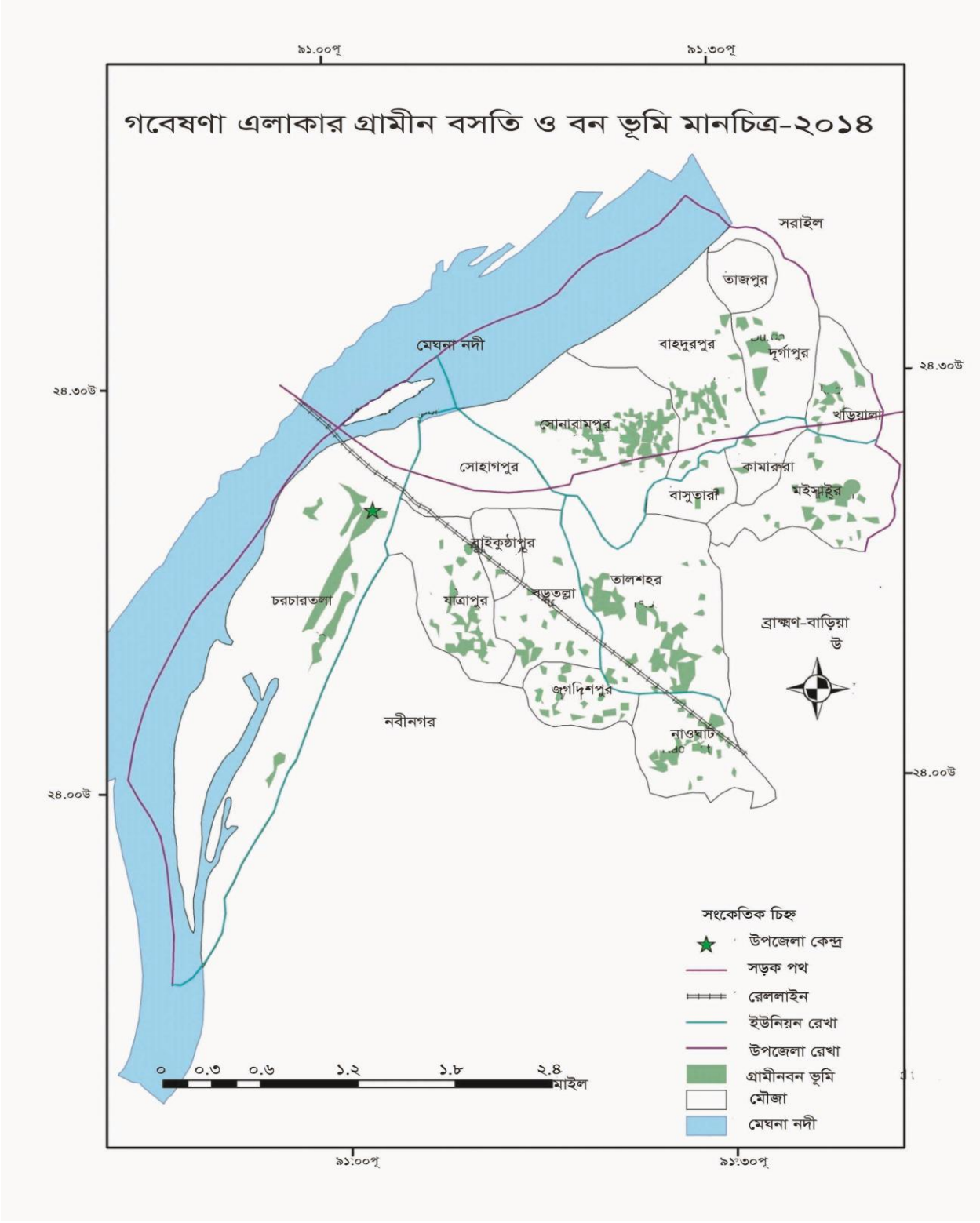

মানচিত্র ৯.১: গবেষণা এলাকার গ্রামীণ বনভূমি
উৎস: মাঠ জরিপ মূল মানচিত্র- ২০১৪

বেশি পরিমানে রয়েছে ৯ শতাংশ ও ১০ শতাংশ এছাড়া দূর্গাপুর ও তালশহর অঞ্চলে ৫% করে মেহগনি বৃক্ষ রয়েছে। মাঠ জরিপে দেখা যায় যে, এলাকাটিতে আশুগঞ্জ ও চর চারতলা ইউনিয়নে ৪% করে বাঁশ ঝাড় রয়েছে। দূর্গাপুর ইউনিয়নে ৩ শতাংশ ও তালশহর ইউনিয়নে ৫ শতাংশ বাঁশ ঝাড় রয়েছে।

টেবিল ৯.২: গ্রামীণ বনায়নে ইউনিয়ন ভিত্তিক গাছের তালিকা ও গাছের শতকরা হার

গাছের নাম	আশুগঞ্জ (%)	চর চার তলা (%)	দূর্গাপুর (%)	তালশহর (%)
রেইনট্রি	৪১	৩৫	৩৫	৩৯
আকাশিয়া	১৮	১৮	১৫	
কড়ই			৬	২০
মেহগনি	৯	১০	৫	৫
বাঁশ	৪	৪	৩	৫
আম	২	১	২	১
কাঁঠাল	৪	৪	৩	৪
সুপারি	১	১	১	১
নারিকেল	১	১	১	১
তাল	১	১	১	১
জাম	১	২	১	২
পিয়ারা	১	২	২	২
খেজুর	১	১	১	১
বেত	১	১	১	১
পাটিপাতা	১	১	১	১
ছন	১	১	১	১
নল খাগড়া	১	১	১	
গোলাপ	১		১	১
হেগলা	০	০	০	১
রজনি গন্ধা	১	১		১
অন্যান্য শাকসব্জি	১২	১২	২০	১৪

উৎস: গবেষণা এলাকা মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

৯.৩ গবেষণা এলাকার পরিবেশতাত্রিক উদ্ভিদকূল

গবেষণা এলাকার সমভূমিতে প্রায় সব খাদ্যশস্য প্রজাতি কমবেশি পরিমাণে দেখা যায়। গবেষণা এলাকার প্রধান প্রধান শস্য যেমন ধান, গম, পাট, তুলা তামাক, ডালজাতীয় শস্য, তেল উৎপাদী শস্য এবং অসংখ্য শাক প্রজাতির শস্য জন্মে থাকে। গবেষণার কারণে আমরা কৃষি প্রজাতি ও উদ্ভিদ প্রজাতির বৃক্ষগুলোকে আলাদা করে নিয়েছি। কৃষি প্রজাতির বিবরণ পূর্বের অধ্যায়ে রয়েছে। এই অধ্যায়ে উদ্ভিদকূল সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হল। পরিবেশ তন্ত্রের উপর নির্ভর করে উদ্ভিদ প্রজাতিকে দুটি ভাগে বিভিক্ত করা হয়েছে।

ক) স্থলজ পরিবেশ তন্ত্রঃ

গৃহ, সড়ক, রেল লাইনের ধারের উদ্ভিদকুলকে এর আওতাধিন করা হয়েছে। নদীর চর এলাকায় সুস্পষ্ট পরিবেশতন্ত্র এর মধ্যে রয়েছে।

খ) জলজ পরিবেশতন্ত্রঃ

নদীতে বহমান অস্থির পানির জলাশয়, হ্রদ, হাওড় বাওড়, বিল জলজ পরিবেশ এর অন্তর্ভূক্ত। ভাসমান প্লাকটন ছাড়াও অনেক উদ্ভিদ প্রাণী জলজ পরিবেশতন্ত্রে আছে।

খাল বিল পুকুরের স্থির পানিতে ভাসমান জলজ উদ্ভিদ লিমনা, উলফিয়া, সেইরপাস, সেগিটারিয়া ইত্যাদি। শৈবালজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে আছে ডায়াটম, নীলাভ সবুজ শৈবাল ও সবুজ শৈবাল। বহমান পানির মধ্যে শৈবাল ছাড়াও বেশ কিছু উদ্ভিদ আছে।

উদ্ভিদ হারিয়ে যাওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। দ্রুত গাছ কাটার কারণের মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং দারিদ্রতা। বিভিন্ন উপায়ে গাছ কাটা হচ্ছে গাছ কেটে নতুন নতুন জনবসতি স্থাপন, গাছ কেটে ধানের বয়লার তৈরি । বিভিন্ন কলকারখানা তৈরি। গাছের পাতা ও ডালপালা আহরণ, জ্বালানির জন্য গাছের কাঠের উপর নির্ভরশীলতা, গবাদি পশুচারণ, বনভূমিকে কৃষি জমিতে রূপান্তর, অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ গাছপালা অধিকহারে সংগ্রহ যেমন ঔষধি গাছ গাছড়া। গবাদী পশু খাদ্য, রং ইটের ভাটা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্পের জ্বালানী হিসাবে কাঠের ব্যাপক ব্যবহার, গৃহস্থালী প্রয়োজনে ভূমিস্থ সবুজ আচ্ছাদনের সম্পূর্ণ বিনাশ এবং বনজ দ্রব্যের অতিরিক্ত ব্যবহার, এছাড়াও ব্যাপক বৃষ্টিপাত, ভূমি ধ্বংস, ভূমি ক্ষয়, বন্যা, সাইক্লোন, টর্ণেডো। এছাড়া উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও সচেতনতার অভাব, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু স্বাভাবিক ক্ষেত্র ও সম্পদ পুনরুৎপাদন সম্পর্কে গবেষণা কর্মকান্ড ও উন্নয়ন কর্মসূচীর অপ্রতুলতা, পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব ইত্যাদির গবেষণা এলাকার উদ্ভিদ ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। উদ্ভিদ বৈচিত্র্য যেমন প্রজাতি প্রাচুর্য্যে ভরপুর ছিল তেমনি প্রতিটি প্রজাতির জাত ও উপজাত সংখ্যা এবং এদের সদস্য সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য শস্য উৎপাদনের জন্য বনজঙ্গল কেটে শস্য জাতীয় উদ্ভিদ চাষ শুরু করা হয়। ফলে কয়েক প্রজাতির শস্য উদ্ভিদের জন্য হাজার হাজার প্রজাতির উদ্ভিদের বংশ নির্মূল হয় (মান্নান, ২০০০)

টেবিল ৯.৩: গবেষণা এলাকায় পরিবেশতাত্তিক ধরণ অনুসারে উদ্ভিদ বিন্যাস সারণি

উদ্ভিদের স্থান অনুসারে ধরন	নাম
জলজ উদ্ভিদ প্রজাতি	জলাআপং, ভাটশোলা, কচুরিপানা, হেলেঞ্চা, কমলি, ক্ষুদিপানা, কেশরদাম, পদ্ম, শাপলা, ঝরাধান, পানিকলা, টোপাপানা, পাইন্যা সিংগারা, হোগলা, পাতা শেওলা, গুঁড়িপানা
স্থলজ উদ্ভিদ প্রজাতি	বেল, আনারস, আতা, কামরাঙ্গা, পেঁপে, কমলা, জামবুরা, তরমুজ, নারিকেল, লিচু, সফেদা, কলা, আমলকি, পেয়ারা, ডালিম/ আনার, আমড়া, কুল বরই, বরই, জাম, সুপারি, গাব, ক্ষুদ্রে জাম, বেতফল/মেতুইন, কদবেল, বিলুম্বী, জামরুল, খেজুর, তাল, স্বর্ণলতা, চানচা, মুথা, পানিকলা, শ্রামাঘাস, জংলীঘাস, মান্দা, বিষকাটালি, বন সরিষা, পটপটি, গাগড়া, ডুমুর বাসক, ঘৃতকুমারী, কালমেঘ, থানকুনি, দুর্বা, ধুতরা, কুরচি, নিম, আসামলতা, তুলসি, অর্জুন, নিসিন্দা, অশ্বগন্ধা, পলাশ, হাসনা হেনা, চন্দ্র মল্লিকা, অপরাজিতা, ডালিয়া, গন্ধরাজ, দোলন চাঁপা, সূর্যমুখী, জবা, বেলী, বকুল, কামিনী, করবী, শেফালী, রজনীগন্ধা, গোলাপ, আর্কিড, গাঁদা, শিরিষ, জাতিম, কদম, কাঁঠাল, হিজল, শিমুল, শিশু, গাব, রেনডি কড়ই, আম, মেহগনি, জাম, তেঁতুল, সেগুন, বাঁশ ঝাড়,

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

৯.৪ গবেষণা এলাকার উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের ধারণা

সৌরজগতে একমাত্র এই পৃথিবী ছাড়া বিশ্বজগতের অন্য কোথাও জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে এখনও জানা সম্ভব হয়নি। পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাবের কাল দুইশত পঞ্চাশ কোটি বছর বলে মনে করা হয়। বিচিত্র জীবের ধরণের আসা-যাওয়ার চিরন্তন খেলা আজও চলছে। বিবর্তনের ধারায় পেলিয়োজোয়িক বা পুরাজীবীয় যুগকে স্বর্ণযুগ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেননা এ যুগের বিচিত্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছিল (পাল ও সরকার, ২০০৩)। সারা পৃথিবীতে প্রায় চারলক্ষ কারো কারো মতে ছয় লক্ষের মতো উদ্ভিদ প্রজাতি সনাক্ত করা হয়েছে। এর বাইরেও অনেক প্রজাতি থাকতে পারে যা হয়তো এখনও সনাক্ত করা হয়নি। এসব উদ্ভিদের আকার আকৃতি, প্রকৃতি, বংশবৃদ্ধির পদ্ধতি, জীবনচক্র, অভিযোজন এবং সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি বৈচিত্র্যময়। "বিশাল ও বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদগোষ্ঠীর মধ্যে আঙ্গিক ও চারিত্রিক যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় তাকেই উদ্ভিদ বৈচিত্র্যে বলা হয়" (পাল ও সরকার, ২০০৩)।

উদ্ভিদ জগতের জিনগত, প্রজাতিগত, ইকোসিস্টিমগত ও কৃষি প্রয়োজনে সৃষ্টিগত সংখ্যা, প্রাচুর্য ও বিভিন্নতার সমগ্রতাই উদ্ভিদ বৈচিত্র্য" (হাসান, ২০০২)। স্থান কাল পরিবেশ প্রভৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ বৈচিত্র্যও পরিবর্তন হচ্ছে। তাই অল্প কথায় উদ্ভিদ বৈচিত্র্যর সংজ্ঞা নিরূপণ করা কঠিন। তবে সব কিছুর সমন্বয়ে মোটামোটি ভাবে বলা যায় স্থান, কাল ও পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদিকালের এককোষী শৈবাল ও ব্যাকটেরিয়া থেকে উত্থান এবং পতনের ক্রমধারার মাধ্যমে বর্তমান কালের যে জটিল ও বৃহদাকার উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে তাদের পরস্পরের মধ্যে তুলনা করলে যে স্বতন্ত্র্যগুলো দৃষ্টিগোচর হয় তাকেই সামগ্রিকভাবে উদ্ভিদ বৈচিত্র্য বলা যেতে পারে। বিশাল ও বৈচিত্র্য উদ্ভিদ জগতের সদস্যদের মধ্যে যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা যায় তা হলো- অঙ্গ সংস্থানিক, পরিবেশতাত্ত্রিক, অন্তর্গঠনগত, কোষ ভিত্তিক, রঞ্জনভিত্তিক, প্রাণরসায়নিক, অভিযোজিত, পরিব্যক্তীয়, পুষ্টিভিত্তিক

প্রজননগত, আকার ও আকৃতিগত, অনুক্রমগত, অর্থনৈতিক গুরুত্বভিত্তিক এবং স্থানগত বৈচিত্র্য। উপরোক্ত বিভিন্নতার ক্ষেত্র বিচারে বলা যায়, বৈচিত্র্যময় জগতের প্রতিটি বাসিন্দাই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির বৈচিত্র্যে প্রাচুর্য বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এদেশে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা ৬ হাজারের বেশি তন্মধ্যে ৩০০ বিদেশী প্রজাতি রয়েছে। স্বাদু পানিতে ৩০০ প্রজাতির শৈবাল রয়েছে। এছাড়া স্বল্প লোনা ও সমুদ্র রয়েছে অজস্র প্রজাতি তবে এদের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগৃহীত হয়নি। এদেশের ব্রায়োফাইট প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ২৫ এবং টেরিডোফাইটা ২৫০ প্রজাতি, যার মধ্যে ২৩০ হলো ফার্ণ। সপুস্পক (আবৃতবীজী) উদ্ভিদ আছে প্রায় ৫০০০ প্রজাতি। এদের মধ্যে ৭০০ বন বৃক্ষ। এদেশে পাট মেস্তার ৩৬৮৬, চায়ের ২৫৬, কাঠ ও বাঁশের ১০৯৮ এবং অন্যান্য শস্যের ২৯২৯ প্রজাতি সংগ্রহ আছে (পাল ও সরকার, ২০০২) বাংলাদেশের বনভূমিগুলোতে প্রায় ১০০০ প্রজাতির বনজ উদ্ভিদ রয়েছে। যেগুলো অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এদের মধ্যে ৪০০ বৃক্ষ প্রজাতি এবং ৪৩০ প্রজাতি ভেষজ উদ্ভিদ, প্রায় ৫০ টি বৃক্ষ প্রজাতি এবং ১০০টি বীরুৎ ও লতা গুল্ম প্রজাতির বাণিজ্যিক গুরুত্ব রয়েছে (পাশা,২০০৩)।

৯.৫ গবেষণা এলাকায় বিলুপ্ত প্রায় গাছের তালিকা ঃ

গবেষণা এলাকার বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশ্ন পত্রের মাধম্যে জানা যায় যে, এলাকাটিতে বিশেষ করে কড়ই ও কাঠাল ও শিশু গাছের সংখ্যা প্রায় দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফল জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে তরমুজ, বাদাম, মিষ্টি আলু খিরাই ও ক্ষুদ্রেজাম বিশেষ করে কমে যাচ্ছে।

টেবিল ৯.৪: বর্তমানে যে সব উদ্ভিদ কম পাওয়া যায় (বিলুপ্ত প্রায়)

বর্তমানে যে সব উদ্ভিদ কম পাওয়া যায় (বিলুপ্ত প্রায়) তার তালিকা

প্রকার	নাম
ফুল	চন্দ্রমল্লিকা, হাসনাহেনা,
ফল	তরমুজ, বাদাম, মিষ্টি আলু, খিরাই, গাব, জাম ক্ষুদ্রেজাম, বেতফল,
গাছ	কড়ই, কাঠাল, শিশু, বট
ভেষজ পাতা	ধুতরা, ডুমুর,

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

৯.৫.১ গবেষণা এলাকায় উদ্ভিদ প্রজাতি কমে যাওয়ার হার নির্ণয়ে জনগনের মতামত বিশ্লেষণ

গবেষণা এলাকা আশুগঞ্জ উপজেলায় উদ্ভিদ প্রজাতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। গবেষণা এলাকার এলাকাবাসি থেকে জানা যায় যে, এলাকায় পূর্বে ছিল এমন অনেক প্রজাতি বর্তমানে হারিয়ে গেছে। বর্তমান সময়ে সে সব বৃক্ষ দেখা যায় না। এলাকাবাসি বলেন এই গবেষণা এলাকায় এক সময় বট বৃক্ষের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। যে জন্য গবেষণা এলাকায় একটি মৌজার নাম ছিল বটতলা। সে মৌজায় শতবর্ষি বেশ কয়েকটি বট বৃক্ষ ছিল। বর্তমানে সে বট বৃক্ষের অনেকগুলো নেই। বর্তমানে বটতলা নাম বিবর্তন হয়ে বড়তলা হয়েছে। ঠিক একই ভাবে এই গবেষণা এলাকায় পূর্বে ভেষজ অনেক রকম গাছ পাওয়া যেত। এখন সে সব ভেষজ গাছ আর পাওয়া যায় না। বিশেষ করে কালমেঘ নামক ভেষজ গাছটি প্রায় পাওয়া যায় না। এখনে ফল গাছের মধ্যে দেখা যায় যে ক্ষুদ্রে জাম, কুল বরই, বেতফল এক সময় এলাকাটিতে বেশি পাওয়া যেত। বর্তমানে এই সব প্রজাতি প্রায় হয়না বলা যায়। এলাকাবাসীর মতামতের ভিত্তিতে জানা যায় যে, গবেষণা এলাকায় ৬৩ শতাংশ বৃক্ষ প্রাজাতি হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র ৯.১: গবেষণা এলাকায় উদ্ভিদ প্রজাতি কমে যাওয়ার হার নির্ণয়ে জনগনের মতামত বিশ্লেষণ

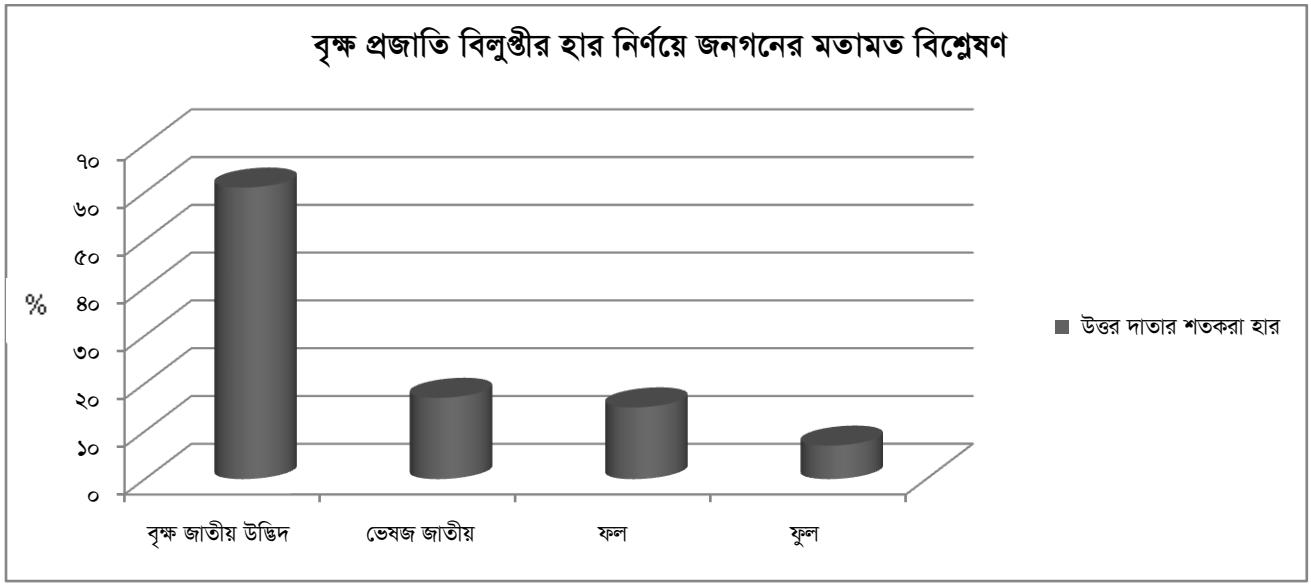

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

গবেষণা এলাকার জরিপে এলাকাবাসীর মতামত বিশ্লেষণ দেখা যায় যে, ভেষজ প্রজাতি হ্রাস পেয়েছে ১৭ শতাংশ। ফল জাতীয় উদ্ভিদ প্রজাতি হ্রাস পেয়েছে ১৫ শতাংশ। ফুল, ফল জাতীয় উদ্ভিদ প্রজাতি হ্রাস পেয়েছে ৭ শতাংশ।

৯.৫.২ গবেষণা এলাকায় উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্তির মানবীয় কারণ বিশ্লেষণ

উদ্ভিদ বিলুপ্তির বিভিন্ন কারণ রয়েছে। কৃষি জমির বৃদ্ধি, নগরায়ণ বৃদ্ধি, ঘরবাড়ি তৈরি, রাস্তাঘাট তৈরি, জ্বালানী কাজে কাঠ ব্যবহার ও আসবাব তৈরি বিভিন্ন কাজে প্রতিনিয়ত গাছ ব্যবহার করা হচ্ছে। এই জন্য অনেক বেশি গাছ কাঠা হচ্ছে। বৃক্ষ হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতি থেকে। গবেষণা এলাকাটিতেও বিভিন্ন কারণে বৃক্ষ প্রজাতি হ্রাস পাচ্ছে। নিম্নে গবেষণা এলাকার বৃক্ষ প্রজাতি হ্রাস পাওয়ার মানবীয় কারণগুলো দেওয়া হল।

চিত্র ৯.২: গবেষণা এলাকায় উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্তির মানবীয় কারণ বিশ্লেষণ

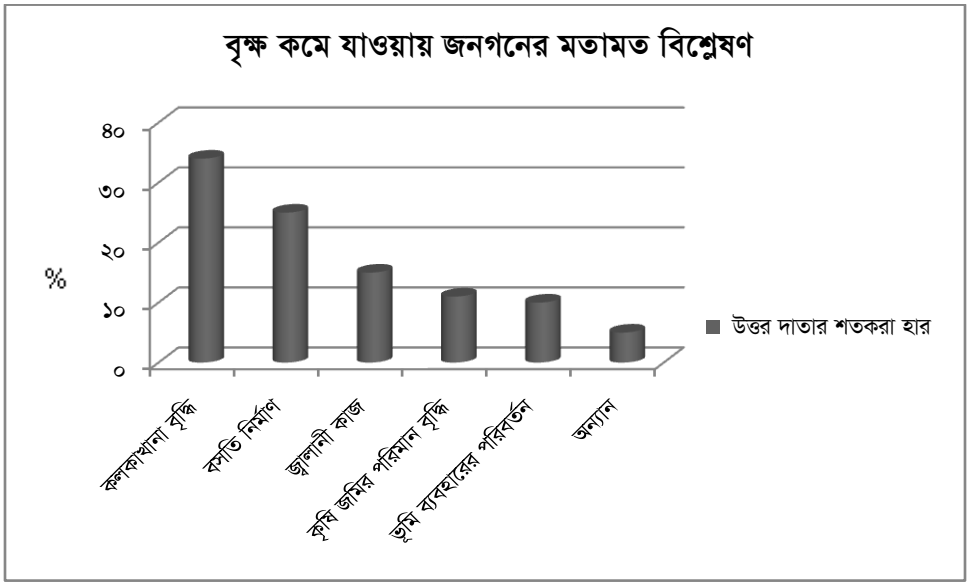

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

ক. কলকারখানা বৃদ্ধি

গবেষণার ৯.২ নং গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করে জানা যায় এলাকাবাসীর ৩৪ শতাংশ মত পোষণ করেন যে কলকারখানা তৈরির জন্য উদ্ভিদ প্রজাতি হ্রাস পেয়েছে। গবেষণা এলাকার এলাকাবাসীর জরিপ প্রক্রিয়ায় পাওয়া তথ্যেও ভিত্তিতে জানা যায় যে, এলাকাটিতে কলকারখানার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ও বনভূমির পরিমাণ প্রতিবছর হ্রাস পাচ্ছে।

খ. বসতি নির্মাণ

৯.২ নং গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করে জানা যায় এলাকাবাসীর ২৫ শতাংশ মত প্রকাশ করে বসতি নির্মাণের জন্য বনভূমি হ্রাস পাচ্ছে। গবেষণা এলাকাটির জনসাধারন বলেন 'বিগত ৫০ বৎসরে জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অধিক বর্ধিত জনসংখ্যা থাকার ব্যবস্থা করার জন্য অধিক পরিমানে বৃক্ষ নিধণ করা হচ্ছে'।

গ. জ্বালানি কাজে ব্যবহার

৯.২ নং গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করে জানা যায় এলাকাবাসীর ১৫ শতাংশ জনগণ মনে করে যে এলাকাটিতে জ্বালানী কাজে কাঠ ব্যবহার করা হয় বলে বৃক্ষ প্রজাতি হ্রাস পাচ্ছে। এলাকাবাসী বলেন বিভিন্ন কলকারখানায় জ্বালানি কাজে কাঠ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ঘ. কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি

৯.২ নং গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করে জানা যায় গবেষণা এলাকার ১১ শতাংশ জনগণ মতামত প্রকাশ করেছে যে, কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য বনভূমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। গবেষণা এলাকাটির জনগণ বলেন জনসংখ্যার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য সরবরাহ করার জন্য বনভূমি হ্রাস করে কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ঙ. ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

৯.২ নং গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করে জানা যায় গবেষণা এলাকার ১০ শতাংশ জনগণ মনে করে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের জন্য গবেষণা এলাকাটির বৃক্ষ প্রজাতি হ্রাস পাচ্ছে। গবেষণা এলাকাটির অধিবাসীরা বলেন বিগত ৫০ বছরের এলাকাটির বিপুল পরিমানে পরিবর্তন হয়েছে। এলাকাটির যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, কোথাও কোথাও কালভার্ট ব্রিজ তৈরি হয়েছে। নদীর পরিমাণ কমে এসেছে। এই থেকে জানা যায় যে গবেষণা এলাকাটির ভূমি ব্যবহারের বিপুল পরিবর্তন হয়েছে।

চ. অন্যান্য

আসবাব তৈরি, ঘরের খুটি তৈরি, অধিক বার্ধক্য জনিত কারণে গাছ ভেঙ্গে পরা বিভিন্ন কাজে গাছ অধিক পরিমানে ব্যবহার করা। যা বৃক্ষ হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। যে জন্য এলাকাটির ৫ শতাংশ জনগণ বলেছে বিভিন্ন কারনে বৃক্ষ হ্রাস পাচ্ছে।

৯.৬ গবেষণা এলাকাটি সামাজিক বনায়ন এর অর্ন্তগত

যে বনায়ন ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণ সরাসরি সম্পৃক্ত থাকে বা জনগণ বন সৃজন কর্মকান্ডে সরাসরি অংশগ্রহন করে অথবা জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের কল্যাণে যে বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয় তাকেই সামাজিক বনায়ন বলা হয় (চক্রবর্তী, ২০০৩)। বাংলাদেশে বনজ সম্পদের হ্রাসের হার অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এ হার ৩.৩ শতাংশ। বন ধ্বংসের ধারা মোকাবিলার এবং বনভূমির আয়তন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আশির দশক থেকে সামাজিক বনায়নের কয়েকটি প্রকল্প শুরু করা হয়। এগুলো হচ্ছে কমিউনিটি ফরেস্ট ও ফরেস্ট্রি সেক্টর। এগুলোতে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বর্তমানে ফরেস্টেও প্রজেক্ট ৫২টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে (বিল্লাহ, ২০০৩)।

বাংলাদেশের মোট ২.১ মিলিয়ন হেক্টর এলাকাতে মানুষ উদ্ভাবিত মৃত্তিকা বিদ্যমান। এসব মৃত্তিকার মধ্যে মানুষের তৈরি ভূমি (০.১ মিলিয়ন হেক্টর) ও বিবিধ ভূমি ২.০ মিলিয়ন হেক্টর অন্তর্ভুক্ত। বিবিধ ভূমির মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ কিলোমিটার সড়ক, সাত হাজার কিলোমিটার নদীর বাঁধ এবং ছয়শত কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধ অন্তর্ভূক্ত। এছাড়া অসংখ্য সেচ ও নিষ্কাশন খাল রয়েছে। খালের পাড়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে গাছ লাগানো হয়েছে। মানুষের তৈরি ভূমির প্রায় ০.৩০ মিলিয়ন হেক্টর বর্তমানে সামাজিক বনের আওতাধীন।

৯.৬.১ এলাকাবাসীর মতামতের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকায় গ্রামীণ বনায়ন তৈরির সমস্যা সমূহ বিশ্লেষণ

বনে উৎপাদিত কাঠ, জ্বালানী কাঠ, ফল, বাঁশ, বেত ইত্যাদি দ্বারা মানুষের আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণ হয়। কিন্তু এই বন বনজ সম্পদ দেশের বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা উপেক্ষিত হয়। ঔষধি প্রজাতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এলাকায় এই সব উদ্ভিদ প্রজাতির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য গাছ লাগানো ও বনায়ন উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন। এলাকাটিতে বনভূমির পরিমাণ প্রায় শূন্য পাওয়া গেছে।
নিম্নে এলাকাবাসীর মতামতের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার গ্রামীণ বনায়নের সমস্যা সমূহ বিশ্লেষণ করা হল-

চিত্র ৯.৩: এলাকাবাসীর মতামতের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকায় গ্রামীণ বনায়ন তৈরির সমস্যা সমূহ বিশ্লেষণ

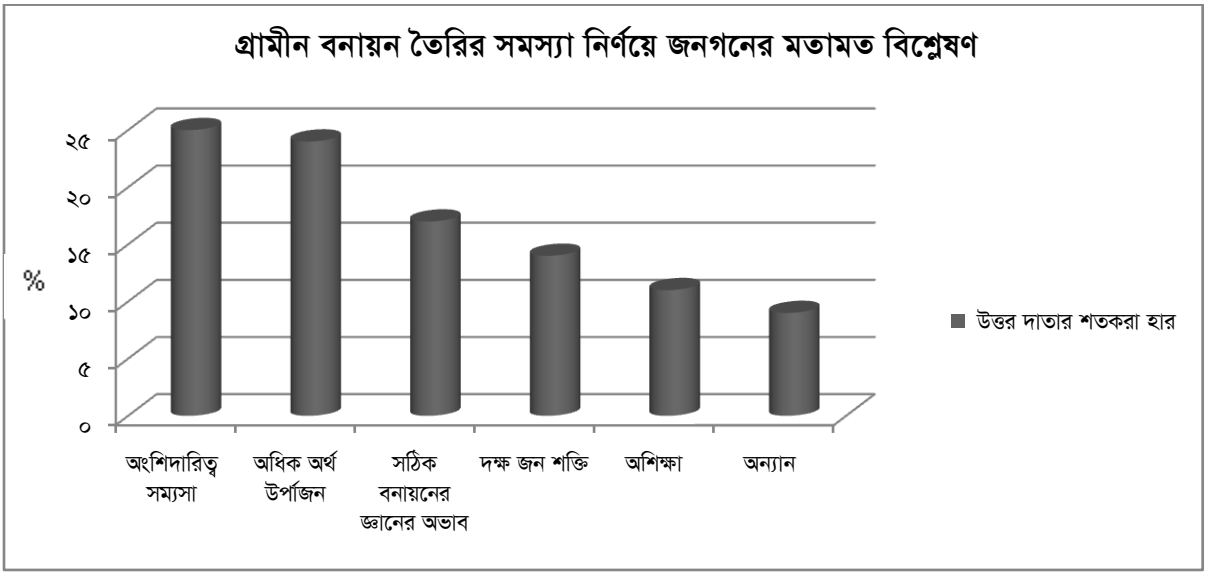

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

ক. অংশীদারিত্ব

৯.৩ নং গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় গবেষণা এলাকার ২৫ শতাংশ জনগণ মনে করে অংশিদারিত্ব নিয়ে কোলাহলের জন্য এলাকাটিকে বনায়ণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এলাকাবাসী বলেন অপরিকল্পিত বৃক্ষ রোপন ও ভূমি ব্যবহারকারিদের অংশীদারিত্ব নিয়ে এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন দ্বন্দ্ রয়েছে। যা সঠিক বন ভূমি তৈরি অন্তরায়।

খ. অধিক আর্থিক উপার্জন

৯.৩ নং গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় গবেষণা এলাকার ২৪ শতাংশ জনগণ মনে করে দরিদ্র জনগণ তাদের আর্থিক চাহিদা পূরণের জন্য গ্রামীণ বনায়নের সমস্যা সৃষ্টি করছে। এলাকায় সবচেয়ে মারাত্মক বিপর্যয় এনে দিচ্ছে বৃক্ষ নিধন। এলাকাবাসী বলেন এলাকার দরিদ্র জনগণ তাদের আর্থিক চাহিদা মেটানোর জন্য গাছের ডালপালা, শাখা প্রশাখা কেটে ফেলছে কখনো সম্পূর্ণ গাছ কেটে নিচ্ছে। এই সব গাছ ইট তৈরির কারখানা, ধানের চাতলে এবং গৃহস্থলী রান্নার কাজে ব্যবহার করছে। কোনো কোনো স্থানে এই সব গাছ কেটে সেখানে ধানের চাতল ও বয়লার গঠন করা হচ্ছে যা বাস্তুতান্তিক পরিবেশের জন্য হুমকি সরূপ।

গ. সঠিক বনায়ণ

৯.৩ নং গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় গবেষণা এলাকায় ১৭ শতাংশ জনগণ মত প্রকাশ করে সঠিক বন ব্যবস্থাপনার জ্ঞানের স্বল্পতা এলাকাটির গ্রামীণ বনায়ন তৈরির সমস্যা করছে। এলাকাবাসী বলেন বন ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন ও সামাজিক বনায়নের জন্য সনাতন বনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যা এলাকার সঠিক বনায়ন বৃদ্ধি ও ধারণক্ষমতার জন্য যথেষ্ট নয়।

ঘ. দক্ষ জনশক্তি

৯.৩ নং গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় গবেষণা এলাকার ১৩ শতাংশ জনগণ মত প্রকাশ করেছে গ্রামীণ বনায়ণ করার জন্য দক্ষ জনশক্তি নেই। বন বিভাগের পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায় এলাকার চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি নেই বলে এলাকাবাসী মনে করেন। যারা বনকে সুরক্ষা করতে পারে। পযাপ্ত অর্থায়নের অভাবে তারা প্রচুর বৃক্ষ রোপনের কর্মসুচি হাতে নিতে পারছে না। এখানে অবকাঠামোগত দূর্বলতা ও সঠিক লজিস্টিক বনবিদ্যার প্রনয়ন কৌশল ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও জনশক্তির অভাব রয়েছে।

ঙ. অশিক্ষা

৯.৩ নং গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় গবেষণা এলাকার ১১ শতাংশ জনগণ মনে করে শিক্ষার অভাবেব কারণে এলাকাটিতে গ্রামীণ বনায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এলাকাবাসী বলেন উদ্ভিদ প্রজাতির গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে না জানা। স্থানীয় বাজারে চারা স্বল্পতা, কোন প্রজাতি রক্ষা করতে হবে এবং কোন প্রজাতির বৃক্ষ কাটা যাবে সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব। এলাকার মানুষের বৃক্ষ রোপনের উদাসিনতা এই বন হ্রাসের জন্য দায়ী।

চ. অন্যান্য

৯.৩ নং গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় গবেষণা এলাকার অধিকহারে বৃক্ষ নিধনের ফলে বনভূমি হারিয়ে যাচ্ছে। এলাকাবাসীর ৯ শতাংশ জনগণ মনে করে বিভিন্ন কারণে এলাকাটির বনায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং আন্তঃ-সংস্থা সহযোগিতা ও শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক ও ব্যবস্থাপকের অভাবে প্রাকৃতিক বন ব্যবস্থাপনা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এলাকার বন উন্নয়ন হচ্ছে না।

৯.৬.২ গবেষণা এলাকায় বনভূমি সংরক্ষণের উপায় সমূহ

কমিউনিটি ফরেস্ট বাংলাদেশের কৃষিবনায়নের একটি ঐতিহ্যবাহী অংশ যা মানুষের কাঠজাতও জ্বালানীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সহায়তা করে। এই ঐতিহ্যকে সঠিক ভাবে ধরে রাখার জন্য যথাযথ উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য প্রযুক্তি ভিত্তিক জ্ঞান প্রয়োজন। গবেষণা এলাকাটিতে বনভূমির বৃদ্ধির জন্য নিম্ন লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে বলে এলাকাবাসী মতামত প্রকাশ করেছে।

চিত্র ৯.৪: গবেষণা এলাকায় বনভূমি সংরক্ষণের উপায় সমূহ

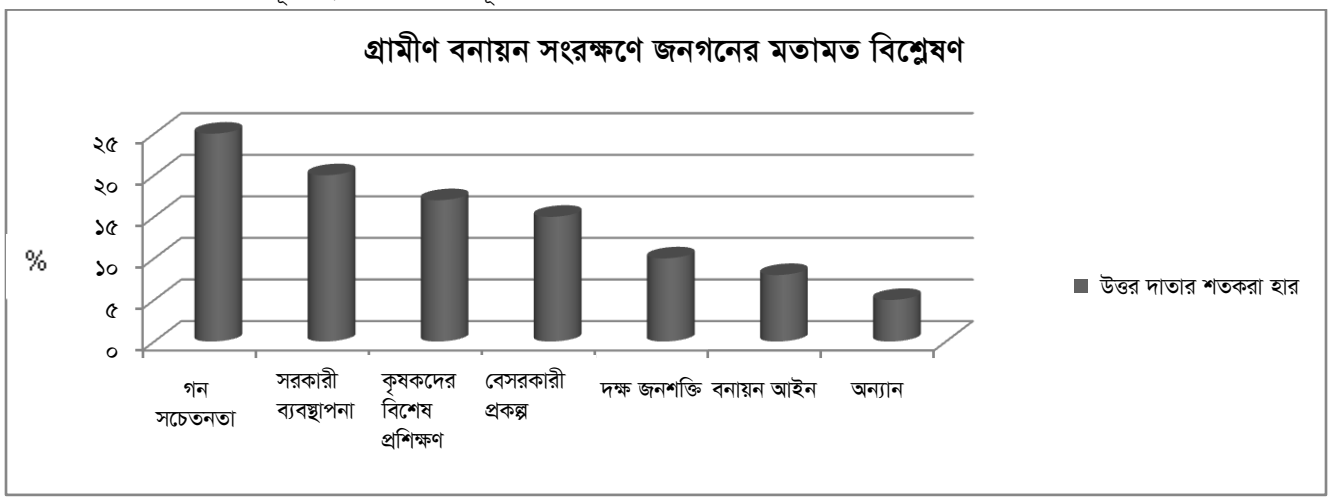

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

ক. গন সচেতনতা বৃদ্ধি

৯.৪ নং গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় গবেষণা এলাকায় ২৫ শতাংশ জনগণ মত প্রকাশ করেছে যে, গন সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ বনায়ন করা সম্ভব। এলাকাবাসী বলেন উন্নয়ন এবং বনায়ন এলাকায় তৈরি একই সঙ্গে এই দুটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য উন্নয়ন মূলক বিভিন্ন প্রোগ্রামের আয়োজন করতে হবে। বিশেষত বাস্তুতান্ত্রিক উন্নয়ন, ঘন বনায়ন, বন্য জীবন সংরক্ষণের জন্য সুরক্ষা, প্রাকৃতিক বন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে আরো শক্তিশালি করে ধরে তুলতে হবে।

খ. সরকারী ব্যবস্থাপনা

৯.৪ নং গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সরকারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রামীণ বনভূমি তৈরি করা সম্ভব বলে ২০% শতাংশ জনগণ মনে করে থাকে। এলাকাবাসী মনে করে সরকারী ব্যবস্থপনার মাধ্যমে এলাকাটিতে বনায়ন করা সম্ভব। বন বিভাগ এলাকায় বনায়নের ঐতিহ্য তুলে ধরে প্রাকৃতিক এবং বাস্তুতান্ত্রিক উদ্ভিদ প্রাচুর্যের বিষয়ে ধারণা দিয়ে এলাকায় ব্যাপক বনায়নের তৈরী করা নিশ্চিত করতে পারে। যাতে সব আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে। এছাড়া বন বিভাগের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা দিয়ে সঠিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিপন্ন প্রায় উদ্ভিদ প্রজাতি গুলো সংরক্ষনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ. কৃষকদের বনায়ন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ

৯.৪ নং গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় কৃষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে এলাকাটিতে গ্রামীণ বনায়ণ সংরক্ষণ করা যাবে বলে ১৭ শতাংশ জনগণ মনে করে। বন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে হবে বলে এলাকাবাসী মত প্রকাশ করেছেন। সঠিক ভাবে পরিচালনার মাধ্যমে কৃষকদেরকে বন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। তাদেরকে পরিবেশিয় উদ্ভিদতাত্তিক জ্ঞান সম্পর্কে জানাতে হবে।

ঘ. বেসরকারী প্রকল্প

৯.৪ নং গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বেসকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ বনায়ন রক্ষা করা সম্ভব বলে ১৫ শতাংশ এলাকাবাসী প্রশ্নমালা জরিপে মত প্রকাশ করেছে। এলাকাবাসী বলেন প্রাসঙ্গিক যোগ্যতা সম্পন্ন এবং দক্ষ এনজিও বনজ ব্যবস্থাপনায় জড়িত হতে পারে। এছাড়াও নদী, খাল বিল, সড়ক ও রেলপথ এলাকাসমূহ ছাড়া অন্য পতিত জমি ও বাঁধ এলাকায় বনায়ন গড়া যেতে পারে। কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস সকল স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণ গ্রামীণ বনায়ন তৈরি করা যেতে পারে।

ঙ. দক্ষ জনশক্তি গঠন

৯.৪ নং গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় দক্ষ জন শক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ বনায়ন সংরক্ষণ করা সম্ভব বলে ১০ শতাংশ জনগণ মত প্রকাশ করেছে। যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজাতি রক্ষা করা যেতে পারে। উন্নত আধুনিক প্রযুক্তি এবং উদ্ভিদ প্রজাতি নির্বাচন, জমির টেকসই উন্নয়ন ভিত্তিক ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক বৃক্ষ চাষ কৌশল ইত্যাদির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

চ. বনভূমি আইন সম্পর্কে ধারণা

৯.৪ নং গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বনভূমি আইন সম্পর্কে সঠিক নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে গবেষণা এলাকায় গ্রামীণ বনায়ন সংরক্ষণ করা যেতে পারে বলে ৮ শতাংশ জনগণ মত প্রকাশ করেছে। জমি আঞ্চলিক আইন, গ্রামের উন্নয়ন আইন, বন আইন (সামাজিক বন বিধি) এই সব প্রধান চাহিদাগুলোর বিষয় মনে রেখে ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

ছ. অন্যান্য

৯.৪ নং গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তিগত উদ্ধেগ্য বাড়ির পাশে খোলা স্থানে বৃক্ষ রোপন করে, রাস্তার ও রেললাইনের পাশে বৃক্ষ রোপন করে গ্রামীণ বনায়ণ বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে ৫ শতাংশ জনগণ মনে করে।

৯.৭ গবেষণা এলাকায় বন নিধনের ফলে পরিবেশের প্রভাব মূল্যায়ন :

গবেষণা এলাকায় জরিপ কাজের সময় প্রশ্ন পত্রের উত্তরের ভিত্তিতে জানা যায় যে, গবেষণা এলাকায় গাছপালা হারিয়ে যাওয়ার ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়ে ছিল। জনগণের উত্তরের ভিত্তিতে জানা যায় যে, গবেষণা এলাকায় ৩২ শতাংশ জনগণ বলেছে বন নিধনের ফলে এলাকাটিতে প্রাকৃতিক দূযোর্গ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৯.১৩ শতাংশ জনগণ বলেছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২২.৯২ শতাংশ জনগণ বলেছে বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন হয়েছে। এছাড়াও শিলা বৃষ্টি, ঘুর্ণিঝড়, বায়ূ প্রবাহের ভিন্নতা দেখা দিয়েছে বলে জনগণ মতামত পেশ করেছে।

চিত্র ৯.৫: বন নিদনের ফলে পরিবেশের প্রভাব মূল্যায়ন

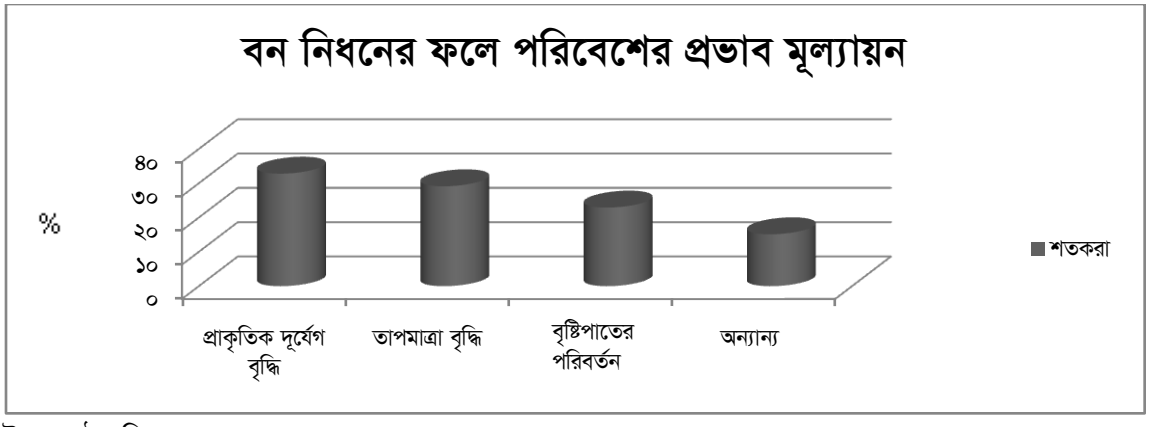

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

৯.৮ গবেষণা এলাকায় সামাজিক বনায়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

ঘনবসতীপূর্ণ গবেষণা এলাকাটি এখানে ভূমি একটি অতিদুস্প্রাপ্য সম্পদ। গবেষণা এলাকায় প্রকৃত পক্ষে ভূমির দুর্ভিক্ষ বিরাজমান বলা চলে। এ পরিস্থিতিতে সামাজিক বনায়নের জন্য নতুন ভূমি প্রাপ্তি এবং কঠিন প্রস্তাব কেবলমাত্র অনাবাদী ও প্রান্তিক ভূমিই সামাজিক বনায়নের জন্য প্রাপ্তিসাধ্য ভূমি বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। সামাজিক বনায়নের জন্য বিভিন্ন প্রধান সড়ক ও বাঁধের প্রান্তিক ভূমির উৎস থেকে প্রাপ্ত্য ভূমির বৃত্তান্ত টেবিল ৯.৫ দেখানো হলোঃ

টেবিল ৯.৫: বনায়নের জন্য প্রাপ্ত ঢাল

অবস্থান	বনায়নের জন্য প্রাপ্তব্য ঢালের আনুমানিক প্রশস্ততা
জাতীয় সড়ক	৪
জেলা পরিষদ সড়ক	২
উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ সড়ক	১
রেল পথ	৩
নদীর পাড় + খালের পাড় বাঁধ	৪
পুকুরপাড় (সরকারী বেসরকারী)	৩

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫ ও বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৯

গবেষণার প্রায় ৪৩১.৩০ হেক্টর বসত বাড়ির এলাকাতে বৃক্ষায়নের উপযোগী ভূমির আনুমানিক পরিমার ১০ হেক্টর। এসব এলাকার কোথাও প্রতিস্থাপন কোথাও উন্নয়ন ও অন্যান্য নতুনভাবে বৃক্ষায়নের মাধ্যমে বৃক্ষ সম্পদ বাড়িয়ে তোলার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

টেবিল ৯.৬: সামাজিক বনায়নের সম্ভাবনাময় ভূমির আনুমানিক ক্ষেত্র ও পরিমাণ

ভূমির শ্রেণী	আনুমানিক পরিমাণ
সড়ক ও বাঁধের ঢালের প্রান্তিক ভূমি	পাকা সড়ক ৩৭.৫০ কি.মি কাচা রাস্তা ১১২ কিমি , রেল লাইন ৭ কিমি এই রাস্তার দুই পাশে বনায়ন গড়া সম্ভব
গৃহস্থালী বৃক্ষায়ন যোগ্য ভূমি	প্রায় ২ হেক্টর
সরকারি মালিকানাধীন উপদ্রুত বনভূমি ও অন্যান্য	প্রায় ২ হেক্টর

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

৯.৯ গবেষণা এলাকায় বর্তমান উদ্ভিদ প্রজাতির তালিকা ও গুনাগুন

গবেষণা এলাকা ঘুরে দেখে ও মাঠ জরিপের মাধ্যম তৈরি প্রশ্ন পত্রের ভিত্তিতে এলাকাটির বর্তমান উদ্ভিদ প্রজাতির তালিকা তৈরি করা হয়েছে। উদ্ভিদের প্রয়োজনিয়তার বিষয় চিন্তা করে এদের ব্যবহারবিধি ও গুরুত্বের একটি তালিকা তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। নিম্নে তালিকা গুলো পর্যায় কমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

টেবিল ৯.৭: গবেষণা অঞ্চলে বর্তমান উদ্ভিদ প্রজাতির তালিকা

উদ্ভিদের ধরন	উদ্ভিদের নাম
ফল গাছ	বেল, আনারস, আতা, কামরাঙ্গা, পেঁপে, কমলা, জামবুরা, তরমুজ, নারিকেল, লিচু, সফেদা, কলা, আমলকি, পেয়ারা, ডালিম/ আনার, আমড়া, কুল বরই, বরই, জাম, সুপারি, গাব, ক্ষুদ্রে জাম, বেতফল/মেতুইন, কদবেল, বিলুম্বী, জামরুল, খেজুর, তাল
ফুল বৃক্ষ	পলাশ, হাসনা হেনা, চন্দ্র মল্লিকা, অপরাজিতা, ডালিয়া, গন্ধরাজ, দোলন চাঁপা, সূর্যমুখী, জবা, বেলী, বকুল, কামিনী, করবী, শেফালী, রজনীগন্ধা, গোলাপ, আর্কিড, গাঁদা,
কাঠ উৎপাদনকারী গাছ	শিরিষ, জাতিম, কদম, কাঁঠাল, হিজল, শিমুল, শিশু, গাব, রেনডি কড়ই, আম, মেহগনি, জাম, তেঁতুল, সেগুন, বাঁশ ঝাড়,
ভেষজ গাছ	বাসক, ঘৃতকুমারী, কালমেঘ, থানকুনি, দুর্বা, ধুতরা, কুরচি, নিম, আসামলতা, তুলসি, অর্জুন, নিসিন্দা, অশ্বগন্ধা
জলজ উদ্ভিদ	জলাআপং, ভাটশোলা, কচুরিপানা, হেলেঞ্চা, কমলি, ক্ষুদিপানা, কেশরদাম, পদ্ম, শাপলা, ঝরাধান, পানিকলা, টোপাপানা, পাইন্যা সিংগারা, হোগলা, পাতা শেওলা, গুঁড়িপানা
সাধারণ আগাছা	স্বর্ণলতা, চানচা, মুথা, পানিকলা, শ্রামাঘাস, জংলীঘাস, মান্দা, বিষকাটালি, বন সরিষা, পটপটি,

	গাগড়া, ডুমুর

উৎস: মাঠ জরিপ (২০১৪-২০১৫)

গবেষণা এলাকায় জন্মানো কিছু উদ্ভিদের গোত্র ও ব্যবহার সারণি

টেবিল ৯.৮: ভেষজ প্রকৃতির উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিক নাম ও ব্যবহার

নাম	গোত্র	বৈজ্ঞানিক নাম	ব্যবহার
বাসক	Acanthaceae	*Adhatoda vasica*	কাশি ও হাঁপানি রোগে
ঘৃতকুমারী	Liliaceae	*Aloe indica*	উল ও শুক্র বর্ধক হিসাবে; আমাশয়ে
কালমেঘ	Acanthaceae	*Andrographis paniculata*	লিভারের মহৌষধ; হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস
থানকুনি	Umbelliferae	*centella asiatica*	কুষ্ঠ ও আমাশয় রোগে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে ও বিভিন্ন চর্ম রোগে
দুর্বা	Gramineae	*Cynodon Dactylon*	রক্তরোধক ও চর্ম
ধুতরা	Solanaceae	*Datura metel*	হাঁপানি রোগে এবং নিদ্রাকর হিসাবে
কুরচি	Apocynaceae	*Holarrhena antidysenteria*	আমাশয়
নিম	Meliaceae	*melia azadirachta*	অ্যান্টিভাইরাল হিসাবে, চর্ম রোগে, সব ধরনের দন্ত রোগে
আসামলতা	Compositae	*Mikania scandens*	দাদ ও আমাশয় রোগে এবং রক্ত রোধক হিসাবে
তুলসি	Labiatae	*Ocimum sanctum*	সর্দি, কাশি, হাঁপানিতে
জাম	Myrtaceae	*Syzygium cumini*	বীজ-বহুমূত্র রোগে, বাকল-আমাশয়ে
অর্জুন	Combretaceae	*Terminalia arjuna*	হৃৎপিন্ডের দুর্বলতা কমাতে ও রক্তের কলেস্টেরল কমাতে
নিসিন্দা	verbenaceae	*vitex negundo*	ঘাঁপানিতে, বাত ও জ্বরনাশক হিসাবে
অশ্বগন্ধা	Solanaceae	*Withania somnifera*	শারীরিক দুর্বলতা কমাতে সহায়তা করে

উৎস: মাঠ জরিপ(২০১৪-১৫) থেকে প্রাপ্ত গাছের নাম ও ব্যবহার

টেবিল ৯.৯: জলজ উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিক নাম ও গোত্র

নাম	গোত্র	বৈজ্ঞানিক নাম
জলাআপং	Amaranthaceae	*Achyranthes aquatic*
ভাটশোলা	*papilionaceae*	*Aeschynomene aspera*
কচুরিপানা	pontederiaceae	*Eichhornia crassipes*
হেলেঞ্চা	Compositae	*Enhydra fluctuans*
কমলি	Convolvulaceae	*Ipomoea aquatic*
ক্ষুদিপানা	Lemnaceae	*Lemna minor*
কেশরদাম	Onagraceae	*Ludwigia repens*
পদ্ম	Nymphaeaceae	*Nelumbo nucifera*
শাপলা	Nymphaeaceae	*Nymphaea nouchali*
ঝরাধান	*Gramineae*	*Oryza rufipogon*
টোপাপানা	*Araceae*	*Pistia strateotes*
পাইন্যা বিষকাটা	*Polygonaceae*	*Polygonum limbatum*
সিংগারা	*Trapaceae*	*Trapa bispinosa*
হোগলা	*Trapaceae*	*Typha angustata*
পাতা শেওলা	*Vallisneria spiralis*	*Hydrocharitaceae*
গুঁড়িপানা	*Lemnaceae*	*Wolffia arrhiza*

উৎস: মাঠ জরিপ(২০১৪-১৫)

টেবিল ৯.১০: বাহারী উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিক নাম ও গোত্র

নাম	গোত্র	বৈজ্ঞানিক নাম
পাতাবাহার	*Euphorbiaceae*	*Codiaeum variegatum*
কাঁটা মেহদী	*Verbenaceae*	*Duranta plumeri*

মনসা	*Euphorbiaceae*	*Euphorbia nerifolia*
লালপাতা	*Euphorbiaceae*	*Euphorbia pulcherima*
লঙ্কা সিজ	*Euphorbiaceae*	*Euphorbia tirucalli*
রংচিতা	*Euphorbiaceae*	*Pedilanthus tithymaloides*

উৎস: মাঠ জরিপ(২০১৪-১৫)

টেবিল ৯.১১: ফুল ও ফল প্রদানকারী উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিক নাম ও গোত্র

নাম	গোত্র	বৈজ্ঞানিক নাম
পলাশ	*Leguminosae*	*Butea monosperma*
হাসনা হেনা	*Solanaceae*	*Cestrum nocturnum*
চন্দ্র মল্লিকা	*Compositae*	*Chrysanthemum coronarium*
অপরাজিতা	*Leguminosae*	*Clitoria ternatea*
ডালিয়া	*Compositae*	*Dahlia hybrida*
গন্ধরাজ	*Rubiaceae*	*Gardenia jasminoides*
দোলন চাঁপা	*Zingiberaceae*	*Hedychium coronarium*
সূর্যমুখী	*Compositae*	*Helianthus annus*
জবা	*Malvaceae*	*Hibiscus rosa-sinensis*
বেলী	*Oleaceae*	*Jasminum sambac*
বকুল	*Sapotaceae*	*Mimosops elengi*
কামিনী	*Rutaceae*	*Murraya paniculata*
করবী	*Apocynaceae*	*Nerium odorum*
শেফালী	*Oleaceae*	*Nyctanthes arbortristis*
শাপলা	*Nymphaeaceae*	*Nymphaea nouchali*
রজনীগন্ধা	*Amaryllidaceae*	*Polianthes tuberosa*
গোলাপ	*Rosaceae*	*Rosa centifolia*
আর্কিড	*Orchidacae*	*Rhyncotylis retusa*
গাঁদা	*Compositae*	*Tagetis patula*
বেল	*Rutaceae*	*Aegle marmelos*
আনারস	*Bromeliaceae*	*Ananas comosus*
আতা	*Annonaceae*	*Annona squamosa*
কাঁঠাল	*Moraceae*	*Artocarpus heterophyllus*
কামরাঙ্গা	*Averrhoaceae*	*Averrhoa carambola*
পেঁপে	*Caricaceae*	*Carica papaya*
জামবুরা	*Rutaceae*	*Citrus grandis*
তরমুজ	*Cucurbitaceae*	*Citrullus vulgaris*
নারিকেল	*Palmae*	*Cocos nucifera*
লিচু	*Sapindaceae*	*Litchi chinensis*
সফেদা	*Sapotaceae*	*Monilkara achras*
কলা	*Musaceae*	*Musa paradisiacal ssp. Sapientum*
আমলকি	*Euphorbiaceae*	*Phyllanthus embelica*
পেয়ারা	*Myrtaceae*	*Psidium guajava*
ডালিম/আনার	*Punicaceae*	*Punica granatum*
আমড়া	*Anacardiaceae*	*Spondias dulcis*
কুল/বরই	*Rhamnaceae*	*Zizyphus mauritiana*

উৎস: মাঠ জরিপ(২০১৪-১৫)

টেবিল ৯.১২: সাধারণ আগাছা জাতীয় উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিক নাম ও গোত্র

নাম	গোত্র	বৈজ্ঞানিক নাম
স্বর্ণলতা	*Cuscutaceae*	*Cuscuta reflexa*
চানচা	*Cyperaceae*	*Cyperus compressus*
মুথা	*Cyperaceae*	*Cyperus rotundus*
শ্রামা ঘাস	*Gramineae*	*Echinochloa colonum*
জলী ঘাস	*Gramineae*	*Hygrorrhyza aristata*
মান্দা	*Loranthaceae*	*Loranthus longiflorus*
টোপাপানা	*Araeae*	*Pistia stratiotes*
বিষকাটলি	*Polygonaceae*	*Polygonum hydropiper*
বন সরিষা	*Cruciferae*	*Rorippa indica*
পটপটি	*Cyperaceae*	*Scirpus articulates*
গাগড়া	*Compositae*	*Xanthium indicum*

উৎস: মাঠ জরিপ(২০১৪-১৫)

টেবিল ৯.১৩: কাঠ প্রদানকারী উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিক নাম ও গোত্র

নাম	গোত্র	বৈজ্ঞানিক নাম	ব্যবহার
শিরিষ/কড়ই	leguminosae	*Albizia Lebbeck*	দরজা জানালা ও আসবাব পত্র তৈরী
জাতিম	Apocynaceae	*Alstonia scholaris*	দেয়াশলাই শিল্পে বাক্স তৈরি
কদম	Rubiaceae	*Anthocephalus chinensis*	দেয়াশলাই শিল্প
কাঁঠাল	Moraceae	*Anthocephalus heterophyllus*	আসবাব ও দরজা জানালা
হিজল	Lecythidaceae	*Barringtonia acutangula*	সাধারণ বিভিন্ন কাজে
শিমুল	Bombacaceae	*Bombax ceiba*	আসবাব, নৌকা, গরুর গাড়ি তৈরি
শিশু	Leguminosae	*Dalbergia sissoo*	সৌখিন এবং দামী আসবাবপত্র তৈরি তে
গাব	Ebenaceae	*Diospyros ebenum*	যন্তপাতির হাতল তৈরি তে
রেনডি কড়ই	Leguminosae	*Enterolobium saman*	জ্বালানি কাজে
আম	anacandiaceae	*Mongifera indica*	জ্বালানি কাজে
মেহগনি	Meliaceae	*Swietenia mahogany*	আসবাবপত্র, দরজা জানালা তৈরি
জাম	Myrtaceae	*Syzygium cumini*	দরজা জানালার ফ্রেম
তেঁতুল	Leguminosae	*Tamarindus indica*	উঁচুমানের লাকড়ি হিসাবে
সেগুন	Verbenaceae	*Tectana grandis*	দামী আসবাবপত্র তৈরি

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

অধ্যায় দশম

গবেষণা এলাকার বিলুপ্ত উদ্ভিদ, প্রাণী ও কৃষি ফসলের মাঠ জরিপ তথ্য

প্রাণী প্রজাতি

ভূমিকা

বর্তমানে পৃথিবীতে আছে ৪,৫০০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, তন্মধ্যে এক-দশমাংশ ভারত উপমহাদেশে রয়েছে। বাংলাদেশে ১২ টি বর্গ ও ৩৫ গোত্রের ১১০ প্রজাতির অভ্যন্তরীণ স্তন্যপায়ী এবং ১টি বর্গ ও ১টি গোত্রের ৩টি সামুদ্রিক প্রজাতি আছে (কৃষ্ণ সাহা, ২০১৪)। স্তন্যপায়ী প্রজাতির মধ্যে ১০টি প্রজাতি বিলুপ্ত প্রায় হয়ে গেছে। এদের মধ্যে আছে রাইনো, বনগুরু, বনমহিষ, নীলগাই। এছাড়া ৪০টি প্রজাতি বিলুপ্ত দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এদেশের জীববৈচিত্র্য যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা যদি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে তবে আগামী ১০ বছরের মধ্যে অনেক প্রজাতি এদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বাংলাদেশের ১১০ প্রজাতির অভ্যন্তরীণ স্তন্যপায়ী মধ্যে ৪০টি নানা পর্যায়ের বিপদের সম্মুখীন ১১ অত্যন্ত বিপন্ন, ৬ বিপন্ন প্রায় (সেলিম, ২০১২)। তথ্যগত ভাবে ৫৩ প্রজাতির অবস্থা মূল্যায়ন সম্ভব হয়নি। পৃথিবীর সবমোট উভচর প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৫০০০। কুণোব্যাঙ ও সোনাব্যাঙ ২৮ গোত্র, ৩৩৮ গণ ও ৪,৩৬০ প্রজাতি এবং এগুলোর বিশেষ গোত্রের সদস্যরা সর্বত্রই আছে। এদেশে উভচর প্রজাতি আছে ২২টি। এর মধ্যে ৩টি প্রজাতির অবস্থা খুবই খারাপ আর ৫টি প্রজাতি অসহায় অবস্থার মধ্যে বাস করছে। সরীসৃপ প্রজাতির সংখ্যা ১০৯টি। এর মধ্যে ঘড়িয়াল প্রজাতি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং ৫৮টি প্রজাতি প্রায় বিলুপ্তির পথে। Reptilia শ্রেণীতে কচ্ছপ, টিকটিকি, গিরগিটি সাপ, গুইসাপ ও কুমির। এগুলি প্রধানত চতুষ্পদী, কিন্তু সাপ ও কিছু গিরগিটির পা লোপ পেয়েছে। ডাইনোসররা ও সরীসৃপ, প্রায় ১০ কোটি বছর স্থলভাগে প্রাধান্য বিস্তার করে বিলুপ্তি হয়েছে ৬.৫ কোটি বছর আগে। বাংলাদেশে সরীসৃপের মোট প্রজাতি ১২৬ (১০৯ অভ্যন্তরীণ, ১৭ সামুদ্রিক) (কৃষ্ণ সাহা, ২০১৪)। অভ্যন্তরীণ ১০৯ প্রজাতির মধ্যে ২ কুমির, ২২ কাছিম ও কাউঠা, ১৮ টিকটিকি ও ৬৭ সাপ। এর মধ্যে ঘড়িয়াল প্রজাতি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং ৫৮টি প্রজাতি প্রায় বিলুপ্তির পথে।

১০.১ এলাকাবাসীর মতামত বিশ্লেষণ:

বিগত ৫০ বৎসরে আশুগঞ্জ উপজেলার বন্যপ্রাণী প্রজাতির ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেয়েছে। গবেষণা এলাকার এলাকাবাসী থেকে জানা যায় যে, এলাকায় এখন বন্যপ্রাণী প্রায় দেখা যায় না। যে সব প্রানী পূর্বে দেখা যেত। এখন সে সব প্রানী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এলাকায় বিভিন্ন ভাবে লিখিত ও অলিখিত ও মৌখিক আলোচনার ভিতিত্তে জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলে বন্যপ্রাণীর সংকট সম্পর্কে ধারণা নেওয়া হয়। পরবর্তিতে প্রায় ১০০০ জন এলাকাবাসীর সঙ্গে দলীয় আলোচনা করে ১০০ টি প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয়। ১০.১ নং টেবিল থেকে জানা যায় যে এই প্রশ্ন পত্রের আলোকে ২৮ শতাংশ লোক বলেন যে, জলার কুমির, গৌর, বাঘ ডাস, বুনো মোষ সবচেয়ে বেশি বিলুপ্ত হয়েছে। ২০ শতাংশ জনগণ জানান যে গুই সাপ, ফনি মনসা, কাল নাগিনী, পাতি দুধরাজ, সবুজ ঢোড়া বিলুপ্ত হয়েছে। ১৬ এলাকাবাসী জানান মাইট্রা সাপ, পাইনা সাপ, জল ঢেড়া, দুমুখ সাপ হারিয়ে গেছে। ১২ শতাংশ বলেন গেছো, ছুচো, সোনা গুঁই, কালো গুঁই বিলুপ্ত হয়েছে। ১০ শতাংশ জনগণ মত প্রকাশ করেন যে, বড় কাঠ বিড়ালী, চামচিকা বিলুপ্তি হয়েছে। ৮ শতাংশ জনগণ জানান কাইটা, কাছিম, কচ্ছপ বিলুপ্ত হয়েছে। সবুজ ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, সুন্দরী ব্যাঙ বিলুপ্ত হয়েছে ৬ শতাংশ জনগণ এই মতামত দেন।

টেবিল ১০.১: গবেষণা এলাকায় হুমকি সম্পূর্ণ বন্য প্রাণী প্রজাতির তালিকা

বন্য প্রজাতির নাম	উত্তর দাতার শতকরা হার	হ্রাসের ক্রম
জলার কুমির, গৌর, বাঘ ডাস, বুনো মোষ	২৮	১
গুই সাপ, ফনি মনসা, কাল নাগিনী, পাতি দুধরাজ, সবুজ ঢোড়া	২০	২
মাইট্রা সাপ, পাইনা সাপ, জল ঢেড়া, দুমুখ সাপ	১৬	৩
গেছো, ছুচো, সোনা গুঁই, কালো গুঁই	১২	৪
বড় কাঠ বিড়ালী, চামচিকা	১০	৫
কাইটা, কাছিম, কচ্ছপ	৮	৬
সবুজ ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, সুন্দরী ব্যাঙ	৬	৭
মোট	১০০	

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

চিত্র ১০.১: গবেষণা এলাকায় হুমকী সম্পূর্ণ বন্য প্রানী প্রজাতির তালিকা

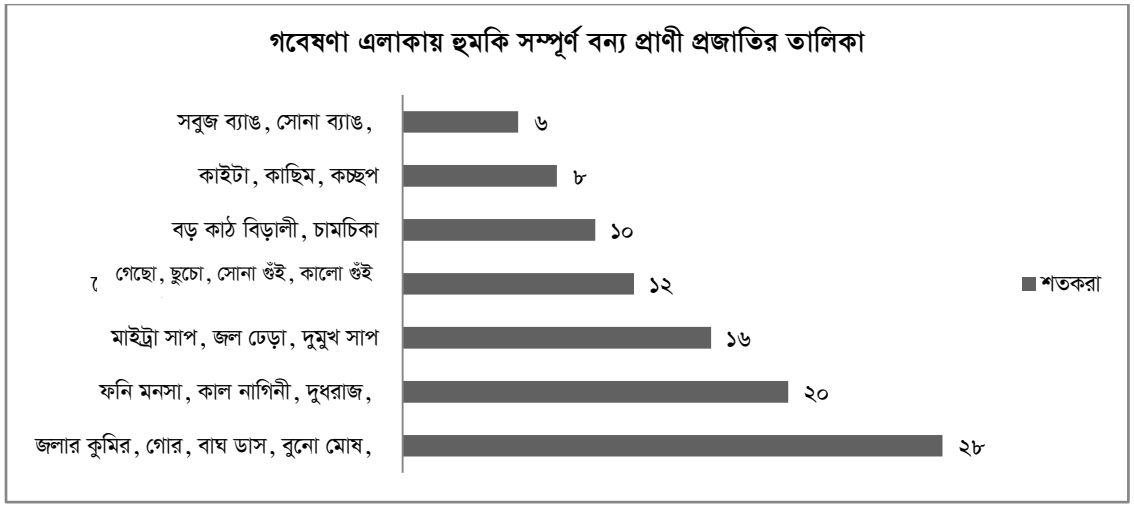

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

১০.২ গবেষণা এলাকায় গৃহপালিত পশু পাখি বিলুপ্তির হার নির্ণয়

১০.২.১ গরু মহিষ ছাগল ভেড়া বিলুপ্তির হার

গবেষণা এলাকায় গৃহপালিত পশু পাখির মধ্যে রয়েছে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, মুরগী, হাঁস ও কবুতর। চিত্র ১০.২ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫, ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে গরু উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ৩৩.৭৮, ৩৪.৬৩, ৪২.৫৭, ৫১.২০ ও ৭২.৪০ শতাংশ। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫, ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে মহিষ উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৩.৯১, ৪০.৪৩, ৬০.৮৭, ৮৩.০৪ ও ৯৩.৪৭ শতাংশ। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫, ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে ছাগল উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ১০.০৯, ২৭.৭৩, ৫৯.৭৯, ৬৮.৮২ ও ৭৬.৬৮ শতাংশ। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫, ২০০৫ ও ২০১৪ ভেড়া উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৭.২৮, ২০.৯৩, ৩৫.৮৮, ৬০.৩৭ ও ৭৪.৯৫ শতাংশ। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া সংখ্যা গননা করে দেখা যায় যে, বর্তমানে প্রতিটি গৃহপালিত পশুর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ধ্রুবক বছর থেকে গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা ৭২.৪, ৯৩.৪৮, ৭৬.৬৮, ৭৪.৯৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র ১০.২: গরু মহিষ ছাগল ভেড়া বিলুপ্তির হার

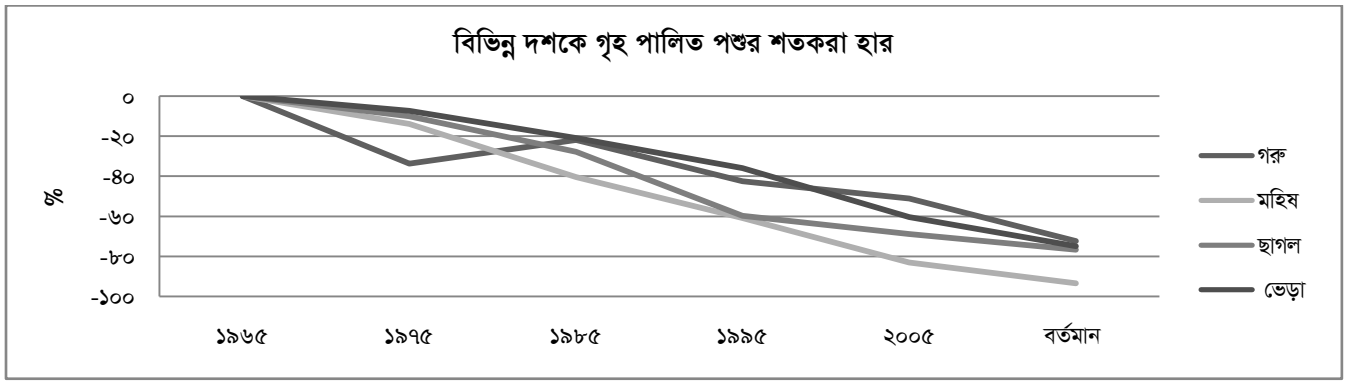

উৎস: বি বি এস ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

১০.২.২ মুরগী হাঁস কবুতর বিলুপ্তির হার

চিত্র-১০.৩ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকাটিতে হাঁস, মুরগী ও কবুতর রয়েছে। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫, ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে মুরগী উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে ১৩.৭৮, ২৩.০৪, ৪১.১৮, ৪০.২৮ ও ৪১.২০ শতাংশ হয়। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫, ২০০৫ ও ২০১৪ হাঁস উৎপাদন হার হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৪.৩৪, ২২.২৩, ৪০.৩২, ৪৭.৩৪ ও ৫৯.৪৩ শতাংশ। ধ্রুবক দশক ১৯৬৫ ধরে দেখা যায় যে, ১৯৭৫, ১৯৮৫, ১৯৯৫, ২০০৫ ও ২০১৪ দশকে কবুতর উৎপাদন হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৫২.৬৭, ৫৬.৬৯, ৫৭.৫৮, ৬৩.৩৯ ও ৭৫ শতাংশ। ধ্রবক বছর থেকে

হাঁস ও মুরগীর সংখ্যা ৪১.২ ও ৫৯.৪৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে কবুতরের সংখ্যা ধ্রুবক বছর থেকে ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে শুধু মাত্র দেশিও হাঁস ও মুরগীর সংখ্যা বলা হয়েছে। তবে বর্তমানে এলাকাটিতে সংকরায়ণ হাঁস ও মুরগীর চাষ হতে দেখা যায়।

চিত্র ১০.৩: মুরগী হাঁস কবুতর বিলুপ্তির হার

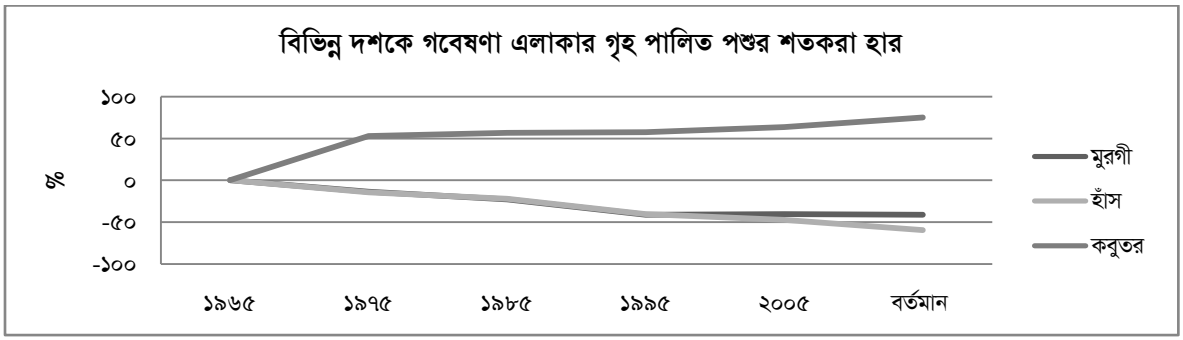

উৎস: বি বি এস ও মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

১০.৩ গবেষণা এলাকার বন্য প্রাণী প্রজাতির হ্রাসের প্রাকৃতিক কারণ

গবেষণা এলাকায় প্রশ্ন পত্র তৈরি করার সময় বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি আরোপ করা হয়। প্রশ্ন পত্রে প্রজাতি বিলুপ্তির প্রাকৃতিক কারণ ও মানবিক কারণ গুলো অনুসন্ধান করা হয়। সে আলোকে এলাকাবাসীর কাছ থেকে প্রশ্ন পত্র সংগ্রহ করা হয়। নিম্নে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হল।

টেবিল ১০.২: বন প্রাণী ধ্বংসের প্রাকৃতিক কারণগুলোর ভিত্তিতে জনগনের মতামত বিশ্লেষণ ঃ

বন প্রাণী ধ্বংসের প্রাকৃতিক কারণ বিশ্লেষণ	উত্তর দাতার শতকরা হার	ক্রম
গাছ কমে যাওয়া	২৯.১৩৩	১
আবহাওয়া পরিবর্তন	২৮.৬০	২
স্বাধু পানির অভাব	২০.০৩	৩
তাপমাত্রা বৃদ্ধি	১৮.৭২	৪
প্রাকৃতিক দূর্যোগ	১২.৫১	৫
অন্যান্য	১১.০২	৬
মোট	১০০	

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-২০১৫

চিত্র ১০.৪: বন্য প্রাণী বিলুপ্তির প্রাকৃতিক কারণ

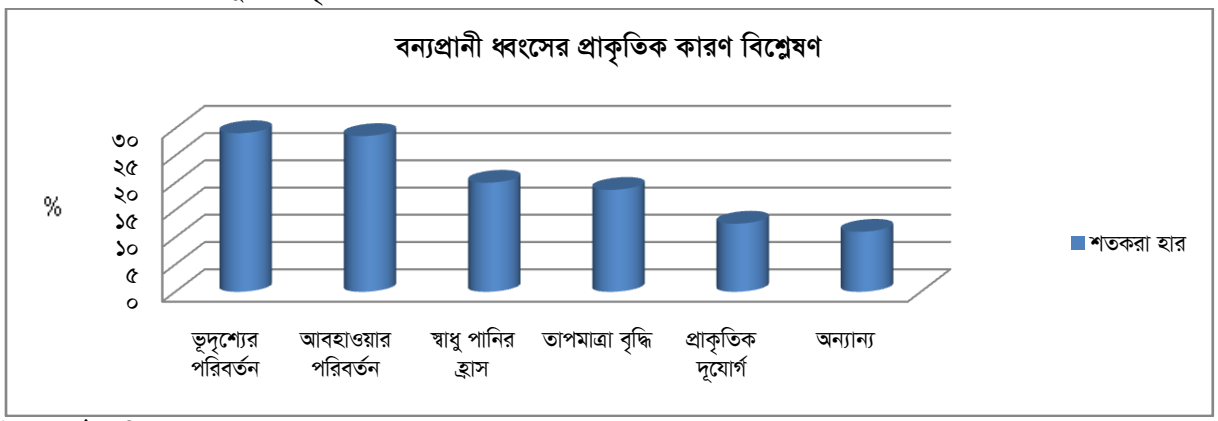

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

ক. ভূদৃশ্যের পরিবর্তন

১০.২ নং টেবিল থেকে জানা যায় যে ২৯.১৩ শতাংশ জনগণ গাছ কাটাকে প্রানী প্রজাতি হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। পূর্বে এই এলাকাটির অবস্থান যেমন ছিল এখন তেমন নেই। এলাকাবাসী জানান পূর্বে এলাকার নদী প্রশস্ততা বেশি ছিল এখন কমে গিয়েছে।

খ. আবহাওয়ার পরিবর্তন

টেবিল ১০.২ থেকে জানা যায় যে, ২৮.৬০ শতাংশ জনগণ আবহাওয়ার পরিবর্তনকে প্রানী প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ্য করেছেন। এলাকাবাসী জানান তাপমাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, মাটির গুনাগুন এই সব কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। যেহেতু সবগুলো বিষয়ের পরিবর্তন হয়েছে। তার প্রভাবে এলাকায় প্রাণী প্রজাতি হ্রাস পেতে শুরু করেছে।

গ. স্বাধু পানির হ্রাস

টেবিল ১০.২ থেকে জানা যায় যে ২০.০৩ শতাংশ জনগণ স্বাধু পানির হ্রাসকে প্রানী প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এলাকাবাসী বলেন পানি প্রবাহের হার পূর্বের তুলনায় কমে গেছে বিশেষ করে এলাকার নদী-নালা ও খাল, বিল, পুকুর ডোবা ইত্যাদিতে পানি কমে যাওয়া। এ থেকে বুঝা যায় যে, এলাকায় পানির প্রাপ্ততা কমে যাচ্ছে। যে জন্য জলচর প্রাণীগুলো অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ব্যাঙ, সাপ গুই ইত্যাদি প্রানী এলাকা থেকে লোপ পেয়েছে। পানির প্রাপ্ততা কমে যাওয়ার কারণেও এলাকা থেকে অনেক প্রানী হ্রাস পেয়েছে।

ঘ. তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া

টেবিল ১০.২ থেকে জানা যায় যে, ১৮.৭২ শতাংশ জনগণ তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে প্রানী প্রজাতির হারিয়ে যাওয়া একটি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। যে কোনো স্থানের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সে স্থানের বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন হয়ে থাকে। এই পরিবর্তনের ফলে এলাকার প্রাণীকুলের উপরও পরেছে অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এলাকাবাসী বলেন এই এলাকায় পূর্বে দেখা যেত এমন অনেক প্রাণী এখন দেখা যায় না।

ঙ. প্রাকৃতিক দূযোর্গ

টেবিল ১০.২ থেকে জানা যায় যে, ১২.৫১ শতাংশ জনগণ প্রাকৃতিক দূযোর্গকে প্রানী প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। অতিরিক্ত প্রাকৃতিক দূযোর্গ প্রানীদের আবাসস্থল ধ্বংস করে দেয়। ফলে অনেক প্রানী মারা যায়। শিলা বৃষ্টির জন্য জমির ফসল নষ্ট হয়, যার ফলে যে সব প্রানী ক্ষেতে খাদ্য সংগ্রহ করতে আসে সে সব প্রাণীরা খাবার না পেয়ে মারা যায় বা খাবারের সন্ধানে অন্য কোথাও চলে যায়। বিভিন্ন সময়ে এলাকায় ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, অধিক বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। যে কারণে এলাকার ঘরবাড়ি সহ গাছপালা ভেঙ্গে যায় যার জন্য প্রানী তার আবাস স্থল হারাচ্ছে ফলে প্রাণী বিলুপ্তি ঘটছে।

চ. অন্যান্য

এছাড়াও মাটির আর্দ্রতা, জৈব পদার্থ কমে যাওয়া। রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণে বৃক্ষ প্রজাতি ঠিত মত জন্মাতে না পারা এই সব কারণে বণ্য প্রাণী হ্রাস পাচ্ছে বলে ১১.০২ শতাংশ জনগণ মনে করে।

১০.৪ বন্য প্রাণী ধ্বংসের মানবীয় কারণের ভিত্তিতে জনগনের মতামত বিশ্লেষণঃ

গবেষণা এলাকায় বন্যপ্রানী ধ্বংসের জন্য বিশেষ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে মূল কারণ ধরা হয়। বসতি নির্মান, অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ণ, কালভার্ট নির্মান প্রভৃতি কারণে এলাকা থেকে প্রানী প্রজাতি হ্রাস পেয়েছে বলে এলাকাবাসী মনে করে। গবেষণা জরিপে প্রশ্নপত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বন্যপ্রাণী বিলুপ্তির মানবীয় কারণ সমূহের আলোচনা করা হল।

টেবিল ১০.৩: বন্যপ্রাণী ধ্বংসের মানবীয় কারণ জনগণের মতামত বিশ্লেষণ ঃ

বনপ্রাণী ধ্বংসের মানবীয় কারণ বিশ্লেষণ	উত্তর দাতার শতকরা হার	ক্রম
কলকারখানা বৃদ্ধি	২৮.৪৩	১
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	২০.৩৮	২
ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন	২০.০৩	৩
কৃষিকাজের বৃদ্ধি	১১.৫৪	৪
ঘরবাড়ি তৈরি	১০.০৬	৫
অন্যান্য	৯.৫৪	৬
মোট	১০০	

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-২০১৫

জীববৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বন্য প্রজাতি। গত ৫০ বৎসরের এই উপজেলায় ব্যাপকভাবে প্রাণী প্রজাতি হ্রাস পেয়েছে। এর মূল কারণ হলো সমগ্র উপজেলার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন। স্থানীয় এলাকাবাসী জানায় এখানে যে সকল প্রানী প্রজাতি পূর্বে দেখা যেত এখন আর সে সব প্রানী প্রজাতি তেমন ভাবে দেখা যায় না এর মূল কারণ হল এলাকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন। এলাকার ভূমি

ব্যবহারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রানী প্রজাতির সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। একটা সময় ছিল যখন এই এলাকাতে প্রচুর পরিমানে বিভিন্ন ধরনের গাছ ছিল। অনেক কৃষি জমি ছিল। বর্তমানে গাছ কেটে বসতি, বয়লার ও চাতাল গঠন করা হচ্ছে। অন্য দিকে কৃষি জমির পরিমান ও হ্রাস পাচ্ছে। আবার কৃষি জমিতে অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন সার ও কীটপতঙ্গ ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন কীটনাশক জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা হচ্ছে। যে জন্য এলাকায় বন্যপ্রানীর সংখ্যা অনেক বেশি হ্রাস পেয়েছে। এক সময়ে এই এলাকার জলাভূমিতে জলাকুমির প্রজাতির দেখা যেত। বর্তমান সময়ে এটি আর দেখা যায় না। কারো কারো মতে এই জলাকুমির হারিয়ে গেছ প্রায় ৫০-৭০ বছরের ও অধিক সময় আগে। নিম্নে এই কারণগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হল-

চিত্র ১০.৫: বন্যপ্রানী ধ্বংসের মানবীয় কারণ পর্যালোচনা

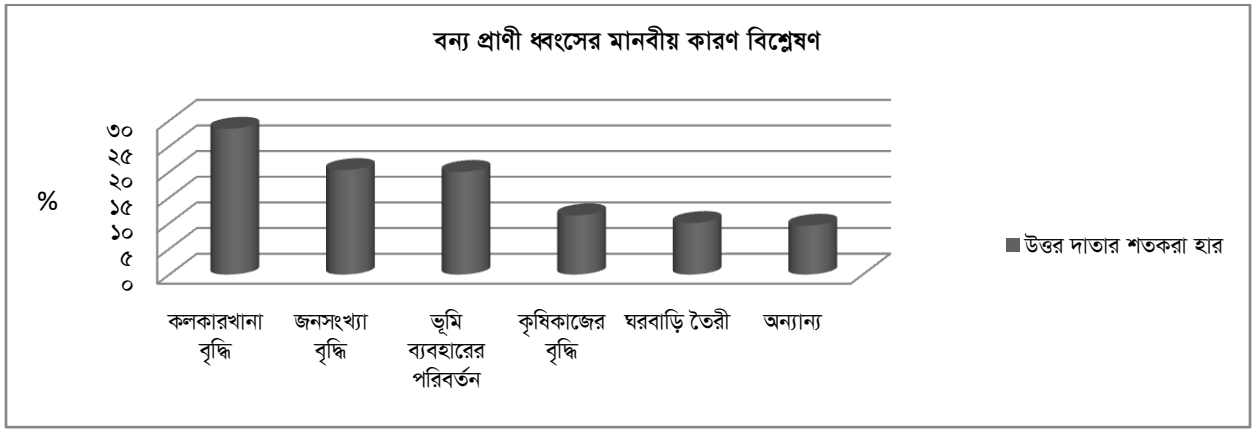

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

ক. কলকারখানা বৃদ্ধি

টেবিল ১০.৩ থেকে জানা যায় যে, ২০.৩৮ শতাংশ জনগণ কলকারখানা বৃদ্ধিকে প্রানী প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। গবেষণা এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষেত্র, ইউরিয়া সার কারখানা, ধান সিদ্ধ ও সংগ্রহ করার জন্য অসংখ্য বয়লার তৈরি করা হয়েছে। এই সব কলকারখানা শব্দ বন্য প্রজাতির জন্য ক্ষতি কর। যে জন্য এই সব এলাকায় প্রাণী প্রজাতি বসবাস করতে পারে না। আবার কলকারখানা তৈরির জন্যও অনেক গাছ কাটা হয়েছে যার জন্য গাছ প্রানীর আবাস স্থল হারিয়েছে বলে এলাকাবাসী মনে করে।

খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া

টেবিল ১০.২ থেকে জানা যায় যে, ২০.৩৮ শতাংশ জনগণ জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রানী প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এলাকাটিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রানী প্রজাতি বিলুপ্তি হয়ে যাওয়ার একটি মূল কারণ বলে অনেক এলাকাবাসী বলেছে। যখন এলাকাটি জনসংখ্যা কম ছিল তখন প্রাণী প্রজাতি বেশি ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জন্য আবাসভূমি তৈরির জন্য অনেক বনভূমি কাটা হয় যার জন্য প্রাণী প্রজাতি হারিয়ে গেছে। তবে অনেকে ধারণা করে মানুষকে দেখে ভয় পেয়ে অনেক প্রানী পালিয়ে যায়। তাছাড়া মানুষ অবিচারে পশু শিকার করে এই সব কারণেও গবেষণা এলাকাটি থেকে প্রাণী প্রজাতি হ্রাস পেয়েছে বলে এলাকাবাসী মত প্রকাশ করেন।

গ. ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

টেবিল ১০.৩ থেকে জানা যায় যে, ২০.০৩ শতাংশ জনগণ ভূমি ব্যবহারের পরির্বতকে প্রানী প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ ভূমিতে যেখানে পূর্বে ধানি জমি ছিল তাতে এখন বয়লার, শিল্প কারখানা, সার কারখানা, বিদুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এটি এক দিকে যেমন খুব লাভজনক ঠিক অন্য দিকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। বর্তমানে এখানে কলকারখানা তৈরির ফলে প্রানীদের খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। গবেষণা এলাকায় ৫০০ এর অধিক বয়লা রয়েছে। যেগুলোর শব্দ ও জ্বালানি ব্যবস্থা প্রানীর জন্য ক্ষতি কর। বলা যায় যে, গবেষণা এলাকার সমগ্র ভূমি ব্যবহার এলাকার প্রানী প্রজাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে বলে এলাকাবাসী মত প্রকাশ করেন।

ঘ. কৃষি জমির বৃদ্ধি

টেবিল ১০.৩ থেকে জানা যায় যে, ১১.৫৪ শতাংশ জনগণ কৃষি জমির বৃদ্ধিকে প্রানী প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। কৃষি জমি বৃদ্ধি করার জন্য এক সময় গাছপালা অনেক বেশি পরিমানে কাটা হয়েছে। গাছপালা বন জঙ্গল কেটে ফেলার কারণে গবেষণা অঞ্চল থেকে প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে। কীটপতঙ্গ, পোকা মাকর মাড়ার জন্য কৃষিজমিতে বিভিন্ন সময়ে কীটনাশক সার প্রয়োগ করা। এই সব কীটনাশক সার প্রয়োগ করার ফলে প্রাণি প্রজাতি হ্রাস পেয়েছে। কারণ প্রানী প্রজাতি এই সব কীটনাশক

ঔষুধ খেয়ে মারা গিয়েছে আবার কোনো কোনো প্রাণী প্রজাতি ভয় পেয়ে পালিয়েছে। তাছাড়া এই সব কীটনাশক ঔষধ বৃষ্টির পানিতে মিশে নদী খাল বিল পুকুরের পানিতে মিশে পানি দূষিত করে। এই দূষিত পানির জন্য পুকুরের মাছ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঠিক তেমন ভাবে এর জন্য প্রাণী প্রজাতিও হ্রাস পেয়েছে বলে এলাকাবাসী মত প্রকাশ করেন।

ঙ. ঘরবাড়ি তৈরি

টেবিল ১০.৩ থেকে জানা যায় যে, ১০.০৬ শতাংশ জনগণ ঘরবাড়ি তৈরিকে প্রানী প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অনেক বেশি ঘরবাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্য গাছপালা অনেক বেশি কাটা হয়েছে। এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে। সে জন্যও অনেক গাছপালা কাটা হয়েছে। বিগত ৫০ বছর আগে যেখানে কাচা রাস্তা ছিল। সেখানে এখন পাকা রাস্তা করা হয়েছে। রিক্সা, ভ্যান গাড়ি, বেবি টেক্সি, ট্রাক্টর চালানোর ফলে যে শব্দ হয় তাতে প্রানীরা ভয় পেয়ে দূরে সরে যায়। মানুষের উপস্থিতিতেও প্রাণিরা ভয় পায়। এই সব কারণে এই এলাকা থেকে প্রানী প্রজাতি হারিয়ে গেছে বলে এলাকাবাসী মত প্রকাশ করেন।

চ. অন্যান্য

টেবিল ১০.২ থেকে জানা যায় যে ৯.৫৪ শতাংশ জনগণ অন্যান্য বিভিন্ন কারণ কে প্রানী প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ও নিম্ন এলাকা ভরাট, কীটনাশক সার ব্যবহার, কৃষি কাজের যান্তিক ব্যবহার ইত্যাদি নানা বিধ কারণে বন্য প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে বলে এলাকাবাসী মত প্রকাশ করেন।

টেবিল ১০.৪: বন্য প্রাণী ধ্বংসের শতকরা হার জনগনের মতামত বিশ্লেষণ

নাম	উত্তর দাতার শতকরা হার	ক্রম
বেশি ধ্বংস হচ্ছে	৫১	১
মোটামোটি ধ্বংস হচ্ছে	৩৭.৪৪	২
সামান্য ধ্বংস হচ্ছে	১১.৫৪	৩
ধ্বংস হচ্ছে না	০	৪
মোট	১০০	

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

চিত্র ১০.৬: বন্য প্রাণী ধ্বংসের শতকরা হার জনগনের মতামত বিশ্লেষণ

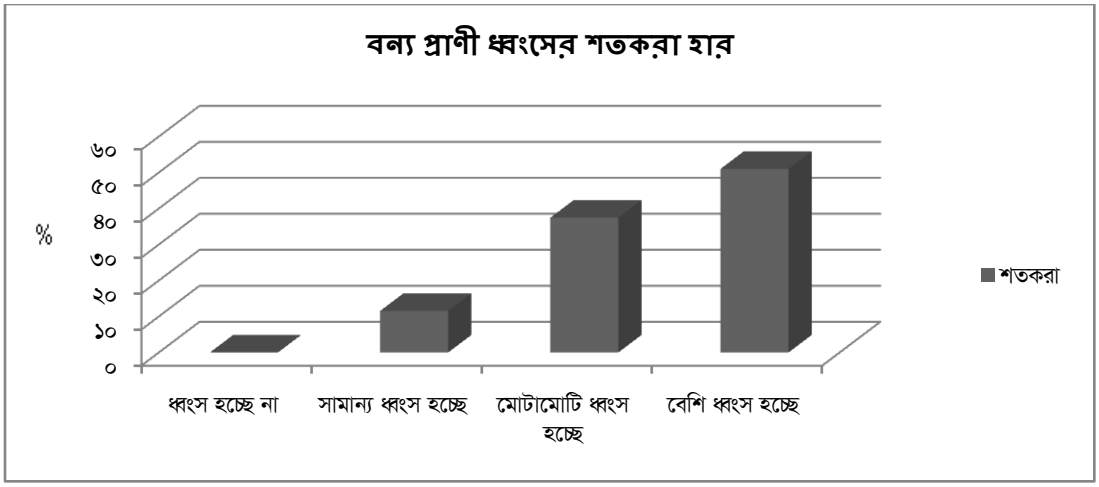

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

১০.৪ গবেষণা এলাকার বনপ্রাণী হ্রাসের জনগনের মতামত বিশ্লেষণ

গবেষণা এলাকায় প্রশ্ন জরিপের মাধ্যমে প্রায় ১০০০ জন এলাকাবাসীর থেকে তথ্যসংগ্রহ করা হয়। এই তথ্যের আলোকে চিত্র ১০.৬ হতে এলাকাবাসীর মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে প্রায় ৫১ শতাংশ জনগণ বলেছে এলাকাটি থেকে বন্যপ্রাণী ধ্বংস হয়ে গেছে। ৩৭. ৪৪ শতাংশ জনগণ বলেছে মোটামোটি ভাবে এলাকাটির বন্যপ্রাণী প্রায় সবটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। ১১.৫৪ শতাংশ জনগণ বলেছে এখনও যে সব বন্যপ্রানী রয়েছে তার যে, সামান্যটুকু রয়েছে তাও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বন্যপ্রাণী ধ্বংস হচ্ছে না এমন মতামত কেউ দেই নি। এই তথ্যের আলোকে বলা যায় যে এলাকাটিতে বন্যপ্রাণী প্রায় সবটুকুই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পথে।

গবেষণা এলাকার প্রানী প্রজাতির তালিকা

টেবিল ১০.৫: গবেষণা এলাকায় প্রানী প্রজাতির নাম

নাম	ইংরেজী নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
সবুজ ব্যাঙ	Green Frog	*Eupylyctis hexadactylus*
বন ভাউয়া ব্যাঙ/ সোনা ব্যাঙ/ কোলা ব্যাঙ	Jerdon's Bull Frong	*Hoplobatrachus crassus*
সোনা ব্যাঙ	Indian Bull Frog	*Hoplobatrachus tigerinus*
ভ্যাপু ব্যাঙ/ সুন্দরী ব্যাঙ/ ব্যান্ড সোনা ব্যাঙ	Painted Bull Frog	*Kaloula Pulchara Gray*
শুকর-ডাকা ব্যাঙ	Bhamo Frog	*Humerana humeralis*
লাল-লিপ্তপাদ গেছো ব্যাঙ	Htun Win's Terr Frog	*Rhacophorus bipunctatus*
জলপাইরঙা সাগর কাছিম	Olive Ridley Sea Turtle	*Lepidochelys olivacea*
সাপ আঁচিলা	Asian Glass Lizard	*Ophisaurus gracilis*
সোনা গুঁই	Yellow Monutor	*Varanus Flavescens*
কালো গুঁই	Water Monitor	*Varanus salvator*
লাউডগা সাপ	Common vine snake	*Ahaetulla nasuta*
লাউডগা সাপ	Short-nosed vine	*Ahaetulla Prasina*
দাগি ঢোঁড়া মাইট্রা সাপ	Striped Keelback	*Amphiesma stalatum*
মাইট্রা সাপ	Olive Keelback	*Atretium schistosum*
ফণিমনসা	Eastern Cat Snake	*Boiga gokool*
কালনাগিনী	Ornate Flying Snake	*Chrysopelea ornate*
পাতি দুধরাজ	Commone Trinket	*Coelognathus Helena*
দুধরাজ	Copper Head Trinket	*Coelognathus radiatus*
জলঢোঁড়া/ পাইন্যা সাপ	Dussimier's Water Snake	*Enhydris Dussumieri*
পাতি জলঢোঁড়া	Common Smooth Water snak	*Enhydris enhydris*

সবুজ ঢোড়া	Green Keelback	*Macropisthodon plumbicolor*
দারাজ	Indo-Chinese Rat Snake	*Ptyas Korros*
কাল মাথা সাপ	Black-Headed Snake	*Sibynophis subpunctatus*
গেছো চুঁছো	Tree Shrew	*Tupaia Belangeri*
বড় কাঠবিড়ালী	Malayan Giant Squirrel	*Ratufa Bicolor*
চামচিকা	Kelaart Pipostrelle	*Pipistrellus ceylonicus*
বন বিড়াল	Jangle Cat	*Felis chaus*
জলার কুমির	Marsh Crocodile	*Crocodylus palustris Lesson*
গৌর	The Indian Bison / Gaur	*Bos Frontalis Lambert*
বুনো মোষ	The Wild Buffalo	*Bubalus Bubalis*
মেছো বিড়াল	Fishing Cat	*Prionailurus viverrinus*
বড় বাগদাশ	Large Indian Civet	*Viverra zibetha*
খাটাশ/ ছোট বাগদাশ	Small Indian Civet	*Viverrricula indica*
পাতি বেজি	Common Mongoose	*Herpestes edwardsi*
পাতি শিয়াল	Jackal	*Canis aureus*
বন ছাগল	Serow	*Capricornis*
তামাটে আর্চিলা আইজলা	Bronze Grass Skink	*Eutropis macularia*
গুই সাপ	Bengal Monitor	*Varanus bengalensis*
দুমুখা সাপ	Brahminy Blind Snake	*Ramphotyphlops Braminus*
খেক শিয়াল	Bengal Fox	*Vulpes bengalensis*
কড়ি	Dull Cowrie	*Cyprala stolid*
গোটা শামুক	Little Mouse Drupe	*Morula marginatra*
গুড়া শামুক	Orange-mouth Olive	*Oliva sericea*
লাল কাকড়া	Red Crab	*Ocypoda ceratophthalma*

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

অধ্যায় একাদশ

গবেষণা এলাকায় বিলুপ্ত উদ্ভিদ, প্রাণী ও কৃষি ফসলের মাঠ জরিপ তথ্য

গবেষণা এলাকার পাখি প্রজাতি

ভূমিকা

পাখি Aves শ্রেনীর বর্গ ও প্রজাতি সংখ্যা যথাক্রমে ২৪ ও ৯,০০০। গায়ক পাখি (passerines) হিসাবে খ্যাত Passeriformes বর্গে রয়েছে অর্ধেকের বেশি পাখি প্রজাতি (কৃষ্ণ সাহা, ২০১৪)। অবশিষ্ট বর্গগুলোকে একত্রে non-passerines বলা হয়। ভারত পাখির প্রজাতি সংখ্যা ১২০০ বা ততোধিক আর বাংলাদেশে আছে ৬২৮ (১৬ বর্গ, ৬৭ গোত্র ২৭৬ গায়ক, ৩৫২ অগায়ক) তন্মধ্যে ৩৮৮ স্থায়ী ১৬ বর্গ, ৬০ গোত্র ১৭১ গায়ক, ২১৭ অগায়ক) বড় সারস (Grus antigone) উপমহাদেশের বৃহত্তম (দাঁড়ানো অবস্থায় উচ্চতা ১,৭৫ মি) পাখি, এখন বাংলাদেশে দুষ্প্রাপ্য। গোলাপি শির (Rhodonessa Caryophyllacea), বুঁচহাঁস (Sarkidioris melanotos), বর্মী ময়ূর (pavo muticus) ও ময়ূর (P. cristatus) প্রজাতিগুলো ৭০/ ৮০ বছর আগে এদেশের সর্বত্র দেখা গেলেও এখন বলতে গেলে বিলুপ্ত (কৃষ্ণ সাহা ও চন্দ্র বসু,২০১৪)। দেশে ৩৮৮ প্রজাতির পাখি রয়েছে। এর মধ্যে ৫৪ প্রজাতির আগামী দশ বছরে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। গোলাপী মাথার উড-ডাক পাখিটি শুধু বাংলাদেশ ও ভারতের আসাম প্রদেশে পাওয়া যেত। এখন আর এর অস্তিত্ব নেই। ময়ূর ও লালশির হাঁস এই দুই প্রজাতির পাখি বিলুপ্তি হয়ে গেছে। ১৯৭৪ সালে সর্বশেষে এক জোড়া ময়ূর দেখা গেছে মধুপুর শাল বনে। চিরতরে হারিয়ে গেছে বেঙ্গল ফোরিক্যান ময়ূর, সাম্বার হরিণ ও মায়া হরিণ। যেসব প্রজাতির প্রাণী এখনও টিকে আছে তাদের অবস্থা বড় করুণ। কিছু পাল্লা ঈগল এখনও টিকে আছে। এই এলাকার পাখি গুলো হল হলুদপাখি, শকুন, ময়না, তোতা ঢাক, ডাহুক, বাবুই, ভীমরাজ, চিল, কাক, শালিক, বাবুই, কুয়া, ঘুঘু, মদনটাক, শামুকভাঙ্গা, মাছরাঙ্গা, সাদাবক, কালাবক, চড়ুই, দোয়েল, বালিহাঁস, বনমোরগ, পেঁচা ও বুলবুলি ইত্যাদি।

১১.১ গবেষণা এলাকার হুমকির সম্মুখিন পাখি প্রজাতি

জীববৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো পাখি প্রজাতি গত ৫০ বৎসরের এই উপজেলায় ব্যাপকভাবে পাখি প্রজাতি হ্রাস পেয়েছে। এর মূল কারণ হল সমগ্র উপজেলার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন। স্থানীয় এলাকাবাসি জানায় এখানে পূর্বে যে সব পাখি প্রজাতি দেখতে পেতেন তা এখন আর তেমন ভাবে দেখতে পান না। এর কারণ গুলো হল এলাকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন। এলাকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাখি প্রজাতির সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। একটা সময় ছিল যখন এই এলাকাতে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের গাছ ছিল। অনেক কৃষি জমি ছিল। বর্তমানে গাছ কেটে বসতি, বয়লার ও চাতাল গঠন করা হচ্ছে। অন্য দিকে কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। আবার কৃষি জমিতে অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন সার ও কীটপতঙ্গ ধ্বংসের বিভিন্ন কীটনাশক জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা হচ্ছে। যে জন্য এলাকায় পাখি প্রজাতির সংখ্যা অনেক বেশি হ্রাস পেয়েছে (IUCN ২০০৮)। বাংলাদেশের প্রায় সবস্থানেই কম বেশি প্রায় সব ধরনের পাখি দেখা যায়। তবে শীত কালে এই গবেষণা এলাকায় বিশেষ কিছু অতিথি পাখি দেখা যায়। সে সময় কিছু পাখি অভিগমনের জন্য আসে। জলচর পাখিগুলো বেশি আসে। জলচর পাখিগুলোর প্রধান খাবার হল খাল, বিলে, ডোবা ও নদী নালার মাছ কিটপতঙ্গ। পাখিরা বাসা বাঁধে গাছের মগ ঢালে। বিভিন্ন কারনে মানুষ গাছ কেটে ফেলছে। নদী পুকুর ডোবার পানি কমে যাচ্ছে যে জন্য প্রতিনিয়ত পাখির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

টেবিল ১১.১: গবেষণা এলাকায় হ্রাস প্রাপ্ত পাখি প্রজাতির তালিকা

পাখির নাম	সংকটাপূর্ন অবস্থা বিশ্লেষণ
গাংচিল	বিলুপ্ত প্রায়
বালি হাঁস	বিলুপ্ত প্রায়
রঙ্গিলা বক	বিলুপ্ত
সাদা বক	বিলুপ্ত প্রায়
পেঁচা	বিলুপ্ত প্রায়
ভূতুম পেঁচা	বিলুপ্ত প্রায়
নীল পাখি	বিলুপ্ত প্রায়
হলদী পাখি	কম দেখা যায়
গাংশালিক	বিলুপ্ত প্রায়

ময়না	কম দেখা যায়
ফুলঝুরি	বিলুপ্ত
কালাবক	কম দেখা যায়
শকুন	বিলুপ্ত
রাজশকুন	বিলুপ্ত
বনমোরগ	বিলুপ্ত

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-২০১৫

টেবিল ১১.২: জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে পাখি বিলুপ্তির হার

পাখির নাম	উত্তর দাতার শতকরা হার	হ্রাসের ক্রম সংখ্যা
শকুন, রাজশকুন	২৮.৭	১
ফুলঝুরি	১১.০৬	২
পেঁচা, ভূতুম পেঁচা	১০.৬২	৩
গাংচিল, গাংশালিক	৯.৬২	৪
বালিহাঁস	৯	৫
রঙ্গিন বক, বিচিত্র বক	৭.৮৭	৬
নীল পাখি	৭	৭
সাদা বক, কালাবক	৬.১৬	৮
হলদী পাখি	৫.৬	৯
বন মোরগ	৪.৩৭	১০
মোট	১০০	

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-২০১৫

১১.২ জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে পাখি বিলুপ্তির হার

গবেষণা এলাকায় মাঠ জরিপের মাধ্যমে দেখা যায় যে, শকুন ও রাজ শকুন সব চেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে। জনগণের মতামত নিয়ে জানা যায় যে, এলাকাটিতে প্রায় ৪০ বছর আগে শকুন দেখা যেত কারো কারো মতে প্রায় ৫০ বছর আগে তারা শেষ বারের মত রাজ শকুন দেখেছে। জনগণের ধারনা এলাকাটিতে গৃহ পালিত প্রাণীর সংখ্যা কমে যাওয়াতে শকুনের সংখ্যাও কমে গেছে। গবেষণা এলাকায় সর্বোচ্চ ২৮.৭ শতাংশ লোক বলেছে এলাকাটিতে শকুন হারিয়েছে। শতকরা ১১.০৬ শতাংশ জনগণের মতে ফুলঝুরি পাখি লোপ পেয়েছে। ১০.৬২ শতাংশ জনগণ মনে করে এলাকাটিতে গাংচিল, গাংশালিক লোপ পেয়েছে। ৯ শতাংশ জনগণ মনে করে বালিহাঁস লোপ পেয়েছে। রঙ্গিনা বক, বিচিত্র বক লোপ পেয়েছে ৭.৮৭ শতাংশ জনগণ মনে করে। নীল পাখি লোপ পেয়েছে শতকরা ৭ শতাংশ। সাদাবক ও কালোবক এখনও মাঝে মাঝে এলাকাটিতে দেখা যায় কিন্তু এর পরিমান আগের তুলনায় অনেক কম। ৬.১৬ শতাংশ মানুষ মনে করে সাদাবক ও কালোবক হারিয়ে যাচ্ছে। হলদী পাখি লোপ পেয়েছে ৫.৬ শতাংশ জনগণ মনে করে। এলাকাবাসী জানান বন মোরগ ৪.৩৭ শতাংশ লোপ পেয়েছে বলে।

চিত্র ১১.১: জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে পাখি প্রজাতি বিলুপ্তির শতকরা হার

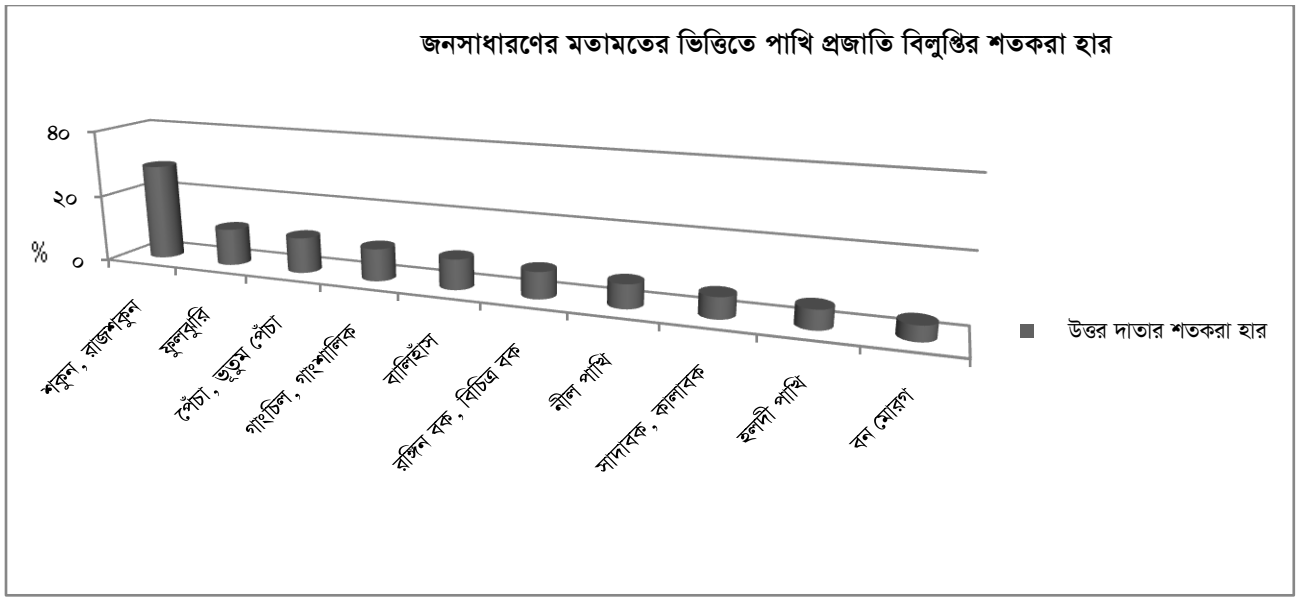

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

১১.৩ গবেষণা এলাকার পাখি প্রজাতির হ্রাসের প্রাকৃতিক কারণ

গবেষণা এলাকায় বিভিন্ন কারণে পাখি প্রজাতি হ্রাস পেয়েছে। নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল।

ক. তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া

টেবিল ১১.৩ থেকে জানা যায় যে, ৩২.৬৬ শতাংশ জনগণ তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে পাখি প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ্য করেছেন। এলাকাবাসী বলেন এলাকাটির মাসিক ও ঋতু ভিত্তিক আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা যায়। কখনো কোনো কোনো মাসে তাপমাত্রা অনেক বেশি দেখা যায় আবার কোনো কোনো মাসে তাপমাত্রা কম দেখা যায়। এলাকার কোনো স্থানের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সে স্থানের বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন হয়ে থাকে। এই পরিবর্তনের ফলে এলাকার পাখিকুলের উপরও পরছে। পাখি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

খ. আবহাওয়ার পরিবর্তন

টেবিল ১১.৩ থেকে জানা যায় যে ২৩.৬১ শতাংশ জনগণ আবহাওয়া পরিবর্তনকে পাখি প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ্য করেছেন। এলাকাবাসী বলেন এলাকাটিতে শুধু তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়নি। তাপমাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত, আদ্রতা, মাটির গুনাগুন এই সব কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। যেহেতু সবগুলো বিষয়ের পরিবর্তন হয়েছে। তার প্রভাবে এলাকার পাখি প্রজাতি হ্রাস পেতে শুরু করেছে।

গ. স্বাধু পানির হ্রাস

টেবিল ১১.৩ থেকে জানা যায় যে, ১৭.২ শতাংশ জনগণ স্বাধুপানির অভাবকে পাখি প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ্য করেছেন। এলাকাবাসী বলেন এলাকার নদী-নালা, খাল, বিল, পুকুর ও ডোবা ইত্যাদিতে পানি কমে গেছে। পানি প্রবাহ অনেক কমে গেছে নদীতে আগের মত স্রোত দেখা যায় না। এ থেকে বুঝা যায় যে, এলাকায় পানির প্রাপ্ততা কমে যাচ্ছে। যে জন্য জলচর পাখিগুলো অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। মাছরাঙ্গা ও বক পানিতে বিচরণ করে। শামুক, ঝিনুক, মাছ, কাকড়া, পোকা মাকর ইত্যাদি পাখির প্রধান খাবার। জেলেরা অল্প সময়ে অধিক মাছ পাওয়ার জন্য পুকুর ও নদীতে বিষ দিয়ে মাছ শিকার করে। যার জন্য বড় মাছ গুলো অতিদ্রুত দূর্বল হয়ে পড়ে। আর ছোট মাছ গুলো খুব তাড়াতাড়ি মরে পানিতে ভেসে উঠে। মাছ হারিয়ে যাচ্ছে। যে সব পাখি মাছ খেয়ে বেঁচে থাকত তারাও হারিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া জেলেরা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরার ফলে নদী ও পুকুরের মাছ হারিয়ে যাচ্ছে যে কারণে পাখি হ্রাস পাচ্ছে। গাংশালিক, মদন টাক, শামুকভাঙ্গা এই সব পাখি প্রজাতি মাছের অভাবে খেতে না পেরে মারা যায়।

ঘ. প্রাকৃতিক দূযোর্গ

টেবিল ১১.৩ থেকে জানা যায় যে ২৩.৬১ শতাংশ জনগণ প্রাকতিক দূর্যোগকে প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ্য করেছেন। এলাকাবাসী বলেন পাখি প্রজাতির একমাত্র আবাসস্থল হলো গাছপালা। গাছপালার ডালে বাসা বাঁধে পাখিরা এলাকায় বিচরণ

করে। কিন্তু এলাকায় প্রাকৃতিক দূর্যোর্গ ও মানুষের ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্য বিভিন্ন কারণে গাছ কাটা হচ্ছে। আবার বয়স জনিত কারণে কিছু কিছু গাছ ভেঙ্গে পরে যায়। এভাবে প্রাকৃতিক কারণে গাছ হারিয়ে যাওয়ার ফলে পাখি প্রজাতি তার আবাস গড়তে না পেরে হারিয়ে যাচ্ছে।

ঙ. শিলা বৃষ্টি

টেবিল ১১.৩ থেকে জানা যায় যে, ১১.০২ শতাংশ জনগণ শিলা বৃষ্টিকে পাখি প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ্য করেছেন। এলাকাবাসী বলেন অতিরিক্ত শিলা বৃষ্টি পাখিদের আবাসস্থল ধ্বংস করে দেয়। ফলে অনেক পাখি মারা যায়। শিলা বৃষ্টির জন্য গাছের ডাল পালা ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে ভেঙ্গে পরে। শিলা বৃষ্টির জন্য জমির ধান নষ্ট হয় যায়। যার ফলে যে সব পাখি ধান ক্ষেতে খাদ্য সংগ্রহ করতে আসে সে সব পাখি খাবার না পেয়ে মারা যায় বা খাবারের সন্ধানে অন্য কোথাও চলে যায়। বিভিন্ন সময়ে এলাকায় ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, অধিক বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। যে কারণে এলাকার ঘর বাড়িসহ গাছপালা ভেঙ্গে যায় যার জন্য পাখি তার আবাস স্থল হারাচ্ছে।

অন্যান্য মধ্যে রয়েছে গৃহপালিত প্রানীর সংখ্যা কমে যাওয়া এই এলাকার মানুষদের বিশেষ ভাবে অভিমত যে তারা বিগত ৩০-৪০ বছরে এই এলাকাতে শুকুন দেখেনি। যার কারণ জানতে চাইলে তাদের বেশি ভাগই একই উত্তর দিয়েছে। এলাকাবাসীর ধারণা এলাকায় গৃহপালিত পশু বিশেষ করে গরুর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় শুকুনের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

টেবিল ১১.৩: ছক পাখি বিলুপ্তির প্রাকৃতিক কারণ

প্রাকৃতিক কারণ	উত্তর দাতা শতকরা হার	হ্রাসের ক্রম
তাপমাত্রা বৃদ্ধি	৩২.৬৬	১
আবহাওয়া পরিবর্তন	২৩.৬১	২
স্বাধু পানির অভাব	১৭.২	৩
প্রাকৃতিক দূর্যোগ	১৫.৫১	৪
শিলা বৃষ্টি	১১.০২	৫
মোট	১০০	৬

উৎস: মাঠ জরিপ (২০১৪-২০১৫)

চিত্র ১১.২: পাখি বিলুপ্তির প্রাকৃতিক কারণ

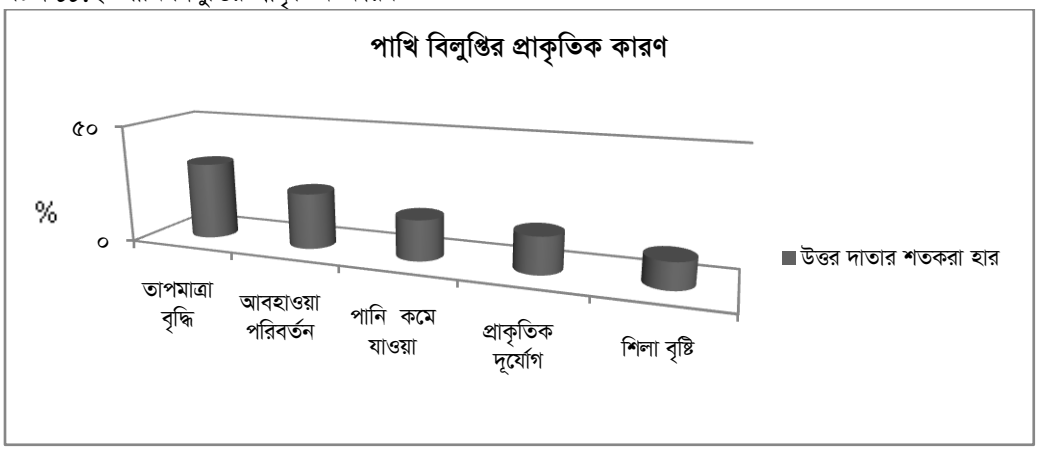

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

১১.৪ গবেষণা এলাকায় পাখি প্রজাতি হ্রাসের মানবীয় কারণ সমূহ

এলাকায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে যেমন পাখি প্রজাতি হ্রাস পাচ্ছে। ঠিক তেমনই এলাকায় মানবীয় কারণেও পাখি প্রজাতি হ্রাস পাচ্ছে। মানবীয় কারণ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে কারণটি রয়েছে তা হল ভূমিরূপের পরিবর্তন। এলাকায় বিগত ৫০ বছরের ভূমিরূপের বিশাল পরিবর্তন হয়েছে বলা যায়। এই সব কটি পরিবর্তনই এলাকার জীবকুল পাখি প্রজাতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। নিম্নে এর বিশদ বিবরণ দেওয়া হল

ক. ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

টেবিল ১১.৪ থেকে জানা যায় যে, ৩২.৩৫ শতাংশ জনগণ ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনেরকে পাখি প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ্য করেছেন। এলাকাবাসী বলেন অধিকাংশ ভূমিতে যেখানে পূর্বে ধানি জমি ছিল তাতে এখন বয়লার, শিল্প কারখানা, সার কারখানা, বিদ্যু উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এটি এক দিকে যেমন খুব লাভজনক ঠিক অন্য দিকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। কেননা ধানি-জমি না থাকার কারণে অনেক পাখি প্রজাতি এখানে আসতে পারে না। তারা খাবার না পেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। যেমন মদকটাক, ফিঙ্গে, ধানুই পাখি ইত্যাদি। বর্তমানে এখানে কলকারখানা তৈরির ফলে পাখিদের খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। গবেষণা এলাকায় ৫০০ এর অধিক বয়লা রয়েছে । যেগুলোর শব্দ ও জ্বালানি ব্যবস্থা ক্ষতি কর। বলা যায় যে, গবেষণা এলাকার সমগ্র ভূমিব্যবহার পাখি প্রজাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

খ. পাখি শিকার

টেবিল ১১.৪ থেকে জানা যায় যে, ২০.৯ শতাংশ জনগণ পাখি শিকারকে পাখি প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ্য করেছেন। গবেষণা এলাকার এলাকাবাসী জানিয়েছে মানুষের হস্তক্ষেপের কারণে গবেষণা এলাকায় অসংখ্য পাখি প্রজাতি হারিয়ে যাচ্ছে। ধানুই পাখি, বক, ঘুঘু, পাতিহাঁস, শামুক ভাঙ্গা ফিঁঙ্গে ইত্যাদি পাখি মানুষ নিজের খাবারের জন্য অবাধে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া স্থানীয় জনগণ ধান ক্ষেতে ফাঁদ পেতে বক পাখি শিকার করে। বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন বাহিরের এলাকা থেকে পাখি ঘুরতে আসে তাদেরকে শিকার করে নিয়ে যাচ্ছে। এলাকার তালশহর বাজারের স্কুলমাঠে খাল পাড়ে শীত মৌসুমে অনেক পাখি আসত। কিন্তু এখন তেমন কোনো পাখি দেখা যায় না।

গ. গাছ কাটা

টেবিল ১১.৪ থেকে জানা যায় যে, ১৭ শতাংশ জনগণ গাছ কাটাকে পাখি প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ্য করেছেন। গবেষণা এলাকার এলাকাবাসী জানিয়েছে এলাকায় মানুষ দ্বারা বৃক্ষ নিধনের ফলেও পাখি প্রজাতি হারিয়ে যাচ্ছে। পাখি প্রজাতির আবাসস্থল হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষ তার ঘর বাড়ি তৈরি করার জন্য গাছ কাটছে। কখনো গাছ কেটে সে স্থানে নতুন ঘর তুলছে। আবার কখনো গাছ কেটে গাছের কাঠ দিয়ে ঘরের খুটি ও আসবাব পত্র তৈরি করছে। যে জন্য এলাকার বেশি ভাগ গাছ হারিয়ে যাচ্ছে। গবেষণা এলাকার সোনারামপুর ও সোহাগপুরের এলাকাবাসি জানিয়েছে সে এলাকার অধিবাসারা গাছ কেটে সেখানে বয়লার বা চাতাল তৈরিতে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে। যার জন্য কেউ কেউ তার বাড়ির প্রায় ২০০-৪০০ গাছ কেটে সেখানে চাতাল বা বয়লার তৈরি করছে। যার জন্য এলাকার পাখি প্রজাতি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

ঘ. কলকারখানা বৃদ্ধি

টেবিল ১১.৪ থেকে জানা যায় যে, এলাকাবাসী ১১.৫৭ শতাংশ জনগণ কলকারখানা বৃদ্ধিকে পাখি প্রজাতি হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ্য করেছেন। গবেষণা এলাকার এলাকাবাসী জানিয়েছে গবেষণা এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্র, ইউরিয়া সার কারখানা, ধান সিদ্ধ ও সংগ্রহ করার জন্য অসংখ্য বয়লার তৈরি করা হয়েছে। এই সব কলকারখানার শব্দ পাখির জন্য ক্ষতি কর। যে জন্য এই সব এলাকায় পাখি বসবাস করতে পারে না। আবার কলকারখানা তৈরির জন্যও অনেক গাছ কাটা হয়েছে। গাছ পাখির আবাস স্থল। গাছ শূন্য স্থানে পাখি থাকতে পারে না।

ঙ. জমি ভরাট

টেবিল ১১.৪ থেকে জানা যায় যে ১০ শতাংশ জনগণ জমি ভরাট পাখি প্রজাতি হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ্য করেছেন। গবেষণা এলাকায় কৃষি জমি, নিম্ন জমি ভরাট করে সেখানে বয়লার ও চাতাল তৈরি করা হচ্ছে বলে এলাকাবাসী জানান। যার ফলে যে, সব পাখি জলচরে বাস করত সে সব পাখি হ্রাস পেতে শুরু করেছে। গবেষণা এলাকার আশুগঞ্জ থেকে সড়ক পথ ধরে সোনারামপুর যাওয়ার পথে সড়কেরর দুই পাশে এই সব বয়লার ও চাতাল দেখা যাবে। জমি ভরাট করে এভাবে বয়লার ও চাতাল তৈরি করার জন্য জলচর পাখিগুলো হারিয়ে যাচ্ছে।

চ. কৃষি জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ

টেবিল ১১.৪ থেকে জানা যায় যে, ৮.১৮ শতাংশ জনগণ কৃষি জমিতে কীটনাশক প্রয়োগকে পাখি প্রজাতির হারিয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ্য করেছেন। গবেষণা এলাকার এলাকাবাসী জানান কৃষিজমিতে বিভিন্ন সময়ে কীটনাশক সার প্রয়োগ করা হয় কীটপতঙ্গ, পোকা মাকর মাড়ার জন্য। এই সব কীটনাশক সার প্রয়োগ করার ফলে পাখি প্রজাতি হ্রাস পাচ্ছে। কারণ পাখি প্রজাতি এই সব কীটনাশক ঔষুধ খেয়ে মারা যাচ্ছে। তাছাড়া এই সব কীটনাশক ঔষধ বৃষ্টির পানিতে মিশে নদী খাল বিল পুকুরের পানিতে মিশে পানি দূষিত করে। দূষিত পানির জন্য পুকুরের মাছ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঠিক তেমন ভাবে এর জন্য পাখি প্রজাতিও হ্রাস পায়।

টেবিল ১১.৪: পাখি প্রজাতি বিলুপ্তির মানবীয় কারণ

পাখি প্রজাতি বিলুপ্তির মানবীয় কারণ	উত্তর দাতা শতকরা হার	হ্রাসের ক্রম হার
ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন	৩২.৩৫	১
পাখি শিকার	২০.৯	২
গাছ কাটা	১৭	৩
কলকারখানা বৃদ্ধি	১১.৫৭	৪
জমি ভরাট	১০	৫
কৃষি জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ	৮.১৮	৬
মোট	১০০	

উৎস: মাঠ জরিপ (২০১৪-২০১৫)

চিত্র ১১.৩: পাখি প্রজাতির বিলুপ্তির মানবীয় কারণ

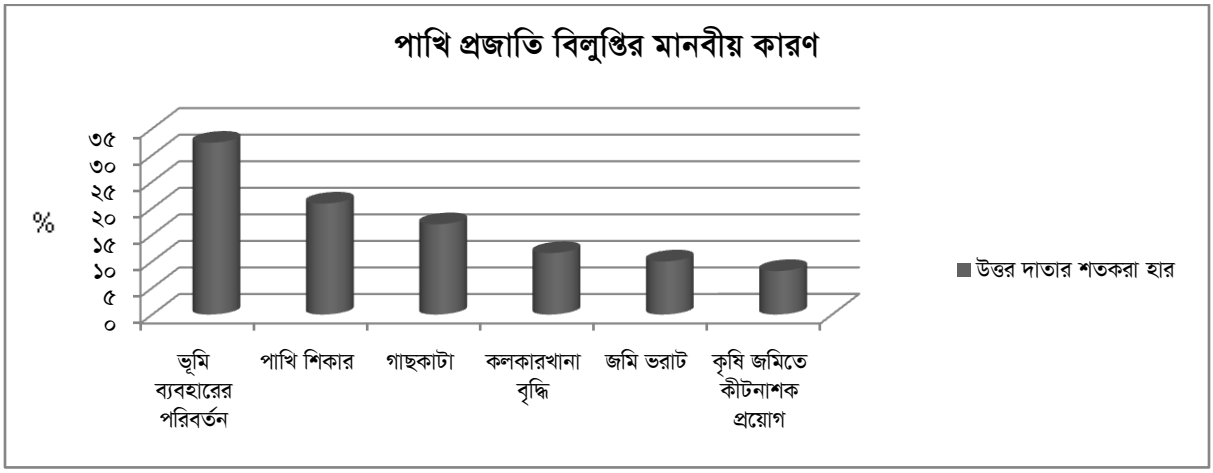

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

১১. ৫ গবেষণা এলাকায় পাখি প্রজাতি সংক্ষনের উপায় সমূহ

উপজেলার সামগ্রিক ইকোলজিক্যাল পরিবর্তনের কারণে পাখি প্রজাতি গত ৫০ বৎসরে অনেক হ্রাস পেয়েছে। এ পাখিদের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় জন্য স্থানীয় সকল শ্রেণীর জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত চাওয়া হয়েছিল। তাদের মতামতের ভিত্তিতে পাখি সংরক্ষনের উপায় সমূহ আলোচনা করা হল।

ক. পাখির অভয়ারণ্য সৃষ্টি

টেবিল ১১.৫ থেকে জানা যায় যে ২২.৫৭ শতাংশ জনগণ পাখির অভয়ারণ্য সৃষ্টিকে পাখি প্রজাতির সংরক্ষনের একটি উপায় বলে উল্লেখ্য করেছেন। এলাকাবাসী বলেন মহা সড়কের পাশে, নদীর পাড় সীমান্ত বরাবর ব্যাপকভাবে নার্সারী চারা রোপন করা যেতে পারে তাছাড়া যে সব স্থানে বাড়ির পাশে, পুকুর পাড়ে, গ্রামের কাঁচা সড়কের দুই পাশে গাছ লাগাতে হবে। এছাড়া গ্রামের খোলা প্রান্তরে যে সব স্থানে খোলা জায়গা রয়েছে সেখানে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে

টেবিল ১১.৫ থেকে জানা যায় যে ২০.৩৮ শতাংশ জনগণ গাছ কাটা বন্ধ করাকে পাখি প্রজাতির সংরক্ষনের একটি উপায় বলে উল্লেখ্য করেছেন। অধিবাসীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, গাছপালাই হলো পাখি প্রজাতির অন্যতম আবাসস্থল। কাঠ ঠোকরা, তোতা, ময়না, কোকিল, বাবুই, টিয়া, প্রভৃতি অসংখ্যা প্রজাতি পাখি গাছে বাসা বেঁধে জীবন ধারণ করে। এমতাবস্থায়, অল্প শিক্ষিত কৃষক, সাধারণ জনগণ আবাসালয়, বয়লার, চাতাল, কলকারখানা তৈরির জন্য যেভাবে গাছ কাটছে তা বন্ধ করতে হবে। এলাকায় বনভূমি সৃষ্টির জন্য বনবিভাগের কর্মকর্তা নিয়োগ করে কোন কোন গাছ কাটতে হবে এবং কোন কোন গাছ কাটা যাবে না তার নিয়ম তৈরি করতে হবে।

গ. জমিতে কীট নাশক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে

টেবিল ১১.৫ থেকে জানা যায় যে, ১৪.৯৬ শতাংশ জনগণ জমিতে কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করাকে পাখি প্রজাতি সংরক্ষনের একটি উপায় বলে উল্লেখ্য করেছেন। এলাকাবাসী জানান পোকা মাকর, কীট পঙ্গত মারার জন্য কৃষিজমিতে বিভিন্ন সময়ে কীটনাশক সার প্রয়োগ করা হয়। এই সব কীটনাশক সার প্রয়োগ করার ফলে পাখি প্রজাতি হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া এই সব কীটনাশক ঔষধ বৃষ্টির পানিতে মিশে নদী খাল বিল পুকুরের পানিতে মিশে পানি দূষিত করে। এই দূষিত পানির জন্য পুকুরের মাছ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঠিক তেমন ভাবে এর জন্য পাখি প্রজাতি হ্রাস পায়। কৃষি জমিতে কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

ঘ. গণসচেতনতা সৃষ্টি

টেবিল ১১.৫ থেকে জানা যায় যে, ১৩.৩৮ শতাংশ জনগণ সচেতনতা সৃষ্টি করাকে পাখি প্রজাতি সংরক্ষনের একটি উপায় বলে উল্লেখ্য করেছেন। এলাকাবাসী বলেন সরকারি কর্মকর্তা ও এনজিও সংস্থার মাধম্যে এলাকাতে পাখি প্রজাতির গুরুত্ব নিয়ে জনসংযোগ তৈরি করতে হবে। পাখির জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে এলাকার মানুষকে জানাতে হবে। তার ফলে এলাকার মানুষ জন পাখির বাসা থেকে পাখি শিকার করা থেকে বিরত থাকবে। বিভিন্ন গনসংযোগময় কর্মসূচীর মাধ্যমে পাখি প্রজাতি সংগ্রহ করা যাবে।

ঙ. অবৈধ শিকার নিষেধ করা

টেবিল ১১.৫ থেকে জানা যায় যে, ১২.৫১ শতাংশ জনগণ অবৈধ পাখি শিকার বন্ধ করকে পাখি প্রজাতি সংরক্ষনের একটি উপায় বলে উল্লেখ্য করেছেন। অধিবাসীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, স্থানীয় জনগণের হাতে সবচেয়ে বেশি পাখি প্রজাতি ক্ষতি হচ্ছে। তারা ফান (পাখি ধরার জাল) পেতে কৃষি জমি থেকে বক, ধানুই, ফিঙ্গে ইত্যাদি পাখি ধরে নিয়ে আসে নিজেদের খাবারের জন্য। এছাড়া আরো কিছু পাখি শিকারি রয়েছে তারা রাতের অন্ধকারে গাছে উঠে পাখির বাসা থেকে পাখির বাচ্চা, ডিম ও বড় পাখি ধরে নিয়ে আসে খাবারের জন্য। এছাড়া জেলেরা মাছ ধরতে যেয়ে বালিহাঁস, বক পাতিহাঁস ইত্যাদি পাখি শিকার করে। এই সব অবৈধ শিকার বন্ধ করতে হবে। তা হলে বিপন্নপাখি প্রজাতি রক্ষা পাবে।

চ. খালে বিষ প্রয়োগ বন্ধ করা

টেবিল ১১.৫ থেকে জানা যায় যে, ৯.৭৩ শতাংশ জনগণ খালে বিষ প্রয়োগ বন্ধ করাকে পাখি প্রজাতির সংরক্ষনের একটি উপায় বলে উল্লেখ্য করেছেন। এলাকাবাসী জানান এক শ্রেণীর জেলেরা এলাকার ভিতরে খাল, বিল, ডোবা নদীতে বিষ প্রয়োগ করে মাছ শিকার করে। এই ভাবে মাছ শিকার করার ফলে নদী, খাল, বিল পুকুর, ডোবাতে বালিহাঁস, মাছরাঙ্গা জলচর পাখিরা নদীতে মাছ খুঁজে পায় না। ফলে তাদের খাদ্য অভাব দেখা দেয়। এই জন্য খালে বিলে বিষ প্রয়োগ করে মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে।

ছ. পানির ব্যবস্থা করতে হবে

টেবিল ১১.৫ থেকে জানা যায় যে, ৬.৮৭ শতাংশ জনগণ জমিতে পানির ব্যবস্থা করতে হবে বলে জানিয়েছে। যা পাখি প্রজাতির সংরক্ষনের একটি উপায় বলে উল্লেখ্য করেছেন। এলাকাবাসী বলেন বিগত ৫০ বৎসরে বিভিন্ন খাল-বিল ডোবা ইত্যাদির পানি ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেয়েছে। যার ফলে জলচর পাখিদের খাদ্যভাব দেখা দিয়েছে। এমতা অবস্থায় এলাকাতে খাল বিল, পুকুর ডোবা ইত্যাদি খনন করতে হবে। প্রয়োজনে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

টেবিল ১১.৫: উত্তর দাতার মতামতের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকায় পাখি প্রজাতির সংরক্ষণে উপায় পর্যালোচনা

সংরক্ষণের উপায়	উত্তর দাতা শতাংশ	ক্রম সংখ্যা
পাখির অভয়ারণ্য সৃষ্টি	২২.৫৭	১
গাছ কাটা বন্ধ করা	২০.৩৮	২
জমিতে কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ	১৪.৯৬	৩
গণসচেতনতা সৃষ্টি	১৩.৩৮	৪
অবৈধ পাখি শিকার বন্ধ	১২.৫১	৫
খালে বিষ প্রয়োগ বন্ধ	৯.৭৩	৬
পানির ব্যবস্থা করতে হবে	৬.৪৭	৭
মোট	১০০	

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

চিত্র ১১.৪: পাখি প্রজাতি সংরক্ষনের উপায়

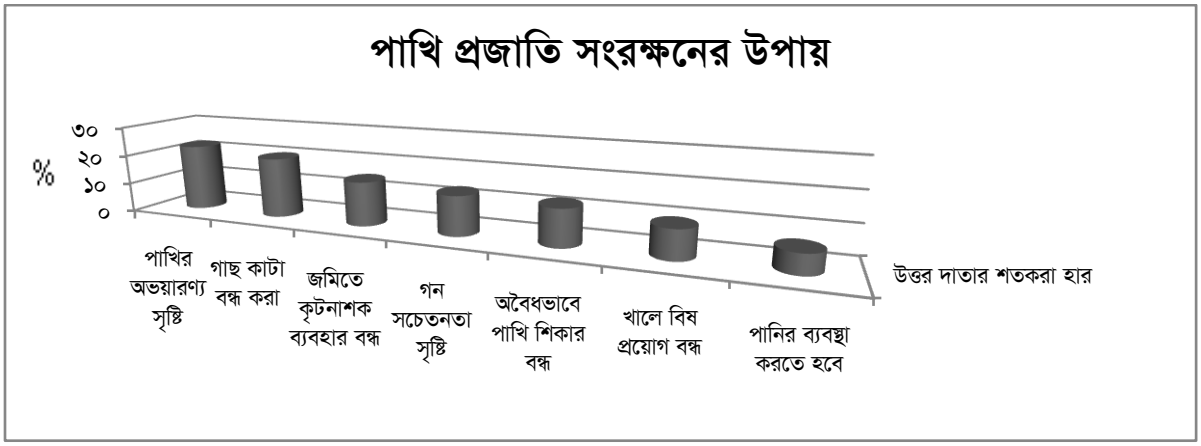

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-২০১৫

১১.৬ গবেষনা এলাকায় পাখি প্রজাতি রক্ষায় সরকারি ভূমিকা

সরকার এই এলাকায় পাখি প্রজাতি সংরক্ষনের জন্য তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয় নি। তবে সরকার এলাকায় বৃক্ষ রোপনের কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, সেই পদক্ষেপকে এলাকাবাসী পাখি প্রজাতি সংক্ষনের পদক্ষেপ হিসাবে ধরে নিয়েছে। এখানে একটি কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। জীববৈচিত্র্য একটি অন্যটি উপর নির্ভরশীল। এর যে কোনো একটি বৃদ্ধি পেলে অন্যটি বৃদ্ধি পাবে। আবার একটি কমলে অন্যটিও কমে যাবে। যেহেতু এলাকায় মহা সড়কের দুই পাশে গাছ লাগানো হয়েছে এত করে কিছু পাখি তার আবাসভূমি তৈরি করতে পারবে বলে তারা মনে করে। কিন্তু এর পরিমাণ অনেক কম আরো বেশি গাছ লাগাতে হবে।

টেবিল ১১.৬ গবেষণা এলাকায় পাখি প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম ও অবস্থা

পাখির নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	বর্তমান অবস্থা (IUCN) এর তথ্য অনুসারে
গাংচিল	Sterna acuticauda	EN
বালি হাঁস	Nettapas coromandelianus	NO
রঙ্গিলা বক	Mycteria leucocephala	CR
সাদা বক	Casmerodius albus	NO
পেঁচা	Ketupa flavipes	EN
লক্ষী পেঁচা	Tyto alba	
হুতুম পেঁচা	Bubo coromundus	VU
নীল পাখি	Pitta sordida	NO
হলুদ পাখি	Oriolus	NO
শালিক	Acridotheres tristis	
লাল বনমুরগী	Gallus gallus	
রাজহাঁস	Greylag Goose	
ঝুটি হাঁস	Sarkidiornis melanotos	
দেশি কানিবক	Ardeola grayii	
বগা	Casmerodius albus	
চিল	Aviceda leuphotes	
শঙ্খচিল	Haliastur indus	
ভিমরাজ	Dicrurus	NO
দোয়েল	Copsychus	NO
গাংশালিক	Acridotheres ginginianus	NO
ময়না	Gracula religiosa	NO

কালাবুলবুল	Hypsipetes leucocephalus	
ফুলঝুরি	Dicaeum Erythrorynehos	NO
চড়ুই	Passer domesticus	NO
কোকিল	Cuculus canorus	EN
কাঠঠুকরা	Dendrocopos Hyperylhrus	VN
টিয়া	Psittacula Krameri	No
ঘুঘু	Chalcophaps	NO
গোয়ালা হাঁস	Haliornithidae	EN
পানি কাটা	Rynehops albieollis	EN
পাতি হাঁস	Anos poecilorhyncha	NO
পাপিয়া	Clamator Jacobinus	NO
লেজ কাটা টিয়া	Loriculus Vernalis	NO
তোতা	Psittacula Alexandri	NO
কবুতর	Columba Livia	NO
ডাহুক	Houbaropsis Bengalensis	DD
সারস/সারু	Grus Antigone	DD
কোরাল	Haliaeetus Leucoryphus	CR
পাতিকাক/ কাক	Corvus Splendens	NO
পাটা বুলবুলি	Chloropsis aurifrons	NO
বাবুই/	Ploceus Philippinue	NO
ঢফি		
রাজ সরালি / Fulvous Whistling	Dendrocygna bicolor	
কালাবক		
রাজ শকুন	Sarcogyps Calvus	CR
ধলা শকুন	Neophron percnopterus	CR
কালা শকুন	Aegypius monachus	
বনমোরগ	Gollus gollus	NO
বাদুর	Phinolophidae affins	
মাছরাঙ্গা	Alcedo meninting	VU
ফিঙ্গে	Dicrurus Leucophaeus	
খয়রামাথা সুইচোরা	Merops leschenaulti	
টুনটুনি	Orthotonus sutorius	
বাঘা বক	Ardeidae	CR
দিন কানা	Caprimulgus Indicus	EN
কালো বুলবুলি	Hypsipetes Leucocephatus	DD
শীতের পাখি		

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

অধ্যায় দ্বাদশ

গবেষণা এলাকায় বিলুপ্ত উদ্ভিদ, প্রাণী ও কৃষি ফসলের মাঠ জরিপ তথ্য

মৎস্য প্রজাতি

ভূমিকা

পৃথিবীতে ৪৫০ গোত্রের প্রায় ২২,০০০ প্রজাতির মাছ রয়েছে, তান্মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ স্বাধু পানির বাসিন্দা। বাংলাদেশের ১৮ বর্গ ও ১২৩ গোত্রের ৪৪২ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ আছে, এর মধ্যে কোমলাস্থিবিশিষ্ট (শ্রেনী Chondrichthyes) ৩ বর্গও ১৫ গোত্রের ৫৬ প্রজাতি, আর কঠিনাস্থিবিশিষ্ট (শ্রেনী Osteichthyes)) ১৫ বর্গের ১০৮ গোত্রের ৩৮৬ প্রজাতি। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে (স্বাদু ও স্বল্পলোনা পানিসহ) আছে ১৪ বর্গ ও ৬১ গোত্রের ২৬৬ প্রজাতি। অভ্যন্তরীণ মাছের মধ্যে Cyprinidae গোত্র (বর্গ Cypriniformes) বৃহত্তম তাতে আছে ২৩ গণ ও ৫৭ প্রজাতি কার্প (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস ইত্যাদি), বাব (পুঁটি, মহাশোল, ইত্যাদি, মিনো (দারকিনা, চেলা, মলা ইত্যাদি) বাংলাদেশের স্বাদুপানিতে আছে ৫৫ প্রজাতির ক্যাটফিশ (টেঙরা, আইড়, সিংগি মাগুর ইত্যাদি) গত বিশ বছরে মাছের সংখ্য অনেক কমে গেছে ৫৪ টি প্রজাতি আগামী ১০ বছরে বিলীন হয়ে যাবে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

টেবিল ১২.১: গবেষণা এলাকার জলাশয় বিশ্লেষণ

ইউনিয়নের নাম	ইউনিয়নের আয়তন	মৎস্য চাষের এলাকা		মাছ চাষকৃত অঞ্চল	শুষ্ক মৌসুমে মাছ চাষকৃত এলাকা	মোট জলাশয়
		পুকুর	সাময়িক মৎস্য			
আশুগঞ্জ	১১৩৩.১৮	৭৯.৮ (৭.০৪%)	৪.৫ (০.৪%)	৮৪.৩ (৭.৪৪%)	৪৭.৯৯ (৪.২৩%)	১৩২.২৯ (১১.৬৭%)
চর চারতলা	৬৩৬.৪৩	৯.৪৬ (১.৪৯%)	৯.১১ (১.৪৩%)	১৮.৫৭ (২.৯২%)	৩১৫.৬৫ (৪৯.৬%)	৩৩৪.২২ (৫২.৫১%)
দূর্গাপুর	১২২৯.৯৬	৪৭.৩৯ (৩.৮৫%)	৫.২৬ (০.৪৩%)	৫২.৬৫ (৪.২৮%)	২৭৬.৪৮ (২২.৪৮%)	৩২৯.১৩ (২৬.৭৬%)
তালশহর	১১৩৮.৮৬	৫৮ (৫.০৯)	১৩.১৬ (১.১৬%)	৭১.১৬ (৬.২৫%)	৩৯.৯৬ (৩.৫২১%)	১১১.১২ (৯.৭৬%)

উৎস: জি আই এস তথ্য সি ই জি আই এস ও স্পার্সো (২০১০-২০১১)

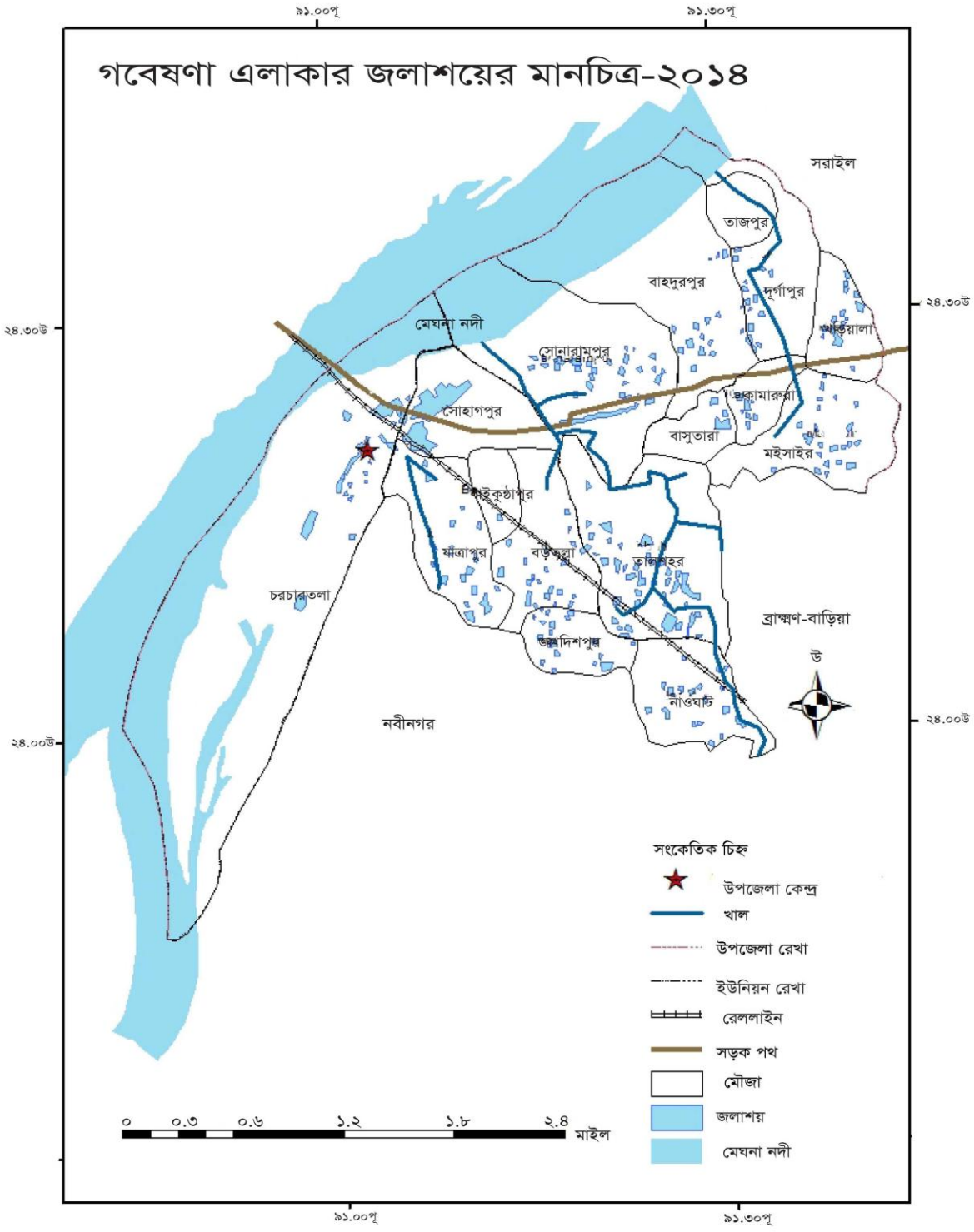

মানচিত্র ১২.১: গবেষণা এলাকার জলাশয় বিন্যাস

উৎস: মূল মানচিত্র ২০১৪

১২.১ গবেষণা এলাকায় হুমকির সম্মখীন মৎস্য প্রজাতি

বিগত ৫০ বৎসরে আশুগঞ্জ উপজেলায় মৎস্য প্রজাতির ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি, অবৈধভাবে পোনা মাছ শিকার, নিম্ন জমি ভরাট, কলকারখানা তৈরি বেকারত্ব, দারিদ্রতা এ সব নানাবিদ কারণে দেশের মৎস্য প্রজাতি মারাত্তকভাবে হুমকির সম্মুখীন। স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে জানা যায় যে, গবেষণা এলাকায় নিম্ন লিখিত মৎস্য প্রজাতিগুলো মারাত্তক ভাবে হ্রাস পেয়েছে। বলা যায় যে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে নান্দিল, কোরাল, বেতরাঙ্গি এই মাছগুলো এলাকায় আগের মত দেখা যায় না। জেলেদের মতামত এই মাছগুলো এখানকার বাজারে বিক্রি করা হলেও এগুলো ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে ক্রয় করে আনা হয়। এলাকার নদীতে এই মাছ দেখা যায় না। এমন কি কোনো কোনো জেলে এই অভিমত পোষণ করেছে যে তারা বিগত ৩০ বছরে এই এলাকার জলাশয়ে এই মাছ দেখেনি। তাদের জালে এই মাছ উঠে আসেনি। এই থেকে বুঝা যায় যে, এই মাছগুলো এই এলাকায় নেই। এছাড়া গবেষণা এলাকায় দেশিয় মাছের প্রজাতি সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে। এখন অনেকে বিদেশি বা সংকরায়ন মাছের চাষ বেশি করে থাকে। যার জন্য বাতাসি, আলাপি, কাটালিশ, পাবদা, বাইলা, কৈ, শিং, কালিবাউস, বাচা, চান্দা লামু ও গাওরা ইত্যাদি মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

টেবিল ১২.২: গবেষণা এলাকায় হুমকির সম্মূখীণ মৎস্য প্রজাতির তালিকা

মৎস্য প্রজাতির নাম	উত্তর দাতার শতকরা হার	মাছ হ্রাসের হার
নান্দিল. কোরাল, বেতরাঙ্গি	৩০.১০	৭৫
বাতাসি, আলাপি, কাটালিশ, পাবধা	২৪.৪০	৬৬
বাইলা, কৈ, শিং, কালিবাউস	১৬.৮৯	৫৩
বাচা, চান্দা, লইট্রা, ধারগিনা	১২.৩৪	৪৮
চপিলা, বাইম, লামু,	৮.৪৯	৩৩
এক ঠোঁট, উকোইল্লা, সেলাইয়া	৭.৭৯	২০
মোট	১০০	

উৎস: মাঠ জরিপ (২০১৪-২০১৫)

চিত্র ১২.১: গবেষণা এলাকায় হুমকি সম্মুখীন মৎস্য প্রজাতির পাই চিত্র

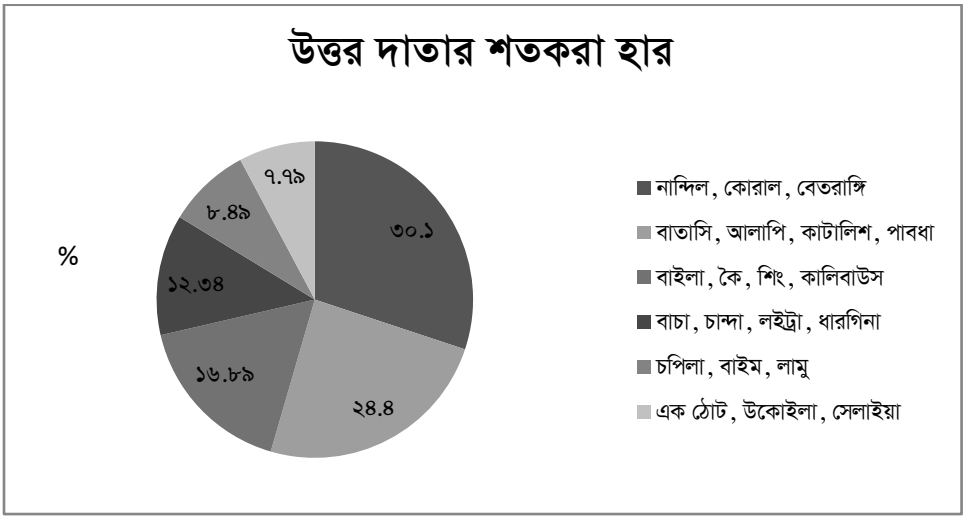

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-২০১৫

১২.১ এলাকাবাসীর মতামত বিশ্লেষণ

আশুগঞ্জ উপজেলায় মৎস্য প্রজাতি ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেয়েছে। গবেষণা এলাকার এলাকাবাসী থেকে জানা যায় যে, এলাকায় এখন অনেক দেশিয় মাছ পাওয়া যায় না। যে সব মাছ আগে পাওয়া যেত। এখন সে সব মাছ আর পাওয়া যাচ্ছে না। এলাকার জনগণের সাথে লিখিত, অলিখিত ও মৌখিক বিভিন্ন ভাবে আলোচনার ভিতিত্তে জেলে সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা বলে মাছ সংকট সম্পর্কে ধারণা নেওয়া হয়। পরবর্তিতে প্রায় এক হাজার জন জেলের সঙ্গে দলীয় আলোচনা করে ১২০ টি প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয়। এই প্রশ্ন পত্রের আলোকে দেখা যায় ৩০.১ শতাংশ জনগণ বলেন নান্দিল, কোরাল ও বেতরাঙ্গি মাছ সবচেয়ে বেশি বিলুপ্ত হয়েছে। ২৪.৪ শতাংশ জনগণ জানান বাতাসি, আলাপি, কাটালিস ও পাবধা মাছ বিলুপ্ত হয়েছে। ১৬.৮৯ শতাংশ এলাকাবাসী জানান বাইলা, কৈ, শিং ও কালিবাউস হারিয়ে গেছে। ১২.৩৪ শতাংশ জনগণ বলেন বাচা, চান্দা, লইট্রা, ধারগিনা বিলুপ্ত হয়েছে। ৮.৪৯ শতাংশ জনগণ জানান চাপিলা, বাইম ও লামু বিলুপ্ত হয়েছে। ৭.৭৯ শতাংশ জনগণ বলেন এক ঠোঁট, উকোইলা, সেলাইয়া বিলুপ্ত হয়েছে ।

১২.২ গবেষণা এলাকায় মৎস্য প্রজাতি হ্রাসের কারণ পর্যালোচনা

ক. গবেষণা এলাকার কলকারখানা

টেবিল ১২.৩ থেকে জানা যায় যে, ২০.৩০ শতাংশ জনগণ কলকারখানা তৈরিকে মৎস্য প্রজাতি হ্রাসের কারণ বলে উল্লেখ্য করেছে। অধিবাসীরা বলেন অধিকাংশ ভূমিতে যেখানে পূর্বে ধানি জমি ছিল তাতে এখন বয়লার, শিল্প কারখানা, সার কারখানা, বিদ্যু উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এটি এক দিকে যেমন খুব লাভজনক ঠিক অন্য দিকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। বর্তমানে এখানে কলকারখানা তৈরির ফলে কারখানার বর্জ্য ময়লা নদী ও পুকুরে গিয়ে পরছে, যা মাছদের জন্য খুব ক্ষতি কর। গবেষণা এলাকায় ৫০০ এর অধিক বয়লা রয়েছে। এছাড়া অসংখ্য শিল্পকারখানা এই সব কিছুর ময়লা বর্জ্য নদী নালার পানি নষ্ট করছে। যার ফলে এলাাকায় মৎস্য প্রজাতির উপর বিরূপ প্রভাব পরেছে।

খ. মৎস্য সম্পদের আবাসস্থল ধ্বংস

টেবিল ১২.৩ থেকে জানা যায় যে, ১৮.৬৪ শতাংশ জনগণ মৎস্যের আবাসস্থল ধ্বংসকে মৎস্য প্রজাতি হ্রাসের কারণ বলে উল্লেখ্য করেছে। এলাকাবাসী জানান মেঘনা নদী ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। নদীটি তার উৎপত্তি স্থল থেকে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করার সময় প্রচুর পলি মাটি বহন করে নিয়ে আসে। এভাবে ক্রমাগত পলি পরে মেঘনা নদীর নাব্যতা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। যার ফলে নদীতে মৎস্য প্রজাতি নিরাপদে থাকতে পারছেনা। মাছগুলো আশ্রয়ের আশায় গভীর পানির দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলে এই এলাকাতে মৎস্য প্রজাতির সংকট দেখা দিয়েছে। এলাকাবাসী বলেন কোনো না কোনো কারণে নিম্ন জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে যে জন্য মৎস্যের আবাসস্থল ধ্বংস হয়ে পরছে।

গ. খালের পানিতে বিষ প্রয়োগ

টেবিল ১২.৩ থেকে জানা যায় যে, ১০.২৪ শতাংশ জনগণ খালের পানিতে বিষ প্রয়োগকে মৎস্য প্রজাতি হ্রাসের কারণ বলে উল্লেখ্য করেছে। এলাকাবাসী বলেন গবেষণা এলাকায় কোন কোন জেলে নদী, পুকুর, ডোবা জলাশয়ে বিষ প্রয়োগ করে মাছ ধরে। এর ফলে নদী ও পুকুরের মাছগুলো তাড়াতাড়ি মরে ভেসে উঠে। এর ফলে অসাধু ব্যবসায়ীরা লাভবান হয় কিন্তু মৎস্য প্রজাতির ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়ে থাকে।

ঘ. ঘন জালের ব্যবহার

টেবিল ১২.৩ থেকে জানা যায় যে, ৯.৭১ শতাংশ জনগণ ঘন জাল/ কারেন্ট জালের ব্যবহারের জন্য মৎস্য প্রজাতি হ্রাস পাচ্ছে বলে জানিয়েছে। এলাকাবাসী বলেন এলাকার জেলেরা মাছ ধরার জন্য অধিক ঘন জালের ব্যবহার করে। এই ঘনজাল বা কারেন্ট জাল ব্যবহার করার ফলে মাছ ধরার সময় ছোট বড় সব ধরনের মাছ এমন কি পোনা মাছ ও জালের মধ্যে আটকে যায়। এভাবে যদি নদী পুকুর ডোবার সব মাছ ধরা হয় তা হলে খুব তাড়াতাড়ি এলাকা মাছ শূন্য হয়ে যাবে। মাছের অভাব দেখা দেবে।

ঙ. কৃষি জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ

টেবিল ১২.৩ থেকে জানা যায় যে, ৯.০১ শতাংশ জনগণ কৃষি জমিতে কীটনাশক প্রয়োগকে মৎস্য প্রজাতি হ্রাসের কারণ বলে উল্লেখ্য করেছে। এলাকাবাসী বলেন কীটপতঙ্গ, পোকা মাকর মারার জন্য কৃষিজমিতে বিভিন্ন সময়ে কীটনাশক সার প্রয়োগ করা হয়। এই সব কীটনাশক সার প্রয়োগ করার ফলে পাখি প্রজাতি হ্রাস পাচ্ছে। কারণ পাখি প্রজাতি এই সব কীটনাশক ঔষুধ খেয়ে মারা যাচ্ছে।

তাছাড়া এই সব কীটনাশক ঔষধ বৃষ্টির পানিতে মিশে নদী খাল বিল পুকুরের পানিতে মিশে পানি দূষিত করে। এই দূষিত পানির জন্য পুকুরের মাছ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঠিক তেমন ভাবে এর জন্য পাখি প্রজাতিও হ্রাস পায়।

চ. রোগব্যাধীর আক্রমন

টেবিল ১২.৩ থেকে জানা যায় যে, ৮.০৫ শতাংশ জনগণ রোগব্যাধীর আক্রমনকে মৎস্য প্রজাতি হ্রাসের কারণ বলে উল্লেখ্য করেছে। এলাকাবাসী বলেন মাঝে মাঝে বিভিন্ন পানি বাহিত রোগ মাছ গুলোকে আক্রমন করে। তখন হঠাৎ করে অনেক মাছ মরে যেতে শুরু করে। এই ধরনের রোগব্যাধির কারণেও মৎস্য প্রজাতি হারিয়ে যেতে পারে।

ছ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি

টেবিল ১২.৩ থেকে জানা যায় যে, ৭.১৭ শতাংশ জনগণ জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে মৎস্য প্রজাতি হ্রাসের কারণ বলে উল্লেখ্য করেছে। অধিবাসীরা বলেন গত ৫০ বৎসরে এলাকায় জনসংখ্যা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সকল জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের থাকার খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য মাছের উপর চাপ পরছে। এছাড়া আশে পাশে এলাকা থেকে প্রায় অর্ধলক্ষ লোক বয়লার ও চাতালে কাজ করতে আসে তারাও তাদের প্রয়োজনে এই এলাকার পুকুর, ডোবা, নদী থেকে মাছ সংগ্রহ করে। যা এলাকার মৎস্য প্রজাতির জন্য হুমকি স্বরূপ। এখানে আরো একটি কথা বলা যায় যে, জনসংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেলে সেখানে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাবে। মানুষ সহজ উপায়ে আয়ের উৎস খুঁজবে। বিশেষ করে মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে জেলেদের তেমন কোনো বিনিয়োগের প্রয়োজন পরে না। নৌকা আর জাল হলেই নদীতে মাছ ধরা যায়। যদি এই ভাবে নদীতে মাছ ধরে মাছের চাহিদা মেটানো ও অর্থের যোগান দেওয়া শুরু হয় তা হলে মৎস্য প্রজাতি ব্যাপক ভাবে হ্রাস হতে শুরু করবে।

জ. পুকুর পাড় / বাঁধ দেওয়া

এলাকাবাসীরা বলেন আগে পুকুর পাড়গুলো খোলা ছিল। বন্যার সময় নদীর পানি পুকুরের পানির সঙ্গে মিশে যেত। এছাড়া খোলা পাড়ের পুকুরে মাছেরা তাদের ইচ্ছা অনুসারে বিচরণ করতে পারত। তারা তাদের মত করে বড় হতে পারত। কিন্তু এখন জেলেরা পুকুরগুলোতে পাড় তোলে দিয়েছে। তারা তাদের ইচ্ছামত শুধু মাত্র কিছু সংখ্যাক মাছ চাষ করে। এভাবে অল্প কিছু সংখ্যাক মাছ চাষ করার ফলে অধিকাংশ দেশিয় মাছ হারিয়ে যাচ্ছে। টেবিল ১২.৩ থেকে জানা যায় যে, ৬.৬৬ শতাংশ জনগণ পুকুর পাড়ে বাঁধ দেওয়াকে মৎস্য প্রজাতি হ্রাসের কারণ বলে উল্লেখ্য করেছে।

ঝ. অবকাঠামোগত নির্মান

টেবিল ১২.৩ থেকে জানা যায় যে, ৬.৩ শতাংশ জনগণ অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণকে মৎস্য প্রজাতি হ্রাসের কারণ বলে উল্লেখ্য করেছে। এলাকাবাসী বলেন গত ৫০ বৎসরে ইউনিয়নে খাল বিল নদী নালা ভরাট করে বিভিন্ন শিল্পকারখানা, ব্রিজ, কালভার্ট তৈরি করা হয়েছে। এই সব নির্মাণের জন্য কখনো এলাকার কোনো শুরু নালা ভরাট করা হয়েছে, কখনো নদীর পাড়। কখনো খাল ভরাট করে কালর্ভাট নির্মান করা চলছে। যদি এই ভাবে এই সব নিয়ম চলতে থাকে তা হলে এলাকার পানি সমস্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় ধরনের মৎস্য সমস্যা দেখা দেবে।

ঞ. জমি ভরাট

টেবিল ১২.৩ থেকে জানা যায় যে, ৩.৯৪ শতাংশ জনগণ জমি ভরাটকে মৎস্য প্রজাতি হ্রাসের কারণ বলে উল্লেখ্য করেছে। এলাকাবাসী বলেন গবেষণা এলাকায় কৃষি জমি, নিম্ন জমি ভরাট করে সেখানে বয়লার ও চাতাল তৈরি করা হচ্ছে। গবেষণা এলাকার আশুগঞ্জ থেকে সড়ক পথ ধরে সোনারামপুর যাওয়ার পথে সড়কেরর দুই পাশে এই সব বয়লার ও চাতাল দেখা যায়। নিম্ন জলাশয় ভরাট করে এই সব বয়লার তৈরি করার কারণে মাছের আবাস স্থলের পরিমাণ কমে গিয়েছে।

টেবিল ১২.৩: গবেষণা এলাকায় মৎস্য প্রজাতি হ্রাসের কারণ পর্যালোচনার ছক

হ্রাসের কারণ	উত্তর দাতার শতকরা হার (%)	ক্রম
গবেষণা এলাকার কলকারখানা	২০.৩০	১
মৎস্য সম্পদের আবাসস্থল ধ্বংস	১৮.৬৪	২
খালের পানিতে বিষ প্রয়োগ	১০.২৪	৩
ঘন জালের ব্যবহার	৯.৭১	৪
কৃষি জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ	৯.০১	৫

রোগব্যাধীর আক্রমন	৮.০৫	৬
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	৭.১৭	৭
পুকুরে পাড়/ বাঁধ দেওয়া	৬.৬৫	৮
অবকাঠামোগত নির্মাণ	৬.৩	৯
জমি ভরাট	৩.৯৪	১০
মোট	১০০	

উৎস: মাঠ জরিপ(২০১৪-২০১৫)

চিত্র ১২.২: মৎস্য প্রজাতির হ্রাসের কারণ

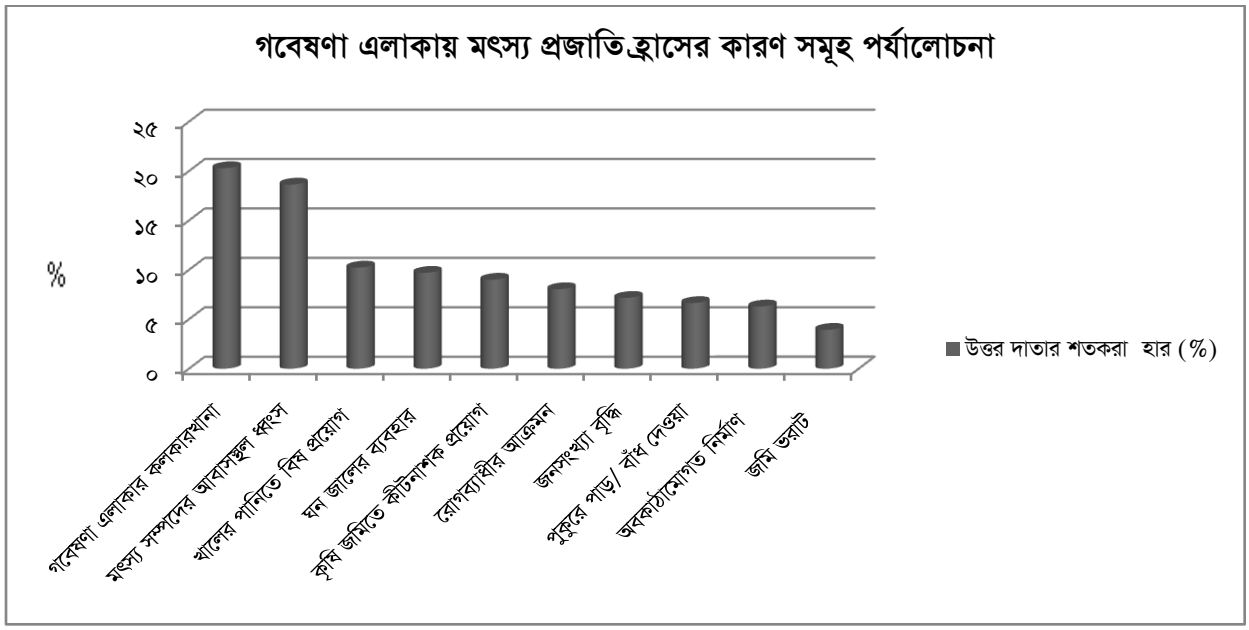

উৎস: মাঠ জরিপ(২০১৪-২০১৫)

১২.৩ গবেষণা এলাকায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে জনগনের অভিমত

আশুগঞ্জ উপজেলায় গত ৫০ বৎসরে প্রাকৃতিক ও মানবীয় বিভিন্ন কারণে মৎস্য প্রজাতি হ্রাস হতে দেখা যায়। এরই মধ্যে দেশিয় প্রজাতির কিছু মাছ। সেখান থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে এলাকার জেলেরা এখন বিদেশি মাছ চাষ করার জন্য বেশি আগ্রহ প্রকাশ করছে। যার জন্য দেশি মাছ হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে যদি শুধু বিদেশি মাছ চাষ করা হয় তা হলে দেশিয় প্রজাতির মাছ সব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যে মাছগুলো রয়েছে তাও মারাত্তভাবে হুমকির সম্মখীন হবে। এই সব সমস্যা থেকে কিভাবে প্রতিকার পাওয়া যায় সে জন্যে এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে তাদের মতামত নেওয়া হয়। তাদের মতামতের ভিত্তি নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল-

ক. গবেষণা এলাকার বসতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

টেবিল ১২.৪ থেকে জানা যায় যে, ৩০ শতাংশ জনগণ মনে করে বসতি তৈরি নিয়ন্ত্রনে রাখা হলে মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ করা যাবে বলে উল্লেখ্য করেছে। এলাকাবাসী বলেন কৃষি জমির জন্য ক্ষতিকর অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের অব্যহত দ্বারাকে আইনি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। তিন ফসলি জমির উপর কোনো প্রকার বসতি বা হাউজিং করা যাবে না। বসতি তৈরি করার জন্য একটি সরকারি আইন মেনে চলতে হবে। গবেষণা এলাকার ২৫ শতাংশ জনগণ মনে করে অপরিকল্পি ভূমিব্যবহার বন্ধ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাবে। জমির আঞ্চলিকতা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের গ্রুপ এবং প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রাস্তাবিত ভূমি জোনিং আইন এবং গ্রামের আইনের সঠিক উন্নয়ন ও প্রয়োগের করা যেতে পারে। জমি আঞ্চলিক আইন এবং গ্রাম উন্নয়ন আইনের

কঠোর ভাবে বাস্তবায়িত করে এবং প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সমূহ পরিক্ষামূলক ভাবে পর্যবেক্ষণ করে জমি আঞ্চলিক আইনে মাধ্যমে এটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কৃষিজমিকে কোনো রকম অকৃষিজ কাজে ব্যবহার করা যাবে না। বিশেষ করে কোনো তিনফসলি জমিতে কখন শিল্পকারখানা তৈরির অনুমতি দেওয়া যাবে না।

খ. জমিতে কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ

টেবিল ১২.৪ থেকে জানা যায় যে, ১৯.৫১ শতাংশ জনগণ জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ বন্ধ করা হলে মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ করা যাবে বলে উল্লেখ্য করেছে। এলাকাবাসী বলেন কৃষিজমিতে বিভিন্ন সময়ে কীটনাশক সার প্রয়োগ করা হয় কীট পতঙ্গ ও পোকা মাকর মাড়ার জন্য। এই সব কীটনাশক সার প্রয়োগ করার ফলে মাছ প্রজাতি হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া এই সব কীটনাশক ঔষধ বৃষ্টির পানিতে মিশে নদী খাল বিল পুকুরের পানিতে মিশে পানি দূষিত করে। এই দূষিত পানির জন্য পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত করছে। যার জন্য মৎস্য প্রজাতি হ্রাস পাচ্ছে। কৃষি জমিতে কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

গ. কলকারখানার বর্জ্য দূষণ মুক্ত করা

টেবিল ১২.৪ থেকে জানা যায় যে, ১৪.৮৭ শতাংশ জনগণ মনে করে অপরিকল্পিতভাবে কলখারখানা তৈরি এবং কলকারখানা থেকে বর্জ্য পদার্থ পানিতে ফেলা বন্ধ করা হলে মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ করা যাবে বলে উল্লেখ্য করেছে। এলাকাবাসী বলেন গবেষণা এলাকায় অনেক শিল্পকারখানা রয়েছে। বয়লার চাতাল রয়েছে। এই সব কিছু তৈরির করার জন্য অনেক পরিমাণে খোলা ও নিচু জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে। এছাড়া এই সব কলকারখানা থেকে বর্জ্য পদার্থ পানিতে ফেলা হয়।

ঘ. খালে বিষ প্রয়োগ বন্ধ করা

টেবিল ১২.৪ থেকে জানা যায় যে, ৭.৩৫ শতাংশ জনগণ খালের পানিতে বিষ প্রয়োগ বন্ধ করা হলে মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ করা যাবে বলে উল্লেখ্য করেছে। এলাকাবাসী বলেন এক শ্রেণীর জেলেরা এলাকার মধ্যে খাল, বিল, ডোবা নদীতে বিষ প্রয়োগ করে মাছ শিকার করে। এই ভাবে মাছ শিকার করার ফলে নদী, খাল, বিল পুকুর, ডোবাতে শিং, কৈ, মাগুর, বাইলা মাছ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর বিষ প্রয়োগের ফলে ছোট মাছ জলে ভেসে উঠে ও বড় মাছ দূর্বল হয়ে পড়ে। বিষ প্রয়োগ মৎস্য প্রজাতির জন্য হুমকি স্বরূপ তাই এই বিষ প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।

ঙ. নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি

টেবিল ১২.৪ থেকে জানা যায় যে, ১০.০৪ শতাংশ জনগণ নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা হলে মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ করা যাবে বলে উল্লেখ্য করেছে। অধিবাসীরা বলেন খাল, বিল, ডোবা, নদী-নালা হলো মৎস্য প্রজাতির আবাস স্থল। প্রতিবছর নদীর পানির সঙ্গে পলি এসে নদীর নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে। যার ফলে মৎস্য প্রজাতি ব্যপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। যদি সম্ভব হয় তা হলে নদী ডেজ্রিং করে নদীর নাব্যতা বাড়াতে হবে। নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি হয় তা হলে খালবিল গুলোর নাব্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। তা হলে মৎস্য সম্পদ ধরে রাখা যাবে।

চ. পানির ব্যবস্থা করতে হবে

টেবিল ১২.৪ থেকে জানা যায় যে, ৭.৩৫ শতাংশ জনগণ মনে করে পানির ব্যবস্থা করা হলে মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ করা যাবে বলে উল্লেখ্য করেছে। এলাকাবসী বলেন বিভিন্ন খাল-বিল ডোবা ইত্যাদির পানি ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেয়েছে। যার ফলে জলে মাছদের খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। এমতা অবস্থায় এলাকাতে খাল বিল, পুকুর ডোবা ইত্যাদি খনন করতে হবে। বৃষ্টির পানি ধরে রাখার মাধ্যমে শুস্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ ধরে রাখার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

ছ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে রাখা

টেবিল ১২.৪ থেকে জানা যায় যে এলাকাবাসীর ৬.৬৫ শতাংশ জনগণ মনে করে জনসংখ্যা নিযন্ত্রণ করা হলে মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ করা যাবে বলে উল্লেখ্য করেছে। এলাকাবাসী বলেন গবেষণা এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাওয়ার কারণে মৎস্য আহরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এলাকাবাসী জানায় জনসংখ্যার জন্য অধিক বসতি নির্মাণের জন্য নিচু এলাকা ভরাট করে বসতি নির্মাণ করা হচ্ছে, এ কারণে মৎস্য প্রজাতি হ্রাস পাচ্ছে।

টেবিল ১২.৪: এলাকায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে জনগণের মতামত পর্যালোচনা

এলাকায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে জনগণের মতামত পর্যালোচনা	উত্তর দাতার শতকরা হার	ক্রম
গবেষণা এলাকার বসতি নিয়ন্ত্রণ	৩০.০০	১
জমিতে কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করা	১৯.৫১	২
কলকারখানার বর্জ্য দূষণ মুক্ত করা	১৪.৮৭	৩
খালে বিষ প্রয়োগ বন্ধ করা	১১.৫৫	৪
নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি	১০.০৬	৫
খাল বিলে পানির ব্যবস্থা করতে হবে	৭.৩৫	৬
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে রাখা	৬.৬৫	৭
মোট	১০০	

উৎস: মাঠ জরিপ- (২০১৪-২০১৫)

চিত্র ১২.৩: এলাকায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে জনগণের মতামত পর্যালোচনা

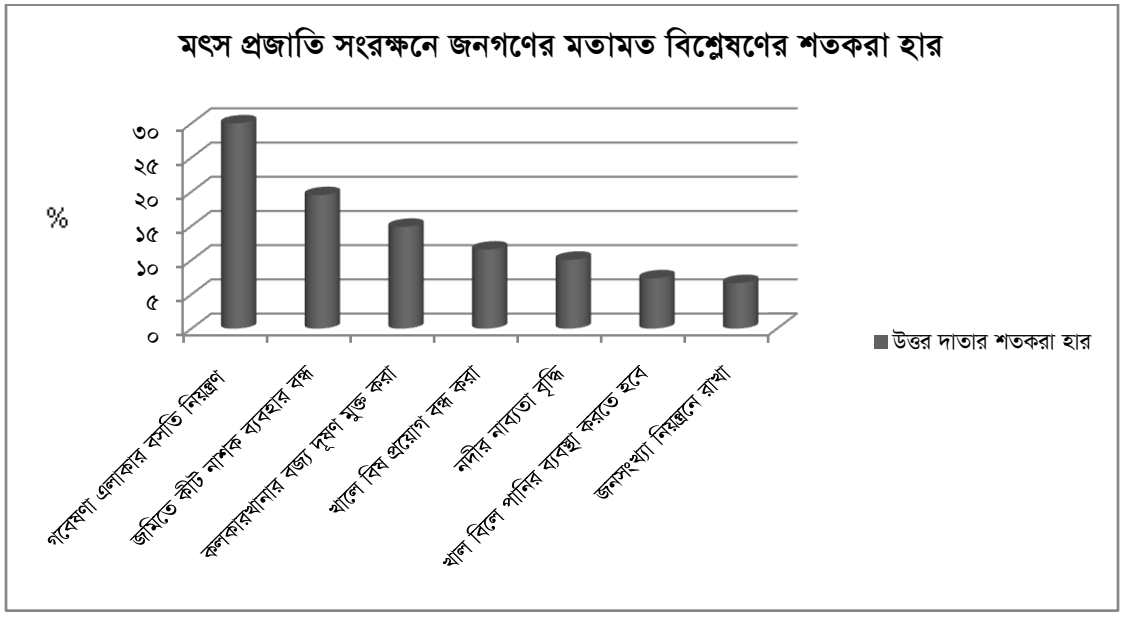

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

১২.৪ গবেষণা এলাকায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে সরকারের ভূমিকা

সরকার বিভিন্ন সময়ে মৎস্য সম্পদ রক্ষার জন্য বিভিন্ন আইন তৈরি করে থাকে। কিন্তু এই সব আইনের বাস্তব প্রয়োগ খুব কমই লক্ষ্য করা যায়। যেমন উদাহরন স্বরূপ বলা যায় যে, কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরা নিষেদ্ধ করা হয়েছে। এখন কেউ কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরছে না। কিন্তু আদৌতে কি তাই ? না কখনও না। এই রিপোর্টটি তৈরি করার সময় সেই সব এলাকার লোক জনের কাছ থেকে জানা যায় সেখানে অনেকেই এখনও কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরে। কারেন্ট জাল এখনও বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সরকার বিগত বৎসরে আশুগঞ্জ এলাকায় বিস্তর পরিবর্তন করেছে। এই এলাকার উল্লেখ্যযোগ পরিবর্তন গুলোর সঙ্গে মিল রেখে এলাকার মৎস্য প্রজাতি জীবকুল সংরক্ষণ করার কোনো টেকসই উন্নয়ন ব্যবস্থা এখানে লক্ষ্য করা যায় না। সরকারকে এলাকার মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের সরকারিভাবে নানা সুযোগ গ্রহন করা পদক্ষেপ গুলো বাস্থবায়িত করতে হবে। যদি সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করা হয় তা হলে এলাকার জনগণ এর থেকে উপকৃতি হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রসাশনিক কর্মকর্তাদের কে ঘুষ দিয়ে কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়। এই সব কর্মকর্তাকে ঘুস দিয়ে ঝাটকা, পোনা মাছ ধরা হয়। যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এলাকায় মৎস্য সংরক্ষণে সরকারি পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করার মাধ্যমে এই সব তথ্য জানা যায়।

টেবিল ১২.৫: গবেষণা এলাকায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে সরকারের ভূমিকার আলোচনার ছক

গবেষণা এলাকায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে সরকার ও জনগণের মতামত বিশ্লেষণ	উত্তর দাতার শতকরা হার	ক্রম
গণসচেতনতা সৃষ্টি করা	২৯.৯২	১
কারেন্ট জালের ব্যবহার বন্ধ করা	২১.০৮	২
বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে	২০.৩৮	৩
অবকাঠামোগত নির্মাণ	১৮.৭২	৪
পাতলা জাল সরবরাহ করা	৯.৮৯	৫
মোট	১০০	

উৎস: মাঠ জরিপ- (২০১৪-২০১৫)

চিত্র ১২.৪: গবেষণা এলাকায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে সরকারের ভূমিকা

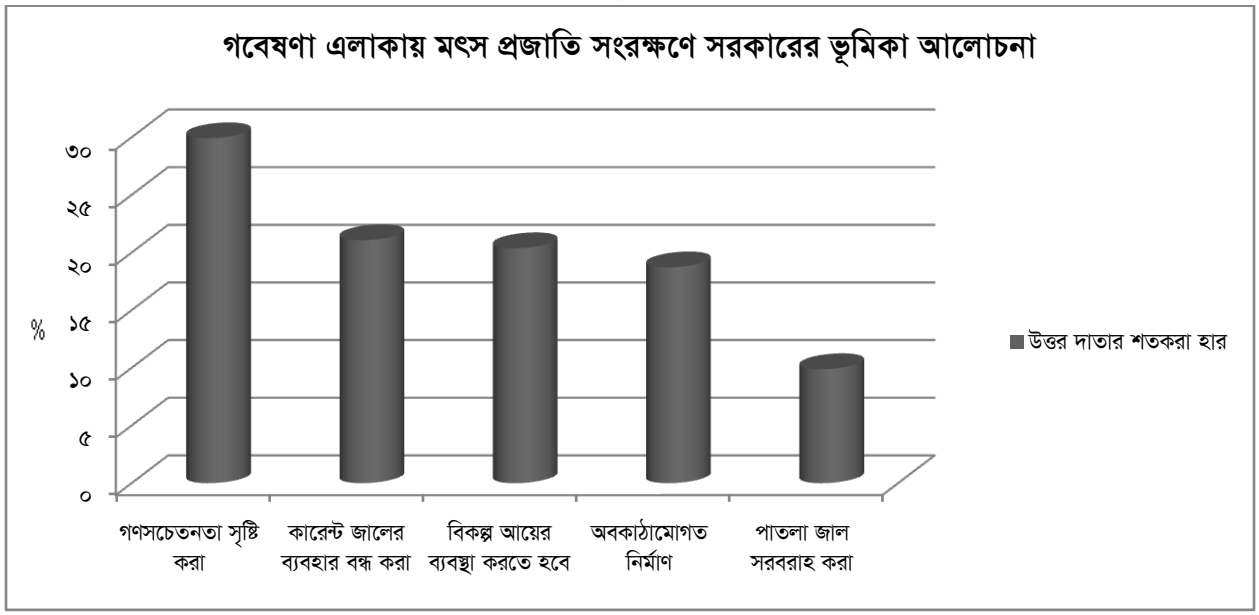

উৎস: মাঠ জরিপ- (২০১৪-২০১৫)

ক. গণসচেতনতা সৃষ্টি

টেবিল ১২.৫ থেকে জানা যায় যে, এলাকার ২৯.৯২ শতাংশ জনগণ মনে করে সরকারের গণসচেতনতা সম্পর্কে নেওয়া পদক্ষেপগুলো মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে সহায়তা করবে। এলাকাবাসী জানান সরকারি কর্মকর্তা ও এনজিও সংস্থার মাধ্যমে এলাকাতে মৎস্য প্রজাতির গুরুত্ব নিয়ে জনসংযোগ তৈরি করতে হবে। জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে এলাকার মানুষকে জানাতে হবে। বিভিন্ন গণসংযোগময় কর্মসূচীর মাধ্যমে কোনো মৎস্য প্রজাতি সংগ্রহ করতে হবে এবং কোনো প্রজাতি সংগ্রহ করা যাবে না সে সম্পর্কে জনগণকে জানাতে হবে।

খ. কারেন্ট জালের ব্যবহার বন্ধ করা

টেবিল ১২.৫ থেকে জানা যায় যে, গবেষণা এলাকার ২১.০৮ শতাংশ জনগণ মনে করেন কারেন্ট জালের ব্যবহার বন্ধ করার মাধ্যমে মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ করা সহজ হবে। এলাকাবাসী বলেন নদীতে কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে। নদীতে কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরার ফলে নদী থেকে বড় মাছের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র পোনা মাছ ও ধরা হয়ে যায়। যে জন্য কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে। কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরার ক্ষেত্রে যে আইন রয়েছে সে আইন যথাযত ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। কোথায় কারেন্ট

জাল দিয়ে মাছ ধরতে দেখলে সে জাল পুড়িয়ে দিতে হবে। তাছাড়া বাজারে কারেন্ট জাল ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করতে হবে। স্থানীয় জনপ্রশাসনকে এ বিষয়ে সহায়তা প্রধান করতে হবে।

গ. বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে

টেবিল ১২.৫ থেকে জানা যায় যে, গবেষণা এলাকার ২০.৩৮ শতাংশ জনগণ মনে করে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ করা সহজ হবে। এলাকাবাসী বলেন এলাকার অতি দরিদ্র মানুষ জন এই পেশার সঙ্গে জড়িত। তারা মাছ ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তাদের ধারণা তারা যত বেশি মাছ ধরবে তত বেশি টাকা পাবে। সে জন্য তারা পরিবেশের কথা ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা না করে সব সময় মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত থাকে। এই সব জন সাধারনের জন্য বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সব দরিদ্র জনসাধারণকে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। অথবা সহজ কিস্তিকে অল্প সুদে ঋনের ব্যবস্থা করে তাদেরকে অন্য কাছের উপযোগী করে গড়ে তোলতে হবে। এভাবে তাদেরকে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে অন্য কাজে নিয়োজিত করে দিতে হবে।

ঘ. অবকাঠামোগত নির্মাণ

টেবিল ১২.৫ থেকে জানা যায় যে, গবেষণা এলাকার ১৮.৭২ শতাংশ জনগণ মনে করে সঠিক অবকাঠামোগত নির্মাণ পদ্ধতির মাধ্যমে মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ করা সহজ হবে। এলাকাবাসী বলেন অধিকাংশ ভূমিতে যেখানে পূর্বে ধানি জমি ছিল তাতে এখন বয়লার, শিল্প কারখানা, সার কারখানা, বিদ্যু উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এটি এক দিকে যেমন খুব লাভজনক ঠিক অন্য দিকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। বর্তমানে এখানে কলকারখানা তৈরির ফলে জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে। যার জন্য মৎস্য প্রজাতির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। গবেষণা এলাকায় ৫০০ এর অধিক বয়লা রয়েছে। যেগুলোর শব্দ ও জ্বালানি ব্যবস্থা ক্ষতি কর। বলা যায় যে, গবেষণা এলাকার সমগ্র ভূমিব্যবহার এলাকার মৎস্য প্রজাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই সব অবকাঠামোগত উন্নয়ন করার সময় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে।

ঙ. পাতলা জাল সরবরাহ

টেবিল ১২.৫ থেকে জানা যায় যে, গবেষণা এলাকার ৯.৯৮ শতাংশ জনগণ মনে করে পাতলা জাল সরবরাহ করার মাধ্যমে মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ করা সহজ হবে। এলাকাবাসী বলেন গবেষণা এলাকায় ঘনজালের বিকল্প হিসাবে পাতলা জালের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কারেন্ট জাল বাদ দিয়ে পাতলা জাল দিয়ে মাছ ধরা হয় তা হলে দেশিয় অনেক মৎস্য প্রজাতি রক্ষা পাবে। স্বল্প মূল্যে পাতলা জাল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

১২.৫ গবেষণা এলাকায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে সরকারি ভুমিকা মূল্যায়ন

সরকারী কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনগণের অভিমতের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকায় প্রজাতি সংরক্ষণে সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ণ সারণি থেকে দেখা যায় যে, এলাকার মাত্র ২৯.৯২ শতাংশ জনগণ সরকারের উন্নয়ন মূলক ভূমিকায় সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন। তাদের ধারনা সরকারের ভূমিকা ও আইনগুলোর সঠিক বাস্তবায়িত হলে এলাকার মৎস্য প্রজাতি রক্ষা পাবে। ৫ শতাংশ মনে করে আল্লাহ প্রকৃতি তৈরি করেছে এর রক্ষনা বেক্ষণ তিনিই করবেন। এই বিষয়ে তাদের কিছু করার নেই। ৯ শতাংশ জনগণের জানা নেই সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে। ২৫ শতাংশ সাধারণ জনগণ মনে করে শুধু সরকারের আইন গত ব্যবস্থাপনাই নয় এর সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও মৎস্য সংরক্ষণে সচেতন হতে হবে। ২৮ শতাংশ জনগণ মিশ্র মতবাদ প্রধান করেছে। তাদের মত অনুসারে সরকারি কর্মকর্তাদের আরো সচেতন হতে হবে। শুধু সরকারি কর্মকর্তা নয় এর পাশাপাশি এনজিও, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। স্থানীয় জনগণের মৎস্য সংরক্ষণের বিষয়ে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে সচেতন করতে হবে। পোনামাছ, ঝাটকা মাছ ধরার আইন আরো মজবুত করতে হবে। যে কোনো আইন তৈরি করা হলে তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো রকমের শিথিলতা করা যাবে না। এলাকার টেকসই অর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্য প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব। পরিবর্তনিয় পরিবেশ উপযোগী চাষপদ্ধতির প্রচলন করতে হবে। এছাড়াও লবণ ও খরা সহিষ্ণু উন্নত জাতের মাছ উদ্ভাবনের কর্মসূচী হাতে নেওয়া প্রয়োজন যাতে করে একদিকে যেমন মাছের উৎপাদন বাড়বে অন্যদিকে তেমনই মৎস্য প্রজাতি রক্ষায় তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

টেবিল ১২.৬: সরকারী কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনগণের অভিমতের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকায় প্রজাতি সংরক্ষণে সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন

সরকারী কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনগণের অভিমতের ভিত্তিতে	উত্তর দাতার শতকরা হার

গবেষণা এলাকায় প্রজাতি সংরক্ষণে সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ণ	
সরকারের ভূমিকায় সন্তুষ্ট	৩২
মিশ্র মতবাদ	২৮
শুধু সরকারের আইন নয় সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে	২৬
সরকার কি প্রদক্ষেপ নিচ্ছে জানে না	৯
ভাগ্যের উপর নির্ভর বিশ্বাস করে	৫
মোট	১০০

উৎস: মাঠ জরিপ- (২০১৪-২০১৫)

১২.৬ মেঘনা নদীতে শুশুকের অবস্থান

গবেষণা এলাকার মেঘনা নদীতে এক সময় শুশক নামক এক ধরনের বিশেষ প্রানী দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে এই প্রানীটিকে আর তেমন করে দেখা যায় না। গবেষণা এলাকার জেলেদের মধ্যে অনেকেই বলেছে এই প্রানীটিকে বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে তাদের কেউ কেউ একবার বা দুবার দেখেছে। কিন্তু পূর্বে সাধারণ মানুষ বিকেলে নদীর পাড়ে ঘুরতে এলেও মাঝে মাঝে নদীতে এই প্রাণীটিকে দেখতে পেত। তা এখন আর দেখা যায় না। আই ইউ সি এন এর তালিকা অনুযায়ি এই প্রাণীটি মারাক্তকহুমকী সম্মূখীন একটি প্রজাতি। মেঘনা নদীতে এক সময় প্রচুর পরিমাণে এই প্রাণী দেখা গেলেও বর্তমানে তা আর আগের মত দেখা যাচ্ছে না। বর্তমানে সে নদীতে পানির নাব্যতা হ্রাস পাওয়ার জন্য এই প্রাণিটিকে আর তেমন ভাবে দেখা যাচ্ছে না বলে এলাকাবাসি বলেন। শুশক প্রজাতিটি ব্যাপকভাবে এই এলাকা থেকে হ্রাস পেয়েছে।

টেবিল ১২.৭: শুশক হ্রাস উত্তর দাতার মতামত

শুশক হ্রাস পাচ্ছে	উত্তর দাতা	শতকরা হার
বেশি হ্রাস পেয়েছে	৬৫	৬৫%
মোটামোটি	৩৭	৩৭০%
সামান্য	৮	৮০%
হ্রাস পায়নি	০০	০০%
মোট	১০০	১০০%

উৎস: মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

গবেষণা জরিপে দেখা যাচ্ছে যে এলাকার প্রায় ৬৫ শতাংশ উত্তর দাতা বলছেন শুশক প্রজাতিটি বেশি মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে। এলাকার ৩৭ শতাংশ উত্তর দাতা বলছেন মোটামোটা হ্রাস পেয়েছে। কিছু সংখ্যা উত্তর দাতা সামান্য হ্রাস পেয়েছে বললেও এটি কেউ বলেনি যে একদম হ্রাস পায়নি। তাদের মতামতের ভিত্তিতে এটা বলা যায় যে এলাকায় শুশুক প্রজাতির মাত্রা ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

১২. ৬ .১ শুশক হ্রাস পাওয়ার কারণ

যে কোনো একটি প্রাণী হঠাৎ করে হারিয়ে গেলে প্রতেক্যের মনেই প্রশ্ন জাগে এই প্রাণীটি কেন হারিয়ে গেল। সেই উত্তর সংগ্রহ করার জন্য আরো একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল কেন হারিয়ে গিয়েছে। তার উত্তরে ২৬.৩০ শতাংশ বলেছিল অবস্থানগত কারণে জলবায়ূ পরিবর্তনের কারণে এই প্রজাতিটি হারিয়ে গিয়েছে। অনেকেই বলেছে প্রাকৃতিক কারণে এটি হারিয়ে গিয়েছে। জেলেদের ধারণা মতে এই প্রাণীটি গভীর জলে থাকতে পছন্দ করে। যেহেতু বর্তমান সময়ে মেঘনা নদীর পানির নাব্যতা কমে গেছে সে জন্য এই প্রাণীটি গভীর জলে চলে গিয়েছে বলে অনেকের ধারণা। এলাকাবাসীর অনেকে অনেক গুলোকারণে এই প্রাণী হারিয়ে যাওয়ার পেছেনে ধারনা করেছে।

টেবিল ১২.৮: শুশক হ্রাসের কারণ

হ্রাস পাওয়ার কারণ	উত্তর দাতা	শতকরা হার
অবস্থানের পরিবর্তন	৩৭০	২৬.৩০%
প্রাকৃতিক অন্য কারণ	২৬০	২৫.৭০%
মানবীয় কারণ	২৪০	১২%
অন্যান্য	১৩০	৩৭%

মোট	১০০০	১০০%

উৎস: মাঠ জরিপ (২০১৪-১৫)

টেবিল ১২.৯: গবেষণা এলাকার মৎস্য প্রজাতির তালিকা

দেশীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	*ইংরেজী নাম*	জীবন দশা
কৈ	Anabas testudineus	*Climbing perch*	সংকটাপন্ন
মাগুর	Clarias batrachus	*walking catfish*	সংকটাপন্ন
শিং	Hetropneustes fossillis	*Stinging Catfish*	সংকটাপন্ন
টাকি	Channa punctatus	*Spotted snake-head*	বিপন্ন
পাবদা	Ompok pabda	*Pabo catfish*	বিপন্ন
টেংরা	Mystus tengra / Batasio tengana	*Assamese Batasio*	বিপন্ন
ফলি	Notpterus notopterus	*Greyfeatherback*	সংকটাপন্ন
বাইলা	Glossogobiusgiuris	*tankgoby*	বিপন্ন
চাপিলা	Gonialosa manmina	*Ganges river gizzard shad*	সংকটাপন্ন
চান্দা	Chanda nama	*Ambassidae*	সংকটাপন্ন
খলিশা	Colisa fasciata	*Giant gourami*	বিপন্ন
শোল	Chanda striatus	*snakehead*	সংকটাপন্ন
মহাশোল	Tor tor	*Tor Mahseer*	মহাবিপন্ন
চিলা/ চেলা	Salmostoma phulo	*Finescale/razorbelly/ minnow*	বিপন্ন
মলা	Amblypharyngodon mola	*Mola carpet*	সংকটাপন্ন
রাজ পুঁটি	Puntius gonionotus	*Silver Barb, java barb*	বিপন্ন
বাইম/ গুচি বাইম	Mastacembalus pancalus	*Striped Spiny Eel*	সংকটাপন্ন
গোলসা	Mystus cavasius	*Gangetic Mystus*	সংকটাপন্ন
রাইনা	Nadus nandus	*Mudperch*	বিপন্ন
বাশ পাতা/ কাজলি	Ailia coila / Ailiichthys punctata day 1872	*Jamina ailia*	বিপন্ন
কাকিলা/ কাকিয়া/গাংতুরি	Xenentodon concila	*Freshwater Gar*	সংকটাপন্ন
রুই/রুইত	Labeo rohita	*Roho carp*	সংকটাপন্ন
কাতল	Cyprinus catla	*Catla carp*	সংকটাপন্ন
সিলভার কার্প	Hypophthalmichthys molitrix	*Silver Carp*	সংকটাপূর্ণ
একঠোঁটা	Dermogenys pusillus	*Wrestling halfbeak*	বিপন্ন
মিরর কার্প	Cyprinus carpio var. specularis	*Mirror carp*	বিপন্ন
কালি বাউস	Labeo calbasu	*Blackpohu*	বিপন্ন
মৃগেল/মিরকা	Cirrhinus cirrhosus (bloch,1795)	*Mrigal carp*	মহাবিপন্ন
ঘনিয়া/ঘন্যা/ ঘনি	Labeo gonius	*Kuria labeo*	সংকটাপন্ন
সরপুটি	Puntius sarana	*Olivebara*	মহাবিপন্ন
তেলাপিয়া	Oriochoromis mosambicus	*Tilapia*	সংকটাপন্ন
কাফিউ	Cyprinus carpio Linnaeus	*Common carp*	মহাবিপন্ন
ভেটকি	Lates calcarifer	*Barramundi*	বিপন্ন
পাঙ্গাস	Pangasius pangasius	*Pungas*	বিপন্ন
বিগহেড কার্প	Aristichys nobilis	*Bighead carp*	বিপন্ন
গজার	Channa marulius	*Giant Snakehead*	বিপন্ন

মিনি	Nandus nandus	*Mottled nandus*	সংকটাপন্ন
বেতাঙ্গী / বেটি	Botia Dario	*Necktie-loach*	বিপন্ন
বৈচা	Trichogaster chuna	*Honey gourami Badis*	বিপন্ন
চিতল	Notopterus chitala	*Humped Featherback*	বিপন্ন
তারা বাইম	Macrognathus aral	*One-striper spilyeel*	সংকটাপন্ন
গুতুম/গুন্টিয়া	Lepidocephaius guntea	*Guntea loach*	বিপন্ন
বোয়াল	Wallago attu	*Boal fish*	বিপন্ন
আইর	Aorichthy aor	*Long-whiskered*	সংকটাপন্ন
ইলিশ	Tenulosa ilisha	*Hilsha*	সংকটাপন্ন
গলদা চিংড়ি	Macrobrachium rosenbergii	*Freshwater Giant Prawn*	সংকটাপন্ন
গুচা/গুইজ্জা	Aorichthys seenghala	*Giantriver-catfish*	বিপন্ন
কানপোনা/ চার-চোখা	Aplocheilus panchax	*Top-minnows*	সংকটাপন্ন
কাসকি/কেসকি/বাটা	Paramugil parmatus	*Broad-mouthed mullet*	সংকটাপন্ন
ঘাউরা	Clupisoma garua	*Garua bacha*	মহাবিপন্ন
ঘাগট/ঘাইরা/ গাচুয়া	Channa orientalis	*Walking snakehead*	সংকটাপন্ন
নান্দিল/নানদি	Labeo nandina	*Nandilabeo*	মহাবিপন্ন
দারকিনা	Rasbora rasbora	*Gangetic Scissortail*	বিপন্ন
কাজলী	Ailiapunctata	*Jamuna ailia*	সংকটাপন্ন

উৎস: মাঠ জরিপ ২০১৪-২০১৫ ও আই ইউ সি এন

অধ্যায় ত্রয়োদশ
ভূ-দৃশ্য পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস সম্পর্ক বিশ্লেষণ

কোনো একটি অঞ্চলের ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে স্থানের পারিপার্শিক অবস্থনের পরিবর্তন হয়ে থাকে। এই পরিবর্তনের প্রভাব থেকে সে স্থানের জলবায়ু, ইকোলজী, জীববৈচিত্র্য কোনটাই বাদ যায় না। এই গবেষণার মূল বিষয় হল ভূ-দৃশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এলাকাটির জীববৈচিত্র্যে হ্রাস সম্পর্ক বিশ্লেষণ। এই গবেষণায় ভূ-দৃশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে জীববৈচিত্র্য হ্রাসের যে সম্পর্ক পাওয়া যায় নিম্নে এর বর্ণনা দেওয়া হল-

১৩.১ কৃষি জমি হ্রাস ও জীববৈচিত্র্য হ্রাসের সম্পর্ক বিশ্লেষণ

গবেষণা এলাকার ভূ-উপগ্রহ চিত্র থেকে পাওয়া তথ্য ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে গ্রাফচিত্র ১৩.১ উপস্থাপন করে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গবেষণা এলাকাটির কৃষি জমির হ্রাস পেয়েছে ১৫.৫ শতাংশ। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একই হারে গবেষণা এলাকা থেকে ফসল, প্রাণী, পাখি প্রজাতি হ্রাস পেয়েছে। গবেষণা এলাকার মাঠ জরিপে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে বহুধা নির্ভরণ করে দেখা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে গবেষণা এলাকাটির ফসল প্রজাতি ৪৮ শতাংশ, প্রাণী প্রজাতি ২৫ শতাংশ ও পাখি প্রজাতি ৩৫ শতাংশ বিলুপ্তি ঘটেছে।

চিত্র ১৩.১: কৃষি জমি হ্রাস ও জীববৈচিত্র্যের হ্রাসের সম্পর্ক বিশ্লেষণ

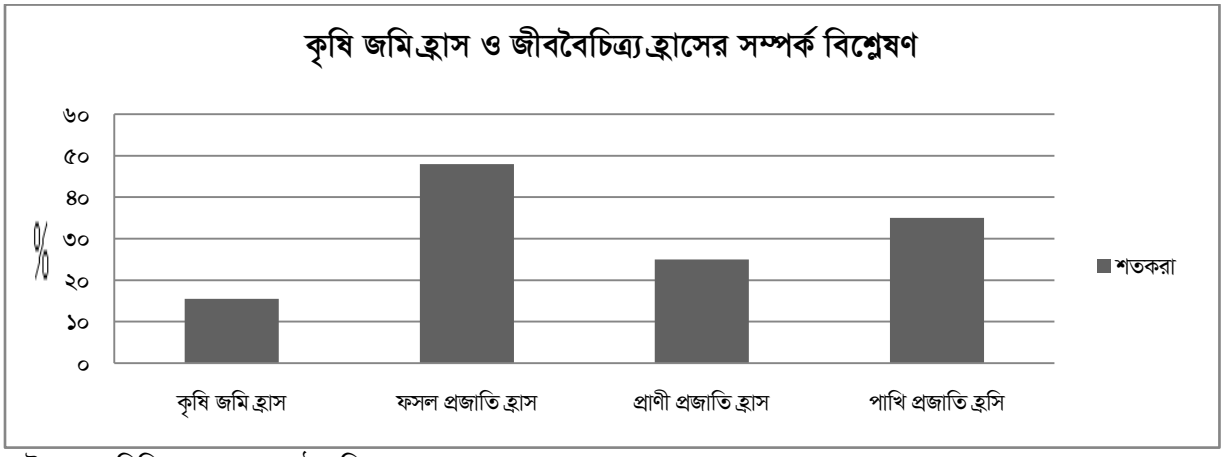

উৎস: ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন এবং মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

১৩.২ নগরায়ণ বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস সম্পর্ক

গবেষণা এলাকার ভূ-উপগ্রহ চিত্র থেকে পাওয়া তথ্য ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন মাধ্যমে বিশ্লেষণ গ্রাফচিত্র ১৩.২ উপস্থাপন করে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গবেষণা এলাকাটির নগরায়ণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২০.৬৩ শতাংশ। কোনো একটি এলাকার নগরায়ণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে এলাকার রাস্তাঘাট, যাতায়াত ব্যবস্থা, কলকারখানা ইত্যাদি উন্নত হয়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা এলাকাটিতে একই হারে ফসল, প্রাণী, মৎস প্রজাতি ও পাখি প্রজাতি হ্রাস পেয়েছে। গবেষণায় মাঠ জরিপে পাওয়া তথ্য বহুধা নির্ভরণ করে দেখা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে গবেষণা এলাকাটির ফসল প্রজাতি ৪৮ শতাংশ, প্রাণি প্রজাতি ২৫ শতাংশ, মৎস্য প্রজাতি ৩০ শতাংশ ও পাখি প্রজাতি ৩৫ শতাংশ বিলুপ্তি ঘটেছে।

চিত্র ১৩.২: নগরায়ণ বৃদ্ধি ও জীব বৈচিত্র্য হ্রাস সম্পর্ক

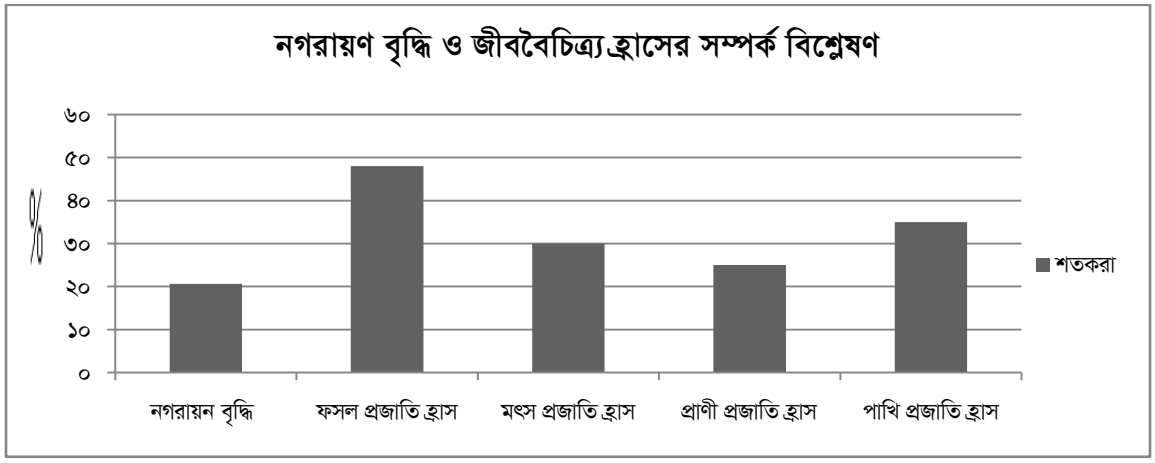

উৎস: ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন এবং মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

১৩.৩ জলাশয় হ্রাস ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস সম্পর্ক বিশ্লেষণ

গবেষণা এলাকার ভূ-উপগ্রহ চিত্র থেকে পাওয়া তথ্য ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন মাধ্যমে বিশ্লেষণ গ্রাফচিত্র ১৩.৩ উপস্থাপন করে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গবেষণা এলাকাটির জলাশয় হ্রাস পেয়েছে ৮.৬১ শতাংশ। মাঠ জরিপে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে, জলাশয় ভরাট করে গবেষণা এলাকাটিতে বয়লার, কলকারখানা ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে। যা গবেষণা এলাকার জীববৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা এলাকাটিতে একই হারে ফসল, প্রাণি, মৎস প্রজাতি ও পাখি প্রজাতি হ্রাস পেয়েছে। গবেষণায় মাঠ জরিপে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এই সময়ের মধ্যে গবেষণা এলাকাটির ফসল প্রজাতি ৪৮ শতাংশ, প্রাণি প্রজাতি ২৫ শতাংশ, মৎস প্রজাতি ৩০ শতাংশ, ও পাখি প্রজাতি ৩৫ শতাংশ বিলুপ্তি ঘটেছে।

চিত্র ১৩.৩: জলাশয় হ্রাস ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্ক বিশ্লেষণ

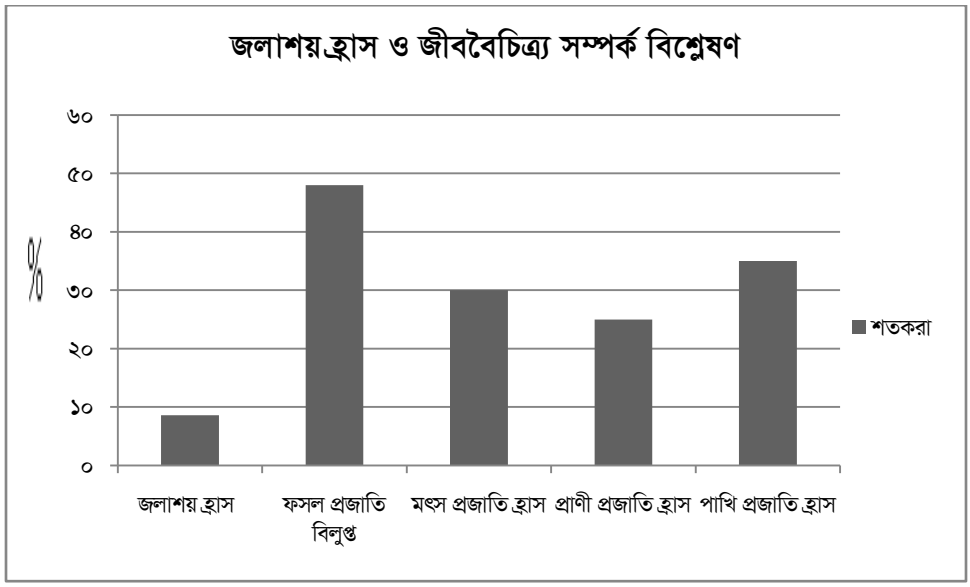

উৎস: ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন এবং মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

১৩.৪ বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস সম্পর্ক

গবেষণা এলাকার ভূ-উপগ্রহ চিত্র থেকে পাওয়া তথ্য ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন মাধ্যমে বিশ্লেষণ গ্রাফচিত্র ১৩.৪ উপস্থাপন করে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গবেষণা এলাকাটির বনভূমি হ্রাস পেয়েছে ৩.৩১ শতাংশ। মাঠ জরিপে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, গ্রামীণ বনভূমি থেকে অধিক গাছ কেটে বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারের ফলে এলাকাটি বর্তমানে বনভূমি শূন্যের কোঠায় চলে এসেছে। গবেষণা এলাকাটি থেকে গাছ কেটে সেখানে বয়লার, কলকারখানা ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে। যা গবেষণা এলাকার জীববৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা এলাকাটিতে একই হারে ফসল, প্রাণি, মৎস প্রজাতি ও পাখি প্রজাতি হ্রাস পেয়েছে। গবেষণার মাঠ জরিপে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে গবেষণা এলাকাটির প্রাণি প্রজাতি ২৫ শতাংশ ও পাখি প্রজাতি ৩৫ শতাংশ বিলুপ্তি ঘটেছে।

চিত্র ১৩.৪: বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস সম্পর্ক বিশ্লেষণ

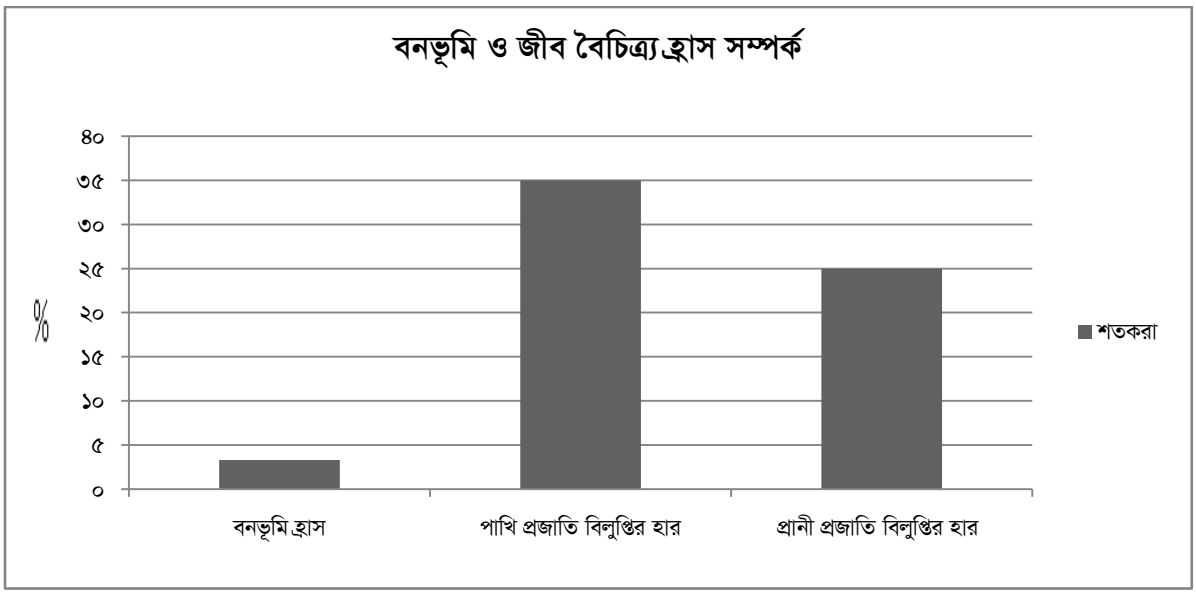

উৎস: ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন এবং মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

১৩.৫ উচ্চ ফলনশীল ফসল ও দেশীয় ফসল উৎপাদন সম্পর্ক

গবেষণা এলাকার ভূ-উপগ্রহ চিত্র থেকে পাওয়া তথ্য ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন মাধ্যমে বিশ্লেষণ গ্রাফচিত্র ১৩.৫ উপস্থাপন করে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গবেষণা এলাকাটির ভূমি ব্যবহারের বিপুল পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় গবেষণা এলাকাটির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য এলাকাটির বসতি বিন্যাসের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাছাড়া অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি তাদের খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এলাকার কৃষকদের মধ্যে উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদনের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। যে জন্য দেশীয় ফসল উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। গবেষণা সারণি ৯.৫ থেকে গবেষণা এলাকাটির ফসল উৎপাদন হার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটির উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদন ৭৫ শতাংশ ও দেশীয় ফসল উৎপাদনের হার ২০ শতাংশ হয়।

চিত্র ১৩.৫: উচ্চ ফলনশীল ফসল ও দেশীয় ফসল উৎপাদন সম্পর্ক

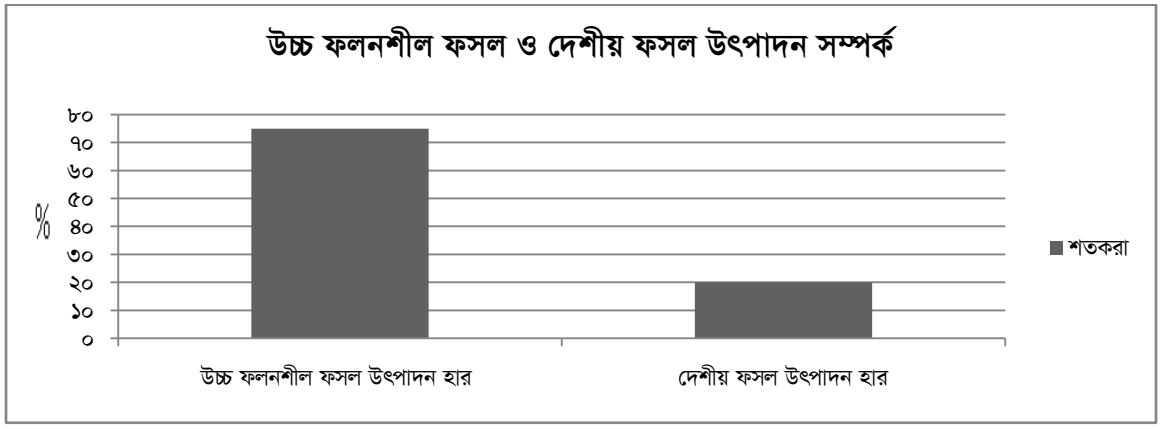

উৎস: ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন এবং মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

১৩.৬ খাদ্য শস্য ও অর্থকারী ফসল উৎপাদন সম্পর্ক

ভূ-উপগ্রহ চিত্র থেকে গবেষণা এলাকার পাওয়া তথ্য ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন মাধ্যমে বিশ্লেষণ গ্রাফচিত্র ১৩.৬ উপস্থাপন করে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গবেষণা এলাকাটির ভূমি ব্যবহারের বিপুল পরিবর্তন হয়েছে। এই পরির্তনের সঙ্গে সঙ্গে এলাকার খাদ্য শস্য ও অর্থকারী ফসল উৎপাদন হারের পরিবর্তন ঘটেছে। গবেষণা এলাকার এলাকাটি মাঠ জরিপ তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় গবেষণা এলাকাটিতে ১৯৮৪ সনে খাদ্য শস্য উৎপাদন হার ছিল ৬৭.৫৯ শতাংশ। যা ২০১৪ সালে কমে গিয়ে হয় ৪৪.৯৩ শতাংশ। সারণি ৯.৬ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৪ সালে অর্থকারি ফসল উৎপাদন হার ছিল ৯.৭৯ শতাংশ। ২০১৪ সালে অর্থকারী ফসল উৎপাদন হার বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৬.৭৫ শতাংশ।

চিত্র ১৩.৬: খাদ্য শস্য ও অর্থকারী ফসল উৎপাদন সম্পর্ক

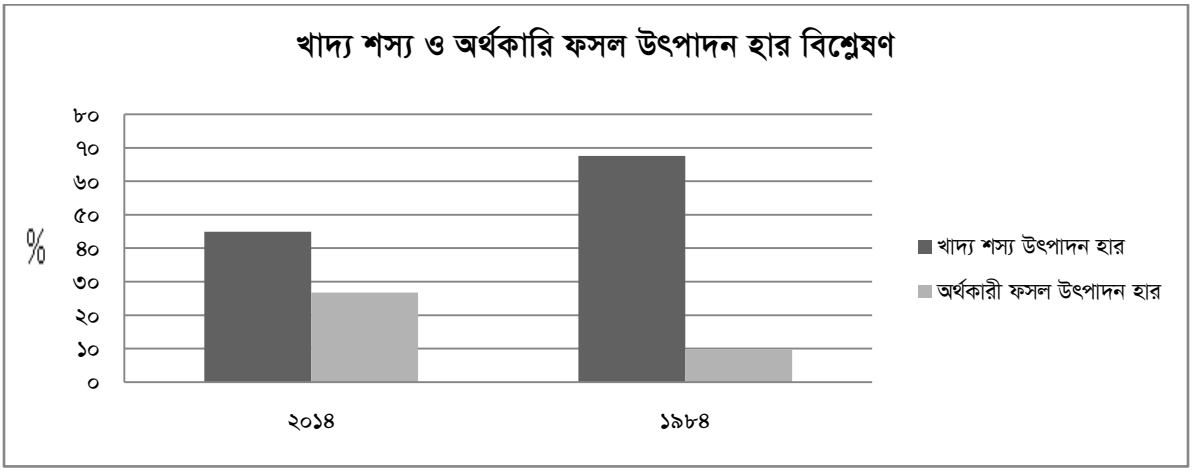

উৎস: ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন এবং মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

১৩.৭ কৃষি জমি ও ফল ও তরকারী জাতীয় ফসল সম্পর্ক বিশ্লেষণ

গবেষণা এলাকার ভূ-উপগ্রহ চিত্র থেকে পাওয়া তথ্য ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ গ্রাফচিত্র ১৩.৭ উপস্থাপন করে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গবেষণা এলাকাটির কৃষি জমি হ্রাস পেয়েছে ১৫.৫ শতাংশ। অপর দিকে বসতি তৈরির পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। বসত ভিটার চার পাশে ফলে এলাকার জনগণকে তরকারী ও ফসল উৎপাদন করতে দেখা যায়। যার ফলে গবেষণা এলাকাটিতে ফল ও তরকারী জাতীয় ফসল উৎপাদ হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সারনি ১৩.৭ থেকে দেখা যায় যে ফল জাতীয় উদ্ভিদ ৪ শতাংশ ও তরকারী জাতীয় উদ্ভিদ ৩.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ১৩.৭: কৃষি জমি ও ফল ও তরকারী জাতীয় ফসল উৎপাদন সম্পর্ক বিশ্লেষণ

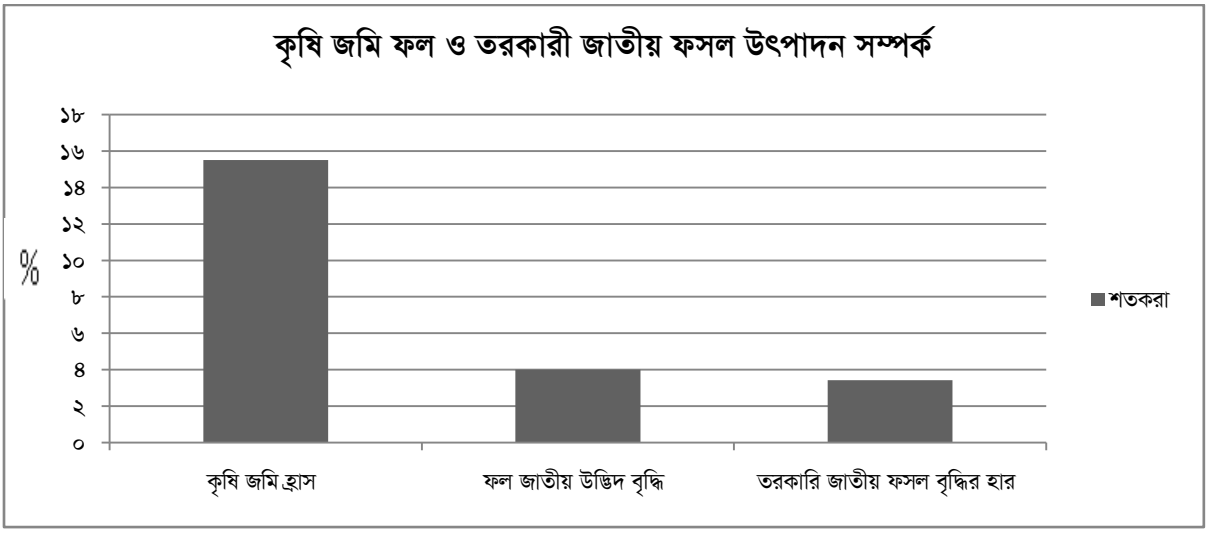

উৎস: ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন এবং মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

১৩.৮ খাদ্য শস্য ও তৈল জাতীয় ফসল হ্রাস সম্পর্ক বিশ্লেষণ

গবেষণা এলাকার ভূ-উপগ্রহ চিত্র থেকে পাওয়া তথ্য ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ গ্রাফচিত্র ১৩.৮ উপস্থাপন করে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গবেষণা এলাকাটির কৃষি জমির হ্রাস পেয়েছে ১৫.৫ শতাংশ। এছাড়া গবেষণা এলাকাটিতে নগারায়ণ ২০.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হ্রাস বৃদ্ধির প্রভাব গবেষণা এলাকাটির বিভিন্ন ফসলের উপর পড়েছে। এই পরিবর্তনের ফল সারণি ১৩.৮ থেকে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকাটির খাদ্য শস্য হ্রাস পেয়েছে ১৬.০৭ শতাংশ ও তৈলবীজ জাতীয় ফসল হ্রাস পেয়েছে ১.৩৯ শতাংশ।

চিত্র ১৩.৮: খাদ্য শস্য ও তৈল জাতীয় ফসল হ্রাস সম্পর্ক বিশ্লেষণ

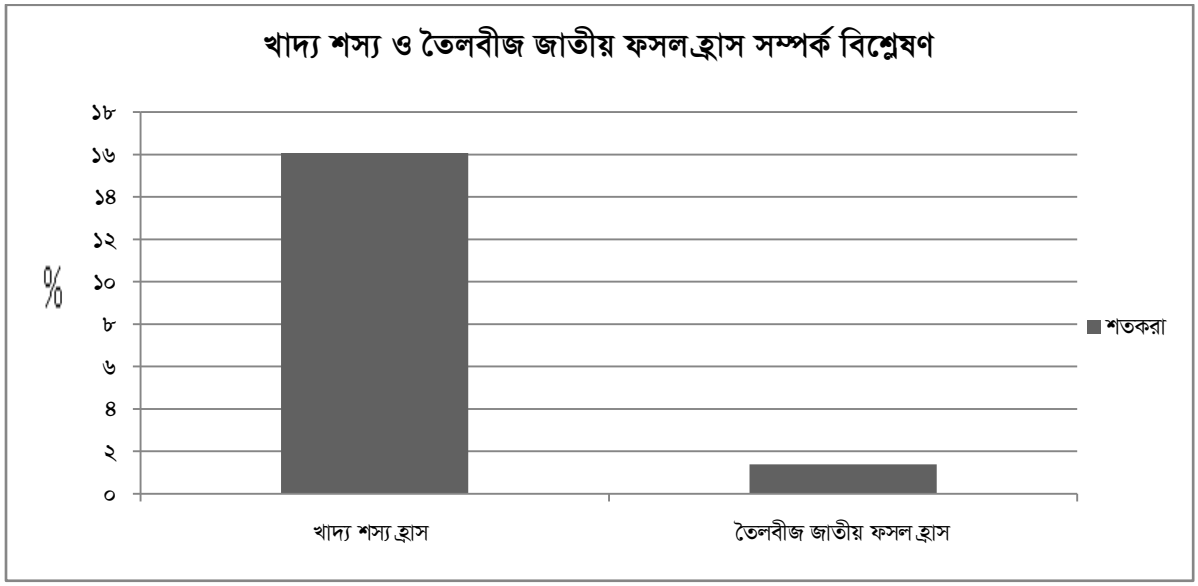

উৎস: ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন এবং মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

১৩.৯ খাদ্য শস্য ও মসলা জাতীয় ফসল হ্রাস সম্পর্ক

গবেষণা এলাকার ভূ-উপগ্রহ চিত্র থেকে পাওয়া তথ্য ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন মাধ্যমে বিশ্লেষণ গ্রাফচিত্র ১৩.৯ উপস্থাপন করে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গবেষণা এলাকাটির কৃষি জমির হ্রাস পেয়েছে ১৫.৫ শতাংশ। এছাড়া গবেষণা এলাকাটিতে নগারায়ণ ২০.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হ্রাস বৃদ্ধির প্রভাব গবেষণা এলাকাটির বিভিন্ন ফসলের উপর পড়েছে। এই পরিবর্তনের ফল সারণি ৯.৯ থেকে দেখা যায় যে গবেষণা এলাকাটির খাদ্য শস্য হ্রাস পেয়েছে ১৬.০৭ শতাংশ। ও গবেষণা এলাকার মসলা জাতীয় ফসল হ্রাস পেয়েছে ০.৪৯ শতাংশ।

চিত্র ১৩.৯: খাদ্য শস্য ও মসলা জাতীয় ফসল হ্রাস সম্পর্ক

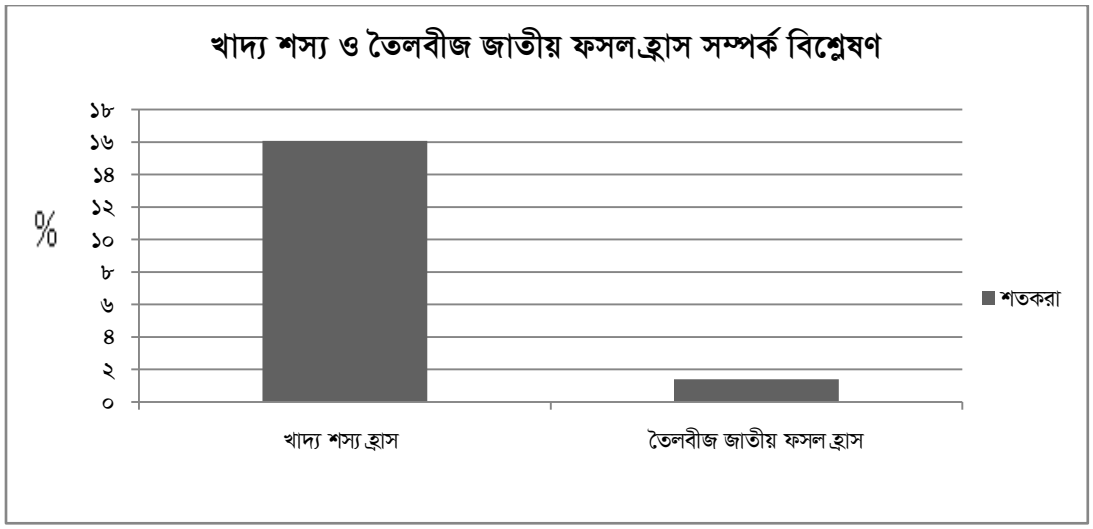

উৎস: ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন এবং মাঠ জরিপ ২০১৪-১৫

অধ্যায় চতুর্দশ
ভূ-দৃশ্য ও জলবায়ূ পরিবর্তন সম্পর্ক

ভূমিকা

গবেষণায় দেখা যায় যায় যে, ভূ-দৃশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে জলবায়ূ পরিবর্তনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ভূ-দৃশ্য বিশেষ করে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের গ্রামীণ বন ভূমি ও নগরায়ণের বৃদ্ধি গবেষণা এলাকার তাপমাত্রা পরিবর্তনের উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাছাড়া এলাকাটির জলাশয়ের পরিবর্তন ও এলাকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি বৃষ্টিপাতকে প্রভাবিত করেছে। জলবায়ুর যে কোনো একটি নিয়ামক পরিবর্তন হলে তা অন্য সকল নিয়ামককে প্রভাবিত করে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১ থেকে ২ ডিগ্রী বৃদ্ধি পেলে এলাকাটির জীববৈচিত্র্যের বিপুল পরিবর্তন ঘটবে। নিম্নে ভূ-দৃশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে জলবায়ুর সম্পর্ক বিস্তারিত আলোচনা করা হলে-

১৪.১ নগরায়ণ বৃদ্ধি ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সম্পর্ক

গ্রাফচিত্র ১৪.১ বিশ্লেষণ করে গবেষণা এলাকাটির ভূ-দৃশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে জলবায়ুর পরিবর্তনের সম্পর্ক পাওয়া যায়। সারণি ১৪.১ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এলাকাটির নগরায়ণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ১৪.১ থেকে দেখা যায় যে ১৯৮৯ সালে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ছিল ৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯৮৯ সালের পর থেকে প্রতি বছরই নগরায়ণের উর্দ্ধমুখি গতির সঙ্গে মিল রেখে তাপমাত্রা উর্দ্ধমুখি ছিল। কিন্তু ২০১৪ সালে এসে দেখা যায় যে, তাপমাত্রা কমে গিয়েছে। এর মূল কারণ দেখা যায় এই সময়ে গ্রামীণ বনভূমির মান অপরিবর্তনিয় ছিল। এলাকাটির নগরায়ণ বৃদ্ধি ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সংশ্লেষ মান (correlation analysis) মান পাওয়া যায় r= ০.৯৩১৭। এ থেকে বুঝা যায় যে, গবেষণা এলাকাটিতে নগরায়ণ বৃদ্ধির ফলে তাপমাত্রার বৃদ্ধি পেয়েছে। নগরায়ণের সঙ্গে তাপমাত্রার একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

চিত্র ১৪.১: নগরায়ণ বৃদ্ধি ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সম্পর্ক বিশ্লেষণ

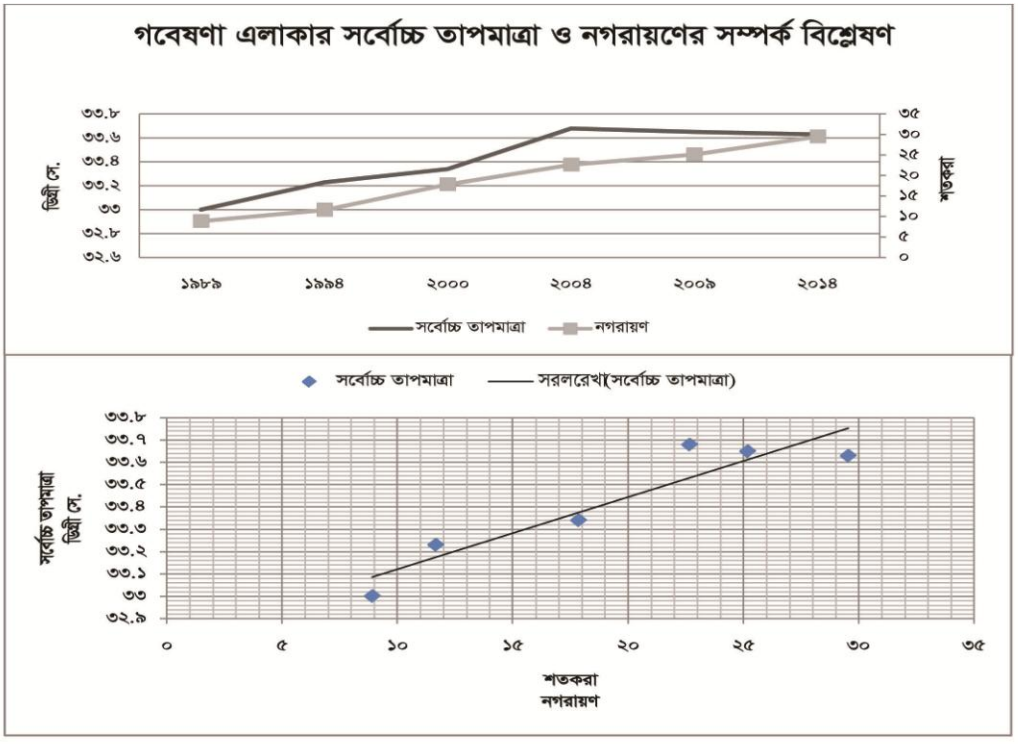

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

১৪.২ নগরায়ণ বৃদ্ধি ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সম্পর্ক

সারণি ১৪.২ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নগরায়ণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধমূখি সরলরেখা গতি প্রদর্শণ করছে । এই গ্রাফচিত্র এটাই প্রমান করে যে নগরায়ণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই চিত্রে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় ছিল ১৬.৪১ যা ২০০৯ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬.৯০ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত। ১৯৮৯ সালে নগরায়ণ ছিল ৮.৯১ শতাংশ এলাকা জুড়ে। ২০১৪ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ২৯.৫৪ শতাংশে। এই তথ্য থেকে বলা যায় যে, এলাকাটির নগরায়ণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকাটির নগরায়ণ বৃদ্ধি ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সংশ্লেষ মান (correlation analysis) পাওয়া যায় r = ০.৮৭৮। এ থেকে জানা যায় যে নগরায়ণের সঙ্গে তাপমাত্রার খুব কঠিন ও ভাল সম্পর্ক রয়েছে। নগরায়ণ বৃদ্ধি পেলে তাপমাত্রার পরিমাণ ও বৃদ্ধি পায়।

চিত্র ১৪.২: নগরায়ণ বৃদ্ধি ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সম্পর্ক

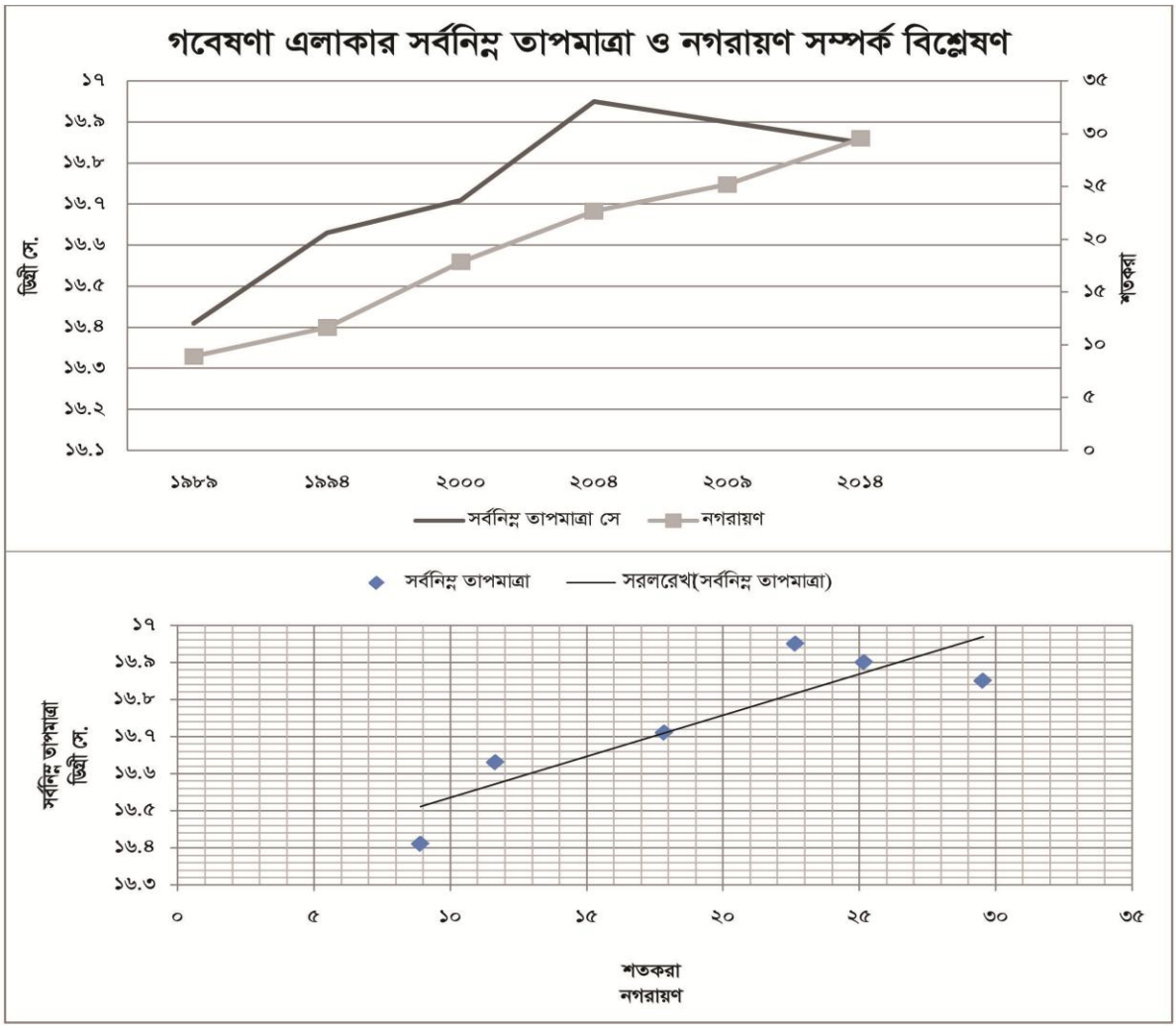

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

১৪.৩ নগরায়ণ বৃদ্ধির ও আর্দ্রতার সম্পর্ক

গ্রাফচিত্র ১৪.৩ বিশ্লেষণ করে গবেষণা এলাকাটির ভূ-দৃশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে জলবায়ুর পরিবর্তনের সম্পর্ক পাওয়া যায়। সারণি ১৪.৩ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটির নগরায়ণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ১৪.৩ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সালে সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ছিল ৭৬.৩৩ শতাংশ। ১৯৮৯ সালের পর থেকে প্রতি বছরই নগরায়ণের উর্দ্ধমুখি গতির সঙ্গে মিল রেখে আর্দ্রতার গতি কখনো উর্দ্ধমুখি কখনো নিম্নমূখি ছিল। কিন্তু ২০১৪ সালে এসে দেখা যায় যে, বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মূল কারণ দেখা যায় এই সময়ে গ্রামীণ বনভূমির মান অপরিবর্তনিয় ছিল। নগরায়ণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্রতার একটি সুনিভির সম্পর্ক রয়েছে। নগরায়ণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে সারণি ১৪.৩ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকাটিতে নগরায়ণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকাটির আর্দ্রতা কমছে। নগরায়ণের সঙ্গে আর্দ্রতার সংশ্লেষন মান পাওয়া যায় r= ০.৬২৮। নগরায়ণের সঙ্গে আর্দ্রতার একটি ধনাক্ত সম্পর্ক রয়েছে।

চিত্র ১৪.৩: নগরায়ণ বৃদ্ধির ও আর্দ্রতার সম্পর্ক

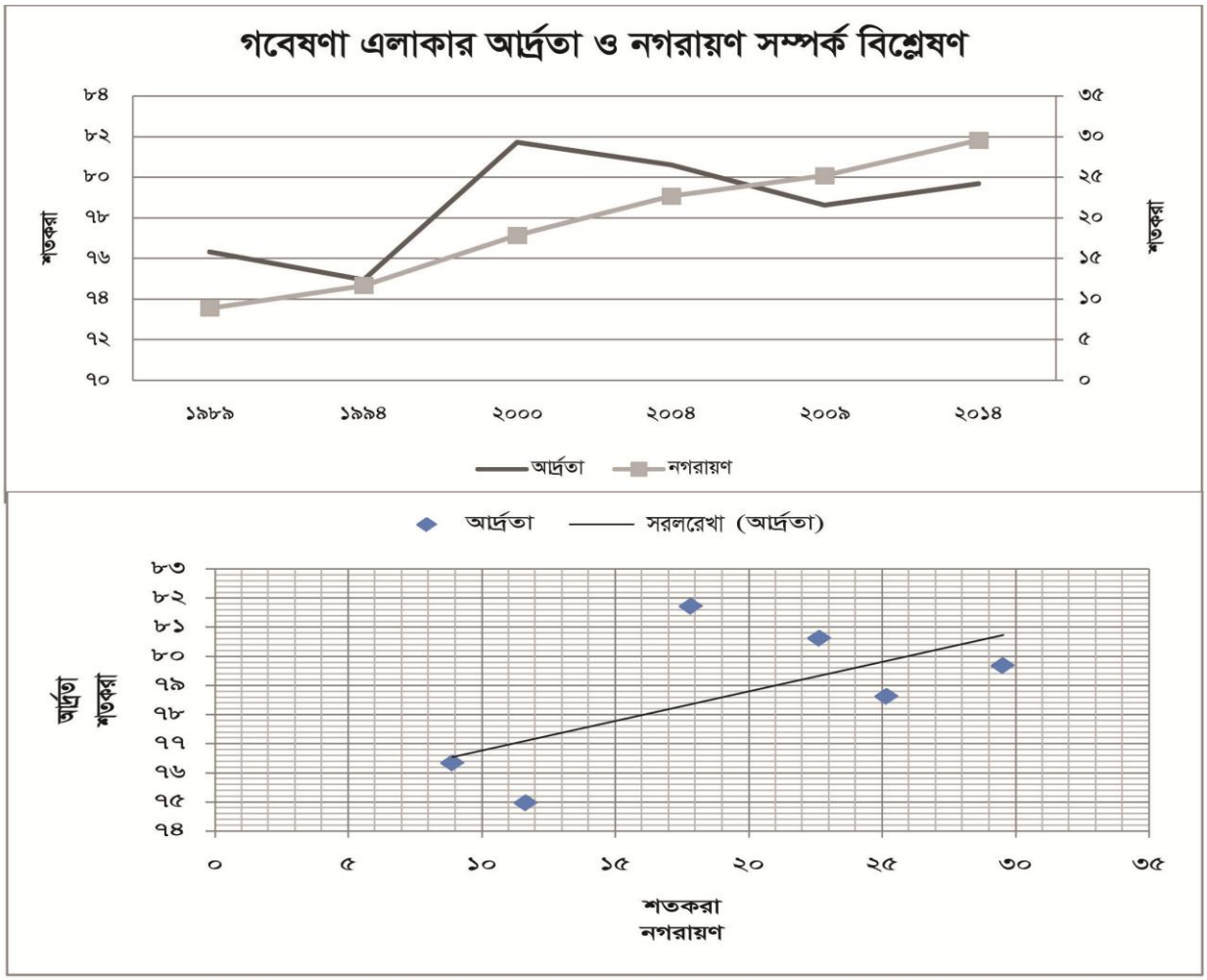

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

১৪.৪ নগরায়ণ ও বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ

নগরায়ণের ফলে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে বায়ু প্রবাহের। খোলা প্রান্তরে বায়ু প্রবাহের গতি বেশি থাকে। নগর তৈরি অর্থাৎ খোলা প্রান্তরে বড় বিল্ডিং ও কলকারখানা তৈরি করা হলে খোলা প্রান্তরে বায়ুর প্রবাহের গতি রোধ করে। সারণি ১৪.৪ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটির নগরায়ণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ু প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে। সারণি ১৪.৪ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সালে সর্বোচ্চ গড় বায়ু প্রবাহ ছিল ৫.৪১ কান্ট । ১৯৮৯ সালের পর থেকে প্রতি বছরই নগরায়ণের উর্দ্ধমুখি গতির সঙ্গে মিল রেখে বায়ু প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ২০১৪ সালে এসে দেখা যায় যে, বায়ু প্রবাহের মান ২.৯ কান্ট হয়েছে। সারণি ১৪.৪ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, নগরায়ণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ু প্রবাহের মাত্রা কমতে শুরু করেছে। নগরায়ণের সঙ্গে বায়ু প্রবাহের ঋনাত্তমানের সম্পর্ক পাওয়া যায়। নগরায়ণের সঙ্গে বায়ু প্রবাহের সংশ্লেষণ মান পাওয়া যায় r= -০.৬৬৮।

চিত্র ১৪.৪: নগরায়ণ ও বায়ূ প্রবাহ বিশ্লেষণ

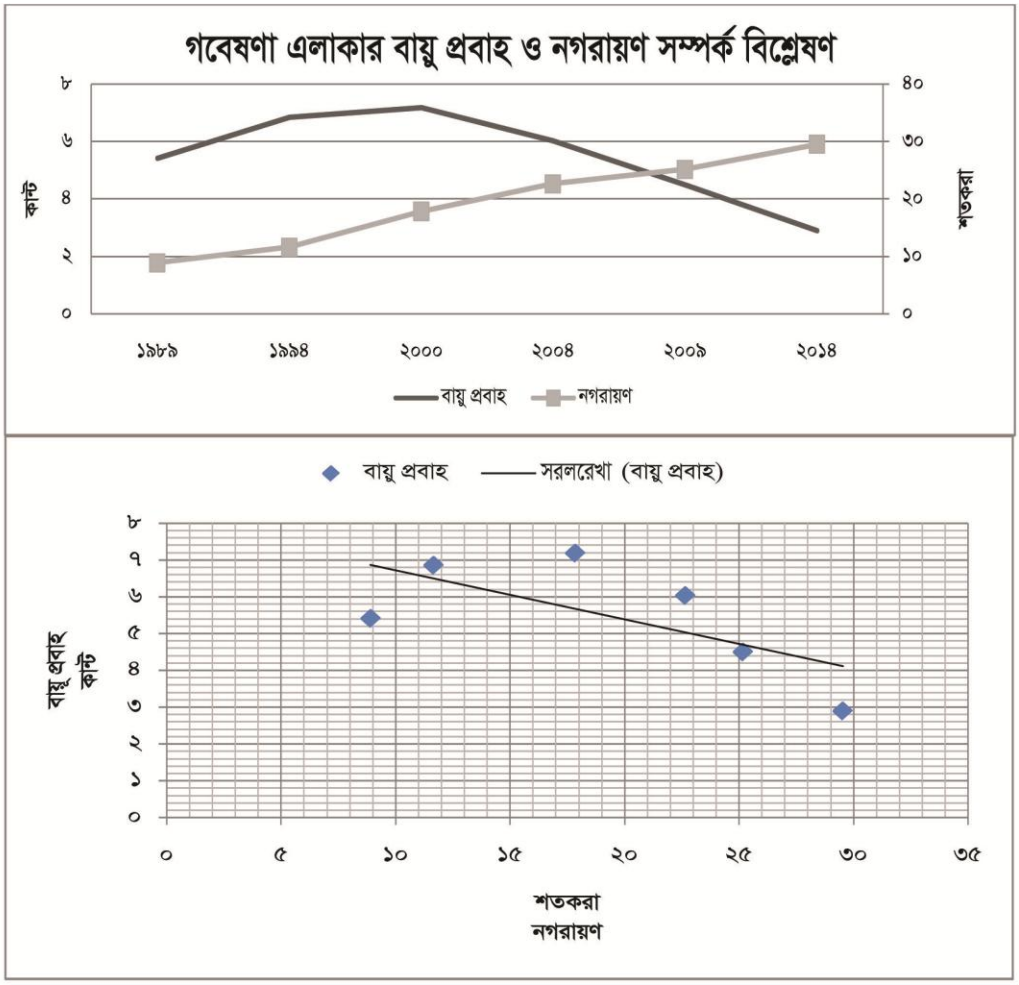

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

১৪.৫ নগরায়ণ ও বাষ্পীভবন সম্পর্ক বিশ্লেষণ

নগরায়ণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এলাকাটির বাষ্পীভবন কমতে শুরু করেছে। নগর বৃদ্ধির ফলে এলাকাটির বনভূমি ও কৃষিভূমি ও জলাশয়ের পরিমাণ কমে গিয়েছে। যে জন্য এলাকাটির বাষ্পীভবনের মাত্রা কমে গিয়েছে। সারণি ১৪.৫ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটির নগরায়ণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভবন হার হ্রাস পেয়েছে। সারণি ১৪.৫ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সালে সর্বোচ্চ গড় বাষ্পীভবণ ছিল ৫৫.৭১ মিলি। ১৯৮৯ সালের পর থেকে প্রতি বছরই নগরায়ণের উর্দ্ধমুখি গতির সঙ্গে মিল রেখে বাষ্পীভবনের মান হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ২০১৪ সালে এসে দেখা যায় যে, বাষ্পীভবনের মান কমে গিয়েছে। সারণি ১৪.৫ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটির নগরায়ণ বৃদ্ধির ফলে বাষ্পীভবন কমতে শুরু করেছে। নগরায়ণ বৃদ্ধির সঙ্গে বাষ্পভবনের ঋনাত্তক সম্পর্ক রয়েছে। এর সংশ্লেষা মান r = -০.৭৫৩।

চিত্র ১৪.৫: নগরায়ণ ও বাষ্পীভবন সম্পর্ক বিশ্লেষণ

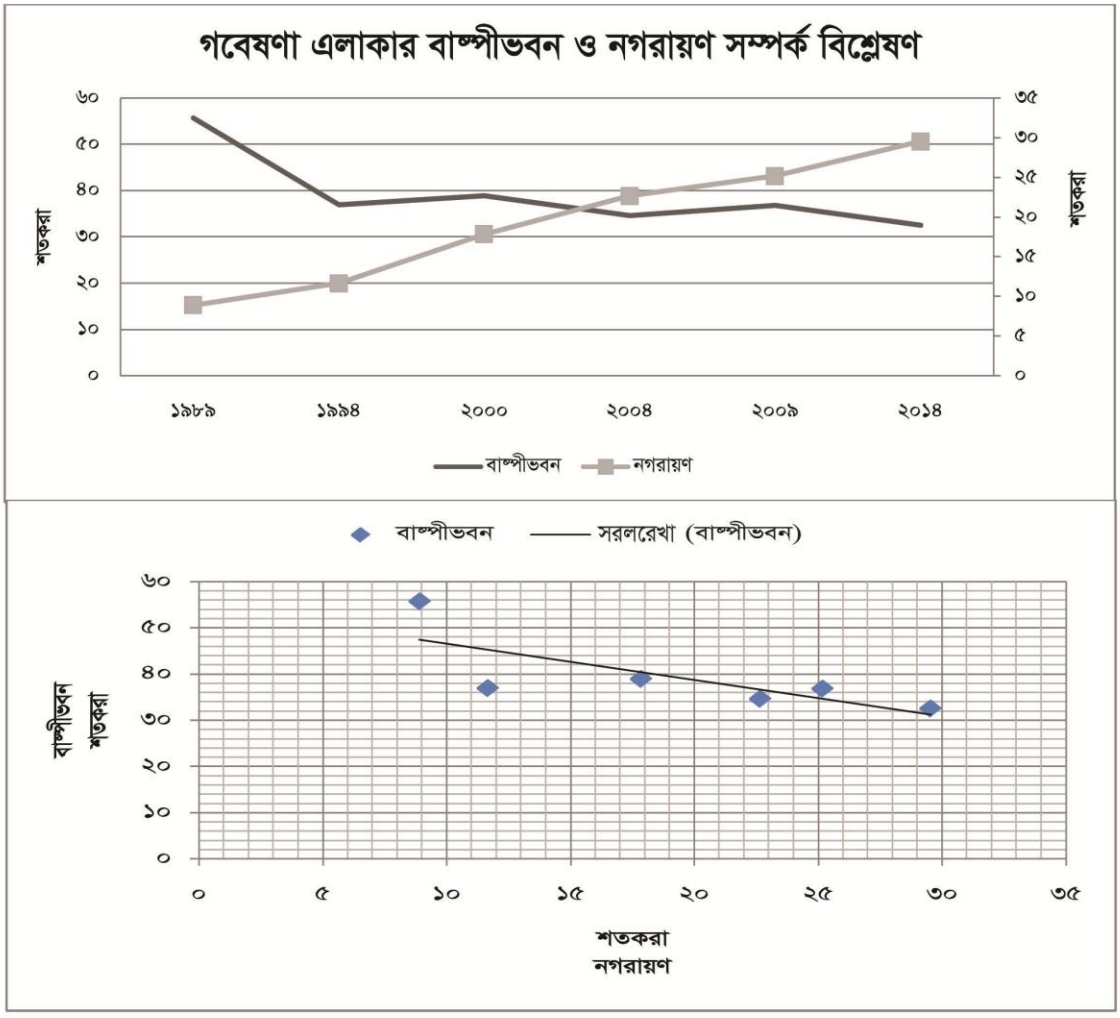

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

১৪.৬ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কৃষি জমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ

কৃষি কাজের সঙ্গে তাপমাত্রার একটি গভীর অন্ত:নিহিত সম্পর্ক রয়েছে। এখানে খুব সহজে বলা যায় যে, কৃষি জমি হ্রাসের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার এটাও বলা যায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে অনেক কৃষি ফসল বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তাপমাত্রার সঙ্গে কৃষি ফসলের সম্পর্ক বিদ্যমান। গ্রাফচিত্র ১৪.৬ বিশ্লেষণ করে গবেষণা এলাকাটির ভূ-দৃশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে জলবায়ুর পরিবর্তনের সম্পর্ক পাওয়া যায়। সারণি ১৪.৬ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটির কৃষিজমি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ১৪.৬ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সালে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ছিল ৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯৮৯ সালের পর থেকে প্রতি বছরই কৃষিজমির হ্রাস গতির সঙ্গে মিল রেখে তাপমাত্রা উর্দ্ধমুখি ছিল। কিন্তু ২০১৪ সালে এসে দেখা যায় যে, তাপমাত্রা কমে গিয়েছে। এর মূল কারণ দেখা যায় এই সময়ে গ্রামীণ বনভূমির মান অপরিবর্তনিয় ছিল। সারণি ১৪.৬ থেকে দেখা যায় যে এলাকাটির তাপমাত্রা উর্দ্ধমূখি গতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি জমি নিম্নমূখি গতি প্রদর্শণ করছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সঙ্গে কৃষি জমির সংশ্লেষ মান r= -০.৮৫৫।

চিত্র ১৪.৬: সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কৃষি জমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ

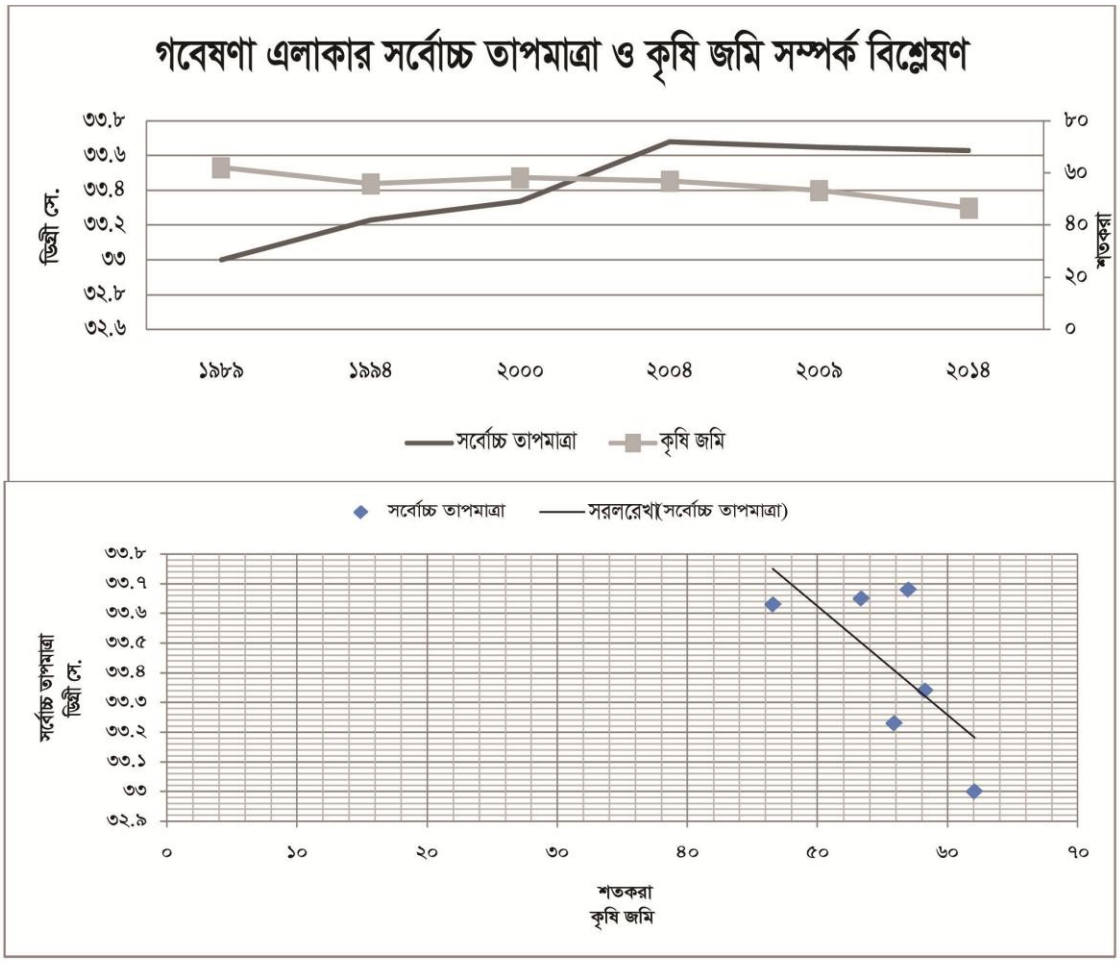

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

১৪.৭ কৃষি জমি ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সম্পর্ক বিশ্লেষণ

গ্রাফচিত্র ১৪.৭ বিশ্লেষণ করে গবেষণা এলাকাটির ভূ-দৃশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে জলবায়ুর পরিবর্তনের সম্পর্ক পাওয়া যায়। সারণি ১৪.৭ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটির কৃষিজমি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ১৪.৭ থেকে দেখা যায় যে ১৯৮৯ সালে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ছিল ১৬.৪১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯৮৯ সালের পর থেকে প্রতি বছরই কৃষি জমির হ্রাস গতির সঙ্গে মিল রেখে তাপমাত্রা উর্দ্ধমুখি ছিল। কিন্তু ২০১৪ সালে এসে দেখা যায় যে, তাপমাত্রা কমে গিয়েছে। এর মূল কারণ দেখা যায় এই সময়ে গ্রামীণ বনভূমির মান অপরিবর্তনিয় ছিল। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ও কৃষি জমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এলাকাটির তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পেতে শুরু করেছে। তাপমাত্রার উর্দ্ধমুখি গতির সঙ্গে কৃষি জমি নিম্নমুখি গতি প্রদর্শণ করছে। কৃষি জমির সাথে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ঋনাত্তক সম্পর্ক পাওয়া যায়। এর সংশ্লেষ মান r= -০.৭৬১।

চিত্র ১৪.৭: কৃষি জমি ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সম্পর্ক বিশ্লেষণ

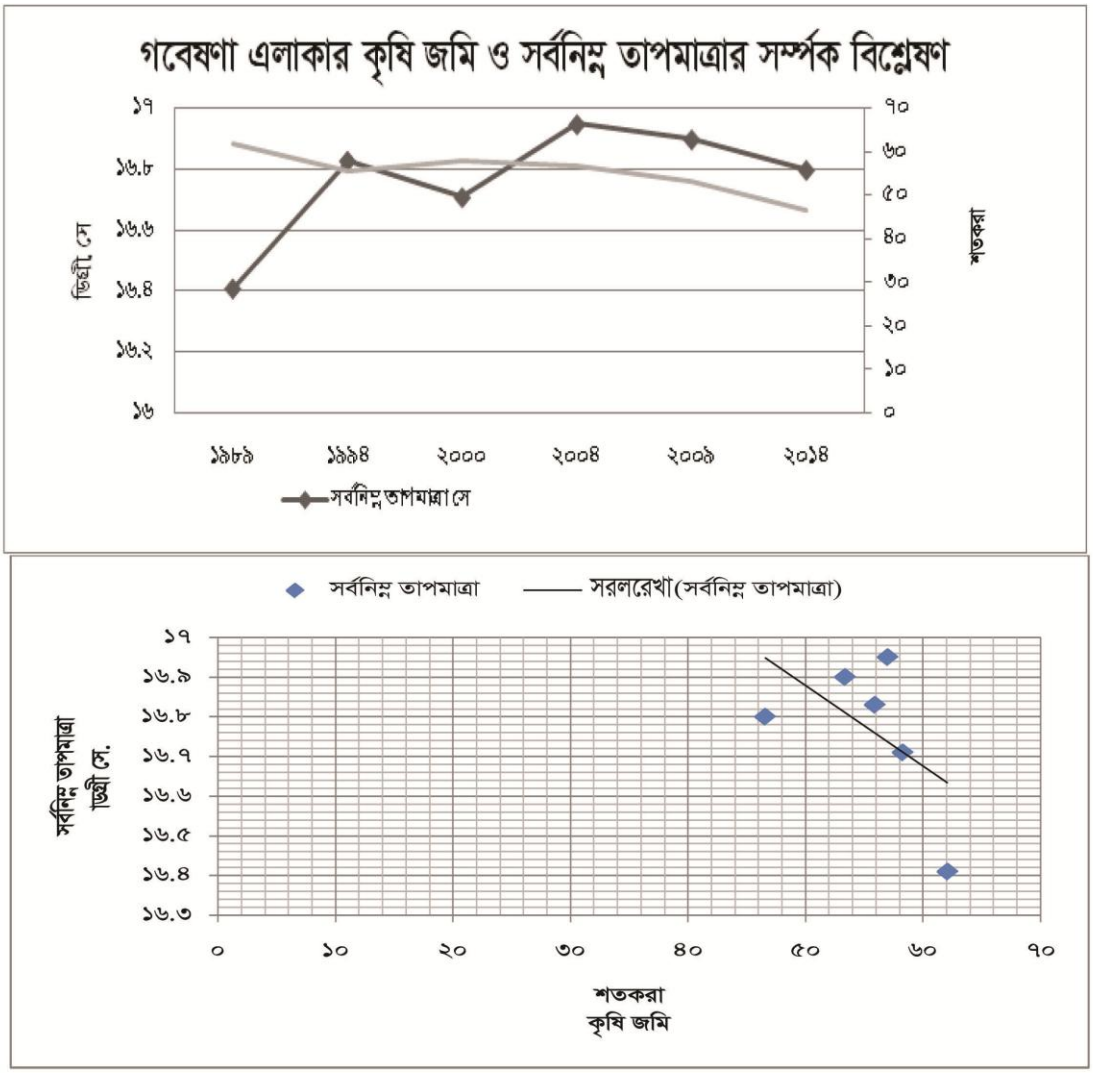

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

১৪.৮ বৃষ্টিপাত ও কৃষিজমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ

সারণি ১৪.৮ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটিতে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস পেতে শুরু করেছে। কৃষি ফসলের পরিমাণ সঠিক সময়ে সঠিক বৃষ্টিপাতের উপর অনেকটা নির্ভরশিল। এছাড়া শিলা বৃষ্টি ও ঝড় বৃষ্টির কারণে ফসল নষ্ট হয়। এলাকাটিতে কখনও অধিক বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে আবার কখন কম বৃষ্টিপাত হতে দেখা যায়। সারণি ১৪.৮ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটির বৃষ্টিপাত ও কৃষিজমি দুটিই হ্রাস পেয়েছে। সারণি ১৪.৮ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সালে সর্বোচ্চ গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ১৫৫.০২ মি মি। ১৯৮৯ সালের পর থেকে প্রতি বছরই কৃষিজমি হ্রাসের গতির সঙ্গে মিল রেখে বৃষ্টিপাত হ্রাস পেয়েছে। গ্রাফচিত্র ১৪.৮ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকাটি কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। বৃষ্টিপাতের সঙ্গে কৃষিজমির সংশ্লেষন মান পাওয়া যায় r= ০.৪৭৮। এ থেকে বুঝা যায় যে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে কৃষি জমির মোটামোটি সম্পর্ক রয়েছে। সঠিক সময়ে বৃষ্টিপাত না হলে ভাল কৃষি ফসল উৎপাদন করা যায় না। যদিও এখন নলকূপের সাহায্যে জমিতে সেচের পানি দেওয়ার মাধ্যমে এই সমস্যা অনেকখানি কমিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে।

চিত্র ১৪.৮: বৃষ্টিপাত ও কৃষিজমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ

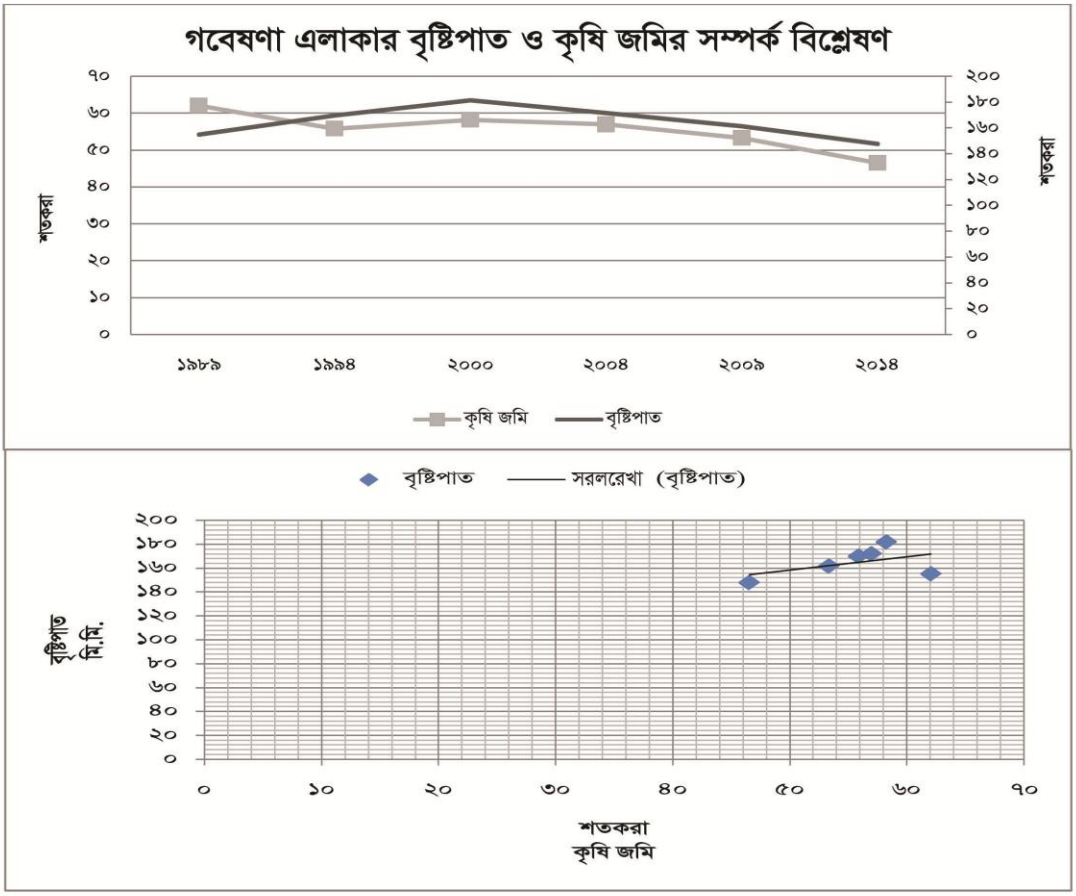

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

১৪.৯ বাষ্পীভবন ও কৃষিকাজের সম্পর্ক:

বাষ্পীভবন ও কৃষিকাজের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রয়েছে। কৃষি কাজ বেশি হলে বাষ্পীয়ভবন বেশি হয়। আর কৃষিকাজ কম হলে বাষ্পীভবন কম হয়। সারণি ১৪.৯ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটির কৃষিজমি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভবণ হ্রাস পেয়েছে। সারণি ১৪.৯ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সালে সর্বোচ্চ গড় বাষ্পীভবন ছিল ৫৫.৭১ মিলি। ১৯৮৯ সালের পর থেকে প্রতি বছরই কৃষিজমি হ্রাস গতির সঙ্গে মিল রেখে বাষ্পীভবন হ্রাস হয়েছে। কিন্তু ২০১৪ সালে এসে দেখা যায় যে, বাষ্পীভবন কমে গিয়েছে। বাষ্পীভবন ও কৃষিকাজের সঙ্গে সংশ্লেষন মান $r = ০.৭৫১$। সারণি ১০.৯ থেকে জানা যায় যে, গবেষণা এলাকাটিতে ১৯৮৯ সালে কৃষিকাজ হত প্রায় ৬২ শতাংশ জমিতে এই সময়ে বাষ্পীভবন হত ৫৫.৭১ শতাংশ জমিতে। এখানে দেখা যে, ২০১৪ সালে কৃষিকাজ হয় মাত্র ৪৬.৫৭ শতাংশ এবং এই সময়ে বাষ্পীভবন হয় মাত্র ৩২.৫৮ শতাংশ।

চিত্র ১৪.৯: বাষ্পীভবন ও কৃষিকাজের সম্পর্ক:

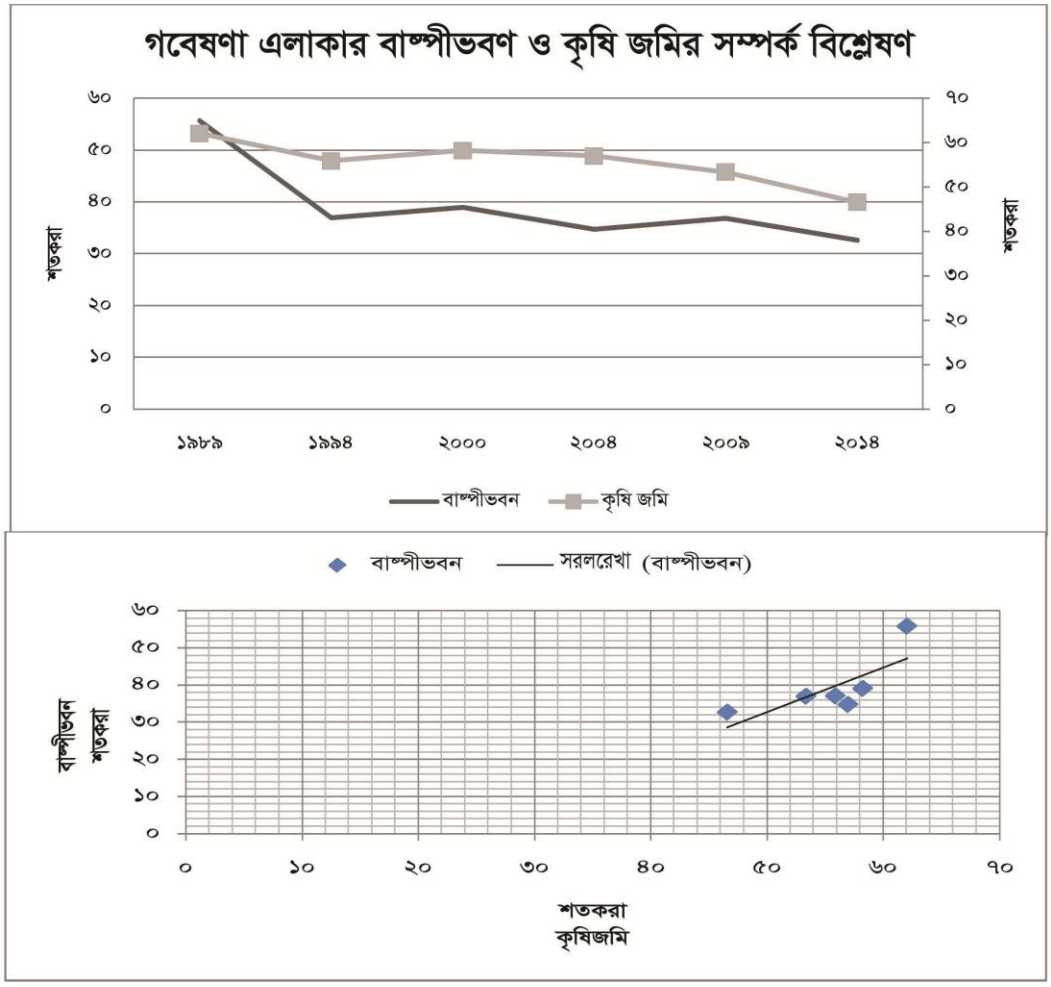

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

১৪.১০ আর্দ্রতা ও কৃষিকাজের সম্পর্ক:

সারণি ১৪.১০ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটির কৃষিজমি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ১৪.১০ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সালে সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা ছিল ৭৬.৩৩ শতাংশ। ১৯৮৯ সালের পর থেকে প্রতি বছরই কৃষিজমি হ্রাসের গতির সঙ্গে মিল রেখে আর্দ্রতা কখনো বৃদ্ধি পেয়েছে কখনো কমে গিয়েছে। আর্দ্রতা ও কৃষিকাজের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রয়েছে। আর্দ্রতা পরিবর্তন হলে কৃষিকাজে ফসল উৎপাদনে ব্যঘাত সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর্দ্রতা ও কৃষিকাজের সংশ্লেষন মান r= ০.৫৬৭। সারণি ১৪.৯ থেকে জানা যায় যে, গবেষণা এলাকাটিতে ১৯৫০ সালে কৃষিকাজ হত প্রায় ৭০.০৪ শতাংশ জমিতে এই সময়ে আর্দ্রতা ছিল ৮৮.৭৫ শতাংশ। ২০১৪ সালে কৃষিকাজ হয় মাত্র ৪৬.৫৭ শতাংশ এবং এই সময়ে আর্দ্রতা পরিমাণ ছিল মাত্র ৭৯.৬৭ শতাংশ।

চিত্র ১৪.১০: আর্দ্রতা ও কৃষিকাজের সম্পর্ক বিশ্লেষণ

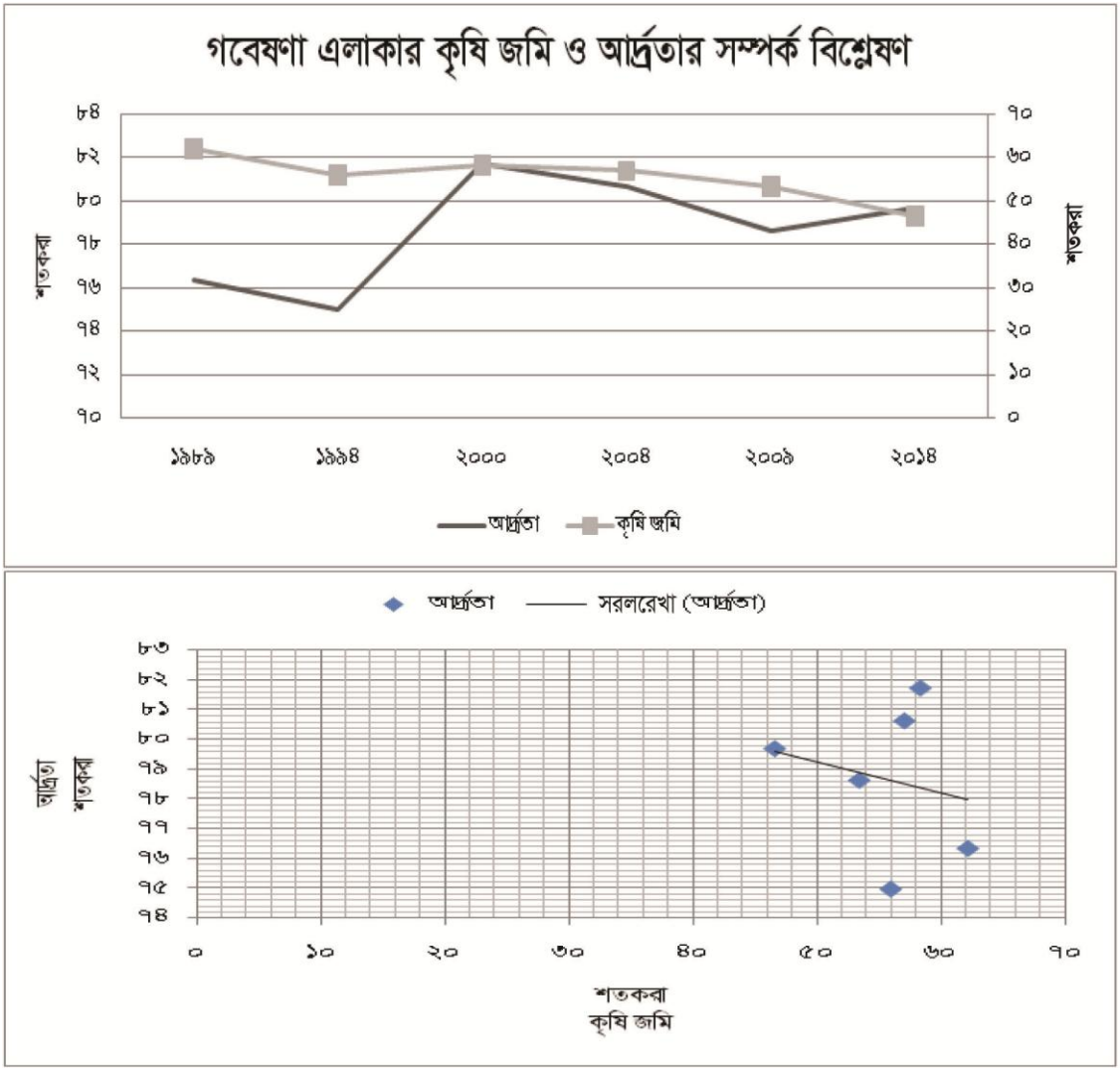

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

১৪.১১ জলাশয় ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সম্পর্ক বিশ্লেষণ

গবেষণা এলাকাটির জলাশয় কমে যাওয়ার কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা আছে যে, কোনো স্থানের জলাশয়ের পরিমাণ বেশি থাকলে সে স্থানের তাপমাত্রার পরিমাণ হ্রাস হয়। আবার জলাশয় থেকে দূরবর্তী স্থানের তাপমাত্রা বেশি হয়ে থাকে। মরুভূমি অঞ্চলের তাপমাত্রা বেশি আর সমুদ্রের কাছাকাছি স্থানে তাপমাত্রা কম। সারণি ১৪.১১ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটির জলাশয় হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ১৪.১১ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সালে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ছিল ৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯৮৯ সালের পর থেকে প্রতি বছরই জলাশয় হ্রাসের গতির সঙ্গে মিল রেখে তাপমাত্রা উর্দ্ধমুখি ছিল। কিন্তু ২০১৪ সালে এসে দেখা যায় যে, তাপমাত্রা কমে গিয়েছে। এর মূল কারণ দেখা যায় এই সময়ে গ্রামীণ বনভূমির মান অপরিবর্তনিয় ছিল। এলাকাটিতে জলাশয়ের পরিমাণ কমে যাওয়াতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ১৪.১১ থেকে দেখা যায় যে গবেষণা এলাকাটির জলাশয় হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা উর্দ্ধমুখী গতি প্রদর্শন করছে। জলাশয় ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সংশ্লেষ মান r= -০.৭১৭।

চিত্র ১৪.১১: জলাশয় ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সম্পর্ক বিশ্লেষণ

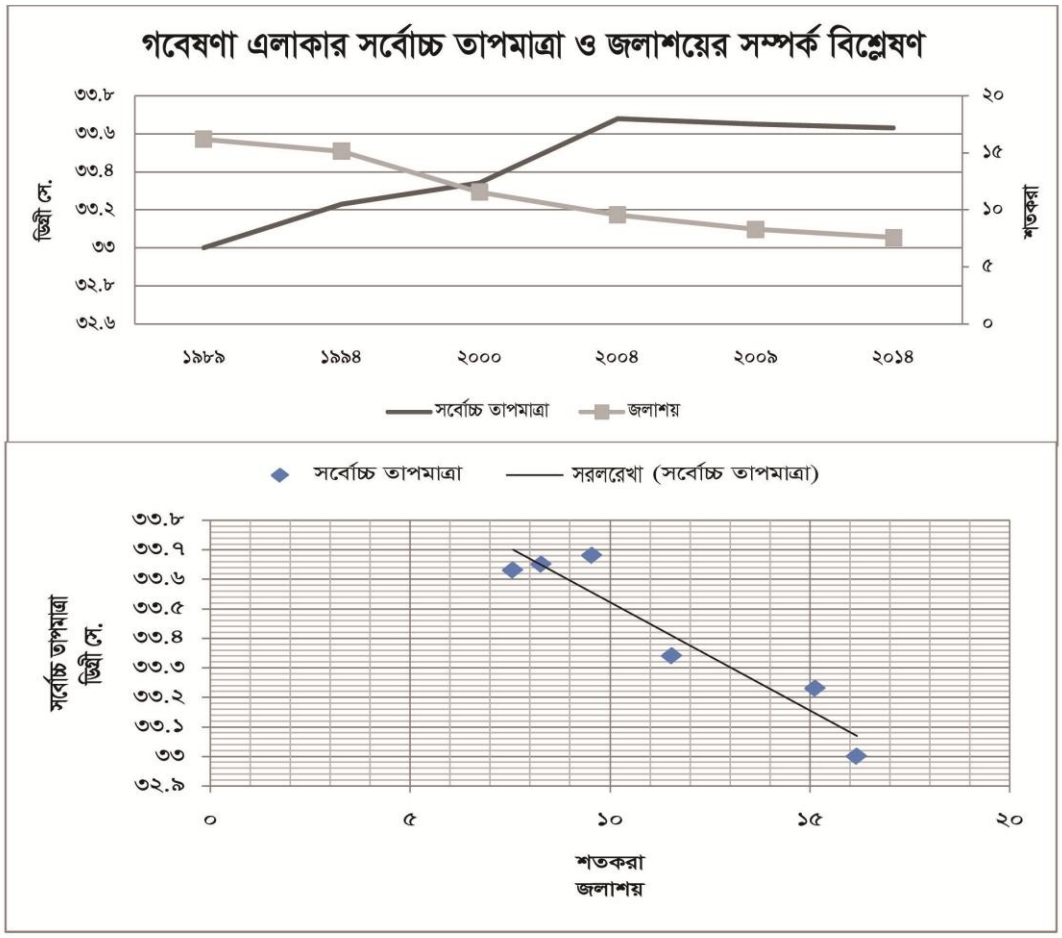

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

১৪.১২ জলাশয় ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সম্পর্ক বিশ্লেষণ

গবেষণা এলাকাটির জলাশয় কমে যাওয়ার কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা আছে যে, কোনো স্থানের জলাশয়ের পরিমাণ বেশি থাকলে সে স্থানের তাপমাত্রার পরিমাণ হ্রাস হয়। আবার জলাশয় থেকে দূরবর্তী স্থানের তাপমাত্রা বেশি হয়ে থাকে। মরুভূমি অঞ্চলের তাপমাত্রা বেশি আর সমুদ্রের কাছাকাছি স্থানে তাপমাত্রা কম। সারণি ১৪.১২ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটির জলাশয় হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ১৪.১২ থেকে দেখা যায় যে ১৯৮৯ সালে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ছিল ১৬.১৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯৮৯ সালের পর থেকে প্রতি বছরই জলাশয় হ্রাসের গতির সঙ্গে মিল রেখে তাপমাত্রা উর্দ্ধমুখি ছিল। কিন্তু ২০১৪ সালে এসে দেখা যায় যে, তাপমাত্রা কমে গিয়েছে। এর মূল কারণ দেখা যায় এই সময়ে গ্রামীণ বনভূমির মান অপরিবর্তনিয় ছিল। এলাকাটিতে জলাশয়ের পরিমাণ কমে যাওয়াতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ১৪.১১ থেকে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকাটির জলাশয় হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা উর্দ্ধমুখী গতি প্রদর্শন করছে। জলাশয় ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সংশ্লেষণ মান r = -০.৭৯৬।

চিত্র ১৪.১২: জলাশয় ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সম্পর্ক বিশ্লেষণ

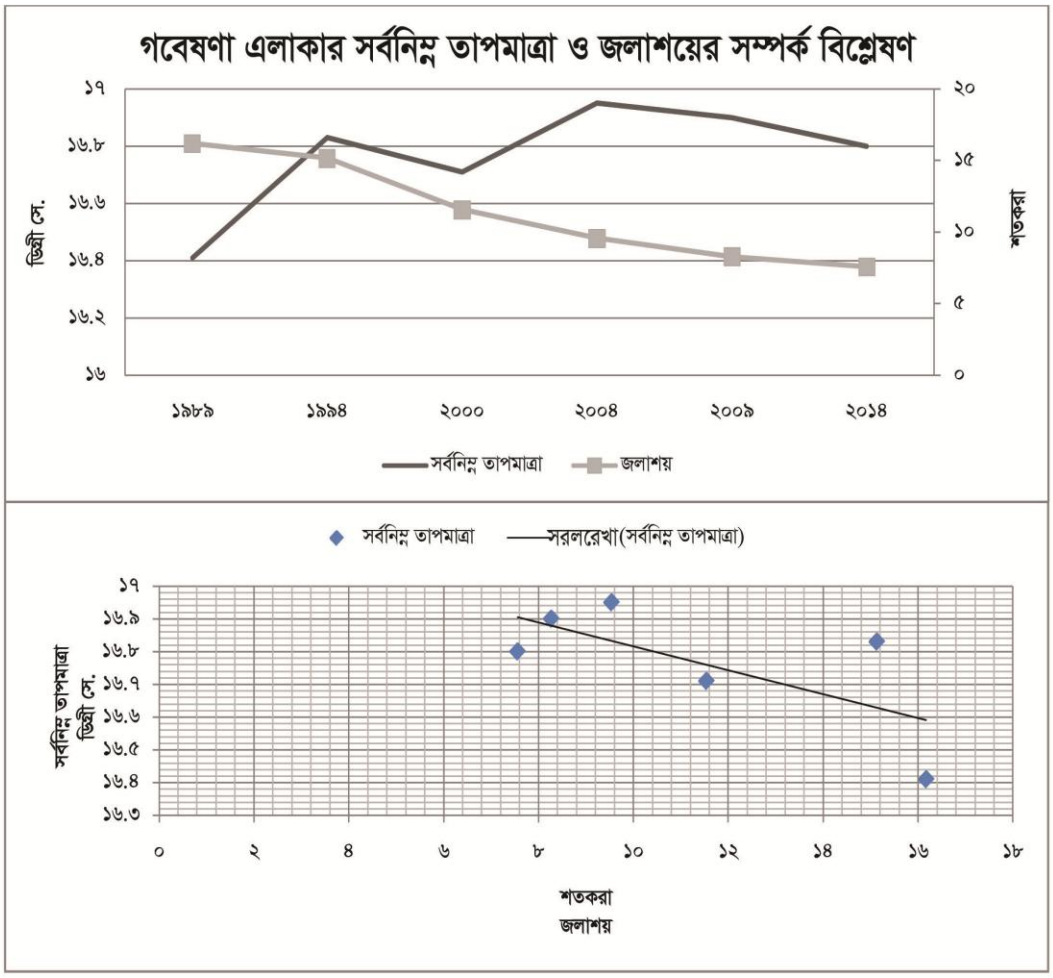

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

১৪.১৩ বৃষ্টিপাত ও জলাশয় এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ

গবেষণা এলাকাটিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলেও জলবায়ুর উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটিতে বৃষ্টিপাত ও জলাশয়ের সম্পর্ক উর্দ্ধ গতি প্রদর্শন করেছে। কারণ গবেষণা এলাকাটির ভূ-উপগ্রহ মানচিত্র থেকে পাওয়া ভূ-দৃশ্য ভূমি ব্যবহার থেকে দেখা যায় জলাশয়

কমে গিয়েছে। বৃষ্টিপাত, বাষ্পভবন ও আর্দ্রতা ও বায়ূ প্রবাহ এই সব কিছু পরোক্ষ ভাবে জলাশয়ের উপর নির্ভর করে। সারণি ১৪.১৩ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এলাকাটির জলাশয় হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত হ্রাস পেয়েছে। সারণি ১৪.১৩ থেকে দেখা যায় যে ১৯৮৯ সালে সর্বোচ্চ গড় বৃষ্টিপাত ছিল ১৫৫ মি.মি.। ১৯৮৯ সালের পর থেকে প্রতি বছরই জলাশয় হ্রাসের গতির সঙ্গে মিল রেখে বৃষ্টিপাত হ্রাস পেয়েছে। যেহেতু এলাকাটির জলাভূমির পরিমাণ কমতে শুরু করেছে সেহেতু সারণি চিত্র ১৪.১৩ তে দেখা যায় যে, জলাশয় কমার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত কমে গিয়েছে। বৃষ্টিপাত জলাশয়ের সংশ্লেষ মান r= -০.৫৬৯।

চিত্র ১৪.১৩: বৃষ্টিপাতও জলাশয় এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ

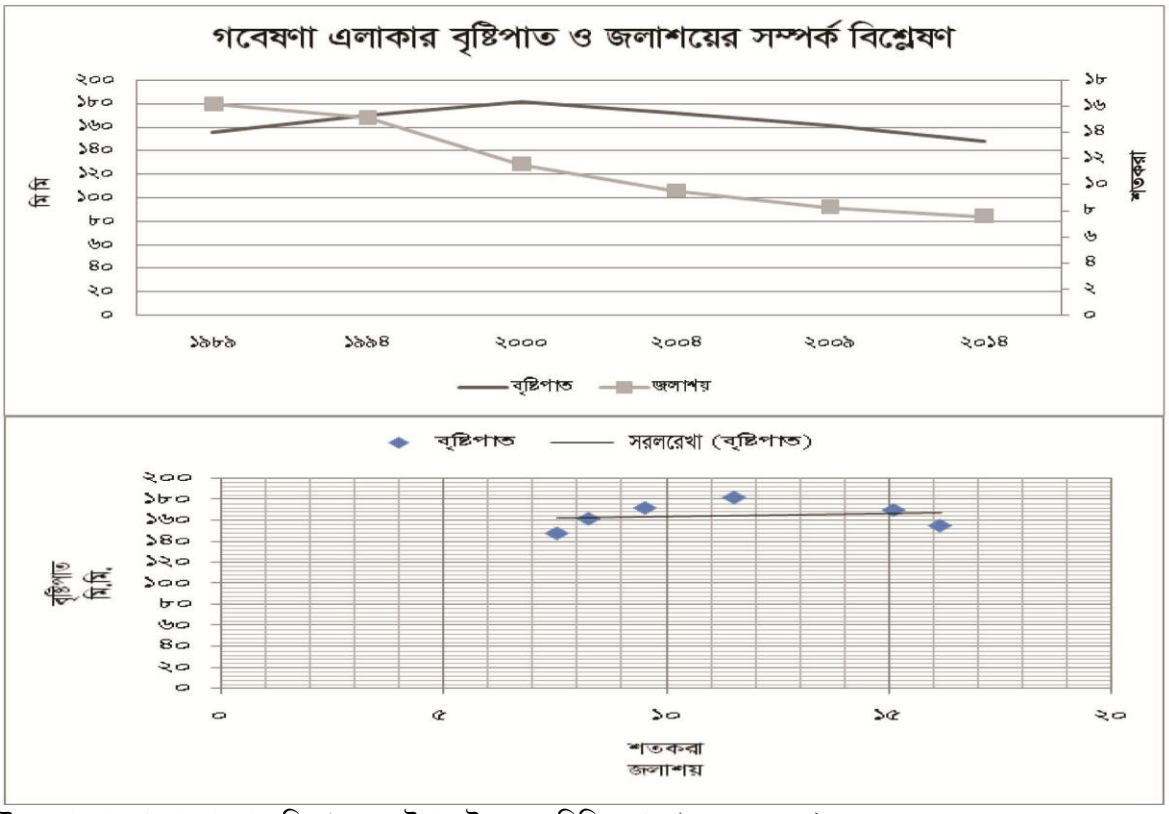

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

১৪.১৪ বাষ্পীভবন ও জলাশয় এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ

গবেষণা এলাকাটিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলেও জলবায়ুর উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটিতে আর্দ্রতা, বায়ু প্রবাহ ও বৃষ্টিপাত নিম্নমুখি গতি প্রদর্শণ করছে। কারণ গবেষণা এলাকাটির ভূ-উপগ্রহ মানচিত্র থেকে পাওয়া ভূ-দৃশ্য ভূমি ব্যবহার থেকে দেখা যায় জলাশয় কমে গিয়েছে। বৃষ্টিপাত, বাষ্পভবন ও আর্দ্রতা, ও বায়ূ প্রবাহ এই সব কিছু পরোক্ষ ভাবে জলাশয়ের উপর নির্ভর করে । গ্রাফচিত্র ১৪.৪ বিশ্লেষণ করে গবেষণা এলাকাটির ভূ-দৃশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে জলবায়ুর পরিবর্তনের সম্পর্ক পাওয়া যায়। সারণি ১৪.৪ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটির জলাশয় ও বাষ্পীভবন হ্রাস পেয়েছে। সারণি ১৪.৪ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সালে সর্বোচ্চ গড় বাষ্পীভবন ছিল ৫৫.৭১ মি.লি.। ১৯৮৯ সালের পর থেকে প্রতি বছরই জলাশয়ের নিম্ন গতির সঙ্গে মিল রেখে বাষ্পীভবনের মান নিম্নমুখি ছিল। এলাকাটির জলাভূমির পরিমাণ কমতে শুরু করেছে সারণি ১৪.১৪ বাষ্পীভবন ও নিম্নমূখি গতি প্রদর্শণ করছে। বাষ্পীভবন ও জলাশয়ের সংশ্লেষন মান r= ০.৭৪৪৪।

চিত্র ১৪.১৪: বাষ্পীভবন ও জলাশয় এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ

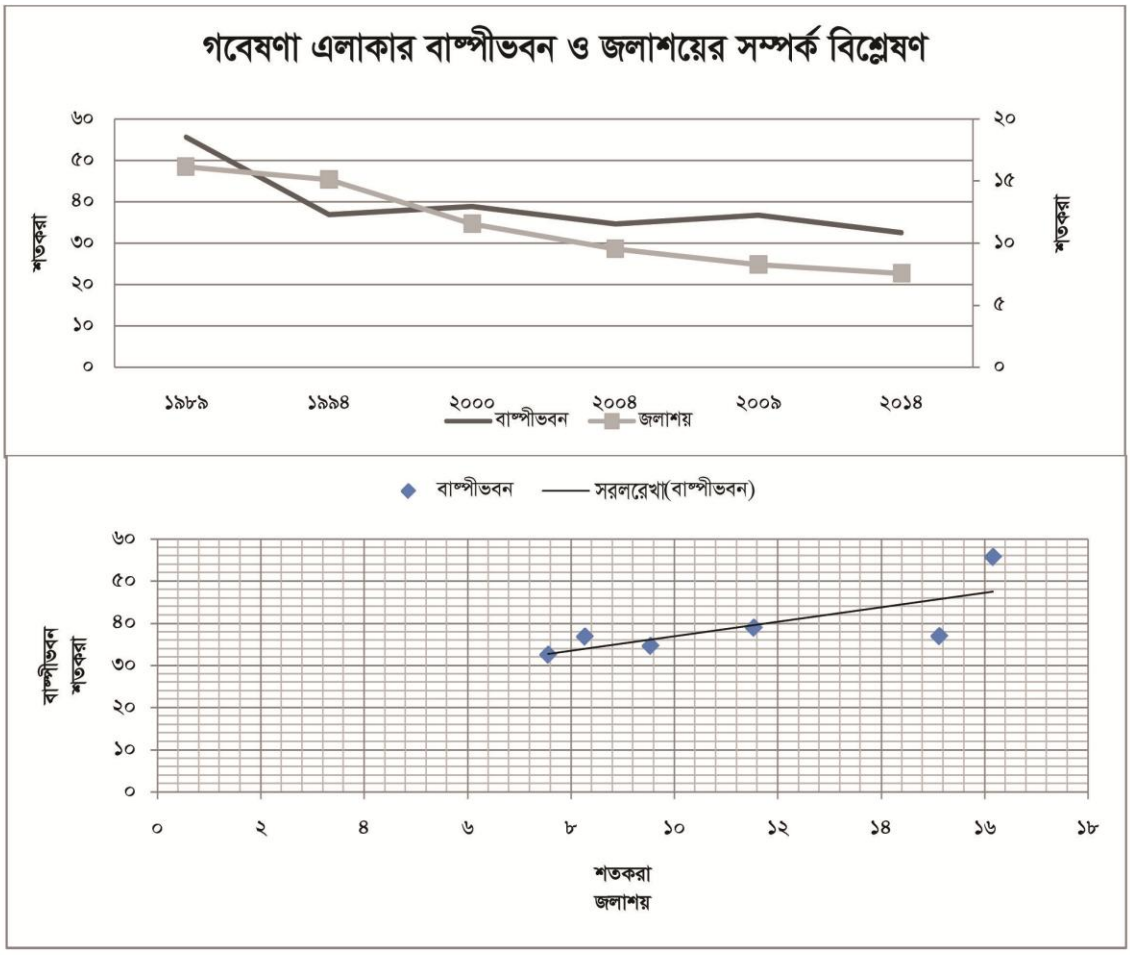

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

১৪.১৫ বনায়ন ও তাপমাত্রার সম্পর্ক

গাছ প্রকৃতির বন্ধু। প্রতিটি অঞ্চলে ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকলে জলবায়ু অপরিবর্তনীয়। এলাকাটিতে এমনিতেই গ্রামীণ বনভূমির পরিমাণ কম। সারণি ১৪.১৫ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকাটি থেকে বনভূমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। যে জন্য এলাকাটির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। সারণি ১৪.১৫ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সালে এলাকাটির সর্বোচ্চ তাপমাত্রার গড় পরিমাণ ছিল ৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় ছিল ১৬.৪১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ২০০৯ সাল পর্যন্ত এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে এই সময়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৩.৬৫ ডিগ্রী ও ১৬.৯০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই সময়ে গবেষণা এলাকার সারণি ১৪.১৫ তে বনভূমির পরিমাণ হ্রাস পেতে দেখা যায়। ১৯৮৯ সালে বনভূমির পরিমাণ ছিল ৫.৫৭ শতাংশ যা ২০০৯ সালে হ্রাসে পেয়ে দাড়ায় ২.২৫ শতাংশে। ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় নি। সারণি ১৪.১৫ বিশ্লেষণ করে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালে এলাকাটিতে বনভূমির পরিমাণ হ্রাস পেতে দেখা যায় নি। গবেষণা এলাকাটিতে বনভূমির সঙ্গে তাপমাত্রার সংশ্লেষ মান পাওয়া যায় r= ০.৬৫৬।

চিত্র ১৪.১৫: বনায়ন ও তাপমাত্রার সম্পর্ক

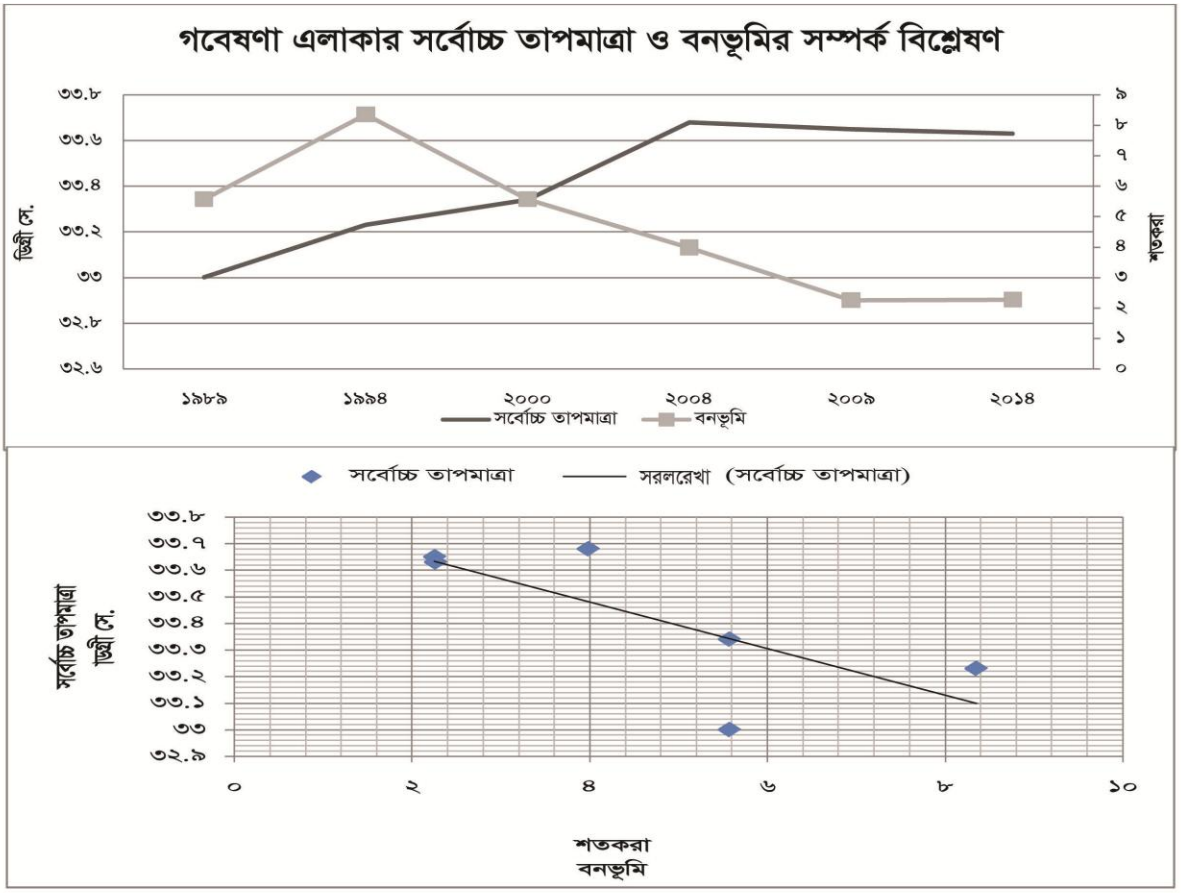

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

১৪.১৬ বৃষ্টিপাত ও বনভূমির বিশ্লেষণ সম্পর্ক

গবেষণা এলাকাটির ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটির ভূমি ব্যবহারে গবেষণা অঞ্চল থেকে বনভূমি পরিমাণ কমেছে। এলাকাটির জলবায়ুও পরিবর্তণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৫০ সাল থেকে গবেষণা এলাকাটির বৃষ্টিপাত ছিল ২১৯.৩৭ মি মি । যা বর্তমানে কখনও হ্রাস পায় আবার কখনও বৃদ্ধি পায়। সারণি ১৪.১৬ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটির বনভূমি হ্রাস পেয়েছে। সারণি ১৪.১৬ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সালে সর্বোচ্চ গড় বৃষ্টিপাত ছিল ১৫৫ মি.মি.। ১৯৮৯ সালের পর থেকে প্রতি বছরই বনভূমি হ্রাস গতির সঙ্গে মিল রেখে বৃষ্টিপাত ও হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন বছরের বৃষ্টিপাতের গড় ও বনভূমি সংশ্লেষ মান হল $r = -0.৫১৪$। বৃষ্টিপাত ও বনভূমির সঙ্গে একটি গভির সম্পর্ক পাওয়া যায়।

চিত্র ১৪.১৬: বৃষ্টিপাত ও বনভূমির বিশ্লেষণ সম্পর্ক

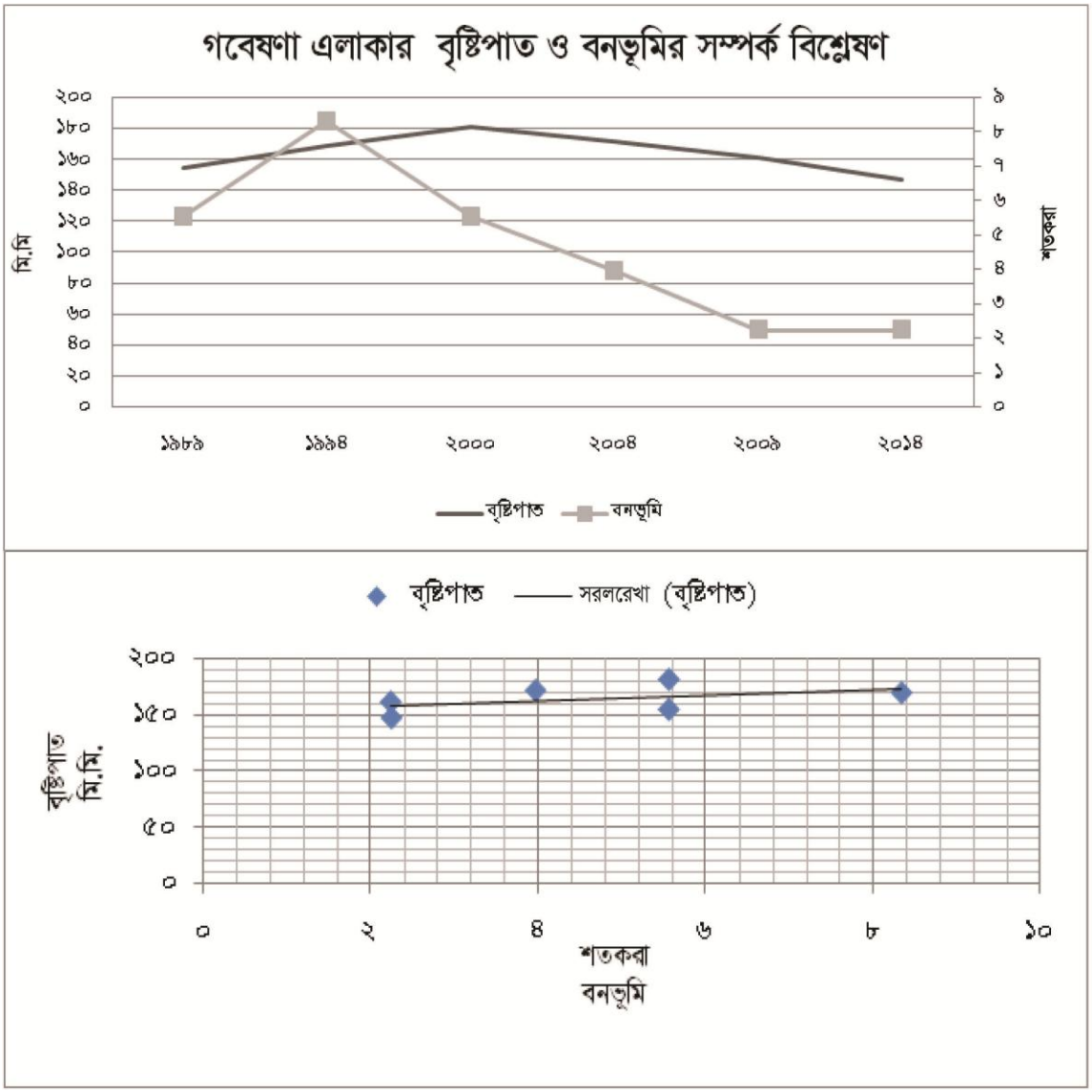

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

১৪.১৭ বায়ু প্রবাহ ও বনভূমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ

গবেষণা এলাকাটির ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটির ভূমি ব্যবহারে গবেষণা অঞ্চল থেকে বনভূমির পরিমাণ কমেছে। এলাকাটির জলবায়ুর পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৫০ সাল থেকে গবেষণা এলাকাটির বায়ু প্রবাহ ছিল ৪.১৬ কন্ট। যা বর্তমানে হ্রাস পেয়েছে ২.২৬ কান্ট হয়েছে। সারণি ১৪.১৭ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটির বায়ু প্রবাহ ও বনভূমি দুটির পরিমানই হ্রাস পেয়েছে। সারণি ১৪.১৭ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সালে সর্বোচ্চ গড় বায়ু প্রবাহ ছিল ৫.৪১ কান্ট। ১৯৮৯ সালের পর থেকে প্রতি বছরই বনভূমির হ্রাসের সঙ্গে মিল রেখে বায়ু প্রবাহ ও হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন বছরের বায়ূ প্রবাহ ও বনভূমি সংশ্লেষ মান হল r= ০.৫৯২। বায়ু প্রবাহ ও বনভূমির সঙ্গে একটি গভির সম্পর্ক পাওয়া যায়।

চিত্র ১৪.১৭: বায়ূ প্রবাহ ও বনভূমির সম্পর্ক বিশ্লেষণ

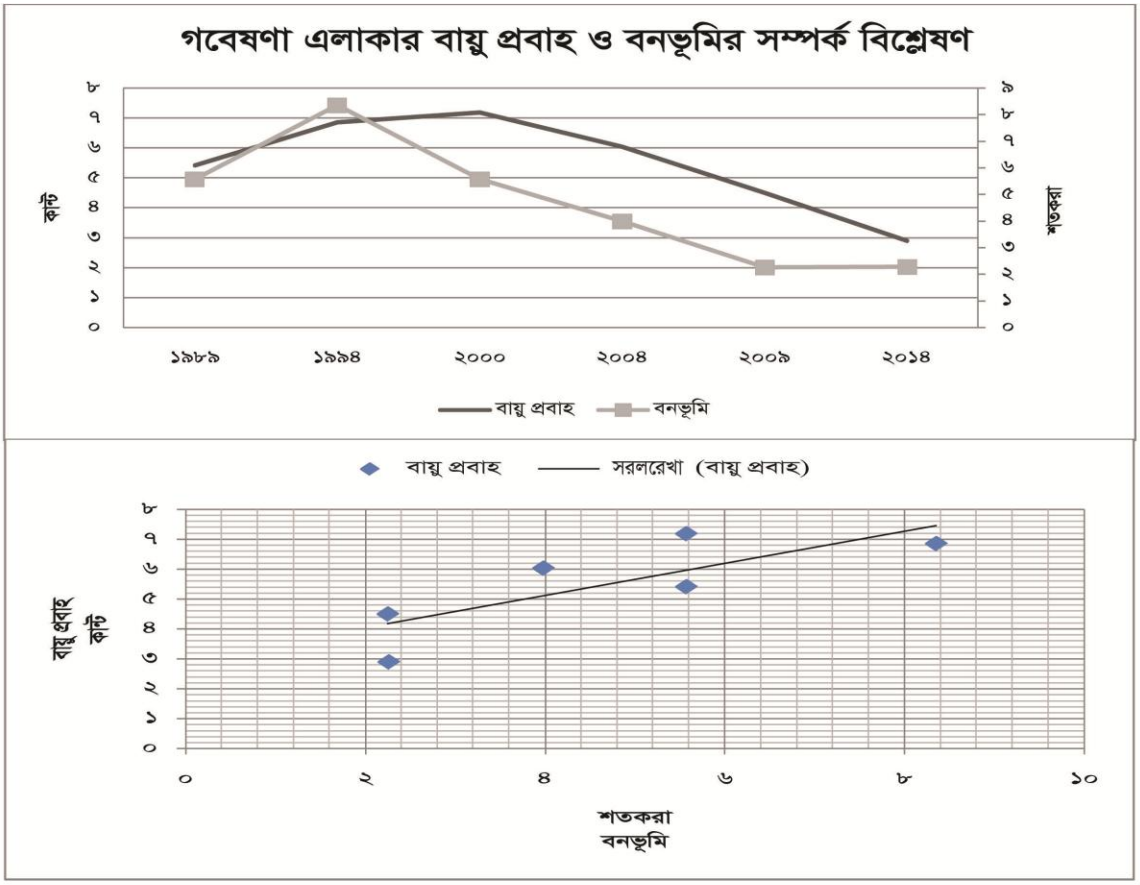

উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং ইডাস ইমেজ ক্লাসিফিকেশন (১৯৮৯-২০১৪)

অধ্যায় পঞ্চদশ

উপসংহার

গবেষণার ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার

"ভূ-দৃশ্য পরিবর্তনের ফলে জীব বৈচিত্র হ্রাসঃ আশুগঞ্জ উপজেলা উপর একটি পর্যবেক্ষণ মূল্যায়ন" বিষয়ের উপর গবেষণা বিগত বৎসরের ভূমি ব্যবহারের ধরণের ভিত্তিতে বিভিন্ন ইকোলজিক্যাল নিয়ামক যেমন মৃত্তিকা, মেঘনা নদীর পানি প্রবাহ, তাপমাত্রা বৃষ্টিপাত প্রাকৃতিক দূর্যোগ ইত্যাদি পরিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে যা আশুগঞ্জ এলাকার উদ্ভিদ, প্রাণী, পাখি ও মৎস্য প্রজাতির বিলুপ্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া মানবীয় কারণেও গবেষণা এলাকার জীববৈচিত্র্য হ্রাস ও প্রাকৃতিক পরিবেশেরর উপর যে স্বল্প দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলছে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। নিম্নে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সংক্ষপে বিবৃত করা হল-

ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনে গবেষণা এলাকার পুরাতন ১৯৫০-৭৫ ও নতুন মানচিত্র ২০০৮ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এলাকার সড়ক পথ এর দুই পাশ দিয়ে ভূমি ব্যবহারে অনেক বেশি পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে রেলপথের দুই পাশ দিয়ে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু সড়ক পথের দুই পাশ দিয়ে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সড়ক পথকে কেন্দ্র করে শিল্পকারখানা ও নগরায়ণ গড়ে উঠেছে। এলাকাটির ১৯৫০ ও ২০১৫ সনের এলাকার ভূমি ব্যবহার জরিপে দেখা যায় যে, সেই সময়ে শতকরা ৭০.০৪ শতাংশ কৃষিজমি, ৫.৮১ শতাংশ বসতি, গ্রামীণ বনভূমি ৬.৭১ শতাংশ ও জলাশয় ছিল ১৭.৪৩ শতাংশ। ২০১৪ সনে গবেষণা এলাকায় ৪৬.৮৯ শতাংশ কৃষিজমি, ১৩.৪৬ শতাংশ বসতি, গ্রামীণ বনভূমি ২.২৭ শতাংশ ও জলাশয় ছিল ৭.৬২ শতাংশ ও নগরা অঞ্চল ২৯.৭৪ শতাংশ দেখা যায় ।

Landsat TM image এর মাধ্যমে ১৯৮৯ ও ১৯১৪ সালের ভূ-পৃষ্ঠস্থ চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় এলাকাটিতে ভূ-দৃশ্যের ব্যপক পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৮৯ সালে গবেষণা এলাকাটিতে নগরের পরিমাণ ছিল ৮.৯১ শতাংশ। ২০১৪ সালে এসে দেখা যায় নগরের পরিমাণ হয়েছে ২৯.৫৪ শতাংশ। বিগত ২৫ বছরে গবেষণা এলাকাটির নগরায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.৬৩ শতাংশ। একই ভাবে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকাটিতে জলাশয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, পূর্বে যে সব স্থানে জলাভূমি ছিল বর্তমানে সে সব স্থানে অনিয়ণন্ত্রত ভাবে ব্রিজ, কার্লভাট তৈরি করার ফলে সে সব স্থানের জলাশয় হ্রাস পাচ্ছে। ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মেঘনা নদী হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে ভূ-মানচিত্রে দেখা যায় মেঘনা নদীটির উত্তর দিকে বেশ কিছুটা অংশ হ্রাস পেয়েছে। নদীর মাঝে চর দেখা যাচ্ছে। গবেষণা এলাকাটিতে ১৯৮৯ সালে জলাশয়ের পরিমাণ ছিল ১৬.১৭ শতাংশ। ২০১৪ সালে জলাশয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে বর্তমানে জলাশয় রয়েছে ৭.৫৬ শতাংশ। বিগত ২৫ বছরে জলাশয় হ্রাস পেয়েছে ৮.৬১ শতাংশ। ভূ-উপগ্রহ মানচিত্র বিশ্লেষণে এই চরের দুই দিকে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। এই ছাড়াও কৃষি জমি হ্রাস পেয়েছে সেটিও ভূ-উপগ্রহ মানচিত্র বিশ্লেষণে সঠিকভাবে দেখা যাচ্ছে। গবেষণা এলাকাটিতে ১৯৮৯ সালে কৃষি জমির পরিমাণ ছিল ৬২.০৭ শতাংশ। ২০১৪ সালে কৃষির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে বর্তমানে কৃষি জমি রয়েছে ৪৬.৫৭ শতাংশ। বিগত ২৫ বছরে কৃষি জমি হ্রাস পেয়েছে ১৫.৫০ শতাংশ।

গবেষণা এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনের পর্যবেক্ষণে দুটি স্টেশনের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, এলাকাটিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমেছে। গবেষণা এলাকার শ্রীমঙ্গল স্টেশনে গড় বৃষ্টিপাত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে ১.৬৫ মি.মি থেকে ২৭.৭২ মি.মি পযর্ন্ত হ্রাস পেয়েছে। এবং মার্চ থেকে অক্টবর পর্যন্ত ১৪.৯৭ মি মি থেকে ১৬৫.২ মি মি হ্রাস পেয়েছে। গবেষণা এলাকার কুমিল্লা স্টেশনের গড় বৃষ্টিপাত নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২.৪ থেকে ৪২.৯ মি মি এবং মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ২৬.০৬ থেকে ২৩৩.৩২ মি.মি. পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হ্রাস পেয়েছে।

শ্রীমঙ্গলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ০.০১ থেকে ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত বিভিন্ন মাসে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে মার্চ ও এপ্রিল মাসে ০.২৭ থেকে ০.৯৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হ্রাস পেয়েছে। কুমিল্লা অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ফেব্রুয়ারি ও এপ্রিল মাসে ১.৭৮ থেকে ১.৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়া অন্য সব মাস গুলোতে ০.১২ থেকে ১.৮৪ সে পর্যন্ত সর্বোচ্চ

তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রীমঙ্গল স্টেশনে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ০.১২ থেকে ০.৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস হ্রাস পেয়েছে। এবং অন্য মাস গুলোতে জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ০.৪১ থেকে ২.২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বৃদ্ধি

পেয়েছে। কুমিল্লা স্টেশনের সর্বনিম্ন তামপাত্রা ০.১৪ থেকে ১.৮২ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে শুধু মাত্র জানুয়ারি মাসের তাপমাত্রা ০.৯৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। শ্রীমঙ্গল স্টেশনের শুষ্ক তাপমাত্রা ঋতুভেদে প্রায় ০.৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে ২.৬৩ ডিগ্রী সে হ্রাস পেয়েছে। যদিও বলা হয় নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীত কাল দেখা যায় যে এই সময়ে ০.৯৬ ডিগ্রী সে শুষ্ক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধিও বিষয়টি অনিয়ন্ত্রিত। যা জীববৈচিত্র্য জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত। মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত শুষ্ক তাপমাত্রা ০.৯ থেকে ১.৩২ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। কুমিল্লা স্টেশনে শুষ্ক তাপমাত্রা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঋতু ভেদে শুষ্ক তাপমাত্রা ডিসেম্বর, জানুয়ারি, এপ্রিল ও মে মাসে ০.৪৪ থেকে ০.৬৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস হ্রাস পেয়েছে। এবং অন্য মাস গুলোর তাপমাত্রার ক্ষেত্রে বিশেষ ০.৩৫ থেকে ০.৯৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

জলবায়ু বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শ্রীমঙ্গল ও কুমিল্লা এই দুটি স্টেশনের আর্দ্রতা হ্রাস পেয়েছে। শ্রীমঙ্গল স্টেশনের আর্দ্রতা ২.৭২ থেকে ৭ শতাংশ ও কুমিল্লা স্টেশনের আর্দ্রতা ১২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বাষ্পীভবন ঋতুভেদে ১৮ থেকে ৪৫ শতাংশ ও কুমিল্লা স্টেশনের বাষ্পীভবন ঋতুভেদে ১ থেকে ২২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। শ্রীমঙ্গল স্টেশনের বায়ু প্রবাহ ঋতুভেদে ০.০২ থেকে ১.২২ কান্ট ও কুমিল্লা স্টেশনের বায়ু প্রবাহ ঋতুভেদে ০.৭৩ থেকে ৩.৪৪ কান্ট হ্রাস পেয়েছে।

শ্রীমঙ্গল স্টেশনের মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা ঋতুভেদে ০.০২ থেকে ৫.৫২ শতাংশ ও কুমিল্লা স্টেশনের মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা ঋতুভেদে ০.৫৯ থেকে ৯.৮৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। শ্রীমঙ্গল স্টেশনের মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা ঋতুভেদে ০.০৪ থেকে ৫.৮৩ শতাংশ ও কুমিল্লা স্টেশনের মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা ঋতুভেদে ০.০৩ থেকে ৬.২২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। শ্রীমঙ্গল স্টেশনের মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা ঋতুভেদে ডিম্বের থেকে মার্চ পর্যন্ত ০.১৪ থেকে ১.৩৮ বৃদ্ধি ও এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ০ থেকে ৬.৩ শতাংশ ও কুমিল্লা স্টেশনের মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা ঋতুভেদে ০.৭৯ থেকে ৩.০৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। শ্রীমঙ্গল স্টেশনের মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা ঋতুভেদে .৯৪ থেকে ৪.০৫ শতাংশ ও কুমিল্লা স্টেশনের মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা ঋতুভেদে ১.১১ থেকে ৬.৮১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। শ্রীমঙ্গল স্টেশনের মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা ঋতুভেদে ১ থেকে ৭.৬৫ শতাংশ ও কুমিল্লা স্টেশনের মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভীরে মাটির আর্দ্রতা ঋতুভেদে ০.১৫ থেকে ৫.২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

ভৈরব বাজার স্টেশন জোয়ারের পরিমাণ পরীক্ষা করে জানা যায় যে জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ০.০৭ থেকে ১.৩৮ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে সেপ্টেম্বর, অক্টেভর, নভেম্বর মাসে ০.৩২ থেকে ০.৫৭মিটার পর্যন্ত জোয়ারে মাত্রা হ্রাস পেয়েছে অন্য দিকে ভাটার পরিমাণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ০.০১ থেকে ০.৭৭ মিটার পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ১.৪ ও ০.৫৫ মিটার ভাটার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। পানির নির্গমন হারের উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে নদীর পানি প্রবাহ ২১৮.১৬ থেকে ৪৬০৫ কিউসেক পর্যন্ত কমে গেছে। ১৯৭৪-২০১৫ সালের নদীর পানির নির্গমন উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে নদীর পানি প্রবাহ প্রায় অর্ধেক কমে গিয়েছে। গবেষণা এলাকার মাটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকাটির মাটির পি এইচ এর মান হ্রাস পেয়েছে ।

গবেষণা এলাকায় দানা জাতীয় শস্যের উৎপাদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকাটিতে ২১টি দানা জাতীয় ফসলের মধ্যে ১৪ টি লোপ পেয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে দেশীয় সকল প্রকার ধান উৎপাদন এলাকাটি থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। অন্যদিকে হাইব্রিড ও উচ্চ ফলনশীল প্রজাতিগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ডাল জাতীয় শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ৮টি ফসলের মধ্যে ২টি ফসল অড়হর ও মটর লোপ পেয়েছে। মুগ ছোলা মাস কলাই উৎপাদন ৮০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তৈলবীজ জাতীয় উদ্ভিদ উৎপাদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এলাকাটিতে তিসি, কেস্টর, সূর্যমুখী ও সয়াবিন উৎপাদন ১০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। সরিষা তৈল ও চীনা বাদাম উৎপাদন প্রায় ৮০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অর্থকরি ফসল উৎপাদন বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, মেস্তা, শনপাট, তামাক, ও তুলা উৎপাদন লোপ পেয়েছে। পাট উৎপাদন ৫৭.৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। কন্দাল জাতীয় চারটি ফসলের মধ্যে শুধু মাত্র কচু গবেষণা এলাকা থেকে লোপ পেয়েছে। তরিতরকারী জাতীয় ২১টি ফসলের মধ্যে ১২টি ফসল বিলুপ্ত হয়েছে। গবেষণা এলাকা থেকে চালকুমড়া, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, মূলা, পটল, ঠেড়স ঝিঙ্গা, করলা, গাজর, কাকরোল ও শালগম উৎপাদন প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। ফল জাতীয় উদ্ভিদ গবেষণায় দেখা যায় যে, এলাকাটি থেকে তরমুজ ও বাঙ্গী ১০০ শতাংশ লোপ পেয়েছে। মসলা জাতীয় উদ্ভিদ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এলাকাটি থেকে আদা ও মৌরী উৎপাদন ১০০ শতাংশ লোপ পেয়েছে। এছাড়া কালোজিরা উৎপাদন ৯৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এলাকাটিতে গো-খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে অন্যদিকে বীজতলা তৈরি দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

আশুগঞ্জ অঞ্চলে কৃষি ফসল বিলুপ্তির হার নিয়ে এলাকাবাসির সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি কৃষি ফসল বিলুপ্ত হয়েছে। এর পর পরই রয়েছে কলকারখানার তৈরি, নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া। এলাকাবাসির মতামতের ভিত্তিতে জানা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তন ১৭ শতাংশ, কলকারখানা তৈরি ১৫ শতাংশ ও ১৩ শতাংশ জনগণ নদীর নাব্যতা কমে যাওয়াকে কৃষি ফসল বিলুপ্তির কারণ বলে উল্লেখ্য করেছেন। অন্যদিকে জনগণের কাছ থেকে ফসল সংরক্ষণের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তারা জানান অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। ১৭ শতাংশ জনগণ মনে করে জমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ৪৩ শতাংশ জনগণ মনে করে এই দুটি সমস্যা সমাধান হলে এলাকায় অধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে।

আশুগঞ্জ উপজেলায় নিবিড় কৃষিভূমি দেখা যায়। এখানে কৃষি-জলবায়ু শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে এলাকাগত ভাবে ফসল উৎপাদন মৌসুমের ব্যাপ্তিকাল ও শুরুর আদর্শ বিচ্যুতিকাল, শুষ্ক দিনের সংখ্যা, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, চরম উষ্ণ ও চরম শীতল তাপমাত্রাযুক্ত দিনের সংখ্যা এবং সম্ভাব্য বাষ্প-প্রস্বেদন ও আর্দ্রতা এই সব জলবায়ু বিষয়ক নিয়ামক নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। এই সকল বিশ্লেষণ থেকে কৃষি ফসল উৎপাদনে জলবায়ুর নিয়ামককে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় ক) প্রাক-খরিফ ক্রান্তিকালের গড় ব্যাপ্তি, মে-অক্টোবর পর্যন্ত অনিশ্চিত ও সবিরাম বৃষ্টিপাতের সময়সীমা। খ) বৃষ্টি নির্ভর খরিফ এবং রবি ফসল উৎপাদনকালের গড় ব্যাপ্তি। গ) নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীত কাল এই সময়ের মধ্যে বছরে ১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে সর্বনিম্ন তাপমাত্রাযুক্ত দিনে সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে। ঘ) বছরে ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশি চরম তাপমাত্রাযুক্ত দিনের গড় সংখ্যা এই সময়ে প্রস্বেদনের মাত্রা ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌছে। এখানে দেখা যায় যে প্রাক-খরিফ ক্রান্তিকাল ২২ মার্চ থেকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ৫-২৫ দিন আগে পরে হতে পারে। এর গড় সময় ৩০-৪০ দিন, তন্মধ্যে ১৭-২৪ দিন শুষ্ক থাকে। খরিফ আর্দ্রকাল প্রায় ১০ মে থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত বজায় থাকে, যার গড় সময় ১৫৫-১৭৫ দিন। এ সময় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয় (১,২০০-২,৫০০ মিলিমিটার)। রবি উৎপাদনকাল ২৪ অক্টোবর থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত। তবে শুরু ১৫-৩০ দিন আগে-পরে হতে পারে এর (গড় সময় ১২০-১৪৫ দিন) ১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে সর্বনিম্ন তাপমাত্রাযুক্ত কাল ৬ ডিসেম্বর থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি (গড় সময় ৫০-৭০) এবং ১৭.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে ২৪ নভেম্বর থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি (গড় সময় ৮০-১০৫ দিন)। ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রা সংঘটনের দিনের সংখ্যা ৫-১৫। এ অঞ্চলে প্রাক-খরিফ ক্রান্তিকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের উর্ধ্বে সংঘটনের মোট সময় গড়ে দুই বছরের এক দিনের বেশী নয়।

গবেষণা এলাকায় সারনি (৬.১৫, ৬.১৬ ৬.১৭ ও ৬.১৮) এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এ উপজেলায় প্রাক-খরিফ ক্রান্তিকালে গড় শুষ্ক দিনের সংখ্যা প্রাক-খরিফ ক্রান্তিকালের অর্ধেক বা এর বেশি, যা এ সময়ে আবাদকৃত বৃষ্টিনির্ভর ফসল যেমন বোনা আউশ ও পাট জাতীয় ফসলের জন্য চারা অবস্থায় হালকা বুনটের মাটিতে খরার আশংকা নির্দেশ করে। খরিফ ফসল উৎপাদনকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং মজুতকৃত মৃত্তিকার রস বিন্যাসে খরিফ ফসল আবাদের জন্য যথেষ্ঠ। এই অঞ্চলের তাপমাত্রার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৫ সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রা গড়ে ৫০-৭ দিন। (৬ ডিসেম্বর- ৪ ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত থাকে। এই নিম্ন তাপমাত্রাকাল এবং রবি উৎপাদনের ব্যপ্তি অনুযায়ী এ অঞ্চলের গম, আলু ও রবি ফসল আবাদের জন্য মাঝারি উপযোগী। ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রা গড়ে ৫-১৫ দিন হওয়ায় বোরো ফসলের বীজ তলা আলু ও অন্যান্য রবি ফসল অতিরিক্ত শীতজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

গবেষণা এলাকার বনায়ন গবেষণা এলাকা জরিপের তথ্য থেকে জানা যায় আশুগঞ্জ ইউনিয়নে ৪১ শতাংশ, চর চারতলা ইউনিয়ন ৩৫ শতাংশ দূর্গাপুর ইউনিয়নে ৩৫ শতাংশ ও তাল শহর ইউনিয়নে ৩৯ শতাংশ রেইট্রি গাছ রয়েছে। এছাড়া আশুগঞ্জ ইউনিয়নে ১৮ শতাংশ, চর চারতলা ইউনিয়ন ১৮ শতাংশ দূর্গাপুর ইউনিয়নে ১৫ শতাংশ আকাশিয়া গাছ রয়েছে। তালশহর ইউনিয়নে কড়ই গাছ ২০ শতাংশ রয়েছে। গবেষণা এলাকায় বৃক্ষ প্রজাতির বিলুপ্তির হার সম্পর্কে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, বৃক্ষ হ্রাসের হার ৬৩ শতাংশ ও ভেষজ প্রজাতির হ্রাসের হার ১৭ শতাংশ। গবেষণা এলাকায় উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্তির মানবীয় কারণগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এলাকার ৩৪ শতাংশ জনগণ কলকারখানার বৃদ্ধি ও ২৫ শতাংশ জনগণ বসতি নির্মাণকে দায়ী করেছে। অন্যদিকে গবেষণা এলাকায় সামাজিক বনায়ন করার সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে জানা যায় যে, এলাকার অধিবাসির অংশিদ্বারিত্ব নিয়ে দ্বন্দ সমস্যাটি অনেক বড় সমস্যা। ২৫ শতাংশ জনগণ মনে করে শুধু অংশিদ্বারিত্ব সমস্যাটির জন্য গ্রামীণ বনায়ণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এর পর রয়েছে এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির গাছ কাটার বিষয়টি ২৪ শতাংশ এলাকাবাসি মনে করে দরিদ্র জনগোষ্ঠির গাছ কাটার জন্য এলাকায় বনায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। বৃক্ষ সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশ্নমালা জরিপ থেকে জানা যায় ২৫ শতাংশ জনগণ মনে করে গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও ২০ শতাংশ অধিবাসি মনে করে সরকারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এলাকাটিতে বৃক্ষ সংরক্ষণ ও বনায়ন করা সম্ভব।

গবেষণা এলাকায় সর্বাধিক হুমকি সম্পন্ন প্রানী প্রজাতি হলো জলার কুমির, গৌর, বাঘ ডাস, বুনো মোষ। যা গত বৎসর গুলোতে ৭০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। দ্বিতীয় হুমকি সম্পন্ন প্রানী প্রজাতি হলো বন গরু, গুই সাপ। ২৮ শতাংশ জনগণের মতে বাঘ ডাস, জলার কুমির ও ২০ শতাংশ জনগণের মতে বন গরু ও গুই সাপ। ২৮ শতাংশ জনগণের মতে বাঘ ডাস, জলা কুমির ও ২০ জনগণের মতে বন গরু ও গুই সাপ অধিক বিলুপ্ত হয়েছে। এলাকায় গৃহ পালিত প্রানীর সংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গরু মহিষ, ছাগল, ভেড়ার সংখ্যা ৭২.৪, ৯৩.৪৮, ৭৬.৬৮ ও ৭৪.৯৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

গত বৎসর গুলোতে প্রানীদের জীববৈচিত্র্যে বিলুপ্ত প্রাকৃতিক কারণ সমূহের মধ্যে মাঠ জরিপে পাওয়া তথ্যের মাধ্যমে দেখা যায় যে, ভূদৃশ্য পরিবর্তনকে ২৯.১৩ শতাংশ প্রধান কারণ হিসাবে দেখিয়েছে। ২৮.৬০ শতাংশ জলবায়ু পরিবর্তনকে মূল কারণ বলেছে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ জলাবদ্ধতা এলাকার শিল্পকারখানা তৈরি প্রভৃতি কারণ ও জড়িত রয়েছে। অপর দিকে মানবীয় কারণ সমূহের মধ্যে বন নিধন, বসতি স্থাপন ফলে প্রানী প্রজাতি হ্রাস পাচ্ছে। এলাকায় কলকারখানা তৈরির জন্য প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে বলে ২৮.৪৩ শতাংশ ও শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রধান কারণ বলে ২০.৬৮ শতাংশ অভিমত প্রকাশ করেছে। তাছাড়া কৃষি ভূমি সম্প্রসারণ, বয়লার তৈরি প্রভৃতির ফলেও ব্যাপকভাবে প্রাণীদের অভয়ারণ্য নষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। গবেষণা এলাকায় প্রানী প্রজাতি ধ্বংস হবার মাত্রা পর্যালোচনায় ৫১ শতাংশ উত্তর দাতা গত বৎসরগুলোতে প্রাণী প্রজাতি অনেক বেশি ধ্বংস হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছে। অপর দিকে ৩৭ শতাংশ উত্তর দাতা মোটামোটি ধ্বংস হয়েছে বলে মতামত দিয়েছেন। কোনো প্রানী ধ্বংস হয়নি এমন মতামত কেউ দেয়নি। এই এলাকায় প্রানী প্রজাতি ধ্বংসের মাত্রা অনেক বেশি এই ভাবে যদি চলতে থাকে তা হলে খুব দ্রুত এলাকা থেকে অনেক প্রাণী হারিয়ে যাবে।

গবেষণা এলাকায় সর্বাধিক হুমকির সম্মুখিন পাখি প্রজাতিগুলো হল মদনটান, বক ও হাঁস। ২০ শতাংশ উত্তর দাতা অভিমত পোষন করেছে অধিক পাখি শিকার করার জন্য পাখি হারিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া শকুন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে হারিয়েছে বলে এলাকার বেশি ভাগ ২৮.৭ শতাংশ উত্তর দাতা অভিমত পোষণ করেছে। তাছাড়া নদী ও খাল বিলের পানি কমে যাওয়ায় হাঁস পাখি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। গবেষণা এলাকায় পাখি প্রজাতি হ্রাস প্রাকৃতিক কারণ সমূহ মধ্যে ৩২.৬৬ শতাংশ জনগণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ২৩.৬১ শতাংশ জনগণ আবহাওয়া পরিবর্তন জনিত কারণে পাখি হারিয়ে যাচ্ছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছে। অন্য দিকে মানবীয় কারণ সমূহের মধ্যে ৩২ শতাংশ লোক ভূমিব্যবহারের পরিবর্তন, ২০.৯ শতাংশ পাখি শিকারকে পাখি প্রজাতি হ্রাস পাওয়ার মানবিক কারণ বলে অভিহত করেন। পাখি সংরক্ষণের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ২২.৫৭ শতাংশ পাখি অভয়ারণ্য সৃষ্টি ও ২০.৩৮ শতাংশ গাছ কাটা বন্ধ করা হলে পাখি প্রজাতি সংরক্ষণ করা যাবে বলেন।

প্রতি বৎসর প্রায় ২ মিলিয়ন টন পলি মাটি বাংলাদেশের নদীগুলো বহন করে নিয়ে আসে (রশীদ-২০০৩)। মেঘনা নদী ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। নদীটি তার উৎপত্তি স্থল থেকে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করার সময় প্রচুর পলি মাটি বহন করে নিয়ে আসে। এভাবে ক্রমাগত পলি পরে মেঘনা নদীর নাব্যতা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। যার ফলে নদীতে মৎস্য প্রজাতি নিরাপদে থাকতে পারছেনা। গত বৎসরগুলোতে দেশিয় প্রজাতির বাইম, মাগুর, কই শিং ইত্যাদি মৎস্য সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ৩১ শতাংশ জেলেদের মতামত নান্দিল. কোরাল, বেতরাঙ্গি মাছ ৭৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এবং বাতাসি আলাপি ও কাটালিশ ও পাবধা ৬৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে বলে এলাকাবাসির অভিমত থেকে জানা যায়। মৎস্য প্রজাতি হ্রাসের কারণ নিয়ে জেলেদের মতামত থেকে জানা যায় যে, কলকারখানা তৈরি ২০.৩০ শতাংশ, মৎস্য প্রজাতি আবাসস্থল হ্রাস ১৮.৬৪ শতাংশ, ও খালে বিলে বিষ প্রয়োগকে ১০.২৪ শতাংশ মোট ৫৯.১৮ শতাংশ জনগণ মনে করে এই তিনটি কারণে এলাকায় মৎস্য প্রজাতি হ্রাস পেয়েছে। মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে অধিবাসিরা জানান এলাকার বসতি নিয়ন্ত্রণ ৩০.০০ শতাংশ, জমিতে কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ ১৯.৫১শতাংশ, কলকারখানার বর্জ্য দূষণ মুক্ত করা ১৮.৮৭ শতাংশ মোট ৬৪.৩৮ শতাংশ জনগণ মনে করে এই বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করা হলে মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এলাকায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে সরকারের নেয়া পদক্ষেপ নিয়ে এলাকাবাসির কাছে প্রশ্ন করা হলে ৩২ শতাংশ বলেন সরকারের কর্মকান্ডে তারা সন্তুষ্ঠ, ২৮ শতাংশ মিশ্র মতামত প্রকাশ করেন।

গবেষণা এলাকায় শুশক মাত্রা হ্রাসের পর্যলোচনা ৬৫ উত্তর দাতা বেশি মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে বলে মনে করেন। অপর দিকে ৩৭ শতাংশ উত্তর দাতা মোটামোটি হ্রাস পেয়েছে বলেছেন। শুশক ধ্বংস পানির অবস্থানের পরিবর্তনের বিষয়ে ২৫ শতাংশ অভিমত পোষন করেছেন।

গবেষণা এলাকাটিতে ভূ-দৃশ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন উপাত্ত নিয়ে পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নগরায়ণ ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সংশ্লেষ মান r= 0.932, নগরায়ণ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা r= ০.৮৭৯, নগরায়ণ ও আদ্রতার সংশ্লেষ মান r = ০.৬২৮ এই সবগুলো মান ধনাত্তক সম্পর্ক রয়েছে। নগরায়ণ ও বাষ্পীভবন সংশ্লেষ মান r= ০.৭৫৩ ঋনাতক দেখা যায়। এই থেকে প্রমাণিত হয় যে, নগরায়ণের পরিবর্তন ও জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রতিটি নিয়ামকের সঙ্গে সর্বোচ্চ সম্পর্ক রয়েছে। কৃষি জমি জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক থেকে দেখা যায় যে কৃষি জমির পরিবর্তন ও তাপমাত্রার সম্পর্কটি ঋনাতক মান প্রদর্শন করে। কৃষিজমি ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সংশ্লেষ r=-০.৮৫৫, ও কৃষিজমি ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সংশ্লেষ r=-০.৭৬১। বনায়ণ ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সংশ্লেষণ মান r= - ০.৬৫৬। এই প্রতিটি মানই প্রমাণ করে যে, এলাকার নগরায়নের পরিবর্তনের সঙ্গে এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনের উচ্চ সম্পর্ক রয়েছে।

অপরদিকে ইকোলজিক্যাল পরিবর্তনের ধারা পর্যালোচনায় ৬৫ শতাংশ উত্তর দাতা উক্ত এলাকাটিতে বেশি পরিবর্তন হয়েছে বলে মতামত দিয়েছে। অপর দিকে ২ শতাংশ লোক উক্ত এলাকার কোনো ইকোলজিক্যাল পরিবর্তন দেখতে পাননি। সুতরাং সমস্ত এলাকাটিতে ব্যাপক ইকোলজিক্যাল পরিবর্তন হয়েছে যা জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি স্বরূপ।

Knowledge (k) Attitude (A), Practice (p) বা (KAP) দৃষ্টিকোনো থেকে গ্রামের গুরুত্ব সম্পর্ক স্থানীয় অধিবাসীদের মূল্যায়ণ পর্যলোচনা করে দেখা যায়। চেয়ারম্যান, মেম্বার ও শিক্ষিত লোকের ১০০ শতাংশ Knowledge থাকলেও কৃষক শ্রেনীর সবচেয়ে কম ৫০ শতাংশ ধারণা বিদ্যামান। আশুগঞ্জ এলাকার জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার উপায় উত্তর দাতার আচরণের মাধ্যমে (A), যদি দেখি তাহলে সর্বাধিক মেম্বার, চেয়ারম্যানদের বিদ্যামান। এক্ষেত্রে কৃষক মাত্র ২৩ শতাংশ অপরদিকে দৃষ্টিকোনো থেকে যদি দেখি তাহলে তাদের দ্বারা সবাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

আশুগঞ্জ উন্নয়নে অতীতে গৃহীত ব্যবস্থা

আজকের বিশ্বখ্যাত আশুগঞ্জের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল প্রায় একশত বছর পূর্বে। সবুজ-শ্যামল পাখি ডাকা, ছায়া সুনিবিড় মেঘনা পাড়ের আশুগঞ্জে মূলত চরচারতলা, আড়াইসিধা, যাত্রাপুর, বড়তল্লা, সোনারামপুর, তালশহর, সোহাগপুর, বাহাদুরপুর গ্রামকে ঘিরেই ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে গোড়াপত্তন হয়। আশুগঞ্জ প্রতিষ্ঠার পূর্বে এলাকার জনগণ ভৈরব বাজারে গিয়েই তাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করতো। দৈনন্দিন বাজার-সদায়ের জন্য ভৈরবই ছিল তখন একমাত্র হাট বা বাজার। আশুগঞ্জের ব্যবসায়ীরা তখন ভৈরব বাজারেই তাদের ব্যবসার পসরা সাজিয়ে বসতো। ভৈরবে সাপ্তাহিক হাটবার ছিল বুধবার। আশুগঞ্জ বন্দরের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস রচনা করতে যেয়ে আশুগঞ্জের অন্যতম সাহিত্য ব্যক্তিত্ব মধ্যদিনের সূর্যগ্রন্থের প্রণেতা কবি আব্দুর রউফ মাহমুদ ১৯৮১ সালে ঢাকাস্থ আশুগঞ্জ সমিতির একটি ম্যাগাজিনে আশুগঞ্জ সৃষ্টির ইতিহাস প্রসঙ্গে লিখেছেন, ভৈরব বাজারের তদানীন্তন মালিক ভৈরব বাবু কর্তৃক আরোপিত করভার মেঘনার পূর্ব পাড়ের ক্রেতা-বিক্রেতারা অতিষ্ট, পিষ্ট, জর্জরিত হয়ে পরে, প্রতিবাদের দানা বেঁধে উঠে পর্যুদস্ত সবার মনে। সবাই জমায়েত হয়ে মেঘনা পূর্ব পাড়ে সৈকতের বালিকণা তথা সোনারামপুর মাঠের উপর হাট বসিয়ে নেয়। প্রতি বুধবার নদী সৈকতের চিকচিক বালিকণার উপর হাট বসেই চললো। উদ্যোক্তরা মহারাজার ঢাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের দুর্গতির অবসানের জন্য মহারাজের নাম সংযোগ করে হাটকে গঞ্জে পরিণত করে। আশুতোষ নাথ রায়ের নাম অনুসারে এই গঞ্জের নাম হয় আশুগঞ্জ। ১৯০৬ সালে রাজা আশুতোষ নাথ রায় বাহাদুরের মৃত্যু হলে পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান রাজা কমলা রঞ্জন রায় পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আশুগঞ্জের আরও উন্নতি সাধন করেন। সে সময় বাংলাদেশের পাট সারা বিশ্বে 'সোনালী আঁশ' হিসাবে পরিচিত ছিল। আশুগঞ্জ ক্রমেই পাটের বড় বাজারে পরিণত হতে থাকে। ফলে সুদূর বিলেত থেকে ইংরেজ সাহেবরা এখানে আসতে থাকে। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই দেখা যায় ইংল্যান্ডের বড় বড় পাট কোম্পানির বিশাল বিশাল গুদামে আশুগঞ্জের ধূ ধূ বালিকণার চর ঢাকা পড়ে যায়। ক্রমে ক্রমে অট্টালিকা তৈরি হতে থাকে। তখন এখানে যে সমস্ত বিদেশী কোম্পানির শাখা খোলা হয়েছিল তার মধ্যে 'লেন্ডেল এন্ড ক্লার্ক, ডাফর্স, এম বে ব্যাক, হামিরমল, ছেট লাল বেটিয়া, রাধাকিশেন বলকিশেন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশের তৎকালীন ৬ষ্ঠ রাজার নামানুসারে মেঘনা নদীর উপর নির্মিত হয় রেলসেতু 'King gorge Bridge' ঢাকা-চট্রগ্রামের সঙ্গে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় আশুগঞ্জের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল শেষ হবার পর থেকে পাটের ব্যবসা ক্রমে ক্রমে লোপ পেতে থাকে। পরবর্তী ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানি সরকারের আর্থিক সহায়তায় আশুগঞ্জ বিদুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। জার্মানির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স বিবিসি, মেসার্স ব্যাবকক এন্ড উইলকক্স আশুগঞ্জ বিদুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে এবং জার্মানির মেসার্স ফিশেনার কোম্পানি উপদেষ্টা হিসাবে নির্মাণ কাজ তদারকি করে। ১৯৬৮ সালে শুরু হয়ে ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দু'টি ইউনিট চালু হয়। বর্তমানে আশুগঞ্জে ১০টি উপরে বিদুৎ ইউনিট চালু রয়েছে। আশুগঞ্জ – ভৈরব রেলসেতুর সন্নিকটে এবং

আশুগঞ্জ রেল স্টেশনের দক্ষিণ পাশে মেঘনার পূর্ব তীর ঘেঁষে প্রায় ৩৬ একর জমির উপর নির্মিত হয় দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ সাইলো। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনীর বর্বরতায় আশুগঞ্জ একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। অনেক বীর মুক্তিযুদ্ধাকে সাইলোর পাশের খোলা জমিতে হত্যা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে শেষ মুহূর্তে নিশ্চিত পরাজয় আঁচ করতে পেরেও পাকিস্তানি সৈন্যরা আশুগঞ্জ-ভৈরব রেলসেতুটি ধ্বংস করে দিয়ে যায়। ফলে অর্থনৈতিকভাবে আশুগঞ্জ মারাত্নক ক্ষতির সম্মুখিন হয়। পরে ব্রিজটি পুনর্নির্মান করা হয়। ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি গঠন করা হয়।

আশুগঞ্জে বর্তমান উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা

বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ, অবিবেচনা প্রসুত সম্পদের আহরণ কৃষি ভূমির সম্প্রসারণ, বনভূমি সংকোচন, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ড, অধিক ফলনশীল উৎপাদনের জন্য পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্যহীন প্রযুক্তির ব্যবহার প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য মারাত্তক হুমকীর সম্মুখীন। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সরকারী ও বেসরকারী ভাবে বিভিন্ন প্রকল্প নীতি ও ব্যবস্থাপনা কৌশল গৃহীত হয়েছে যা নিম্নে প্রদত্ত হল :

টেবিল ১১.১: সাম্প্রতিকালে বন সংরক্ষিত বনভূমির বিভিন্ন প্রকল্প সমূহ

প্রকল্প	উদ্দেশ্য
'Conservation Management plan of the wildlife saneturies in SRF'/GOB	দুর্বল (vulnerablo) প্রজাতি রক্ষা বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্যে প্রাণী প্রজাতি রক্ষা গনসচেতনা সৃষ্টি।

টেবিল ১১.২: National ACTs/ policies related to the Management of the SRF

নাম	নীতি
The Environment policy (1992)	উপকূলীয় এলাকার পানি দূষণের হাত থেকে রক্ষা উপকূলীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহার EIA এর মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় প্রকল্প গ্রহন করার ব্যবস্থা করা।
The forest policy (1992)	স্থানীয় জনগণকে বন এলাকায় পশুচারনে সতর্ক হতে হবে। মূল্যবান বনজ সম্পদ যথাযথ সংরক্ষণ করতে হবে।
National Environment Management Action Plan (1995-90)	পরিবেশিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি পরিবেশিক অবক্ষয় রোধ
The Fisheries Act 1950	পোনা মাছ ধরা যাবে না । মাছ ধরতে কীটনাশক ঔষধ ও বিষ প্রয়োগ করা যাবে না।
Brick Burning Act 1992	ডিসির অনুমতি ছাড়া কোনো এলাকার ইটের ভাটা স্থাপন করা যাবে না।

আশুগঞ্জ অঞ্চললে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে টেকসই ব্যবস্থাপনা

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের অন্যতম আলোচিত বিষয় হল টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development) বিশ্বের ধারণ ক্ষমতা ও সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টি ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনোরিওতে অনুষ্ঠিত প্রথম ধরত্রী সম্মেলনে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। উক্ত সম্মেলনে প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস বৈচিত্র্য টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যে তিনটি সমঝোতা স্বাক্ষর করে তার অন্যতম হল জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন (the Convention on Biological Diversity CBD)। টেকসই ব্যবস্থাপনা নিয়ে বর্তমান ব্যাপক গবেষণা চলছে। এটি উন্নয়নশীল বিশ্বের জনপ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি। "Sustainalbe forest management in the process of managing the forest to achieve one or more clearly specified objectives of management with regard to the production of a contiruous flow of desired forest products and services without under reduction of its inherent values and fulure productivity and without under undesirable effect on the physical and social environment (mankin-1998)"

আশুগঞ্জকে টেকসই উন্নয়নের ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা উচিত। যথাযথ জরিপের মাধ্যমে সেখান থেকে বার্ষিক কাঠ আহরণ করা উচিত। যেভাবে বৃক্ষরাজি হ্রাস পাচ্ছে সেটা জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। বন থেকে এভাবে অতিরিক্ত কাঠ কাটা হলে পরিবেশের জন্য বিপর্যয় বয়ে আনবে। গাছপালা বৃদ্ধি ও পুনরুৎপাদনের হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্পদ আহরণ করা হলে সেখানকার ইকোসিস্টেমের কোনো সমস্যা হবে না। সঠিকভাবে বড় গাছগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো অপসারণ করলে বৃক্ষের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।

যদি বয়স্ক শ্রেণীর গাছের পরিমাণ বেশি হয় এবং যৌবন প্রাপ্ত গাছের সংখ্যা কম হয় তাহলে এক সময় সেখানকার ইকোসিস্টেমে অস্থিরতা দেখা দিবে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞদের মতামত

আশুগঞ্জের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে আশুগঞ্জ জেলা পরিষদের প্রধান কৃষি কর্মকতা তৌফিক আহমেদ খান বলেন, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। নদীর সীমানা বরাবর খালগুলো খনন করতে হবে। এলাকায় পুকুরের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে খান বীল ও পুকুর গুলোতে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে প্রাণী প্রজাতি রক্ষা পাবে। মেঘনা নদী বন্দরে বর্জ্য ও তেল ফেলার উপর নিষেদ্ধাজ্ঞা জারি করতে হবে। তা হলে নদীর জলজ প্রানিকুল রক্ষা পাবে। এলাকায় মানব সৃষ্টি বনায়ন কর্মসূচী চালাতে হবে।

IUCN কর্মকর্তা বলেন নদীতে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি জন্য প্রকল্প পুনরায় শুরু করতে হবে। কেননা নদীর পানির নাব্যতা কমতে শুরু করেছে। এভাবে যদি পানি কমতে থাকে তা হলে ভবিষ্যতে বড় ধরণের সমস্যা তৈরি হতে পারে। কাজেই ইকোসিস্টেম সংরক্ষণের জন্য নদীর পানির নাব্যতা বাড়ানোর একান্ত প্রয়োজন। পাখিরা সাধারণত বিভিন্ন গাছে বাসা বাঁধে। অযথা পাখির বাসা যাতে না ভাঙ্গে সে জন্য সচেতন হতে হবে। তাছাড়া পোনা মাছ শিকার যাতে না করে সে জন্য সরকারকে যথাযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। এদানিং অনেক বিদেশি মাছ চাষ করা হয়। এই সকল মাছ চাষ করার পাশাপাশি দেশিয় মাছ গুলোও সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ অধিদফতরের উপসচিব মো. মনিরুজ্জামান বলেন ২০১০ সালের ১২ মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এক জনসভায় আশুগঞ্জে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। এর প্ররিপেক্ষিতে দেশের ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে আশুগঞ্জে একটি শিল্পাঞ্চল করা হচ্ছে। এজন্য ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের আশুগঞ্জ উপজেলার সোনারামপুর এলাকার সোহাগপুর, তালশহর ও বাসুতারা মৌজার প্রায় ৩শ' ২৮ একর জমি অধিগ্রহনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান 'এ শিল্পাঞ্চলে থাকবে বিদেশী বিভিন্ন শিল্প কারখানা এ মধ্যে বিদেশী গার্মেন্টস শিল্প, স্পিনিং মিল, ফার্মাসিটিক্যাল, টেক্সটাইল মিলসহ বিভিন্ন শিল্প কারখানা স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে।" গ্যাস, বিদ্যুৎ ও যোগযোগ ব্যবস্থার সুবিধা থাকায় আশুগঞ্জে এ শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে উদ্যোগে নিয়েছে সরকার।

আশুগঞ্জ এলাকার অধিবাসি বিশিষ্ট্য গবেষক শাজাহান আলম সাজু বলেন প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য অভয়াশ্রম নিমার্ণ ও প্রতি বছর জরিপকার্য চালাতে হবে। পাখি অধিক শিকার করা পুরুপুরি বন্ধ করতে হবে। এছাড়া জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সরকারী পরিকল্পনাগুলো আক্ষরিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। বিশেষ করে এলাকাটিতে বনায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। বনায়নয় না করে শুধু আধুনিক উন্নয়নের সঙ্গে নগরায়ণের সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে গেলে এই এলাকাটিতে জীববৈচিত্র্য পুরপরি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

আশুগঞ্জে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষেণের সুপারিশ

উদ্ভিজ্জ প্রজাতি সংরক্ষণে সুপারিশমালা

১) গরু-মহিষ ঢুকে ছোট ছোট চারাগাছের যাতে ক্ষতি করতে না পারে সে জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।
২) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প ও এনজিওদের মাধ্যম, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় ঐ এলাকায় উপযোগী নতুন চারাগাছ রোপন করতে হবে।
৩) বন্দর কলকারখানার বর্জ্য যাতে গাছপালার ক্ষতি করতে না পারে সে জন্য যথাযথ মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে
৪) বননিধন যাতে না হয় সেজন্য গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

<u>প্রাণী প্রজাতি সংরক্ষনে সুপারিশমালা</u>

৫) প্রানীরা গাছের লতাপাতা খেয়ে বেচে থাকে। কাজেই প্রাণীদের সুরক্ষার জন্য এলাকার বৃহৎ অংশ অভয়ারণ্য করা গেলে অনেক প্রাণী প্রজাতি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।
৬) গবেষণা এলাকায় খাল-বিল ও নদী ড্রেনেজ করে পানি সরবরাহ করতে পারলে বিভিন্ন ধরনের প্রানী পানি পান করে বেঁচে থাকতে পারবে তা ছাড়া এলাকার বেশ কিছু পুকুর খনন করতে হবে।

৭) মানুষ কর্তৃক প্রাণী শিকার বন্ধ করতে হবে।

পাখি প্রজাতি সংরক্ষণে সুপারিশমালা

৮) যেসব জমিতে পূর্বে ধানের আবাদ হতো সেখানে ধাইনু (যে সব পাখি ধান খেতে আসে তাদের ধাইনু বলে) পাখিরা অবাধে বিচরণ করতে পারত। এখন সে সব স্থানে ধানের জমি কমে যাওয়ায় অনেক ধানুই পাখি হ্রাস পেয়েছে। যদি বসতি নির্মানের ক্ষেত্রে ধানি জমির বিষয়টি লক্ষ্য রাখা হয় তা হলে এই সব পাখি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

৯) জেলেরা মাছ ধরার সময় পাতিহাঁস, শামুকভাঙ্গা, বক বালিহাঁস ইত্যাদি অবাধে শিকার করতে না পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১০) শীত মৌসুমে মৌসুমী পাখির উপর যদি অবিচার বন্দ করা যায় তাহলে স্থায়ীভাবে কিছু পাখি এখানে থেকে যেতে পারে। পাখির প্রতি যত্নশীল হলে। শীতের পাখি শিকার না করা হলে প্রতি বছর অনেক মৌসুমী পাখির দেখা পাওয়া যাবে। পাখি প্রজাতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে।

১১) ছোট ছোট খাল বিল ডোবাতে জেলেরা বিষ দিয়ে মাছ ধরতে না পারলে। অসংখ্যা জলচর পাখি যেমন মাছরাঙ্গা, কাঁচি ঝুড়া, শামুকভাঙ্গা বক ইত্যাদি সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

১২) তাছাড়া পাখিদের অভয়ারণ্য সৃষ্টি, গাছ কাটা বন্ধ করা ও গনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে আশুগঞ্জ উপজেলার পাখি প্রজাতি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণের সুপারিশমালা

১৩) পানির মধ্যে খাল-বিল ডোবা নালায় বিষ প্রয়োগ করে মাছ শিকার করা বন্ধ করতে হবে।

১৪) পুকুর পাড়ে বাঁধ দিয়ে বিদেশি মাছ চাষ করা হয়। যার ফলে দেশিয় অনেক মাছ হারিয়ে যাচ্ছে। দেশিয় মাছ সংরক্ষণে বিশেষভাবে পুকুরের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫) জেলেরা যাতে ঘনজাল দিয়ে নদীতে মাছ ধরতে না পারে সেজন্য ঘনজাল সম্পূর্ণভাবে নিষেদ্ধ করতে হবে। এর পরির্বতে পাতলা জাল সরবরাহ করতে হবে।

১৬) গবেষণা এলাকায় খাল ও নদী গুলো ডেজিং করা হলে মিষ্টি পানির প্রবাহ বেড়ে যাবে। এবং দেশীয় প্রজাতির অসংখ্য মাছ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

১৭) জেলেদের ঋণ দিয়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। মৎস্য সম্পদের উপর চাপ অনেকাংশে কমে যাবে।

১৮) ভারত কর্তৃক আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত না হয় সে জন্য দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিকভাবে বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। আর হলেও তা যেন কোনো ভাবে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৯) নদীর মাছ চাষের সময় যাতে ভাইরাস আক্রমন করতে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। মাছ এমন ভাবে প্রক্রিয়াজাত করতে হবে যাতে পরিবেশের ক্ষতি না হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

২০) অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট ও বেরিবাধ নির্মাণের ফলে পানি প্রবাহ যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে জন্য (EIA) এর মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে।

২১) আশুগঞ্জ বন্দরে শিল্পকারখানার বর্জ্য, জাহাজের মবিল, পেট্রোল ও বিষাক্ত গ্যাস যাতে পানিতে, না পড়ে সে জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারকে যথাযথ্য প্রকল্প গ্রহন করতে হবে।

২২) আশুগঞ্জ উপজেলা হুমকি, দূর্বল ও বিলুপ্তি সম্পন্ন উদ্ভিদ, প্রাণী, পাখি ও মৎস্য প্রজাতিগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো রক্ষা করার জন্য সরকারকে নতুনভাবে সংরক্ষণ নীতি গ্রহন করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, এলাকায় একমাত্র টেকসই উন্নয়ন দ্বারায় প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব। এলাকাটি প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নগরায়ণের দিকে প্রতি মুহুর্তে ধাবিত হচ্ছে। এই উন্নয়ন গতিকে ত্বরানিত করতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে এলাকাটির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সুব্যবস্থা নিতে হবে। এই এলাকাটির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ন এলাকা বলে ঘোষণা দেওয়া যেতে

পারে। তাহলেই এ অঞ্চলের উদ্ভিদ, প্রাণী, পাখি ও মৎস্য প্রজাতি জীববৈচিত্র্যের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।এলাকাটির পরিবেশগত উন্নয়ন সুনিশ্চিত না করে শুধু মাত্র প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করে এলাকাটিতে নগরায়ণ গড়ে তুলা ঠিক হবে না। এই এলাকাটির পরিবেশ দূষণমুক্ত রেখে সকল প্রকার উন্নয়ন বিষয় চিন্তা করতে হবে। ঢাকা ওয়াসা নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার বিষমানদি ইউনিয়নের মেঘনা নদীর একটি পয়েন্ট থেকে ঢাকায় খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করছে। নদীর গতি পথে দেখা যায় যে মেঘনা নদী আশুগঞ্জ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নারায়নগঞ্জের এই ইউনিয়নে আসে। শুধু জীববৈচিত্র্যই নয় পরিবেশগত দিক থেকেও এলাকাটিকে দূষণ মুক্ত রাখতে হবে। এই জীববৈচিত্র্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে সুব্যবস্থা নিতে হবে।

গ্রন্থপুঞ্জি (References)

Adjaye, J. A. (2000) Biodiversity loss and Economic Growth: A cross-country analysis. Contemporary Economic Policy, 21(2): 173-185pp.

Ahmed, (*1999*).The depletion of *biodiversity* is the result of various ... *BANGLADESH* : *STATE* OF THE ENVIRONMENT 2001. 78 .... million metric tons in 1990

Ali, Omar M: "Bangladesh Forests With Special Reference to Demand and Supply of Fuel wood'' a research mimio, BARC, Dhaka, 1990.

ASB (2006) Banglapediea: National Encyclopediea of Bangladesh. Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh.

Akter, A. and Zuberi, M.I. (2009) Invasive Alien Species in Northern Bangladesh: Identification, inventory and impacts, Internationnal Journal of Biodiversity and Conservation, 1(5): 129-134 pp.

Afrin, S., Sharmin, S. and Mowla, Q. A (2010) The Environmental Impact of Alien Invasive Plant Species in Bangladesh. In: proceedings of International Conference on Environmental Aspects of Bangladesh (ICEAB 2010), Japan, September 2010.

Altieri (1999) The ecological role of biodiversity in agroecosystems Invertebrate Biodiversity as Bioindicators of Sustainable Landscapes Practical Use of Invertebrates to Assess Sustainable Land Use 1999, Pages 19–31

BBS (1961) primary Report : Census 1961 (in Bengali). Bangladesh Bureau of Statistice, Ministry of Planning, Government of Bangladesh.

BBS (1961) Community Series: Comilla Zila. Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of Bangladesh

BBS (1971) primary Report : Census 1974 (in Bengali). Bangladesh Bureau of Statistice, Ministry of Planning, Government of Bangladesh.

BBS (1971) Community Series: Comilla Zila. Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of Bangladesh.

BBS (1981) Community Series: Brammon baria Zila. Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of Bangladesh.

BBS (1981) primary Report : Census 1981 (in Bengali). Bangladesh Bureau of Statistice, Ministry of Planning, Government of Bangladesh.

BBS (1994) primary Report : Census 1993 (in Bengali). Bangladesh Bureau of Statistice, Ministry of Planning, Government of Bangladesh.

BBS (2001) Community Series: Brammon baria Zila. Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of Bangladesh.

BBS (2011) Community Series: Brammon baria Zila. Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of Bangladesh.

BSRDI (2003) Community Series: Brammon baria Zila. Bangladesh Soil Resource Development Institute, Ministry of Planning, Government of Bangladesh.

BSRDI (2013) Community Series: Brammon baria Zila. Bangladesh Soil Resource Development Institute, Ministry of Planning, Government of Bangladesh.

Bangladesh Journal of Forest Science: Vol. 24, No. 1, Januaary June 1993, 1999, Bangladesh Forest Research institute Chittagong. Bangladesh.

Baten, M. A. (2010) Agriculture Biodiversity and Food Security: two sides of a coin. Final report submitted in the Center for Research and Action on development, Unnayan Onneshan, Dhaka, Bangladesh.

Brink, B. T. (2010) Rethinking Global Biodiversity Strategies. Netherlands Environmenttal Assessment Agency, Hague, Netherlands.

Brammer, H. (2002) Land Use and Land Use Planning in Bangladesh. The University press Ltd., Dhaka,80 pp.

Baillie, J.E.M., Hilton-Taylor, C. and Stuart, S.N. (eds). (2004) 2004 IUCN Red List of Threatened Species: A global species assessment. The World Conservation Union (IUCN), Switzerland and Cambridge.191 pp.

Bachner, B. (2010) Biodiversity Conservation and Endangered Species Protection. Environmental Laws and their Enforcement, 23(2): 56-60pp.

Brauer, I., Mussner, R, Marsden, K., Oosterhuis, F., Rayment, M., Dodokova, A. (2006) The Use of market Incentives to preserve Biodiversity. Agriculture, Ecosystems & Environment, 98(1-3): 483-491 pp.

CBD (2006) Global Biodiversity Outlook 2. Secretariat of the Convention on Biological Diversity (SCBD), Montreal, 81 pp.

Chowdhury G. G. (1999) Bangladesh State of Environment Report, Ministry of Environment and Forest Government of people's Republic of Bangladesh. UNDP.

Constanza, et al. (1997) The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital. Nature, 387: 253-260pp.

Das Dilip Kumar (1990): Forest Types of Bangladesh Bulletin 6 Plant Taxonomy Series. Government of Forest Research Institute, Chittagong 1990.

Das, D. K. (1989): " Forest Types of Bangladesh '' Seminar Paper presented at Sixth National Botanical Conference held in the University of Chittagong, 1989.

De Candolle A (1855) Geographie Botanique raisonnee: ou, exposition des faites principaux et des lois concervant la distribution geographique des plantes de l'epoque actuelle. V Maisson, Paris.

Dey, T. k. (2006) Useful Plants of Bangladesh (in Bengali), 2nd revised edition. Aligarh Library, Dhaka, Bangladesh, 945-949pp.

Diamond, J.M. (1975) The island dilemma: lessons of modern biogeographic studies for the design of natural reserves. *Biol. Conserv.* **7**, 129–46

FAO (2009) The State of Food Insecurity in the World. Food and Agriculture Organisation (FAO), Rome.

Graham, F. (1990) The Audubon Ark. Alfred Knop, New York

Harris, L.D. and Silva-Lopez, G. (1992) Forest fragmentation and the conservation of biological diversity. In Conservation Biology, the Theory and Practice of Nature Conservation and Management (P.L. Fiedler and S.K. Jain, eds) pp. 197–237. New York:

Hossain, M. K. (2001) Overview of the Forest Biodiversity in Bangladesh. In: Assessment, conservation and sustainable use of forest biodiversity (CBD Technical Series no. 3) Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, 33-35pp.

Hussain, K. Z. (1992) Wildlife preservation in Bangladesh. Wildlife Newsletter,4: 5-10pp.

Holden, S. T., Shiferaw, B. and Wik, M. (1998) poverty, Market Imperfections and Time Preferences: of relevance for environmental policy? Environment and Development Economics, 3 (1): 105-30pp.

Islam, S. S. (2003) State of Forest Genetic Resources Conservation and Management in Bangladesh. In: Forest Genetic Resource Working Papers, Forest Resources Development Service, Forest Resources Division. FAO, Rome, 31pp.

Jeffries, M.J. (1997) Biodiversity and Conservation, Routledge, London and New York.

John C. *Jeavons* BA. Journal of Sustainable Agriculture. Volume ... Journal of Sustainable Agriculture. Volume 33, *2009* - Issue 4. Published online: 5 May *2009*

Kaimowitz, D. and Angelson, A. (1998) Economic Models of Tropical Deforestation. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor. 139pp.

Kannan, R. and James, D. A. (2009) Effects of Climate Change on Global Biodiversity: A review of key literature. Tropical Ecology, 50 (1): 31-39 pp.

Khan, M. S., M.M. Rahmam, and M. A. Ali. (Eds). (2001) Red Data Book of Vascular Plants of Bangladesh. Bangladesh National Herbarium. Dhaka. 179pp.

Khuda, Z. R. M. M. (2001) Environmental Degradation: Challenges of the 21st century. Environmental Survey and Research unit, Dhaka.

Koziell, I. (2001) Diversity not Adversity: Sustaining Livelihoods with Biodiversity. International Institute for Environment ant Development (IIED) and Department for International Development (DFID), England, 58 pp.

Leopold, A. (1933) Game Management. Charles Scribner's sons, New York.

Lovejoy, T.E., 1980. in: Barney, G.O. (Ed.), The Global 2000 Report to the President The Technical Report, vol. 2. Penguin, , pp. 327–332

Lovejoy, T.E., Rankin, J.M., Bierregaard, R.O.Jr., Brown, K.S.Jr., Emmons, L.H. and Van der Voort, M.E. (1984) Ecosystem decay of Amazon forest remnants. In *Extinctions* (M.H. Nitecki, ed.) pp. 295–326. Chicago:

Mahatab (1989), Labor force in 'others' category and Activity rate of Bangladesh, *1991*. Fig 3.19 ... *MoEF*. Ministry of Environment and Forest. NAP. National Action Programme. NAPA ..... Notable among them are those of *Mahatab* (1989), BUP (1994), Ali (1999).

Mokhlesur, R., M. (1995) " Wetland and Biodiversity: A case study of common property resources in Bangladesh''. In: Fifth Annual Common Property Conference of the Internationnal Association for the Study of Common, Norway, May 1995.

McNeely, J.A. (2002) Forest Biodiversity at the Ecosystem level: Where do people fit in? Unasylva (Special issue on Forest Biological Diversity), 53 (2): 10-15pp.

Marx, W. (1967) The Frail Ocean. Coward-McCann, New York.

Mitchell, J. G. and C. L. Stalling, (1970) Ecotactics: The Sierra Club Handbook for Environment Activists. Pocket Books, New York, 287 pp.

Mittermeier, R. A., Myers, N., Thomsen, J. B., Fonseca, G. A. and Olivieri, S. (1998) Biodiversity Hotspots and Major Tropical Wilderness Areas: Approaches to setting conservation priorities. Conservation Biology, 12: 516-520pp.

MOL (2011) Land Zoning Report : Ashuganj Upazila . District : brahmanbaria Ministry of land, Dhaka, Bangladesh.

Mukul, S. A. and Saha, N. (2010) Contribution of Indigenous Agroforestry Systems in Biodiversity Conservation and Ecosystem Functioning: Experiences from four contrasting systems of Bangladesh. A review report submitted in Center for Research on Landuse Sustainability, Maizdee 3800, Bangladesh.

Mukul, S.A. 2007. Biodiversity Conservation and Sustainnable Developmant in Bangladesh: An overview of the present status, management problems and future prospects. A review report submitted at the Department of Forestry and Environmental Science, Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet, Bangladesh.

Nishat, A., huq, S. M. I., Barua, S. P., Reza, A.H.M.A. and Khan, A.S.M. (2002) Bio-ecological Zones of Bangladesh. The World Conservation Union(IUCN), Bangladesh, 141 pp.

Ney-nifle, M. and Mingel, M. (1999) Habitat Loss and Changes in the Species – Area Relationship. Conservation biology, 14 (3): 893-998pp.

Norse, E.A., McManus, R.E., 1980. Environmental Quality 1980: The Eleventh Annual Report of the Council on Environmental Quality. Council of Environmental Quality pp. 31–80.

Osborn, F. (1948) Our Plundered Planet. Pyramid, New York. 176 pp.

Pingali, P.L. and Rosegrant, M. W (1994) Confronting the Environmental Consequence of the Green Revolution in Asia. Agriculture, Ecosystems & Environment, 95 (3): 483-491 pp.

Perrings, C. and Gadgil, M. (n.d) Conserving Biodiversity: Reconciling local and global public benefits. Unasylva, 52 (3): 14-17 pp.

Rahman, M. M.(2004) Forest resources of Bangladesh with Reference to Conservation of Biodiversity and wildlife in particular for poverty Alleviation. In:Sim, H.C. Appanah, S. and Youn, Y.C. (Eds), Forests for poverty Reduction: Opportunities with clean development mechanism, environmental services and biodiversity. Proceedings of the workshop held at Seoul, Korea in 27-29 august 2003. FAO Regional office for Asia and the Pacific (FAO-RAP), Bangkok. 139-148pp.

Roe, D. and Elliott, J. (2004) poverty Reduction And Biodiversity Conservation: Rebuilding the bridges. Oryx, 38 (2): 77-80pp.

Rasheed, K. B. S. (2008) Bangladesh: Resource and environmental profile. A H development Publishing House, Dhaka.

Sandler, t. (1999) Tropical Deforestation: Markets and Market Failures. Land Economics, 69(3): 225-33pp.

Sing, s. (2008) Environmental Geography. Prayag pustak Bhawan, India.

Slingenberg, A., Braat, L., Windt, H.V. D., Rademaekers, K.,Eichler, L., and Turner, K. (2009) Study on Understanding the Causes of Biodiversity loss and the Policy Assessment Framework. Final report submitted in European Commission Directorate-General for Environment.

Stebbins (1971) The role of seed size in seedling establishment in dry soil conditions—experimental evidence from semi-arid species MR Leishman, M Westoby - Journal of Ecology, 1994 - JSTOR

Thrupp, L. A. (2000) Linking Agricultural Biodiversity and Food Security: The valuable role of agro-biodiversity for sustainable agriculture. International Affairs, 76(2): 265-281 pp.

Uddin, .M.B, Mukul, S.A., khan, M. A. S.A and Marzan, B. (2008) protected Areas of Bangladesh: Current status and efficacy for biodiversity conservation. In: Proceedings of Pakistan Academy of Science, 45 (2): 59-68pp.

Vavilov, N.I. 1935. Theoretical Basis for Plant Breeding, Vol. 1. Moscow. Origin and Geography of Cultivated Plants. Pages 316-366 *in* The Phytogeographical Basis for Plant Breeding (D. Love, transl.). Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK.

Wilson, E.O. (1988) the Current State of Biological Diversity In: wilson, E.O. and Peter, F. M. (eds). Biodiversity. National Academy press, Washington, DC. 1-18pp.

www.straight.com (Accessed on/03/07/12)

আজাদ, মো আবুল কালাম, সেলিম এম হক, মো. ওয়াহিদুজ্জামান (২০১২) 'বায়োডাইভারসিটি এণ্ড কনজারভেশন" ক্লাসিক পাবলিকেশন, ঢাকা-১১০০

আলী সৈয়দ সালামত (২০০৩)ঃ "বন ব্যবস্থাপনা," বাংলাপিডিয়া, ভলিউম ৬, বাংলাদেশ জ্ঞানকোষ। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ঢাকা।

আলী, সৈয়দ সালামত (১৯৯১)ঃ "বাংলাদেশের সামাজিক বনায়নের প্রেক্ষিত এবং সার্বিক উন্নয়নে তার ভূমিকা"। বিশ্বখাদ্য দিবস. ১৯৯১, বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।

আহমদ,নওয়াজেশ (২০০৩)ঃ"উদ্ভিদ কূল", বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। ঢাকা বাংলাদেশ।

ইমাম, হাসান কাজী (২০০০) পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত। ঢাকা।

ইলাহী, মউদুদ (১৯৯৫)ঃ "বাংলাদেশের মৃত্তিকা"। বিজ্ঞান পত্রিকা । ২২বর্ষঃ ১ম সংখ্যা। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ইয়াসমীন, শাহিন (১৯৮৭)ঃ রাজশাহী নগর বিস্তার ও আসবাব শিল্পের ক্রমোন্নতি। অপ্রকাশিত এমএসসি প্রজেক্ট পেপার। ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী।

উদ্দীন, জসীম (২০০০)ঃ " ভেষজের জন্য রয়ালটি দিতে হবে।" পরিবেশ বর্ষ ৪, সংখ্যা ৩। IUCN ঢাকা ।

কবেরী (১৯৯৮)ঃ "সামাজিক বনায়ন বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট", Mohmudul Ameer (ed.) Zoological Society of Bangladesh 11th Biennial National Conference (1998) Dhaka.

কবীর, শামসুর (২০০২) ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অবকাঠামো। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ঢাকা। বাংলাদেশ।

খান, শরফত হোসেন (১৯৯১)ঃ "বাংলাদেশ উদ্ভিদ কৌলিক সম্পদ ও তার সংরক্ষণ"। বিশ্বখাদ্য দিবস ১৯৯১। ১৬ অক্টোবর, ১৯৯১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ফার্মগেট, ঢাকা।

খান, সালাম (২০০০) ঃ "দেশের ভেষজ উদ্ভিদ সংরক্ষণের আইন নেই" পরিবেশপত্র, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৩।

খান, এম, এ খালেক (২০০৩)ঃ সামাজিক বনবিভাগ রংপুর, বন অধিদপ্তর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। জুন, ২০০৩, ঢাকা, বাংলাদেশ।

খান, শামসুল কবীর (২০০০)ঃ " বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ", বাংলাদেশের অর্থনীতি, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেম সরকার (২০০৩)ঃ পরিবেশ আইন সংকলন। এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯০)ঃ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ১৯৯০-৯৫, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৬)ঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ১৯৯৬-২০০২, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২)ঃ বাংলাদেশ বন সম্পদ, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৩) ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০, পরিকল্পনা, মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০৩)ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০২। ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০৪)ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪। ঢাকা।

গনি আব্দুর (২০০৩)ঃ " ভেষজ উদ্ভিদ", বাংলাপিডিয়া, ভলিউম১, বাংলাদেম জাতীয় জ্ঞানকোষ। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। ঢাকা।

চক্রবর্তী তপন (২০০৩)ঃ বাংলাদেশের বন ও বনাঞ্চল, দিবা প্রকাশ। ঢাকা। বাংলাদেশ।

চৌধুরী এ. কে. এম বজলুল করিম ও নবী শাহ আহমদ (২০০৭)ঃ বায়োডাইভারসিটি এন্ড কনজারভেশন। কবির পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজা, ঢাকা।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (১৯৮৮)ঃ আর্থনীতিক ভূগোল। বাংলাদেশ ও বিশ্ব। দি সিটি প্রেস, ঢাকা।

জুবেরী এম ইকবাল (২০০৩)ঃ "লোকজ ভেষজ জ্ঞান" বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতয়ি জ্ঞানকোষ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ঢাকা।

তারীক, হাসান (১৯৯৫)ঃ পরিবেশ বিজ্ঞান ও জীব বৈচিত্র্য, রাজশাহী।

তাহা, আবু (২০০০)ঃ পৃথিবীর আঞ্চলিক ধরন, জনসংযোগ দপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

দৈনিক ইনকিলাব ২৭ মে ২০০৪, উজাড় বৃক্ষ" বিরীন বন" চৌধুরী আফতাব। ঢাকা।

দৈনিক প্রথম আলো ২৪ জানুয়ারী ২০০৪। আরিফুর রহমান " সামাজিক বনায়ন পাল্টে দেবে চরের চেহারা," ঢাকা।

নিশাত আইনুন ও অন্যান্য (২০০২)ঃ সুন্দরবনে কিছুক্ষণঃ দি বাংলাদেশ সুন্দরবনস এ ফটোরিয়েল সোজারন, IUCN ঢাকা ।

পাল ও সরকার (২০০১)ঃ বায়োডাইভারসিটি উদ্ভিদ এবং প্রাণী বৈচিত্র্য, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী।

পাল, নিমীত কুমার ও সরকার মোঃ আব্দুল মান্নান (২০০১)ঃ বায়োডাইভারসিটি, রাজশাহী ২০০২।

পাশা, কামাল মোস্তফা (২০০৩)ঃ " বনজ সম্পদ ও বনশিল্প", বাংলাপিডিয়া, ভলিউম ৬, বাংলাদেশ জ্ঞান কোষ। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

পিপলস রিপোর্ট অন বাংলাদেশ ইনভায়রনমেন্ট (২০০১)ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সমন্বয় ও জাতি সংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী। IUCN ঢাকা ।

বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৫)ঃ ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট এ্যাকশন প্লান, নেমাপ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিল্লাহ মুস্তাইন, এ এইচ এম (২০০৩)ঃ" বনায়ন একটি কেস স্টাডি", জনপ্রতিবেদন, ২০০১, বাংলাদেশ পরিবেশ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালায় এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী, উন্নয়ন কর্মসূচী, ঢাকা।

ভূইয়া আলী আকবার (১৯৯১)ঃ "নগরায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসাবে বৃক্ষের অবদান" বিশ্বখাদ্য দিবস, ১৯৯১, ১৬ অক্টোবর, ১৯৯১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ফার্মগেট, ঢাকা।

মন্টু, রফিকুল ইসলাম (২০০৩)ঃ " সংরক্ষিত বনভূমি টেংরাগিরি", জন প্রতিবেদন (২০০১) বাংলাদেশের পরিবেশ । পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী, উন্নয়ন কর্মসূচী, উন্নয়ন সমন্বয়, ঢাকা।

মৌ মহুয়া (২০০০)ঃ "ভেষজ উদ্ভিদেও সমাহার ", ভারতবিচিত্রা, ভারতীয় হাইকমিশন, গুলশান-১ ঢাকা।

সাত্তার, এম. এ (২০০৩)ঃ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাপিডিয়া ভলিউম ৬, জাতীয় জ্ঞানকোষ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ২০০৩, ঢাকা।

সাহা কৃষ্ণ জীবন ও বসু চন্দ্র সুনির্মল (২০০৫) "বায়োডাইভারসিটি এ্যান্ড কনজারভেশন" গ্রন্থ কুটির। ঢাকা-১১০০

সিদ্দিকী, গিয়াস (১৯৯৪)ঃ সবুজ স্বর্ণঃ বনদস্যুদের তৎপরতা। পরিবেশ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ঢাকা ১৯৯৪।

সাজু অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম (২০১১)ঃ "মুক্তিযুদ্ধ এবং আশুগঞ্জ" মাহদী প্রকাশনী ঢাকা-১০০০

সুলতানা, সানজিদা (২০০৩)ঃ "মধুপুর বন" জন প্রতিবেদন ২০০১ বাংলাদেশ পরিবেশ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সমন্বয় ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী, ঢাকা।

হক, শামসুল (১৯৯১)ঃ" বাংলাদেশের পশুসম্পদ উন্নয়নে বনজ ও কৃষিজ সম্পদেও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা"। বিশ্বখাদ্য দিবস ১৯৯১, ১৬ অক্টোবর। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।

হাবীব, মোহাম্মদ গোলাম (২০০৩)ঃ " বনভূমি সংরক্ষণ", বাংলাপিডিয়া ভলিউম ৬, জাতীয় জ্ঞানকোষ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ২০০৩, ঢাকা।

হাসান, আব্দুল (২০০২)ঃ বায়োডাইভারসিটি এ্যান্ড কনজারভেশন। হাসান বুক হাইজ, ঢাকা।

হাসান, মোহাম্মদ মীর (২০০৩)ঃ " বনভূমির মৃত্তিকা এবং বসতবাড়ি ও সামাজিক বন ", বাংলাপিডিয়া, ভলিউম ৬, বাংলাদেশ জ্ঞান কোষ। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

হাসান ড. মোহাম্মদ আবুল (২০০০) "বায়োডাইভারসিটি এ্যান্ড কনজারভেশন" হাসান বুক হাউস। ঢাকা-১১০০

হুদা শামসুল এ জেড এম (১৯৯১)ঃ ' বাংলাদেশ দূর্যোগ প্রতিরোধে বৃক্ষ ও বনায়ন "। বিশ্বখাদ্য দিবস ১৯৯১। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাইন্সিল ফার্মগেট। ঢাকা।

রয় এ হেইগ্যান (২০০১)ঃ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন অনুসরনিকা। IUCN ঢাকা ।

রহমান, মাহফুজুর (২০০৩)ঃ "বনবাস্তব্য" বাংলাপিডিয়া, ভলিউম ৬, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইট। ঢাকা। বাংলাদেশ।

রহমান, শামসুর ম. (১৯৯৮)ঃ উদ্ভিদ পরিবেশতত্ত্ব ও উদ্ভিদ ভূগোল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। রাজশাহী।

রহমান মোঃ হাবিবুর (২০০০)ঃ "বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন", বাংলাপিডিয়া, ভলিউম ৬, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

রায়, অনিরুদ্ধ ও নাথ শেখর (২০০০)ঃ " আমাদের ঔষধি আমাদের সম্পদ" পরিবেশ পত্র, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৩। সমুন্নয় প্রকাশনা, ইউএন ডিপি, সেল্প।

রুমী, রফিকুল আলম (২০০০)ঃ " পরিবেশ সংরক্ষণে দেশজ উদ্ভিদ বৈচিত্র্যেও ভূমিকা ঃ নাগরিক সমাজের করনীয়"। এডাব, রাজশাহী।

পরিশিষ্ট

সকল জলবায়ু গত সকল তথ্য

টেবিল ৬.১: শ্রীমঙ্গল আঞ্চলের বৃষ্টিপাত সংঘটনের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন (মি.মি.)(গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ৫৯)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
১৯৫০-৬০	১২.১	৩৭	৭৯.১	১৮১.৮	৩৪৪.২৭	৪৮১.৮১	৩১৪.০৯	৩৮৮.৬	২৫৮.৭২	১৯২	৫৬.৪৪	২.৯
১৯৬১-৭০	২২.১২	২১	৮৯.২৫	১৭৪.৩৩	২৬৩.৬২	৫৩৭.৮৭	৩৪৪.৩৭	৩২১.২	২০১.৫	১৫৮.৩৭	২৭.৩৭	৫.৬
১৯৭১-৮০	০.৬	৩৫.৩৩	৩০.৮৫	২৬৮	৪৪৮.২৮	৬২৯.২৮	৩৭০.২৮	২৬৪.৩৩	২১১.৩৩	১১১.৩৩৩	৫৪.৪২	১১.৫৭
১৯৮১-৯০	২.২৫	২৭.৬৩	১১১.৬৬	২৭১.১২	৪৬৪.১২	৩৮০.৫	২৯৯.৩৭	৩৭২.২২	৩১১.৬৬	১৩৮.৮১	৫২.৫৫	৯.২২
১৯৯১-০০	৯.৭	৩৬.১	৯৪.৮	১৪৩.৫	৪০৫	৩৯৫.২	৩৬৭.৯	৩০৭.৯	২৭৩.৬	১৭৬.৩	২৪.৩	১৯.৩
২০০১-১০	৪.৭	৩০.২	৬৮.৮	২৪৬	৪৬৫.২	৪৮৬.৩	৩৬৭.৭	৩৩৬.৭	২৬৫.২	১৭৫.৪	৩৩.৩	১০.৮
২০১১-১৪	২.২৫	৭.২৫	৩৮.২৫	১৪৬.৫	৫০৬.৫	৪১৯.২৫	২৮৮	৩৬৮.৫	২৪৩.৭৫	১২৪.৭৫	৬.৫	১.২৫

টেবিল ৬.২: কুমিল্লা আঞ্চলের বৃষ্টিপাত সংঘটনের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন (মি.মি.)(গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ৬০)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
১৯৫০-৬০	২.১৫	২৩.৮	৫১.৬৩	১৩২.১১	২৭৯.৪৪	৫৪৬.৭	৪৯৭.৮১	৪৪০.৬৩	৩৫১.৫৪	২৩৪.৩৩	৬৮.৪	৩.৯
১৯৬১-৭০	৭.৪৪	১০.৫	৩২.৮৭	১৪২.৩৩	১৬৭	৫৫২.৭৫	৫২০.৮৭	৪৪৭.৭	২৮২.২২	২৩৪.৬২	৩৩.২৫	১২
১৯৭১-৮০	১.৮৮	২৩.৩৩	৪০.৫৭	১২৬.৫	২৮৬.২৮	৩৬৩.৮৭৫	৩৮৪.৫	২৬৬.৮৮	১৮০.৫৫	১২৭.৪৪	৪৭.৫৫	১১
১৯৮১-৯০	৫	১১.৭	৫৫.৮	১৭৯.৫	৩৩১	৩৩৪.৮৮	৩৫৯.৩	৩৪২.৭	২৬১.৩	১৪৩.৮	৩.৭৪	৮.৫
১৯৯১-০০	১১.৪	৩৯.৯	৯০.৯	১৪৪.৮	৩৫১.১	৩৩৮.২	৪৭৩.৮	২৯৬.৩	২১৭.২	১৫৮.৮	৪১.৭	১৪.৬
২০০১-১০	৬.৭	১১.৩	৫৪.১	১০১	২৮৪.৪	৪৪২.৪	৩৮৮.৩	২৬৩.৩	২৮৩.৭	১৯৫.৪	২৪.২	৬.২
২০১১-১৪	৪	৩	২২	৭৮.৭৫	৩০৫.৫	৩৪৯	২৬৪.৫	৩৮৩.৭৫	২৪০.৫	৯৪.৭৫	২৫.৫	১.৫

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
১৯৫০-৬০	২৮.০৬	৩২.০৪	৩৫.৯৭	৩৭.৯২	৩৬.৪	৩৫.২৭	৩৪.৬৩	৩৪.৮৫	৩৪.৬৪	৩৩.৮৯	৩১.৪	২৮.৮৩
১৯৬১-৭০	২৮.৭৬	৩২.১২	৩৫.৩১	৩৬.৩৪	৩৬.৫১	৩৫.৯৩	৩৪.৯২	৩৪.৬	৩৫.১৭	৩৩.৬৩	৩১.০৭	২৯.০৭
১৯৭১-৮০	২৮.০২	৩১.৬৫	৩৫.৮১	৩৫.৮১	৩৫.৮২	৩৪.৯৫	৩৫.১৫	৩৫.৭	৩৪.৮১	৩৩.৯৮	৩১.৯৬	২৯.১৩
১৯৮১-৯০	২৮.৬৩	৩১.২৬	৩৫.৬৮	৩৬.৪৮	৩৬.০৫	৩৫.৬৮	৩৫.২৪	৩৫.৪৩	৩৪.৭১	৩৪.৩৫	৩১.৯৬	২৯.৮৬
১৯৯১-০০	২৮.৪৯	৩০.৬৪	৩৫.০৮	৩৬.৩৪	৩৬.১৮	৩৫.৬৫	৩৫.৩৮	৩৫.৩৪	৩৫.৩১	৩৪.৪৭	৩২.৫৪	২৯.০৮
২০০১-১০	২৮.৮৪	৩২.২৯	৩৫.৯৩	৩৫.৬২	৩৫.৮৩	৩৫.২	৩৫.৪৮	৩৫.৭	৩৫.৫৮	৩৪.৬৮	৩২.৩	২৯.৭২

২০১১- ১৪	২৯.১৩	৩২.০৫	৩৫.৭	৩৭.২	৩৫.৪২	৩৫.৯	৩৫.৭	৩৫.৫	৩৫.৮২	৩৪.৯২	৩২.৯২	৩০.৪

টেবিল ৬.৩: সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ভিত্তিতে শ্রীমঙ্গল স্টেশনের জলবায়ুগত পরিবর্তন (ডি. সেন্টি.)(গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ৬১)

টেবিল ৬.৪: সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ভিত্তিতে কুমিল্লা স্টেশনের জলবায়ুগত পরিবর্তন (ডি. সেন্টি.)(গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ৬২)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
১৯৫০-৬০	২৯.০৪	৩২.৩৮	৩৫.৭৫	৩৭.৬৬	৩৫.৭৮	৩৪.৪৮	৩৩.৩৮	৩৩.৯৭	৩৪.৪৫	৩৩.৮৮	৩১.৫৩	২৯.৬
১৯৬১-৭০	২৮.৬৫	৩২.৭	৩৬.১৫	৩৬.৪১	৩৬.৩৫	৩৪.৫৮	৩৪.৬	৩৪.০২	৩৪.৮২	৩৩.৭৮	৩১.৯৪	২৮.৮৬
১৯৭১-৮০	২৮.৩৬	৩১.৭৭	৩৫.৩৬	৩৫.২৩	৩৫.৯১	৩৪.২১	৩৩.২৭	৩৩.৭২	৩৩.৯৬	৩৩.২৪	৩২.১৬	২৮.৮৭
১৯৮১-৯০	২৮.৯৫	৩১.০৯	৩৪.০৬	৩৪.৪১	৩৫.৪	৩৫.২৩	৩৪.১৭	৩৪.৯৮	৩৪.৫৮	৩৩.৯৬	৩২.৩৮	২৯.৫৮
১৯৯১-০০	২৮.৭	৩০.৩৯	৩৩.৮৪	৩৫.৫৬	৩৫.৫৬	৩৪.৯	৩৪.৬২	৩৫.০১	৩৪.৯৩	৩৪.৫৭	৩২.৬৭	২৯.৩৬
২০০১-১০	২৮.৫৭	৩১.৫১	৩৩.৯২	৩৫.৭	৩৬.২৮	৩৫.৫৭	৩৪.৮৯	৩৫.২৬	৩৫.২৭	৩৫.০৪	৩২.৪	২৯.৭৬
২০১১- ১৪	২৮.৬	৩০.৪৭	৩৪.১	৩৫.৮৮	৩৫.৯	৩৫.৭৭	৩৫.২২	৩৪.৮৭	৩৫.৩৫	৩৪.৭৫	৩২.৬৭	৩০

টেবিল ৬.৫: সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ভিত্তিতে শ্রীমঙ্গল স্টেশনের জলবায়ুগত পরিবর্তন (ডি.সেন্টি.)(গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ৬৩)

বছর	জানু	ফেব্র	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
১৯৫০-৬০	৪.৭৪	৫.৩	৯.৮১	১৫.৩	১৮.২৯	২১.০৯	২২.৭৩	২৩.২২	২২.২৩	১৭.৪৪	১১.২৯	৭
১৯৬১-৭০	৪.৫৩	৫.৩৬	১০.৬	১৪.৬৭	১৮.৪২	২১.৭৮	২৩.৬২	২২.৮৪	২২.২	১৬.০৩	৯.৮৬	৬.৫
১৯৭১-৮০	৫.২৬	৬.০৬	১০.২৬	১৭.২৮	১৮.৬২	২০.৯	২৩.১২	২৩.৪৫	২২.৩৫	১৬.৮	১২.৮৭	৭.১
১৯৮১-৯০	৬.১৪	৮.৩৩	১১.৯২	১৭.২৩	১৮.৯	২২.১৭	২৩.১৮	২২.৮৪	২২.৯১	১৮.৩৭	১২.৩৫	৯.৯৬
১৯৯১-০০	৬.২৩	৭.৮৩	১১.৫১	১৬.৬১	১৯.৪৮	২১.২৫	২৩.৩	২৩.২৭	২২.৫২	১৮.২	১২.৫৭	৮.৪
২০০১-১০	৬.১২	৭.৬১	১১.৩১	১৭.৫	১৯.৯৭	২১.৯৫	২৩.৭৯	২৩.৭৫	২৩.১৩	১৮.৩৮	১২.২৩	৮.১৬
২০১১- ১৪	৫.৫৭	৭.৫৭	১০.২২	১৬.৬২	১৯.৪	২২.২৩	২৪.৪২	২৪.০২	২৩.৪	১৭.০৭	১১.১৭	৭.৩৩

টেবিল ৬.৬: সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ভিত্তিতে কুমিল্লা স্টেশনের জলবায়ুগত পরিবর্তন (ডি. সেন্টি.)(গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৬৩)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
১৯৫০-৬০	৮.৯৬	৯.৬৮	১৪.২৬	১৮.৭	২০.২৪	২২.১৩	২৩.১৬	২৩.২৪	২২.৯	২০.৩৬	১৪.৪৩	১০.৮
১৯৬১-৭০	৮.৭৫	৯.৮২	১৫.১৪	১৮.৪২	১৯.৫৪	২১.৩৮	২২.১	২১.৯৪	২২.৮১	২০.৯৭	১৪.৪	১০.৪৮
১৯৭১-৮০	৮.০৬	১০.৩২	১৪.০১	১৯.১৬	২০.০৬	২২.১৬	২৩.৮৮	২৩.৩	২৩.২৫	২০.১৫	১৫.০৬	১০.৫২
১৯৮১-৯০	৯.১	১১.২৬	১৩.৯২	১৮.৫৮	১৯.৭৩	২২.৩৫	২৪.০৫	২৩.৭৩	২২.৯৩	১৯.৫৩	১৪.২৫	১০.৪
১৯৯১-০০	৮.২৮	১১.৩১	১৪.৭৮	১৭.৮৮	২০.১৮	২২.৫৯	২৩.৫৭	২৩.৮৩	২৩.৩৬	২০.১৮	১৪.১১	৯.৯৭
২০০১-১০	৮.৭৭	১১.১৭	১৫.০২	১৮.৫১	২০.২৭	২২.৬৪	২৩.৮৭	২৪.২৫	২৩.৩৮	২০.৫	১৪.৬	১০.১৬
২০১১- ১৪	৮	১১.৫	১৪.৭৭	১৮.৬৭	২০.৫২	২৩.২৫	২৪.৪৫	২৪.২২	২৪.৫	১৯.৮২	১৪.৫৭	১০

টেবিল ৬.৭: শুষ্ক তাপমাত্রার ভিত্তিতে শ্রীমঙ্গল স্টেশনের জলবায়ুগত পরিবর্তন (ডি. সেন্টি.)(গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৬৪)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
১৯৫০-৬০	১৪.৫১	১৭.৭	২৩.২	২৬.৯৪	২৭.৬	২৭.১৮	২৭.১৩	২৭.০৭	২৬.৮৩	২৫.১৭	২০.৫২	১৭.৭৭
১৯৬১-৭০	১৪.৫৩	১৭.৯৯	২৪.৫৪	২৭.৬	২৮.২৮	২৭.৫২	২৭.৪৬	২৭.২৪	২৭.২৬	২৫.১৭	২০.৫৮	১৫.৬৯
১৯৭১-৮০	১৪.৯৮	১৮.০১	২৩.৬৩	২৬.৬৫	২৬.৭	২৭.২২	২৭.৫৭	২৭.৬২	২৭.৩১	২৫.৬৯	২১.৪৩	১৬.৪৯
১৯৮১-৯০	১৮.০৫	২০.৮৫	২৪.৬৪	২৭.২৩	২৭.৭৩	২৮.৬	২৮.১৫	২৮.৪	২৭.৬৫	২৬.৯৫	২২.৭	১৯.৫৭
১৯৯১-০০	১৬.৩১	১৯.৩	২৪.০৭	২৬.৫৯	২৬.৯৭	২৭.৭৮	২৭.৯২	২৭.৯৯	২৭.৫৮	২৬.২৩	২২.৩৫	১৭.৮৩
২০০১-১০	১৬.২৭	১৯.৮৬	২৪.০৩	২৬.৬৩	২৭.১৮	২৭.৬৪	২৮.০১	২৮.২৪	২৭.৮১	২৬.২৫	২২.১৬	১৮.১৮
২০১১- ১৪	১৫.৪৭	১৫.০৭	২৪.১৭	২৬.৫৭	২৭.২	২৮.১	২৮.৪৫	২৮.১	২৮	২৬.২২	২১.৪২	১৭.৩

টেবিল ৬.৮: শুষ্ক তাপমাত্রার ভিত্তিতে কুমিল্লা স্টেশনের জলবায়ুগত পরিবর্তন (ডি.সেন্টি.)(গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৬৫)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
১৯৫০-৬০	১৮.২১	২০.৬৭	২৪.৯৭	২৮.১৪	২৮.৬৪	২৮.০৭	২৭.৬৮	২৭.৮	২৭.৮৮	২৬.৭৬	২২.৬	১৯.৪৩
১৯৬১-৭০	১৮.৬৫	১৫.০৮	২৫.৮৮	২৮.১	২৮.৯২	২৭.৮২	২৭.৮১	২৭.৬১	২৮.১১	২৬.৮৮	২৩.৭৪	১৬.৭
১৯৭১-৮০	১৯.৫৭	২১.৯২	২৬.৩৭	২৮.২৬	২৮.৫৭	২৮.২৮	২৭.৯৬	২৮.০৩	২৮.৩৭	২৭.৪৮	২৪.৫৪	২০.৪
১৯৮১-৯০	১৮.৫২	২১.১৭	২৪.৬৩	২৬.৬৭	২৭.৯৮	২৮.২৯	২৭.৮৬	২৮.২৯	২৭.৯৩	২৬.৯৩	২৩.৪২	১৯.৪৪
১৯৯১-০০	১৭.৯২	২০.৯৫	২৪.৮৫	২৬.৯৭	২৭.৭১	২৮.২৪	২৭.৯৭	২৮.১৬	২৭.৯৩	২৬.৯৫	২৩.৪৪	১৯.১৯
২০০১-১০	১৭.৯৪	২১.৬	২৫.১৬	২৭.৫৬	২৮.২১	২৮.২৪	২৮.২৯	২৮.৬২	২৮.২৯	২৭.১২	২৩.৫৬	১৯.৬৭
২০১১- ১৪	১৭.৫২	২১.২৭	২৫.৩২	২৭.৪৭	২৮.২	২৮.৮	২৮.৬২	২৮.৩	২৮.৪৭	২৭.১৩	২৩.২	১৮.৮

টেবিল ৬.৯: আর্দ্রতা ভিত্তিতে শ্রীমঙ্গল স্টেশনের জলবায়ুগত পরিবর্তন (শতকরা) (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৬৬)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
১৯৫০-৬০	৮৭.৭২	৭৮.৫৪	৭১.৭২	৭২.৭২	৭৯.৮১	৮৬.৭২	৮৭.০৯	৮৮.৪৫	৮৮.৫৪	৮৮.৪৫	৮৮.২০	৮৮.৯
১৯৬১-৭০	৮৩.৫	৭৬	৬৮	৬৯.৮	৭৬	৮৪.৮	৮৬.৮	৮৭.১	৮৬.৫৫	৮৬.২	৮৪.৭	৮৬.৮
১৯৭১-৮০	৮৬.৮	৭৯.৮	৭৩.৪	৭৭.৬২	৮৩.১২	৮৭.৩৭	৮৭.১১	৮৭.৮৭	৮৮	৮৭.৪	৮৮.১১	৮৭.৮
১৯৮১-৯০	৬৮.২	৬২.৭	৬২.৫	৬৩.৬৬	৬৯.২২	৭২.৪৪	৭৪.৭	৭৫.১	৭৫	৭২.১১	৬৯.৫৫	৬৯.১১
১৯৯১-০০	৭৯.৭	৭৪.২	৭০.৩	৭৪.৪	৮১	৮৩.৯	৮৪.৯	৮৪.৮	৮৫.৫	৮৪.৮	৮২.৭	৮০.৯
২০০১-১০	৮১.৩	৭২.৮	৬৯.৫	৭৫.১	৭৯.৯	৮৪.৪	৮৪.৫	৮৪.৪	৮৪.৭	৮৪.৯	৮২.৭	৮২.৪
২০১১- ১৪	৮০.৭৫	৭১.৫	৬৭.৫	৭৩	৮০.৭৫	৮৪	৮২.৭৫	৮৪.২৫	৮৪.২৫	৮৩.৫	৮০.৭৫	৮৪.২৫

টেবিল ৬.১০: আর্দ্রতা ভিত্তিতে কুমিল্লা স্টেশনের জলবায়ুগত পরিবর্তন (শতকরা) (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৬৭)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
১৯৫০-৬০	৮৫.৪	৭৯.৬	৭৮.৯	৮২.৯	৮৯.২	৯৫.১	৯৫.৪	৯৫.৩	৯৪.৪	৯২.৯	৮৮.৯	৮৭
১৯৬১-৭০	৬৬	৬৩.১	৬৩.৩	৭০.৩	৭৪.৩	৮০	৮০	৮০.১	৭৭.৫	৭৪.১	৭১.৫	৬৭.৭৫
১৯৭১-৮০	৫৯.৮	৫৯.১১	৬২	৬৫.৪৪	৬৯.৯	৭৪.২	৭৬.৩	৭৫.৭	৭৪.১	৭১.৮	৬৭.১	৬২.১১
১৯৮১-৯০	৭৪.৬	৭২.৯	৭৫.৭	৮০.৬	৮০.৮	৮৪.৯	৮৬.৩	৮৪.৭	৮৬.৬	৮২.৭	৭৮.৫	৭৬.৬
১৯৯১-০০	৭৮.৭	৭৭.৩	৭৯.২	৮২.১	৮৩.৭	৮৬.৩	৮৭.৪	৮৬.৭	৮৬.৫	৮৫	৮২.২	৭৯.২
২০০১-১০	৭৮	৭৪.২	৭৬.১	৭৯.৫	৮০.৩	৮৫.৪	৮৫.৪	৮৪.২	৮৪.২	৮২.৭	৭৯.৩	৭৯
২০১১- ১৪	৭৬.২৫	৬৯.৫	৭৩.৫	৭৭.২৫	৮০.৭৫	৮৩.৭৫	৮৩.৫	৮৪.৭৫	৮৪	৮২	৭৮	৮২

টেবিল ৬.১১: বায়ু প্রবাহ ভিত্তিতে শ্রীমঙ্গল স্টেশনের জলবায়ুগত পরিবর্তন (কান্ট) (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৬৭)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
১৯৫০-৬০	১.৭৭	১.৯৬৩	৩.১০৯	৩.৩৫	৩.২৯	২.৯৩৬	২.৮২	২.৬	২.৪৭	২.৫৪	১.৯৯	০.৮৮
১৯৬১-৭০	২.৭৬	৩.০৭	৪.৮৬	৫.০৪	৫.৬	৫.৩৪	৫.৫৬	৪.৮৮	৩.৯৬	০.৫	০.২	০.১৫
১৯৭১-৮০	০.৮৩	১.৭৮	৫.৮২	৬.৬	৫.০৭	৫.৭৭	৫.৬৮	৫.৩৭	৪.৬	৪.৯৫	৩.৮৮	২.৮৩
১৯৮১-৯০	৩.৮	২.৬৬	৩.৮৩	৪.৬২	৩.৯	৩.৫৮	৩.৩৩	২.৭২	২.৮৬	৩.১৬	২.৭২	৩.০৫
১৯৯১-০০	৩.৩৫	৪.০৯	৪.৭	৩.৮৯	৪.০৯	৩.৯৬	৪.১	৩.৮৯	৩.৩৩	২.৯৮	২.৭৭	৩
২০০১-১০	৩.৪৭	৪.০৩	৪.৫৩	৪.১৭	৩.৩	৩.৪৬	৩.৪	৩.২৫	৩.০১	৩.১৪	২.৯৩	২.৮
২০১১- ১৪	২.৫	৩.১২	৪.১২	২.৯২	৩.১৫	২.৯৮	২.৮	২.৫৭	২.৪৮	২.৩৫	১.৮৮	২.১

টেবিল ৬.১২: বায়ু প্রবাহ ভিত্তিতে কুমিল্লা স্টেশনের জলবায়ুগত পরিবর্তন (কান্ট) (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৬৮)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
১৯৫০-৬০	২.৭৫	৩.৩	৪.৭৩	৫.৫৬	৫.৯৯	৫.১৫	৫.৮	৫.১৫	৪.০৬	৩.৫৫	১.৯১	২
১৯৬১-৭০	৪.২৭	৫.১৭৭	৬.২	৬.৭১	৬.৩৪	৬.১২	৫.৫	৫.৮২	৫.২৩	৫.১১	৫.৪৩	৪.২
১৯৭১-৮০	৪.৭৬	৫.৪৮	৬.৮৪	১০.১৩	৮.১৪	৭.৮	৭.৪	৬.৮৪	৫.৮২	৫.৩	৪.১৭	৪
১৯৮১-৯০	৭.৫৫	৭.৮২	১০.৬৭	১৩.৫৮	১৩.৪	১৩.৫	১৪	১১.৩৩	১০.১	৮.৮৮	৬.৫৩	৭.১
১৯৯১-০০	৮.০২	১০.৮২	১১.৮২	১২.৪	১৪.৮৮	১৩.৭	১২	১১.৩৫	১০.১	৯.০৩	৬.৮	৭.৪
২০০১-১০	৭.৪	৯.৪৭	৯.৫২	১১.৮৫	১০.২	১০.৪	৯.৯	৮.৩	৭.১৮	৭.২৮	৫.৯৮	৬
২০১১- ১৪	২.০২	২.৩	২.৬৫	২.২	২.৫৫	২.৩৮	২.৫	২.২৫	২.১৫	২.৩	১.৭৩	২

টেবিল ৬.১৩: বাষ্পীয়ভবন ভিত্তিতে শ্রীমঙ্গল স্টেশনের জলবায়ুগত পরিবর্তন (শতকরা) (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৬৯)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
২০১৩-২০১০	২৩	৪০	৪৮	৪৮	৩০	৩২	৩৫	৩৪	৩৩	৩০	২৭	২১
২০০৯-২০০৫	২৪.০২	৩৫.৪২	৪৭.৪৫	৫২.২২	৪৭.৩৭	৩৯.৯৯	৪০.৮৬	৩৯.৮	৩৮.৬	৩৬.৭৫	৩০.০৫	২৩
২০০৪-২০০০	২৪.৬	৩১	৪১.২	৪২.৪	৩৯.৮	৩৬.৪	৩৭.৪	৩৯.৮	৩৫.২	৩২.২	৩০.৪	২৬.২
১৯৯৯-১৯৯৫	২২	৩২.২	৪৭.৪	৪৯.২	৪৬.৬	৪০.৮	৩৪.৮	৩৬	৩৫	৩৬	২৯.৪	২৪
১৯৯৪-১৯৯০	২২.২৫	৩২.৫	৩৮	৩৮.৫	৩৬.২৫	৩৩.২	৩৩.৬	৩৯.৪	৩৯	৩৩	২৭.৫	২৩
১৯৮৯-১৯৮৫	৬০	৭০	৭৯.৬৬	৯৩.৩৩	৭৩	৬১.৫	৫৮	৬৩.৫	৫১.৩৩	৬৪.২৫	৫৭.৫	৫১.৭৫

টেবিল ৬.১৪: বাষ্পীয়ভবন ভিত্তিতে কুমিল্লা স্টেশনের জলবায়ুগত পরিবর্তন (শতকরা) (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৭০)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
২০১৩-২০১০	২২	২৯	৩৮	৩৯	৩৬	৩৪	৩৭	৩১	৩৪	৩৩	২৭	২১
২০০৯-২০০৫	১৮.৭৫	৩০.৫৫	৩৯.২১	৪৭.৪২	৪৮.৯৭	৪২.৩৬	৩৯.৭৬	৪০	৩৮.৬১	৩৪.৬৪	২৯.১৬	১৯.৮৬
২০০৪-২০০০	২৩.৮	৩১.২	৩৭.৭৫	৪৩.৫	৪৪.৭৫	৩৪	২৯	৪৪.৭৫	৩৮.৫	৩৫.২৫	৩০.২৫	২২.৬
১৯৯৯-১৯৯৫	২৫.৪	৩৩	৪৪.৬	৫১.৮	৫৪.২	৫১.৪	৪৬.৬	৪৭.২	৫০.৪	৩৭.৬	৩৩.২	২৬.৪
১৯৯৪-১৯৯০	২৪.৬	৩২.৮	৪২.৬	৫১.৪	৫৩.৮	৫০.৪	৪৮.৮	৪৬.৫	৪৪.২	৩৮.২	৩০.৮	২৭.২
১৯৮৯-১৯৮৫	৪৬.৩৩	৩৭	৫৬.৩৩	৪৮.৬৬	৫৬	৪৮	৫৩	৫৩.৬৬	৩৭	৩২	৪৪.৭৫	৪০.৭৫

টেবিল ৭.১: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভিরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ (শতকরা) (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৭৬)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে

২০০৩-২০০৬	১৪.৮২	১২.১	১৩.২৪	১৯.৫৮	২০.০৮	২২.৯৩	২২.৯৪	২২.৫৯	২৪.৬৪	২২.৫৭	১৮.৮৫	১৬.৭৭
২০০৭-২০১০	১৪.২	১৪.১৪	১২.৪১	১৬.৯৪	১৮.৮৩	২২.৯৬	২১.৩৭	২৪.০৯	২১.৫৪	২০.৬২	১৭.৫৯	১৫.১৭
২০১১-২০১০	১৩.৯২	১৩.৭৯	১৩.৮২	১৬.৬৪	২৩.৪৮	২২.৯১	২১.৭৯	২২.৯১	২৩.৭২	১৭.০৫	২০.৫৪	১১.০৫

টেবিল ৭.২: কুমিল্লা স্টেশনের মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভিরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ (শতকরা) (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৭৭)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
২০০৩-২০০৬	২৮.৯৫	২৩.৯২	১৯.১০	২৯.৫৯	৩৫.৭১	৪১.৬৬	৪২.১৪	৪০.৮২	৪০.২২	৩৬.৮৭	২৫.১১	২৪.৬২
২০০৭-২০১০	২৩.০৮	২০.৮৭	১৯.২৫	১৯.৫৭	৩১.০১	৩৮.৮৭	৪০.৭১	৪০	৪৩.২৯	৩৭.৬১	৩২.২৭	২৭.৩৭
২০১১-২০১৩	২২.৫৫	২১.৪১	২১.৮৯	২৬.৬৪	৩০.০৭	৩৩.৩৪	৩২.২৭	৩৩.৪৫	৩৫.৬৮	৩০.০৪	২৪.৫২	২৩.৭৪

টেবিল ৭.৩: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভিরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ (শতকরা) (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৭৮)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
২০০৩-২০০৬	১৪.৮৯	১২.৯৩	১৩.৫২	২০.১৮	২০.৫৫	২২.৩৯৮	২১.৯২	২১.৮৩	২৩.৪৪	২১.৭২	১৮.১৫	১৬.১০
২০০৭-২০১০	১৩.২৩	১৫.৩১	১৩.৬১	১৫.৯২	১৮.৯৪	২১.৬১	২০.৩১	২২.৭০	২১.৩৪	১৯.৯৭	১৭.২২	১৫.২৭
২০১১-২০১৩	১৪.৪৯	১৪.১১	১৩.০৪	১৬.৯৭	২১.৩০	২১.৪৭	১৯.৮৫	২০.৪৫	২২.৪৯	১৫.৯০	১৯.১১৭	১০.২৭

টেবিল ৭.৪: কুমিল্লা স্টেশনের মাটির ১০ সেন্টিমিটার গভিরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ (শতকরা) (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৭৯)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
২০০৩-২০০৬	২৩.২৭	২০.৬৫	১৮.৫৭	২৪.৮	৩২.০৭	৩১.৫৮	২৯.৯৪	৩০.৮১	৩০.১৯	৩২.৩০	২২.১৫	২১.৪৪
২০০৭-২০১০	২১.৮৯	১৯.৪৩	১৮.২১	১৯.৫২	২৬.০৯	৩১.৩৩	৩১.১১	৩০.৯১	৩১.৩১	৩০.২৮	২৫.৩৪	২২.২১৭
২০১১-২০১৩	১৯.৩৭	১৮.৪১	১৮.৫৪	২১.২৬	২৫.৮৫	২৫.৯৭	২৭.২৮	২৭.৫৭	৩১.২৬	২৬.১৮	২০.৯৭	১৯.৬৭

টেবিল ৭.৫: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভিরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ (শতকরা) (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৮০)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
২০০৩-২০০৬	১৫.০৬	১৪.১৭	১৩.৭৪	১৫.১৪	১৫.৬৩	১৭.৩৯	১৬.৪৯	১৫.৮৪	১৭.৪৩	১৫.৮৭	১৩.৪২	১১.৬৭
২০০৭-২০১০	১৪.৯২	১৬.৬১	১৪.৯৭	১৭.২	২০.৬০	২০.৯৮৯	২১.১৮	২১.৯৬	১৯.০২	১৯.৫৯	১৭.৪৯	১৫.১২
২০১১-২০১৩	১৪.৭৭	১৪.০৩	১৩.৩৯	১৬.৪২	২১.৯৩	১৯.৯৯	১৯.৩১	১৯.৫৮	২০.৯৯	১৫.৮৭	১৮.০৩	১০.২৯

টেবিল ৭.৬: কুমিল্লা স্টেশনের মাটির ২০ সেন্টিমিটার গভিরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ (শতকরা) (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৮১)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
২০০৩-২০০৬	২০.২৯	১৮.২৫	১৮.৪৩	২২.৪০৩	২৫.২২	২৭.৮৩	২৬.৭১	২৭.৪৭	২৬.২১	২৬.৮১	২০.৫৯	১৮.৮৫
২০০৭-২০১০	১৯.২৪	১৮.০৮	১৬.২৪	১৭.৪৮৫	২৪.৭২	২৮.২০	২৭.৬৮	২৭.১৩	২৬.৯৩	২৬.৬৯	২৪.৩৯	২০.৭৬
২০১১-২০১৩	১৭.৩৪	১৬.৯০	১৬.৭৯	১৯.৩১	২৪.৪৩৬	২৫.০৯	২৪.৪৪	২৪.৫১	২৭.০৭	২৪.১৯	১৭.৫৩	১৬.৪৫

টেবিল ৭.৭: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভিরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ (শতকরা) (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৮২)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
২০০৩-২০০৬	১৫.৬১	১৫.৫৫	১৪.৮৯	১৯.৭২	২১.৯৯	২৩.৪৮	২২.২৫	২১.৮৪	২২.৭৩	২১.২৯	১৮.৭	১৬.৫৭
২০০৭-২০১০	১৭.২৬	১৫.৬০	১৬.১২	১৮.২৫	২১.৯৮	২০.৯৪	২০.৭৮	২১.৬১	১৯.৮৭	২২.০৬	১৮.২৩	১৬.৫৬
২০১১-২০১৩	১৫.৮৩	১৪.২৬	১৩.৯৫	১৭.৩৫	১৯.৪৬	১৯.৪৩	২১.০৪	১৯.৭৭	২০.৩২	১৫.৯১	১৭.৭৭	১০.৪২

টেবিল ৭.৮: কুমিল্লা স্টেশনের মাটির ৩০ সেন্টিমিটার গভিরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ (শতকরা) (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৮৩)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
২০০৩-২০০৬	২০.৩১	১৯.২৩	১৭.৯০	২১.০৭	২৪.২৯	২৬.৬২	২৫.৮৫	২৬.৭৯	২৫.৯৬	২৭.২৭	২২.০৩	২০.৬৯
২০০৭-২০১০	১৯.৩৪	২০.১৮	২০.২৭	২০.২০	২৫.০৪	২৭.৯৫	২৭.২৪	২৬.৩৫	২২.৬৩	২৩.৫৬	২৩.১৮	২০.৬৪
২০১১-২০১৩	১৮.১৫	১৬.৮৪	১৬.১৭	১৯.২৫	২০.১৭	২৩.৪৮	২৪.৭৭	২২.৪৭	২৪.৮৫	২১.৬৬	১৫.২২	১৬.১০

টেবিল ৭.৯: শ্রীমঙ্গল স্টেশনের মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভিরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ (শতকরা) (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৮৪)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
২০০৩-২০০৬	১৮.০৪	১৮.০৯	১৬.১৭	২০.৭৪	২৩.৬৯	২৪.২০	২৪.০২	২৩.৬১	২৪.৮০	২৩.২৩	২০.৪৮	১৮.৫৪
২০০৭-২০১০	১৭.২০	১৭.১৪	১৬.৩১	১৯.২৩	২৩.১৭	২২.৮১	২২.১৬	২৩.১৫	২১.৪৫	২২.০৩	১৯.২১	১৮.৩৬
২০১১-২০১৩	১৬.৬৫	১৫.৭৫	১৫.১১	১৮.৩৩	২০.০৩	২০.৩৮	২১.৪৫	২০.২৩	২০.৮৯	১৭.১৮	১৮.১৮	১০.৮৬

টেবিল ৭.১০: কুমিল্লা স্টেশনের মাটির ৫০ সেন্টিমিটার গভিরে মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ (শতকরা) (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৮৫)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
২০০৩-২০০৬	২২.২৬	২১.১৯	২০.৯৯	১৯.৯৯	২৪.০১	২৬.১৬	২৭.৮৩	২৮.০১	২৬.৬৩	২৮.০৬	২৫	১৫.২৭
২০০৭-২০০১	১৯.৪৭	২০.০৪	১৭.৮৪	১৬.৩১	২২.৩৮	২৭.১৩	২৯.২৫	২৭.৭৮	২৬.৭৪	২৭.৭৫	২৬.০৯	২১.৯০
২০১১-২০১৩	১৮.৭৫	১৮.০২	১৭.৪	২০.১৪	২১.৬৯	২৩.৮৫	২৫.৭১	২৩.৮৫	২৬.১৩	২২.৭৮	২০.৩৭	১৮.৫৫

টেবিল ৭.১১: ভৈরব বাজার স্টেশনের জোয়ার বিশ্লেষণ (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৮৬)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
১৯৬৮-১৯৭৬	১.৭২	১.৫৭	১.৬৮	২.১৮	২.৯১	৪.২৩	৫.৯৮	৬.৩৯	৫.৯৪	৪.৮৮	৩.০৮	২.১২
১৯৭৭-১৯৮৫	১.৬২	১.৪৯২	১.৭০৩	২.২৫	৩.০৩	৪.৩০	৫.৬৭	৬.১২	৫.৯৪	৪.৮২	২.৮৭	২.০৩
১৯৮৬-১৯৯৪	১.৬২	১.৫৫৬	১.৭০	২.২৪	৩.০১	৪.৩৬	৫.৬৮	৫.৯২	৫.৭৫	৫.১৪	৩.০৪	২.০৪
১৯৯৫-২০০৪	১.৭৩	১.৬২	১.৭৭	২.২৮	৩.০১	৪.৩৫	৫.১০	৬.২০	৫.৮৭	৪.৭৯	২.৬৯	২.১৮
২০০৫-২০১৪	১.৭৮	১.৬৫২	১.৮১	২.২৫	২.৮৬	৩.৯৫	৫.২৪	৫.০১	৫.৪১	৪.৩১	২.৭৬	২.১২

টেবিল ৭.১২: ভৈরব বাজার স্টেশনের ভাটা বিশ্লেষণ (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৮৭)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
১৯৬৮-৯৭৬	১.৫৩	১.৩৬	১.৪৭	২.০১	২.৮১	৪.২৩	৫.৯৮	৬.৩৯	৫.৯৩	৪.৮৭	২.৯৮	১.৯৫
১৯৭৭-১৯৮৫	১.৪১	১.২৬	১.৪৭	২.০৭	২.৯৩	৪.২৮	৫.৬৬	৬.১১	৫.৯৩	৪.৭৯	২.৮০	১.৮৪
১৯৮৬-১৯৯৪	১.৩৮	১.৩২	১.৪৬	২.০৫	২.৯০	৪.৩১	৫.৬৫	৫.৯০	৫.৭৩	৫.১১	২.৯৫	১.৮৪
১৯৯৪-২০০৪	১.৪৯	১.৩৭	১.৫৩	১.৮৭	২.৬০	৩.৮৭	৫.৩৭	৫.৫৬	৫.২৩	৪.২৫	২.৩৪	
২০০৫-২০১৪	১.৫০	১.৩৫	১.৫০	২.০১	২.৭০	৩.৮৮	৫.২১	৪.৯৯	৫.৩৮	৪.২৬	২.৫৭	১.৮৪

টেবিল ৭.১৩: ভৈরব বাজার স্টেশনের পানি নির্গমণ হার বিশ্লেষণ (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং-৮৮)

বছর	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্ট	অক্ট	নভে	ডিসে
১৯৭৪-১৯৮৪	৩৬.১৭	১২.৭	২৭.৩৩	১৩৬.৩৩	৩১.৫৫	৭০৯২.৯১	১০৮১৫.১৪	১০৬৪৬.৬৬	১১৩৭২.৩৬	৮৯২৮.১৬৭	৪৮৩০	১১১
১৯৮৫-১৯৯৪	২৫৪.৩৩	২০১	৪৯০.৫	১১১৬	৩৯১৩.৮১	৮১১৫.২৬	১০৮৪০.২	৯৭৭২.৫	১০৩৮৮.১	৯১৭১.২৬২	৪৪৪৩.৭৬৯	৬১০

১৯৯৫-২০০৪			৩২৪৭.০৫	৪৫২২.৬২	৭৪৭৯.৩৭	৭৩৮৬.৫২	৯৬৯৮.২১৩	১১১৭০.৭২	৯৭৭৮.৩৪৫	৭৭১৭.৪৬৩	৩৭৩৯.২২৭	
২০০৫-২০১৪						৬২২৭.৭২	৭৭০৬.৩৭৭	৭৪৬৬.৯৮৩	৬৭৬৬.৮৩৬	৫২৩৭.৬৮৯	৪৪৮৪.৮৬	

কৃষি ফসলের গানিতিক তালিকা

টেবিল ৮.১: দানা জাতীয় শস্য (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ৯১)

দশক	দেশি বোনো আউশ		দেশি রোপা আউশ		উচ্চ ফলনশীল আউশ		পাইজম আউশ	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	৩৪৫৫	০	৬০১	০	০	০	২৩৩	০
১৯৭৫	৩৫২১.৫৬	১.৯৩	৬১৪	২.১৬	০	০	৩৬৫	৫৬.৬২
১৯৮৫	৩৭০২.৯৮	৭.১৮	৫২৬.১	-১২.৪৬	৫৩৭	০	১৯৪.৯৫	-১৬.৩৬
১৯৯৫	১৪৬২.৮	-৫৭.৬৬	৪৯১	-১৮.৩০৩	৫৯০	৯.৮৭	১৭২.৬	-২৫.৯৩
২০০৫	০	-১০০	০	-১০০	৬০৯	১৩.৪১	০	-১০০
২০১৪(বর্তমান)	০	-১০০	০	-১০০	৭৭৫	৪৪.৩২	০	-১০০

টেবিল ৮.২: দানা জাতীয় শস্য (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ৯৩)

দশক	দেশি বোনো আমন		দেশি রোপা আমন		উচ্চ ফলনশীল আমন		পাইজম আমন	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	৪৩২	০	৩৪৫০	০	-	০	৫০০	
১৯৭৫	৩৪৫	-২০.১৩	৩৮৩৪	১১	-	০	৫৩২	৬.৪

১৯৮৫	২৩৮.২৭	-৪৪.৮৪	১২৮৪	-৪২	১৫৪.১৪	০	৫৫০.৩০	১০.০৬
১৯৯৫	১০৭	-৭৫.০৯	১২৭	-৬৩	১৬২.৪	৫.৩৫	৪৯৫.৮	-০.৮৪
২০০৫	০	-১০০	০	-৯৬	২১১	৩৬.৮৮	৩৩৫	-৩৩
২০১৪(বর্তমান)	০	-১০০	০	-১০০	৩৭২	১৪১.৩৩	০	-১০০

টেবিল ৮.৩: দানা জাতীয় শস্য (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ৯৪)

দশক	দেশি বোরো		হাইব্রীড বোরো		উচ্চ ফলনশীল বোরো		গম		উচ্চ ফলনশীল গম	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	২৬৩৩.৩	০	-	-	-	-	১৩২৫.৬	০	-	-
১৯৭৫	২৫৬৭.৩২	-২.৫০	-	-	-	-	১৩৬৫.৫	৩.০০	-	-
১৯৮৫	২২৯২.৮৯	-১২.৯২	৯৯৮.৪২	-	৮৪৩.৯৭	০	১১৮৮.৭৫	-১০.৩২	১১২.৫৮	-
১৯৯৫	২০৬০.৮	-২১.৭৪	১২৮৫.৪	২৮.৭৮	৯০৯	৮	৬২৬	-৫২.৭৭	১৫২.৮	৩৫.৭১
২০০৫	১৫২	-৯৪.২২	৩০৪০	২০৪.৪৮	১১৯৭	৪২	০	-১০০	১৪২	২৫.৭৩
২০১৪(বর্তমান)	১৭	-৯৯.৩৫	২৩২৫	১৩২.৮৬	১১৪০	৩৫	০	-১০০	১৪০	২৪.৩৪

টেবিল ৮.৪: দানা জাতীয় শস্য (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ৯৪)

দশক	দেশি ভুট্টা		হাইব্রীড ভুট্টা		বার্লি		যব	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	৪.৪	০	-		৩.১২	-	৪.১২	০
১৯৭৫	৩.৫	-২০.৫	-		২.১৩	-৩১.৭৩	৪.০৩	-২.১৮

১৯৮৫	২.১	-৫২.৩	৩	০	১.১৩	-৬৩.৯১	৩.৮২	-৭.১৪
১৯৯৫	২	-৫৪.৫	৪	৩৩	০.৬	-৮০.৭৭	২.২	-৪৬
২০০৫	১.৫	-৬৫.৯	৮	১৬৭	০	-১০০	০	-১০০
২০১৪(বর্তমান)	০	-১০০	৯	২০০	০	-১০০	০	-১০০

টেবিল ৮.৫: দানা জাতীয় শস্য (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ৯৫)

দশক	জোয়ার		বাজরা		চীনা		কাউন	
	উৎপাদন হার	*ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার*	*উৎপাদন হার*	*ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার*	*উৎপাদন হার*	*ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার*	*উৎপাদন হার*	*ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার*
১৯৬৫	*৬.৩৩*	-	*৭.৪৫*	*০*	*৭.৫৮*	*০*	*১৩.৬৭*	-
১৯৭৫	*৫.২২*	*-১৭.৫৪*	*৬.৬৬*	*-১০.৬*	*৪.৫৫*	*-৩৯.৯৭*	*১১.৩৩*	*-১৭.১২*
১৯৮৫	*৪.৬২*	*-২৬.৯৫*	*৩.৯২২*	*-৪৭.৩৬*	*৩.৪৩*	*-৫৪.৭৮*	*৫.৬২*	*-৫৮.৮৯*
১৯৯৫	*৩.২*	*-৪৯.৪৫*	*২.৬*	*-৬৫.১*	*০.৪*	*-৯৪.৭২*	*০.২*	*-৯৮.৫৪*
২০০৫	*০.৫*	*-৯২.১*	*০*	*-১০০*	*০*	*-১০০*	*০*	*-১০০*
২০১৪(বর্তমান)	*০*	*-১০০*	*০*	*-১০০*	*০*	*-১০০*	*০*	*-১০০*

টেবিল ৮.৬: ডাল জাতীয় শস্য(গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ৯৬)

দশক	ছোলা		অড়হর		মটর		মুগ	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	২.১৩	০	১.৩৪	০	১৩.২	০	২৬	০
১৯৭৫	১.৭৫	-১৭.৮৪	১.৭৫	-৩০.৫৯	১২.১	-৮.৩৩	২৩	-১১.৫৩
১৯৮৫	১.৩৮	-৩৪.৯২	০.৫৯	-৫৫.২২	১২.৭৬৬	-৩.২৮	৪.১০	-৮৪.২২
১৯৯৫	০	-১০০	০.৬	-৫৫.২৩	১.৬	-৮৭.৮৭	৩.৬	-৮৬.১৫

২০০৫	০.৪	-৮১.২২	০.২২	-৮৩.৫৮	০	-১০০	৪	-৮৪.৬১
২০১৪(বর্তমান)	০.৩৪	-৮৪.০৩	০	-১০০	০	-১০০	২.০৯	-৯১.৯৬

টেবিল ৮.৭: ডাল জাতীয় শস্য(গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ৯৬)

দশক	মাস-কলাই		খেসারি		গাড়ি-কলাই		ফেলন	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	৩৪৫	০	৯৪	০	৮.৪	০	-	-
১৯৭৫	২৩৪	-৩২.১৭	৭২	-২৩.৪০	৭.২৩	-১৩.৯২	-	-
১৯৮৫	১১৮.৯৮	-৬৫.৫১	৬১.৭১	-৩৪.৩৪	৬.৪৮	-২২.৭৬	-	-
১৯৯৫	১৯০.৪	-৪৪.৮১	৮৮.৯৩	-১১.০৬	২.৮	-৬৬.৬৬	৭	০
২০০৫	১৩১.৭	-৬১.৮২	২৭.৬৫	-৭২.৩৪	২.৫	-৭০.২৩	৮	১৪.২৮
২০১৪(বর্তমান)	৩২	-৯০.৭২	২৫	-৭৫	১.৪৩	-৮২.৯৭	১০	৪২.৮৫

টেবিল ৮.৮: তৈল বীজ জাতীয় ফসল (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ৯৭)

দশক	সরিষা		রাই		তিল		তিসি	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	৩০২৪	০	৪৩	০	১৪২	০	২৫	০
১৯৭৫	২৯৭৫	-১.৬২	২৫	-৪১.৮৬	১২১	-১৪.৭৮	১৬	-৩৬
১৯৮৫	২০৮৫.১৯	-৩১.০৪	১২	-৭২.০৯	৮৭.২৪	-৩৮.৫৫	১১.৯৫	-৫২.১৯

১৯৯৫	২৭৩৩.৪	-৯.৬০	২	-৯৫.৩৪	৪৪.৬	-৬৮.৫৯	৫.২	-৭৯.২
২০০৫	২২৫১	-২৫.৫৬	০	-১০০	২৩	-৮৩.৮০	০	-১০০
২০১৪(বর্তমান)	৭৬৮	-৭৪.৬০	০	-১০০	২০.৩	-৮৫.৭০	০	-১০০

টেবিল ৮.৯: তৈল বীজ জাতীয় ফসল (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ৯৭)

দশক	চীনা বাদাম		রেড়ী (কেস্টর)		সূর্যমুখী		সয়াবিন	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	২৫৪	০	১.৪	০	২.৫	০	৭.২৩	-
১৯৭৫	২৩১	-৯.০৫	১	-২৮.৫৭	১.৩	-৪৮	৬.৩৪	-১২.৩১
১৯৮৫	১৫৮.৮০	-৩৭.৪৭	০.৯	-৩৫.৭১	০.৭৮	-৬৮.৮	৫.৯৩	-১৭.৮৮
১৯৯৫	৮৫.৪	-৬৬.৩৭	০.৮	-৪২.৮৫	১.২	-৫২	১.৮	-৭৫.১০
২০০৫	৭৭	-৬৯.৬৮	০	-১০০	০	-১০০	০	-১০০
২০১৪(বর্তমান)	৪৪	-৮২.৬৭	০	-১০০	০	-১০০	০	-১০০

টেবিল ৮.১০: অর্থকরী ফসল (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ৯৮)

দশক	পাট		মেস্তা		শন পাট	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	৫৪৩৫	০	৪৫	০	৬.৭	০
১৯৭৫	৩৫৬৭.৩২	-৩৪.৩৬	২৩	-৪৮.৮৮	৫.১	-২৩.৮৮
১৯৮৫	২৪১৫.৯৮	-৫৫.৫৪	১৩.৪৪	-৭০.১২	৪.৯৯	-২৫.৫২
১৯৯৫	২০৫৯.৮	-৬২.১০	১	-৯৭.৭৭	৩	-৫৫.২২

২০০৫	২৩৩৭	-৫৭.০০	০	-১০০	০	-১০০
২০১৪(বর্তমান)	২৩১৫	-৫৭.৪০	০	-১০০	০	-১০০

টেবিল ৮.১১: অর্থকরী ফসল (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ৯৮)

দশক	তুলা		আঁখ		তামাক	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	২.৩	০	২৭৯	০	৫৬.৩	০
১৯৭৫	১.৭	-২৬.০৮	২৩৪.৪৪	-১৫.৯৭	৪৪.১	-২১.৬৬
১৯৮৫	০.৫৯	-৭৪.২৬	১৮৪.৩৪	-৩৩.৯২	৩৪.২৩	-৩৯.১৯
১৯৯৫	০	-১০০	১৫.৪৮	-৯৪.৪৫	১২	-৭৮.৬৮
২০০৫	০.২	-৯১.৩০	২	-৯৯.২৮	০	-১০০
২০১৪(বর্তমান)	০	-১০০	১.৩	-৯৯.৫৩	০	-১০০

টেবিল ৮.১২: কন্দাল জাতীয় ফসল (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ৯৯)

দশক	গোল আলু		মিষ্টি আলু		কচু		ওল কচু	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির শতকরা হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	২৩৩.২	০	১৪১	০	৩৪	০	-	-
১৯৭৫	৩৪৫	৪৭.৯৪	১৫৪	৯.২২	২৫	-২৬.৪৭	-	-
১৯৮৫	৩১৪.৮৬	৩৫.০২	১৩৪.৮৩	-৪.৩৭	১৫.২৫	-৫৫.১৩	-	-
১৯৯৫	৩০৫.৪	৩০.৯৬	১২১.৮	-১৩.৬১	০.৬	-৯৮.২৩	২৪	-

২০০৫	৩১৩	৩৪.২১	১১১	-২১.২৭	০	-১০০	২৫	৪.১৬
২০১৪(বর্তমান)	২৯৬	২৬.৯২	৯৬.৫	-৩১.৫৬	০	-১০০	৫০	৮.৩৩

টেবিল ৮.১৩: তরি-তরকারী জাতীয় ফসল গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ১০০)

দশক	বেগুন		মিষ্টি কুমড়া		চাল কুমড়া		বাঁধা কপি	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	১৩৩	০	৩৭	০	৪১	০	৩.২	০
১৯৭৫	১৬৫	২৪.০৬	৩৯	৫.৪১	৩৪	-১৭.০৭	২.৭৮	-১৩.১২
১৯৮৫	১০৫.৮৬	-২০.৪০	৩১.৬০৬	-১৪.৫৭	২৬.০৫	-৩৬.৪৬	২.৩৩	-২৭.১২
১৯৯৫	৯৪.২	-২৯.১৭	২৪.৮	-৩২.৯৭	৩	-৯২	২	-৩৭.৫
২০০৫	৮৩	-৩৭.৫৯	২৫	-৩২.৪৩	২	-৯৫.১২	১	-৬৮.৭৫
২০১৪(বর্তমান)	৬৫	-৫১.১২	১৮	-৫১.৩৫	০	-১০০	০	-১০০

টেবিল ৮.১৪: তরি-তরকারী জাতীয় ফসল গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ১০১)

দশক	ফুল কপি		ওল কপি		লাউ		টমেটো	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	২১.৩	০	১.৩	০	১২৩	০	৫৬	০
১৯৭৫	১৫	-২৯.৫৭	০.৯৭	-২৫.৩৮	১১২	-৮.৯৪	৫০	-১০.৭১

১৯৮৫	৯.২১	-৫৬.৭৬	০.৪৩	-৬৬.৯২	৯২.১০	-২৫.১১	৪০.০৭	-২৮.৪৪
১৯৯৫	৫	-৭৬.৫২	০.২	-৮৪.৬১	৭০	-৪৩.০৮	৪০.৪	-২৭.৮৫
২০০৫	৬	-৭১.৮৩	০	-১০০	৬০	-৫১.২২	৪০	-২৮.৫৭
২০১৪(বর্তমান)	০	-১০০	০	-১০০	৪০.২৮	-৬৭.২৫	৩৮	-৩২.১৪

টেবিল ৮.১৫: তরি-তরকারী জাতীয় ফসল গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ১০১)

দশক	মূলা		শিম		পটল		ঢেঁড়স	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	৫০	-	২০৩	-	৫.২	০	২৫	০
১৯৭৫	৪৩	-১৪	১৭৯	-১১.৮২	৪.৬৭	-১০.১৯	১৭	-৩২
১৯৮৫	৩০.৯৬	-৩৪.০৬	১২৬.৬৯	-৩৭.৫৯	২.৯৯	-৪২.৪২	১০.৩২	-৫৮.৭২
১৯৯৫	১৪.৬	-৭০.৮	১০২	-৪৯.৭৫	০	-১০০	৩.২	-৮৭.২
২০০৫	২	-৯৬	৯০	-৫৫.৬৬	২	-৬১.৫৮	২.২	-৯১.২
২০১৪(বর্তমান)	০	-১০০	৬০	-৭০.৪৪	০	-১০০	০	-১০০

টেবিল ৮.১৬: তরি-তরকারী জাতীয় ফসল গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ১০২)

দশক	ঝিঙ্গা		শসা		লাল শাক		পুই শাক	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	৩৪	-	২০	-	২৯৫	-	৪.৬	০
১৯৭৫	২৯	-১৪.৭০	১৫	-২৫	২৭৮	-৫.৭৬	৪.২	-৮.৬৯
১৯৮৫	২১.৫৫	-৩৬.৫৯	১১.৮১	-৪০.৯৪	২৪৮	-১৫.৯৩	৩.৩৫	-২৭

১৯৯৫	২.৮	-৯১.৭৬	৩.৬	-৮২	১৯৬	-৩৩.৫৫	২.৮	-৩৯.১৩
২০০৫	০	-১০০	৬	-৭০	১০৭	-৬৩.৭২	১.৮	-৬০.৮৭
২০১৪(বর্তমান)	০	-১০০	২.০১	-৮৯.৯৫	৭৫	-৭৪.৫৭	২	-৫৬.৫২

টেবিল ৮.১৭: তরি-তরকারী জাতীয় ফসল গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ১০৩)

দশক	বরবটি		করলা		গাজর		কাকরোল		শালগম	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	৫.১	০	৯.১৩	-	২	-	৯	০	২	০
১৯৭৫	৫.৩	৩.৯২	৮.৯	-২.৫১	১.৫	-২৫	৭.৫	-১৬.৬৬	১.৬	-২০
১৯৮৫	৩.০৯	-৩৯.২৫	৭.৬৩	-১৬.৩৬	০.৩	-৮৫	৬.০১	-৩৩.২৪	০.৮৪	-৫৭.৯
১৯৯৫	৮	-২১.৫৬	৮.৮	-৩.৬১	০	-১০০	০.৪	-৯৫.৫৬	০.২	-৯০
২০০৫	২	-৬০.৭৮	০	-১০০	০	-১০০	০	-১০০	০	-১০০
২০১৪(বর্তমান)	৩	-৪১.১৭	০	-১০০	০	-১০০	০	-১০০	০	-১০০

টেবিল ৮.১৮: ফল জাতীয় ফসল(গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ১০৩)

দশক	কলা		পেঁপে		তরমুজ		বাঙ্গী		আনারস	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	১৮২৩	০	৫০	০	১৬	-	৬	০	২৩	০
১৯৭৫	১৬২৩	-৮.২৮	৪৩	-১৪	১৫	-৬.২৫	৩	-৫০	১৮	-২১.৭৩

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৫	১৫৬১	-১৪.৩৭	৩৮	-২৪	৯.১০	-৪৩.০৭	০.৯৫	-৮৪.০৩	১৭	-২৬.০৮
১৯৯৫	১০৩৪	-৪৩.২৮	২০	-৬০	৪.৬	-৭১.২৫	০.৮	-৮৬.৬৬	১৩	-৪৩.৪৭
২০০৫	৯৭৬	-৪৬.৪৬	১৩	-৭৪	২	-৮৭.৫	০.৫১	-৯১.১৫	৯	-৬০.৮৭
২০১৪(বর্তমান)	৭৫২	-৫৮.৭৪	১১	-৭৮	০	-১০০	০	-১০০	৬	-৭৩.৯১

টেবিল ৮.১৯: মসলা জাতীয় ফসল(গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ১০৪)

দশক	মরিচ		পেঁয়াজ		রসুন		হলুদ	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	৬৭১.৩	০	৫৫.২	-	৯৪.২	-	৩৩.২	-
১৯৭৫	৫৩২.১২	-২০.৭৩	৫১.২৩	-৭.১৯	৮৭.৯	-৬.৬৮	২৭.৭	-১৬.৫৬
১৯৮৫	৪৯৬.৬৪	-২৬.০২	৪১.৭৫২	-২৪.৩৬	৮২.৪৬	-১২.৪৬	১৯.১৩	-৪২.৩৭
১৯৯৫	৪৮০.৮	-২৮.৩৭	১০.৩৬	-৮১.২৩	৬৪.২	-৩১.৮৪	১১.৪	-৬৫.৬৬
২০০৫	১৪৬	-৭৮.২৫	৬	-৮৯.২৩	৩১.২	-৬৬.৮৭	১৩	-৬০.৮৪
২০১৪(বর্তমান)	৭৫	-৮৮.৮২	৪.১৫	-৯২.৪৮	২৮.৩	-৬৯.৯৫	১১	-৬৬.৮৬

টেবিল ৮.২০: মসলা জাতীয় ফসল(গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ১০৫)

দশক	ধনে		আদা		কালোজিরা		মৌরী	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	৪৫	-	৮.৩	-	১১	০	৫.৩	০
১৯৭৫	৩৭.৪	-১৬.৮৮	৭.৪	-১০.৮৪	৯.৬	-১২.৭২	৪.৩	-১৮.৮৬
১৯৮৫	২৬.৯৬	-৪০.০৭	৪.৫	-৪৫.৭৮	৭.৮	-২৯.০৯	৩.৯	-২৬.৪১
১৯৯৫	১২.৬	-৭২	৩.৬	-৫৬.৬২	০.৬	-৯৪.৫৪	২.২	-৫৮.৪৯

২০০৫	৪	-৯১.১	২	-৭৫.৯০	০.৪	-৯৬.৩৬	২	-৬২.২৬
২০১৪(বর্তমান)	২.১৩	-৯৫.২৬	০	-১০০	০.২২	-৯৮	০	-১০০

টেবিল ৮.২১: গো-খাদ্য, জ্বালানী, বীজ তলা (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ১০৫)

দশক	গো-খাদ্য		জ্বালানী		বীজ তলা	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	৭৪	০	৫৬	০	০	-
১৯৭৫	৬০	-১৮.৯১	৩৩	-৪১.০৭	০	-
১৯৮৫	৪২.৩৫	-৪২.৭৭	১২.৩১	-৭৮.০১	১০৫	-
১৯৯৫	২৩	-৬৮.৯১	৭.৮	-৮৬.০৭	১৬৫	৫৭.১৪
২০০৫	০	-১০০	২.৪	-৯৫.৭১	২৮৬	১৭২.৩৮
২০১৪(বর্তমান)	০	-১০০	১.৭	-৯৬.৯৬	৭০০	৩২৪.২৪

টেবিল ১০.১: গরু মহিষ ছাগল ভেড়া (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ১২৮)

দশক	গরু		মহিষ		ছাগল		ভেড়া	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	১৫৬২৩	-	২৩০	০	৩৮৬৫	-	৫৩৫	০
১৯৭৫	১০৩৪৫	-৩৩.৭৮	১৯৮	-১৩.৯১	৩৪৭৫	-১০.০৯	৮৯৬	-৭.২৮
১৯৮৫	১০২১২	৩৪.৬৩	১৩৮	-৪০.৪৩	২৭৯৩	-২৭.৭৩	৪২৩	-২০.৯৩

১৯৯৫	৮৯৭২	-৪২.৫৭	৯০	-৬০.৮৭	১৫৫৪	-৫৯.৭৯	৩৪৩	-৩৫.৮৮
২০০৫	৭৬২৪	-৫১.২০	৩৯	-৮৩.০৪	১২০৫	-৬৮.৮২	২১২	-৬০.৩৭
২০১৪(বর্তমান)	৪৩১২	-৭২.৪	১৫	-৯৩.৪৭	৯০১	-৭৬.৬৮	১৩৪	-৭৪.৯৫

টেবিল ১০.২: মুরগী হাঁস কবুতর (গ্রাফচিত্র- পৃষ্ঠা নং - ১২৯)

দশক	মুরগী		হাঁস		কবুতর	
	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার	উৎপাদন হার	ধ্রুবক বছর থেকে হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১৯৬৫	৩৪৫২৬	-	৩২৫৬১	-	২২৪	-
১৯৭৫	২৯৭৬৫	-১৩.৭৮	২৭৮৯১	-১৪.৩৪	৩৪২	৫২.৬৭
১৯৮৫	২৬৫৭০	-২৩.০৪	২৫৩২১	-২২.২৩	৩৫১	৫৬.৬৯
১৯৯৫	২০৩০৫	-৪১.১৮	১৯৪৩১	-৪০.৩২	৩৫৩	৫৭.৫৮
২০০৫	২০৬১৬	-৪০.২৮	১৭১৪৫	-৪৭.৩৪	৩৬৬	৬৩.৩৯
২০১৪(বর্তমান)	২০৩০০	-৪১.২০	১৩২১০	-৫৯.৪৩	৩৯২	৭৫

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা এলাকায় গবেষণাকালীন সময়ে সংগ্রহকৃত কিছু আলোকচিত্র

গবেষণা এলাকা আশুগঞ্জ অঞ্চলের সড়ক পথ

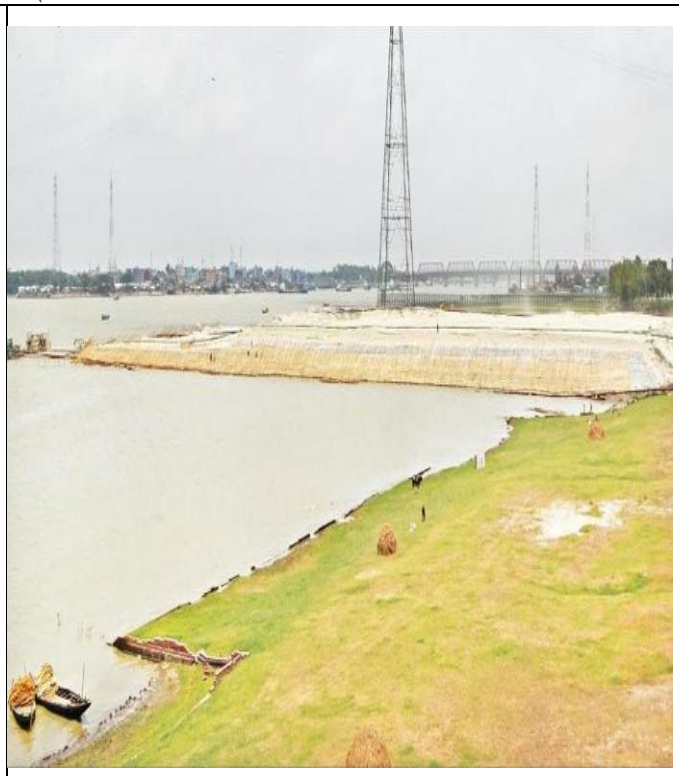

গবেষণা এলাকার মেঘনা নদীর পাড়

গবেষণা অঞ্চলের নদী বন্দর

গবেষণা এলাকা আশুগঞ্জের গোল চত্বর

গবেষণা এলাকার নগর

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন

Dhaka University Institutional Repository

মেঘনা নদীর থেকে চর চারতলা

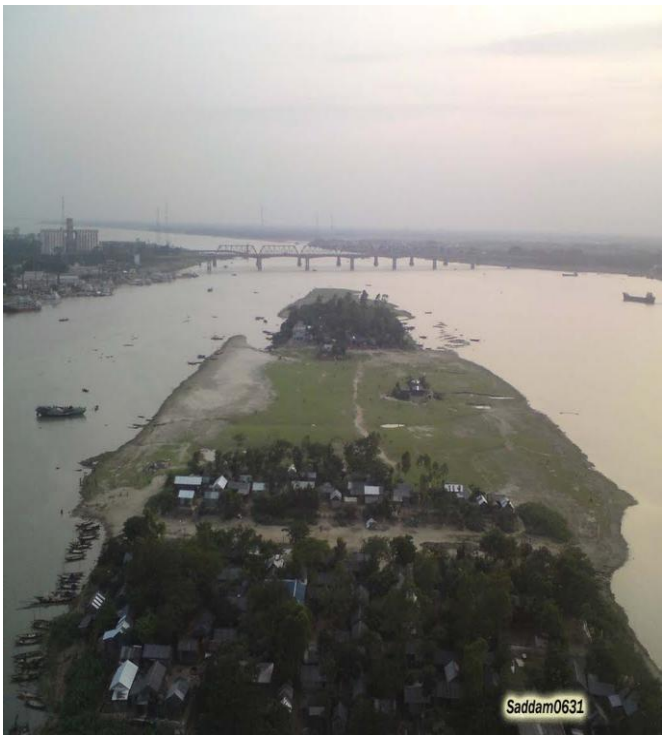

মেঘনা নদীর চর

সাইলো

ইউরিয়া সার কারখানা

আশুগঞ্জ এলাকার রেল ও সড়ক সেতু

গবেষণা এলঅকার গ্রামীন বনায়ন

গ্রামীন শস্য ক্ষেত্র

পাখি প্রজাতি

পাখি প্রজাতি	ফসল উত্তলন
প্রাণী প্রজাতি	প্রাণী প্রজাতি

হোটেল ওজানভাটি

হোটেল রাজমনি

আশুগঞ্জ রেল স্টেশন

রাইস মিল

রাইস মিল	**আশুগঞ্জ**

Dhaka University Institutional Repository

ভূ-দৃশ্য পরিবর্তনের ফলে জীব বৈচিত্র হ্রাসঃ আশুগঞ্জ উপজেলা উপর একটি পর্যবেক্ষণ মূল্যায়ন

এম ফিল প্রোজেক্ট

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্থানীয় জন সাধারণের জন্য প্রশ্নমালা

প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণা(থিসিসের কাজে ব্যবহৃত হবে)

প্রশ্নকারীর নাম ----------

১ উত্তর দাতার নাম ---------- গ্রামের নাম------ ইউনিয়ন

মৌজা নং---------- থানা ---------- জেলা ---------- তারিখ ------

স্বাক্ষাৎকার প্রদানকারীর ব্যক্তিগত বিবরণ

নাম	বয়স	জন্মস্থান	শিক্ষা	পেশা	কত বৎসর যাবৎ বসবাস করছেন	আপনার আয়ের উৎস কি	

২ উদ্ভিজ্জ প্রজাতি ৫০ বছর পূর্বে থেকে বর্তমান পর্যন্ত উদ্ভিদ প্রজাতির নাম

উদ্ভিদের নাম	৫০ বছর পূর্বের	৪০ বছর পূর্বের	৩০ বছর পূর্বের	২০ বছর পূর্বের	১০ বছর পূর্বের	বর্তমান উদ্ভিদ প্রজাতির নাম

৩ বর্তমানে কি কি উদ্ভিদ হুমকির স্মুখীন

৪ বর্তমানে কি কোন বৃক্ষ নিধন হচ্ছে যদি হয় সে গুলোর নাম

৫ বৃক্ষ নিধনের কারণগুলো কি কি?

৬ মানবীয় কারণগুলো কি কি

৭ গ্রামীন বনায়ন তৈরীতে কি কি সমস্যা রয়েছে

৮ কৃষি কাছের জন্য আপনার নিজের জমি আছে/ নেই , থাকলে এর পরিমান কত .....

৯ কিভাবে গ্রামীন বনায়ন তৈরী করা সম্ভব? বন নিধনের ফলে পরিবেশের উপর কি ধরনের প্রভাব পরছে

১০ ক. এখানের কি কি শীতকালীন ফসল ছিল/ বিলুপ্ত হয়েছে

ক. ১০ বছর পূর্বে..... খ ২০ বছর পূর্বে... গ ৩০ বছর পূর্বে....

ঘ ৪০বছর পূবে ..... ঙ ৫০ বছর পূর্বে ..... চ বর্তমান.....

১১ খ. ফসলের ধরণ ও উৎপাদন শীতকালীন ফসল (পূর্বে চাষ করতেন এখন করেন না)

শীতকালিন শস্য নাম	উৎপাদন হার						উৎপাদন ব্যয়						আবাদী জমীর পরিমান
	১০ বছর পূর্বে	২০ বছর পূর্বে	৩০ বছর পূর্বে	৪০ বছর পূর্বে	৫০ বছর পূর্বে	বর্তমান	১০ বছর পূর্বে	২০ বছর পূর্বে	৩০ বছর পূর্বে	৪০ বছর পূর্বে	৫০ বছর পূর্বে	বর্তমান	

১২.ক এখানে কি কি গ্রীষ্মকালীন ফসল ছিল/ বিলুপ্ত হয়েছে (পূর্বে চাষ করতেন এখন করেন না)

ক. ১০ বছর পূর্বে..... খ ২০ বছর পূর্বে... গ ৩০ বছর পূর্বে....

Dhaka University Institutional Repository

ভূ-দৃশ্য পরিবর্তনের ফলে জীব বৈচিত্র হ্রাসঃ আশুগঞ্জ উপজেলা উপর একটি পর্যবেক্ষণ মূল্যায়ন

এম ফিল প্রোজেক্ট

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘ ৪০বছর পূবে ..... ঙ ৫০ বছর পূর্বে ..... চ বর্তমান.....

১৩.খ ফসলের ধরণ ও উৎপাদন গ্রীষ্মকালনি ফসল

গ্রীষ্মকালীন শস্য নাম	উৎপাদন হার						উৎপাদন ব্যয়						আবাদী জমীর পরিমান
	১০ বছর পূর্বে	২০ বছর পূর্বে	৩০ বছর পূর্বে	৪০ বছর পূর্বে	৫০ বছর পূর্বে	বর্তমান	১০ বছর পূর্বে	২০ বছর পূর্বে	৩০ বছর পূর্বে	৪০ বছর পূর্বে	৫০ বছর পূর্বে	বর্তমান	

১৪ সংকারয়ণ হাইবিড ফসল উৎপাদন করে আপনি লাভবান হচ্ছেন...

১৫ সংকারায়ণের ফলে মূল্য প্রজাতিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে কি আপনার মনে হয়.....

১৬ ফসল বিলুপ্তির কারণ সমূহ কি কি ?

১৭ এই সকল ফসল রক্ষায় কি ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া যায় ?

১৮ আক্রান্ত গাছে কি ধরেণের কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করা হয়

১৯ ফসল উৎপাদনে সরকার কি ধরণের পদক্ষেপ নিচ্ছে

২০ ফসল উৎপাদের হার মানুষের জীবন যাত্রার উপর কি ধরণের প্রভাব ফেলে

২১ বন নিধনের ফলে পরিবেশের উপর কি ধরণের প্রভাব বর্তমানে দেখা যায়

ক) প্রাকৃতিক দূযোর্গ বৃদ্ধি খ) তাপমাত্রা বৃদ্ধি

গ) বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনশীলতা ঘ) অন্যান্য

২২) এলাকার ইকোলজিক্যাল পরিবর্তনের ধরণ

ক) পরিবর্তন হচ্ছে না খ) সামান্য পরিবর্তন হচ্ছে

গ) মোটামুটি পরিবর্তন হচ্ছে ঘ) বেশি পরিবর্তন হচ্ছে ঙ) কম পরিবর্তন হচ্ছে

২৩) ফসল উৎপাদনের পর আতিরিক্ত অংশ গুলো কি কাজে ব্যবহার করেন

ক) জ্বালানী খ) ঘরবাড়ি তৈরী গ) জৈব সার তৈরী ঘ) মাটিতে পুতে রাখেন ঙ) জলাশয় ও নিচু এলাকা ভর্তিতে ব্যবহার করেন

২৪ প্রানী সংক্রান্ত প্রশ্ন (এ সময়ের মধ্যে কি কি প্রানী বিলুপ্তি হয়েছে)

প্রানীদের নাম	৫০ বছর পূর্বের	৪০ বছর পূর্বের	৩০ বছর পূর্বের	২০ বছর পূর্বের	১০ বছর পূর্বের	বর্তমান প্রানীদের নাম নাম

২৫ আপনার পরিবারে কি কি গৃহপালিত পশু ছিল/ আছে (সম্ভাব পরিমান সহ)

ক. ১০ বছর পূর্বে..... খ ২০ বছর পূর্বে... গ ৩০ বছর পূর্বে....

ঘ ৪০বছর পূবে ..... ঙ ৫০ বছর পূর্বে ..... চ বর্তমান.....

২৬ উল্লেখিত প্রানী প্রজাতি ধ্বংস হওয়ার কারণ

ক) কি কি প্রাকৃতিক কারণে প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্ত হচ্ছে

ভূ-দৃশ্য পরিবর্তনের ফলে জীব বৈচিত্র হ্রাসঃ আশুগঞ্জ উপজেলা উপর একটি পর্যবেক্ষণ মূল্যায়ন

এম ফিল প্রোজেক্ট

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১) গাছ কমে যাওয়া ২) আবহাওয়া পরিবর্তন ৩) স্বাধু পানির অভাব ৪) তাপমাত্রা বৃদ্ধি ৫) প্রাকৃতিক দূর্যোগ

খ) মানবীয় কি কি কারণে প্রাণী প্রজাতি গুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে

১) ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ২) ঘরবাড়ি তৈরী ৩) কৃষি কাজ বৃদ্ধি ৪) কলকারখানা বৃদ্ধি ৫) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ৬) অন্যান্য

২৭) প্রাণীগুলো ধ্বংস হওয়ার মাত্রা কেমন

ক) ধ্বংস হচ্ছে খ) সামান্য গ) বেশি ঘ) কম

২৮) কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করণে প্রাণীগুলো রক্ষা করা যাবে

পাখি প্রজাতি

পাখিদের নাম	৫০ বছর পূর্বের	৪০ বছর পূর্বের	৩০ বছর পূর্বের	২০ বছর পূর্বের	১০ বছর পূর্বের	বর্তমান পাখিদের নাম

২৯ কোন কোন পাখি বর্তমানে বিলুপ্তি হয়ে গিয়েছে

৩০) পাখি বিলুপ্তির মানবীয় কারণ হারিয়ে গিয়েছে

৩১) বর্তমানে কোন কোন পাখি একদম দেখা যায় না

৩২) পাখি বিলুপ্তির প্রাকৃতিক কারণ হারিয়ে গিয়েছে

৩৩) পাখি গুলোকে কিভাবে সংরক্ষণ করা যায়

৩৪) পাখিগুলো সংরক্ষণে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছে

মৎস্য প্রজাতি

৩৫ নদীগুলোর নব্যতা কেমন?

৩৬) নদীগুলোর নব্যতা কমার কারণ কি?

৩৭) ৫০ বৎসর পূর্বে নদীতে কি কি মাছ পাওয়া যেত?

৩৮) বর্তমানে কি কি মাছ পাওয়া যায়

৩৯) কি কি মাছ বিলুপ্তি হয়ে গিয়েছে?

৪০) বর্তমানে কোন কোন মৎস হুমকীর সম্মূখীন

৪১) মাছগুলো বিলুপ্ত হওয়ার কারণ

৪২) মৎস রাজি হ্রাসের ফলে পরিবেশে কি প্রভাব পরছে

৪৩) কিভাবে মৎসরাজি সংরক্ষণে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে

ক) মৎসরাজি সংরক্ষণে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছে

৪৪) নদীতে শিশুক এর পরিমান কেমন

ক) কম খ) সামান্য গ) মোটামোটি ঘ) বেশি

৪৫ শিশুকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণ কি

ক) আবাস্থন পরিবর্তন খ) প্রাকৃতিক দূর্যোগ গ) অন্যান্য

৪৭) জীব বৈচিত্র রক্ষায় বর্তমান আপনারা কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন

৪৮) জীব বৈচিত্র ধ্বংসের ফলে পরিবেশগত কি কি অসুবিধার হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন।

৪৯) আপনার বাড়ীর পাশে কোন প্রকৃতির গাছ হয়.....

ভূ-দৃশ্য পরিবর্তনের ফলে জীব বৈচিত্র হ্রাসঃ আশুগঞ্জ উপজেলা উপর একটি পর্যবেক্ষণ মূল্যায়ন

এম ফিল প্রোজেক্ট

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫০ জ্বালানী কাজে কোনটি ব্যবহার করেন : কাঠ/ কেরোসিন/ হ্যাজাক/ বিদুৎ/ বায়ূ গ্যাস

৫১ আলোর ব্যবস্থা : কুপি/ হারিকেন/ হ্যাজাক/ বিদুৎ/ বায়ূ গ্যাস / সৌর শক্তি

৫২ গৃহ কর্তার আবাসস্থলের বিবরন

ক) আবাসস্থল: নিজ/ ভাড়া

খ) ঘরের সংখ্যা -------- গ) ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কবে------ ঘ কারণ----------

ঙ) ঘরের প্রকৃতি------১ পাকা ২ আধাপাকা গ কাচা ঘ বস্তি ঙ টিন চ অন্যান্য

চ) পয়নিস্কাশনের ব্যবস্থা: কাচা টয়লেট/ স্যনিটারী টয়লেট/ উম্মমুক্ত স্থান/ অন্যান্য

ছ) খাবার পানির উৎস: ওয়াসা/ চাপকল/ কূয়া/ অন্যান্য

জ) অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত পানির উৎস : চাপকল/ নদী/ কূয়া/ পুকুর

ঝ) পানি আর্সেনিক মুক্ত কিনা : হ্যাঁ/ না

ঞ) আপনার বাড়িটি কোথায় তৈরী করেছেন ফসলি জমি/ চারা- বিরচা / পতিত জমি

৫৩ এলাকার পরিবহনের ধরণ

ক নিকটবর্তী : বাস/ রিক্সা/ ভ্যান বা ঠেলা গাড়ি/ অন্যান্য

খ দূরবর্তী স্থান: বাস/ লঞ্চ/ ট্রাক/ ট্রেন/ অন্যান্য

৫৪ পরিবহন পথের ধরণ ও পরিবর্তনের সময়

ক. কাঁচা সড়ক ------- খ পাকা সড়ক------

গ আধাপাকা------- ঘ জলপথ--------- ট্রেন--------

৫৫ কৃষি কাজে পানির ব্যবহার: নদী/ গভীর নলকূপ/ খাল থেকে পানি সেচ/ অন্যান্য

৫৬ কৃষির ধরণ: শস্য উৎপাদন/ মৎস্য খামার/ পশু পালন/ বাগান কৃষি/ অন্যান্য

৫৭ এলাকাটিতে নদী ভাঙ্গনের প্রবনতা : আছে/ নেই

৫৮ নদী ভাঙ্গন এর কারণ কি

৫৯ ভূমির মূল্য: প্রতি শতাংশ জমির মূল্য(টাকায়) ক. ১০ বছর পূর্বে..... ২০ বছর পূর্বে..... ৬০ বছর পূর্বে..... ৪০বছর পূবে..... ৫০ বছর পূর্বে .....

৬০ বর্তমান জমির ব্যবহার পরিবর্তিত হয়েছে কি না : ---- হ্যা/ না

৬১ বর্তমানে ভূমি ব্যবহারের পরিমান শতাংশ

সময়	বাড়ি	বাগান	পুকুর	কৃষি জমি	কৃষিযৌগ পতিত	পতিত
বর্তমান						
১০ বছর পূর্বে						
২০ বছর পূর্বে						
৩০ বছর পূর্বে						
৪০ বছর পূর্বে						
৫০ বছর পূর্বে						

৬২ মানুষ কোন ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে বেশি যুক্ত ছিল.....

Dhaka University Institutional Repository

ভূ-দৃশ্য পরিবর্তনের ফলে জীব বৈচিত্র হ্রাসঃ আশুগঞ্জ উপজেলা উপর একটি পর্যবেক্ষণ মূল্যায়ন

এম ফিল প্রোজেক্ট

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ক. ১০ বছর পূর্বে..... খ ২০ বছর পূর্বে... গ ৩০ বছর পূর্বে....

ঘ ৪০বছর পূবে ..... ঙ ৫০ বছর পূর্বে ..... চ বর্তমান.....

৬৩ এলাকাটিতে কোন বছর হতে বনায়ন করা হয়েছে

৬৪. এই বনায়নে কি কি গাছ লাগানো হচ্ছে

৬৫. আবাসিক এলাকা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পৌরসভা কর্তৃক অনুমোদিত কিনা .. হ্যা/ না

৬৭ পরিবেশগত প্রভাব : বিগত ৫০ বছরের মধ্যে আপনার নিজস্ব কোন নিম্নভূমি এলাকা ভরাট হয়েছে:

বিগত ৫০ বছরের মধ্যে আপনার নিজস্ব কোন ভূমির উপর দিয়ে রাস্তা তৈরী হয়েছে কি... হ্যা/না

হলে তার পরিমান কত.../ এর ফলে আপনার কোন ক্ষতি/ লাভ হয়েছে ....

৬৮ বিগত বছরগুলোর মধ্যে আপনি কটি গাছ রোপন এবং কর্তন করেছেন

ক. ১০ বছর পূর্বে..... টি রোপন..... টি কর্তন

খ ২০ বছর পূর্বে... ..... টি রোপন ..... টি কর্তন

গ ৩০ বছর পূর্বে.... ..... টি রোপন ..... টি কর্তন

ঘ ৪০বছর পূবে .... টি রোপন ..... টি কর্তন

ঙ ৫০ বছর পূর্বে ..... টি রোপন ..... টি কর্তন

চ বর্তমান.....